ISSN-2277-8780

আমি অরণি

(সাহিত্য ও গবেষণামূলক ষান্মাসিক পত্রিকা)

৫ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা আশ্বিন ১৪২৩ / অক্টোবর ২০১৬

শারদ সংখ্যা ১৪২৩

সম্পাদক

সঞ্জিত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডঃ শর্মিলা দাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী

ডঃ কনক মৈত্র, ডঃ দেবীপ্রসাদ নাগ চৌধুরী, বিপুল রঞ্জন সরকার, গৌতম বসু, ডঃ জয়ন্ত মেটে, বাদল দত্ত, ডঃ চন্দ্রিমা বসু, ডঃ বিশ্বম্ভর মণ্ডল।

সম্পাদক মণ্ডলী

ডঃ বিভাস গুহ, ড. সুব্রত মণ্ডল, ড. অনসূয়া বাগচি, ডঃ সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শান্তনু সেন, জয়দেব হালদার, দেবজ্যোতি রায়, মিহির নাথ, গোপাল দে।

প্রকাশক

সুরজিত রায়

সম্পাদক

সঞ্জিত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডঃ শর্মিলা দাস

প্রচ্ছদ ঃ বাদল দত্ত

ঃ যোগাযোগ ঃ

9635359025, 9434552238, 9434165623, 9635508115
e-mail : sanjitdhanicha@rediffmail.com
sarmiladas16@rediffmail.com
amiarani@rediffmail.com

ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ

সঞ্জিত দাস / ডঃ শর্মিলা দাস
গ্রাম ঃ ধনিচা নূতন পাড়া, পোঃ চাকদহ, জেলা - নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড ঃ ৭৪১২২২

১৫০ বর্ষে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন

প্রবন্ধ

ডঃ সুরঞ্জন মিদ্দে

প্রথম বিজ্ঞানসম্মত সাহিত্য ইতিহাস ঃ

১৮৯৬ খ্রীঃ। দীনেশচন্দ্রের বয়স মাত্র ৩০ বছর। লিখে ফেললেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত। শুরু করেছিলেন আরো ১০ বছর আগে থেকে। ২০ বছর বয়সে, ছাত্রাবস্থায় শুরু করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার শ্রমসাধ্য গবেষণা। বইটির নাম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬)। দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬ - ১৯৩৯) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) অবিসংবাদিতভাবে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সুলিখিত ইতিহাসও। পাঁচবছরের কনিষ্ঠ দীনেশ চন্দ্রের সঙ্গে তখনও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়নি। সাক্ষাৎ হয়নি বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষের সঙ্গেও। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'(১৮৯৬) প্রকাশের পাঁচ বছর পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় ১৯০১ খ্রীঃ। আরও পাঁচ বছর পর ১৯০৫ খ্রীঃ স্যার আশুতোষের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি প্রকাশের আগে সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল বেশ কয়েকজনের রচনা। যা এক ঝলকে দেখে নেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা শুধু বাংলা ভাষাতে নয়, ইংরেজিতেও হয়েছিল।

১৮২০ — জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধান বিলাস'।
১৮৩০ — কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'On Bengali Works and Writes'.
১৮৫২ — রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙালী কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'।
১৮৫৩ — ঈশ্বরগুপ্তের 'অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য' (সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত)
১৮৫৩ — বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'।
১৮৬৯ — হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবি চরিত' (প্রথম খন্ড)
১৮৭১ — মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস'(প্রথম খন্ড)
১৮৭১ — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'Bengali Literature' (Calcutta Review-তে প্রকাশিত)।
১৮৭৩ — রামগতি নায়রত্নের 'বাঙালী ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (শিক্ষাগুরু বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণায় প্রকাশিত)
১৮৭৭ — রমেশচন্দ্র দত্তের 'The Literature of Bengal'.
১৮৭৮ — রাজনারায়ণ বসুর 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য'।
১৮৭৯ — গঙ্গাচরণ সরকারের (অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা) 'বঙ্গ সাহিত্য ও বঙ্গভাষা'।
১৮৮১ — হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বর্তমান শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য'।
১৮৯৬ — দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

উপরিলিখিত তালিকা দেখে আমরা আশ্চর্য হই - ১৮২০ খ্রীঃ থেকে ১৮৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় ৭৫ বছর ধরে বাঙালি চিন্তাবিদরা যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা করেছেন; তাতে কোন সাহিত্যের ইতিহাসের পরিপূর্ণ কাঠামো গড়ে ওঠেনি। গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দুটি খন্ডের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সম্পূর্ণ কাঠামোর ভীত তৈরী করেন। দীনেশচন্দ্র সেনের আগে অন্তত ১৩ জন বুদ্ধিজীবি বাঙালি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে কলম ধরেছেন। এই বিশিষ্ট বাঙালিদের মধ্যে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আছেন। আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো পন্ডিত বরেণ্যগণ। অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানীক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারেননি। অথচ অখ্যাত গ্রামীণ গবেষক দীর্ঘ ছয় বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গড়ে তুললেন - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বুনিয়াদ। যা শুধু বাঙালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে নয় ইউরোপে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। ইউরোপীয়দের কাছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে প্রবল আগ্রহী করে তোলে। পরাধীন ভারতবর্ষের তখনও কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী । তখনও দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও ভাবে যুক্ত হননি। নিজের আত্মবিশ্বাস, অসাধ্য অনুশীলনে দুটি খন্ডে প্রকাশ করলেন — বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ইতিকথা; 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা ধীরচন্দ্র দেববর্মনকে উৎসর্গ করেছিলেন। সম্ভবত ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র এই গ্রন্থের জন্য আর্থিক সহায়তাও করেছিলেন। অবিভক্ত বঙ্গদেশে তার নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির ইতিকথা দেশী - বিদেশী সকলের কাছে দুর্বার কৌতূহল সৃষ্টি করল। দীনেশচন্দ্র সেনের জীবিতকালেই সাত-সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত বাংলার বিদগ্ধ সমাজে স্মরণীয় সাড়া ফেলে দিল। আর প্রত্যেক সংস্করণে বেশ কিছু পরিবর্তন বর্জন ও সংযোজন করে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি আরও সর্বজন গ্রাহ্য করে তুললেন। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় পাঁচ বছরের মধ্যে।

প্রথম সংস্করণ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬।
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০১।

প্রথম সংস্করণ গ্রন্থটি প্রকাশকালে ত্রিপুরেশ্বর বীরচন্দ্র দেব বর্মন তখন মৃত্যুশয্যায়। যিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। রাজা বীরচন্দ্র দেব বর্মনের মৃত্যুশয্যায় গ্রন্থটি রাখা হয়েছিল। তিনি পড়তেও শুরু করেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবার আগেই মারা গেলেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র লেখেন — তাঁর হৃদয় বিদারক আর্তি। প্রথম সংস্করণ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ যে অনেক বেশি সংযোজন ঘটেছে তা বলাই বাহুল্য। তিনি লিখেছেন —

"যে সকল পুথি, আমার এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হবার পর আবিষ্কৃত হইয়াছে, বর্তমান সংস্করণ অধিকাংশের ন্যূনাধিক বিবরণ দিয়াছি। ...... এবার এই পুস্কখানির পূর্ব্ব সংস্করণের আয়তনের অন্যূন এক চতুর্থাংশ বাড়িয়া গেল। এই সংশোধন পরিবর্তন

এবং পরিবর্দ্ধনাদি ব্যাপারে আমাকে যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। তথাপি প্রাণান্ত পরিশ্রমে তাহা করিয়াছি। কখনও কখনও কিছু লিখিয়া এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি যে ১০-১৫ দিন শয্যা হইতে উঠিতে সমর্থ হই নাই।"

উপরিলিখিত দীনেশচন্দ্রের এই জবানী থেকে স্পষ্ট হয় কতখানি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত প্রায় ১১ বছর ধরে অক্লান্ত অনুশীলন করে গেছেন। শুধু শারীরিক নয় মানসিক চাপ সহ্য করে - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থ বাঙালির জন্য 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' উপহার দিয়েছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে জানতে পারি শিক্ষা বিভাগের পরিচালক পেড্লার সাহেব বিদ্যালয়গুলোর জন্য ৭০ কপি ক্রয় করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই বদান্যতা পেয়ে দীনেশচন্দ্র অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আর সেই প্রেরণা তৃতীয় সংস্করণের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রথম পুঁথি আবিষ্কারক বিশে-ষণ ঃ

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকাটি উলে-খযোগ্য। পঞ্চম সংস্করণের বিশেষ গৌরব হচ্ছে রেভারেন্ড জেমস্ লঙের ক্যাটালোগ গ্রন্থটির পুরোপুরি সংযোজন। পরিশিষ্টে লঙ সাহেবের গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ১১০। জেমসের ক্যাটালোগে ১৮০০ খ্রীঃ থেকে ১৮৫৫ খ্রঅঃ পর্যন্ত ১৪০০ টি প্রকাশিত পুস্তকের তালিকার বিবরণ আছে। যা উনিশ শতক তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একমাত্র মূদ্রিত নমুনা। জেমস্ সাহেবের ক্যাটালোগটি সেই সময় খুবই বিরল ছিল। সাহিত্য ঐতিহাসিক দনিেশচন্দ্র সেনের দূরদর্শিতায় ক্যাটালোগটি পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যভাগ পর্যন্ত একটা প্রামাণিক নমুনা পাওয়া গেল। অতীব দুস্প্রাপ্য লঙ সাহেবের ক্যাটালোগটি আধুনিক পাঠক, গবেষককে নতুন দিগন্তে প্রসারিত করেছে।

১৯২৬ খ্রীঃ ১৫ ডিসেম্বর দীনেশচন্দ্র সেন, পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় লিখলেন — "লঙ সাহেবের খ্যাটালোগ ছাড়া আরো অনেক নূতন বিষয় এই সংস্করণে অন্তর্গত করা হইল। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সন্দর্ভ, রামবাবুর নব তথ্যপূর্ণ জীবনী এবং অপরাপর বহু বিষয় এবার নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। বহু ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। ... এক কথায় এই নব সংস্করণের নিকট চতুর্থ সংস্করণও একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল।"

এ পর্যন্ত আমরা প্রথম থেকে পঞ্চম সংস্করণ পর্যালোচনা করে বলা যায় - প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি কিংবা দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টি - চতুর্থ - পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত পর পর নয়া সংযোজন হয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সাহিত্য ইতিহাস গ্রন্থটি তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিবৃত্তে এক স্মরণযোগ্য সংকলন গ্রন্থ তথা মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সেন প্রধানত একজন প্রখ্যাত পুঁথি গবেষক। পুঁথি গবেষণাসূত্রে, তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে ভ্রমণ করে, গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে অসংখ্য পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের দিয়েও এই সংগ্রহের কাজ করিয়েছিলেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর জীবন

সাধনার সুদীর্ঘ ৫০ বছর ধরে নিজেও নতুন তথ্যের সন্ধান করেছেন। অজস্র নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই নতুন তথ্য এসেছে প্রাচীন পুঁথি, পান্ডুলিপি,দলিরপত্র, চিত্র এবং নকশা মানচিত্র। তিনি গ্রামে গ্রামে পদব্রজে ভ্রমণ করে প্রায় ১০০টি দুস্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করে, এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক হর্নলি সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হর্নলি সাহেব, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থকে তার কাছে পাঠান। বিনোদবিহারী মাসে ১-২ যেতেন কিন্তু বছরের বেশির ভাগই সময় তিনি নিজেই গ্রামে গ্রামে অসংখ্য পুরাতন পুঁথি উদ্ধার করেন।

১৯১০ খ্রীঃ দীনেশচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্যপদে মনোনীত হন। ২০ বছর এই পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২০ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়। দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান। ১৯২০ থেকে ১৯৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'রামতনু লাহিড়ী' এবং ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে আসীন ছিলেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে যিনি তাঁকে সাহসী ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন - তিনি হলেন বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন প্রায় দশ হাজার পুঁথি সংগ্রহ করান। সেই অসংখ্য পুঁথির তালিকাও প্রস্তুত করান।

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন সারাজীবন ধরে পুঁথি সংগ্রহ করে পুঁথির উপকরণ মূল্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিকাশ ও সমৃদ্ধির ইতিবৃত্ত লিখতে সাহায্য করে এই বিপুল পরিমাণ পুঁথিগুলি। তিনি পুঁথিগুলি পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন ভাষার আঙ্গিকের বিবর্তন। সময়ের সঙ্গে বাংলা লিপি ও উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি বাংলা পুঁথিগুলি পর্যালোচনা করে,দেখান বৃহত্তর অখন্ড বৃহৎ বঙ্গের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসেরও বিবর্তন ঘটেছে। যা বাংলার ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন বাঙালির ইতিহাস নেই বলে। সেই ক্ষত কিছুটা হলেও আচার্য দীনেশচন্দ্র পূরণ করেছিলেন। কারণ বাংলার ইতিহাস লুকিয়ে আছে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে। সেই সূত্র নিহিত আছে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য পুঁথির মধ্যে।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন শুধু পুঁথি আবিষ্কার করেননি। সেইসঙ্গে বাংলা লিপির বিবর্তনমূলক ফটোচিত্র সংগ্রহ করেছিলেন। আবিষ্কার করেছিলেন বাংলার বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানের চিত্র। আবার শুধু ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক মানচিত্র নয়, পৌরাণিক দেবদেবী এবং ঐতিহাসিক মহান ব্যক্তিদের রঙিন চিত্রও অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করেছিলেন। এক কথায় বলা যায় - আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের আকরভূমির রূপস্রষ্টা। যাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানীক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে শিল্পচেতনা বিকাশ ঘটেছে। বাঙালী জাতির সার্বিক পরিচয়ের জন্য গভীর জীবন সত্য তিনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি বিদেশী চাকরী, অর্থের প্রলোভন থেকে দূরে সরে গিয়ে বঙ্গভূমির প্রেমে নিজেকে নিমজ্জিত রাখেন।

তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি ১৮৯৬ থেকে ১৯৪১ খ্রীঃ পর্যন্ত ৭টি সংস্করণ হয়েছিল। তিনি জীবিত ছিলেন ১৯৩৯ খ্রীঃ পর্যন্ত। তিনি দেখে গেছেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি সপ্তম সংস্করণ হতে যাচ্ছে। আর অষ্টম সংস্করণটির ভূমিকা লিখেছিলেন তাঁর পুত্র বিনয়চন্দ্র সেন। পুত্র লিখছেন পিতার পুস্তক সম্পর্কে —

"বর্তমান সংস্করণ যে পূর্ব্ববর্তী সংস্করণের প্রায় অবিকল পুনমূর্দ্রণ, ইহা স্পষ্টভাবে জানাইবার জন্যই উপরিউক্ত সামান্য পরিবর্তন ও সংশোধনের কথা উলে-খ করিলাম। মুদ্রণের পূর্ব্বে পন্ডিতপ্রবর ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম.এ.ডি.লিট. (প্যারিস) মহাশয় গ্রন্থখানি আদ্যপ্রাপ্ত পাঠ করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত 'পরিশিষ্ট' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অষ্টম সংস্করণের শেষভাগে সংযোজিত করা হইয়াছে।"

দীনেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঃ

১৮৯৬ খ্রীঃ যখন দীনেশচন্দ্র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন; তখনও পর্যন্ত কবির সঙ্গে পরিচয় ছিল না। পাঁচ বছরের ছোট দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয় ১৯০১ খ্রীঃ। বাংলার বাঘ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়ের পাঁচবছর আগেই কবির সঙ্গে পরিচয় হয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটির জন্য ডাকযোগে দীনেশচন্দ্রকে অভিনন্দন পাঠান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এই শুরু আজীবন দুজনের মধ্যে জাগরুক ছিল। পত্র বিনিময় ছিল দু'জনের। অসংখ্য চিঠিপত্র দু-জনই পরস্পরকে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সর্বদা দীনেশচন্দ্রকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ইতিহাস এবং সাহিত্যের বিচারে দুজনের পত্রাবলির গুরুত্ব অপরিসীম। অবশ্য বেশিরভাগ পত্রই ছিল দুই যুগ স্রষ্টার পুস্তক পর্যালোচনাভিত্তিক আলোচনা। দীনেশচন্দ্র গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে, আবার গুরুদেব এসেছিলেন বাগবাজারের বাড়িতে। দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র অরুণ সেনকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে পড়াশুনার জন্য ভর্তি করিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্রকে প্রিয়বরেষু, প্রীতিভাজনেষু, বন্ধুবরেষু সম্বোধনে পত্র লেখেন। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছিলেন 'প্রিয়বরেষু' শব্দবন্ধটি। দীনেশচন্দ্র কবিকে শ্রদ্ধাভাজনেষু ও ভক্তিভাজনেষু সম্বোধনে পত্র লিখেছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের প্রখ্যাত 'রামায়ণী কথা' গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লিখেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

" কবিকথাকে ভক্তের ভাষার আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পুজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা - এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। ...... ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজা মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘন্টা নাড়িবার ভার দিলেন। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়ণ থেকে স্পষ্ট হয় - তিনি দীনেশচন্দ্রের রচনার একজন নিবিড় পাঠক। দীনেশচন্দ্রকে যেভাবে তিনি পর্যালোচনা করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য সঠিক বিশে-ষণে দীনেশচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্য ইতিহাসে চিহ্নিত করেছেন।

দেশ - বিদেশে দীনেশচন্দ্র ঃ

দীনেশচন্দ্র শুধু বাংলা ভাষা গ্রন্থ রচনা করেননি। বাংলা ভাষা সাহিত্য প্রসারে ও প্রচারে ইংরেজিতে গ্রন্থ প্রকাশ করে বিশ্বের দরবারে সম্মানিত হয়েছেন। বিশেষ করে পরাধীন ভারতবর্ষে একজন স্বদেশপ্রেমিক মানুষের স্বদেশচর্চা করেছিলেন, সারা জীবনের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। ইংরেজিতে গ্রন্থ লিখে প্রমাণ করলেন, ভারতীয়রা আন্তর্জাতিক মানের লেখক গবেষক হতে পারেন। ইংরেজিতে তাঁর গ্রন্থগুলি হল -

1. Mediaeval Vaishnava Literature.
2. Chaitanya and his companies.
3. Folk Literature of Bengal.
4. Bengali Ramanayas.
5. Glimpses of Bengal.
6. Chaitanya and his age.
7. Bengal prose style.
8. Eastern Bengal Ballades.
9. History of Bengali Language and Literature.
10. Typical selections from old Bengali Literature.

উপরিলিখিত ১০ নম্বর গ্রন্থটি তাঁর প্রধান কীর্তি। দীর্ঘ ভূমিকাসহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থটি দুটি খন্ডে প্রকাশিত হয়। ৭ নম্বর গ্রন্থটি ইউরোপ ও আমেরিকায় সুখ্যাতি এনে দেয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকার বহু প্রসিদ্ধ পত্র পত্রিকায় গ্রন্থটির উচ্চ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ৬ নম্বর গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন প্রখ্যাত ফরাসি পন্ডিত সিলভাঁ লেভি। ১ নম্বর গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে.ডি. এন্ডারসন। ৪ নম্বর গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন স্বয়ং ভারতের সচিব লর্ড জেটল্যান্ড। বাংলা ও ইংরেজিতে নয় 'Eastern Bengal Ballades'গ্রন্থটি ফরাসি ভাষাতে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক রোমাঁ রোঁলার বোন পূর্ব্ববঙ্গের পলী-গীতিকার ফরাসিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। ১৯২২ খ্রীঃ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেনকে ডি.লিট. উপাধি দান করেন। ১৯১১ খ্রীঃ তাঁর 'History of Bengali Language and Literature'গ্রন্থটিও আরও এক স্মরণীয় কীর্তি। যে গ্রন্থটি বিদেশে সবচেয়ে আলোড়িত করেছিল সেটিই ছিল এটি। যা রবীন্দ্রনাথের নোবেলপ্রাপ্তির দু বছর আগে প্রকাশিত হয়ে দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়। আচার্য দীনেশচন্দ্র প্রথম পরাধীন ভারতীয় যাঁর গবেষণাগ্রন্থ বিশ্বখ্যাতি এনে দিয়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই এই সম্মান অর্জন করেছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাদনা: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -

প্রকাশকাল : আগষ্ট, ১৯৮৬ (নবম সংস্ককরণ) - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)

২. বৃহৎবঙ্গ — দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম প্রকাশ: ১৯৩৫, দে'জ তৃতীয় পুনর্মূদ্রণ - মার্চ ২০০৬ (সুধাংশুশেখর দে),. প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১ম ও ২য় খন্ড)

৩. রামায়ণী কথা — দীনেশচন্দ্র সেন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সম্বলিত), প্রথম প্রকাশ ১৩১০, প্রথম তুলসী সংস্করণ ১লা বৈশাখ ১৪১০ (ত্র্যশীতি সংস্করণ)

৪. চিঠিপত্রঃ রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র সেন — সম্পাদনায় : দেবকন্যা সেন; প্রকাশকাল: একুশের বইমেলা ২০১৫, একুশে বাংলা প্রকাশন - ঢাকা বাংলাদেশ (২১/২. পুরানো পল্টন ঢাকা - ১০০০)

৫. স্মরনিকা ২০১৫ — আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটি, হ্যালো কলকাতা - কলকাতা বইমেলা ২০১৫।

৬. স্মৃতি বিস্মৃতি (সূচিপত্রঃ পৃঃ ১২২ : দীনেশচন্দ্র) — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৬৯, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ: এপ্রিল ১৯৯৮।

৭. বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য — আহমদ শরীফ, নয়া উদ্যোগ কলিকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০১৪ (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)

৮. বহুমাত্রিক রবীন্দ্রনাথ — সুরঞ্জন মিদ্দে, প্রথম প্রকাশ: ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ (ফাদার দ্যতিয়েনের ৯২তম জন্মদিন), প্রকাশক: রূপসী বাংলা (২০ এ রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা ৬)।

বনলতা সেন

বিপুল রঞ্জন সরকার

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকার মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি খরে আসে--সব নদী--ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

শুধু একটি কবিতা দিয়ে একজন কবিকে পরিচায়িত করার দৃস্টান্ত সাহিত্যে দুর্লভ। শুধু এই কবিতাটি রচনা করেই যদি জীবনানন্দ কাব্য চর্চার শুরু এবং শেষ করতেন, তাহলেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্ভবত কাব্যরসিকের নজর এড়াতো না। কবিতাটি নিশ্চিতভাবে বিংশ শতকের সর্বাধিক পঠিত বাংলা কবিতার অন্যতম। আমরা এখানে এককভাবে এই কবিতাটির আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকব। প্রথমে রসগ্রাহী পর্যালোচনা এবং তারপর কবিতা রচনার পটভূমিকা উপস্থাপিত করাই আমাদের লক্ষ্য।

শিরোনাম এক নারী চরিত্র। অক্ষরবৃত্ত ও পয়ারে বিন্যস্ত আঠারো পংক্তির কবিতাটি তিনটি স্তবকে বিভক্ত। প্রতিটি স্তবকের অন্তে উল্লিখিত 'বনলতা সেন'। কেউ সুদীর্ঘকাল সুদীর্ঘ পথপরিক্রমা করে অবশেষে ঘরে ফেরে। তার ভ্রমণ দেশ এবং কাল অতিক্রম করে বিস্তীর্ণ

জগতে। কোথাও শান্তির সন্ধান পায়নি। পরিশেষে নাটোরে বনলতা সেনের সান্নিধ্যে তার জীবনে শান্তি আসে। এমন প্রশান্ত সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ তার জীবনে আগে কখনো ঘটেনি। তার অবস্থা সমুদ্রের হাল ভাঙা দিক্‌ভ্রস্টনাবিকের মত। সবুজ ঘাসের দেশ এবং তার উপর দারুচিনি দ্বীপের সন্ধান পাওয়ায় পরম স্বস্তি বোধে নিমজ্জিত। কারণ, বনলতা সেনের সান্নিধ্য।

কবিতাটি মূলত স্নিগ্ধ প্রেমের কবিতা। কেন্দ্রবিন্দুতে এক রোমান্টিক সৌন্দর্য্য প্রতিমা - বনলতা সেন। সে 'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে' তাকায়, সে 'দুদণ্ড শান্তি' দেয়। পরিশেষে যখন দিবাবসানে শিশিরের শব্দের মত সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ চিল মুছে ফেলে, পৃথিবীর সব রঙ নিভে যায়, জোনাকির রঙে ঝিলমিল করে, সব পাখি ঘরে আসে, সব নদীর মোহনায় মিলন ঘটে এবং জীবনের সব লেনদেন ফুরিয়ে যায়, তখন অবশিস্ট 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।' অতি সংক্ষেপে কবিতাটির মর্মবাণী এভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। তবে আমরা আরেকটু বিশদভাবে স্তবক ধরে আলোচনার চেস্টা করব।

প্রথম স্তবকটিতে হাজার বছর ধরে ক্লান্তিকর ভ্রমণের কথা বিন্যস্ত। হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে পথে পরিক্রমা সেই পথিকের। যাত্রার ব্যাপ্তি সিংহল সমুদ্র থেকে অন্ধকার মালয় সাগর পর্যন্ত। ইতিহাসের গণ্ডী অতিক্রম করে অবাধ বিচরণ তাঁর, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে। তাঁর উপস্থিতি সর্বত্র, এমনকী বিস্মৃতপ্রায় বিদর্ভ নগরীতেও। এই সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় তাঁর ক্লান্তি অপরিসীম। এ হেন পরিবেশে তার জীবনে আবির্ভাব বনলতা সেনের। জীবনের আর সবই যেখানে একঘেয়ে, ক্লান্তিকর, সেখানে বনলতা সেনের স্নিগ্ধ প্রেম তার জীবনকে প্রশান্তি শুধু নয়, পূর্ণতা দান করে।

দ্বিতীয় স্তবকটি ঘিরে রয়েছে বনলতা সেনের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা। তার চুলের বিন্যাস, প্রাচীনকালের 'অন্ধকার বিদিশার' নিশার মত। তার মুখাবয়ব অনিন্দ্যসুন্দর - যেন তাতে 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' বিদ্যমান। কবির অনুভূতি এখানে অসাধারণ এক চিত্ররূপময়তায় পূর্ণ। বনলতা সেনকে দেখে তাঁর অনুভূতি হাল ভেঙে দিশা হারানো নাবিক যখন অকস্মাৎ গভীর সমুদ্রে কোন দ্বীপ দর্শনে পরম স্বস্তিলাভ করে, তার মত। উপরন্তু এই দ্বীপ সাধারণ নয়, সবুজ ঘাসের দেশ 'দারুচিনি দ্বীপ'। যখন তিনি দিশাহারা হয়ে পরিত্রাণ লাভের জন্য ব্যাকুল, তখন কবির উদ্‌ভ্রান্ত অনিশ্চিত জীবনে বনলতা সেনের আবির্ভাব। সে 'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে' তাঁর দিকে তাকায়। এ দৃস্টি অসামান্য সৌন্দর্যমণ্ডিত, কুহেলিকাময়ও বটে। তাঁর ইশারা উপেক্ষা করে সাধ্য কার? এই পংক্তিটি বিবিধ অর্থবাহী। কবির জীবনে নেমে আসে গভীর প্রশান্তি।

শ্রাবস্তী ঐতিহাসিক নগরী, অধুনা উত্তর প্রদেশে রাপ্তি নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। এখানে বুদ্ধদেব তাঁর সন্ন্যাস জীবনের বৃহত্তর সময় অতিবাহিত করেন। শ্রাবস্তীর প্রধান স্তূপগুলি জেতাবন এবং পাবারামা। সন্নিকটে গভীর বন। এই নগরীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বুদ্ধদেবের স্মৃতি। প্রাচীন শ্রাবস্তীর দেয়াল এখনও বিদ্যমান। এর ভেতরে রয়েছে সুপ্রাচীন অঙ্গুলিমালার স্তূপ, অনাথপিণ্ডকের স্তূপ এবং একটা প্রাচীন জৈন মন্দির। কারুকার্যের যে উল্লেখ কবিতাটিতে করা হয়েছে, তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন

কারুকার্যের সন্ধান কোনারক, খাজুরাহো, অজন্তায় সুলভ। তথাপি এই স্থানগুলির উল্লেখ না করে শ্রাবস্তীর কারুকার্য শব্দগুচ্ছের উল্লেখ একটা মাদকতা, একটা মদিরতার আবেশ সৃস্টি করে। শোনা যায় ধ্বনিময় এক সঙ্গীতের অনুরণন। এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যের তুলনায় প্রাচীন ইতিহাসের অনুষঙ্গে বনলতা সেনের মুখমণ্ডলীর অপরূপ সৌন্দর্যের আভাসদানেই কবি সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। এর বিকল্প কোন শব্দগুচ্ছ এভাবে পাঠকহৃদয়ে প্রত্যক্ষ আবেদন রাখতে পারত কিনা সন্দেহ। আবার উল্লেখ করা হয়েছে 'বিদিশার নিশা'। এক্ষেত্রেও আগের কথাই প্রযোজ্য। বিদিশা অধুনা মধ্যভারতে অবস্থিত সুপ্রাচীন একটি শহর। প্রাচীনত্বের বিচারে শ্রাবস্তীর চেয়েও পুরনো, ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই শহরটি পরিত্যক্ত হয়, যদিও বহু পরে আবার কর্মচঞ্চল জনপদে পরিণত হয়। কালিদাস মেঘদূত-এও এর উল্লেখ করেন। সম্রাট অশোক রাজপুত্র রূপে এই নগরী শাসন করেন এবং এখানে তিনি তাঁর বৌদ্ধ সম্রাজ্ঞী বিদিশা দেবীকে পত্নী রূপে লাভ করেন। এখানেও প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান। এর ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক তাৎপর্যের তুলনায় প্রাচীনত্বের আশ্রয়ে অধুনালুপ্ত, প্রায়ান্ধকারে বিলীন সভ্যতার অনুষঙ্গে রচিত 'বিদিশার নিশা' যে আবেশ সৃস্টি করে, তা তুলনারহিত। অন্য কোনভাবে তা সম্ভব হত কিনা, বলা কঠিন।

শেষ স্তবকটিতে কবির মনে হয়, জীবনের অবসান আসন্ন। শিশিরের শব্দ শীতের বা সমাপ্তির ইঙ্গিতবাহী। দিনের শেষে যেভাবে চিলের ডানা থেকে রোদের গন্ধ মুছে যায়, নদী গিয়ে মেশে তার অন্তিম মোহনায়, জীবন মেশে মৃত্যুতে, তখন পৃথিবীর সব আলো মুছে যায়। অন্ধকারে জ্বলে দু'একটি জোনাকি, ক্ষীণ প্রাণের চিহ্ন। জীবনভোর সব হিসেব নিকেশ শেষ হয়, তৈরি হয় পাণ্ডুলিপি। তখন সব ভেদাভেদের অবসান। এক রঙ গ্রাস করে সব। তখন শুধু অন্ধকারে মুখোমুখি বসে গল্প করার জন্য অবশিস্ট থাকে নাটোরের বনলতা সেন।

কবিতাটির প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি উপমা, প্রতিটি চিত্র এক স্বপ্নলোকে আমাদের পৌঁছে দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' - 'দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে/খুঁজিতে গেছিনু কবে পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে" অনুষঙ্গ মনে পড়ে না কী! বনলতা সেন আমাদের অতীতাচারী করে, দেশ কালের গণ্ডী মুছে দেয়, পৌঁছে দেয় নামগোত্রহীন কোন চিরন্তন রোমান্টিকতার গভীরে। আসলে বনলতা সেন চিরন্তন সৌন্দর্যপ্রতিমা, শাশ্বত নারীর প্রতিভূ, চিরন্তন প্রেমের আবেদন নিয়ে তার উপস্থিতি। এই রূপ এবং এই প্রেমের আবর্তে ঘূর্ণ্যমান চিরকালের প্রেমপিয়াসী। জীবনে যতই দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণা, ক্লান্তি থাকুক না কেন, প্রেমের আবির্ভাব তাকে স্নিগ্ধতা দান করতে পারে। প্রেমে মানুষ জীবনের পূর্ণতা খুঁজে পায়। জীবন হয়ে উঠে অর্থবহ। জীবনানন্দ যে প্রেমচিত্রণ এখানে করেছেন, তা আবহমানকাল সব কবি, সব শিল্পীর ঈপ্সিত। তাঁরা তাঁদের সৃস্টিতে এই প্রেমকে অমোঘ, বাঙ্ময় করে তুলতে চেয়েছেন। জীবনানন্দ 'বনলতা সেন' নির্মাণ করে যে ভাবে সফল, 'মোনালিসার' স্রস্টা সম্ভবত একইভাবে আপন সৃস্টিতে সফল। মানসিকতায় সম্ভবত উভয়ের অবস্থান একই অনুভূমিতে। সব স্রস্টাই আপন সৃস্টিতে অন্তরের সব সম্পদ উজাড় করে দিতে চান। সব শিল্পীরই এটা লক্ষ্য। এক্ষেত্রে স্রস্টা আপন স্বপ্নলোকের, কল্পনার ঐশ্বর্য কোন সৃস্টিতে ঢেলে দিলেও, সব সৃস্টি সমভাবে সফল হয় না। স্রস্টার হৃদয়ের সঙ্গে পাঠক বা দর্শকের একাত্মতা রচিত হয় কোন কোন ক্ষেত্রে, কোন কোন

সৃষ্টিতে। জীবনানন্দ লিখেছেন, আট শতাধিক কবিতা, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আবেদনধর্মী হয়ে উঠেছে বা ইংরেজি পরিভাষায় বললে ক্লিক করেছে বনলতা সেন। জীবনানন্দ এই গীতিকবিতায় সর্বতোভাবে লক্ষভেদে সমর্থ।

কবিতাটির রচনার পটভূমিকা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা সম্ভবত অসমীচীন হবে না যদিও কাব্যরসিকের কাছে তার কোন মূল্য থাকার কথা নয়। কাটাছেঁড়া বা পোস্টমর্টেম আর যাই হোক রাসাস্বাদনে সহায়ক নয়। তাতে হয়ত গবেষক, ইতিহাসবিদ্ বা সমালোচকের চাহিদা পূর্ণ হয়।

আঠারো লাইনের এই কবিতাটির রচনাকাল ১৯৩৪। তখন কবি সিটি কলেজের চাকরি হারিয়ে সম্ভবত কিঞ্চিৎ উদ্‌ভ্রান্ত। ইতোমধ্যে স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা দাশের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য জীবন যথেস্ষ্ট সুখকর হয়নি। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় ১৯৩৫-এ, ডিসেম্বর বা পৌষ সংখ্যায়। আবু সৈয়ীদ আয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৯-এ আধুনিক বাংলা কবিতার যে সংকলন প্রকাশ করেন, তাতে কবিতাটি স্থান পায়। পরবর্তী সময় ১৯৪২-এ গ্রন্থাকারে 'বনলতা সেন' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক রূপে তাতে স্বয়ং কবির নাম, কিন্তু প্রকাশনা সংস্থা বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবন। তখন বাংলার কাব্যাকাশের মধ্যগগনে বিরাজমান বুদ্ধদেব বসু 'এক পয়সার একটি' গ্রন্থমালা প্রকাশ করছিলেন। অপরাপর শ্রেষ্ঠ কবির সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'ও তখন প্রকাশিত। ১৬ পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণে বারোটি কবিতা সম্বলিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ আঁকেন শম্ভু সাহা। প্রায় এক দশককাল পরে যখন সিগনেট প্রেস ১৯৫২ সালে শোভন সংস্করণ প্রকাশ করে, তখন তার প্রচ্ছদ আঁকেন সত্যজিৎ রায়, বইটির দাম দু'টাকা। এই সংস্করণে কাব্যগ্রন্থটির পৃষ্ঠা বেড়ে হয় ৪৯ এবং সর্বসাকুল্যে ত্রিশটি কবিতা এতে স্থান পায়।

কবি বনলতা সেন ছাড়াও তাঁর বিভিন্ন কাব্যে আরো কয়েকটি নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছে সুরঞ্জনা, সুচেতনা, শ্যামলী, শেফালিকা বোস প্রভৃতি। কবি ১৯৩২-এ কারুবসনা নামে একটি উপন্যাস লেখেন। তাতে প্রথম 'বনলতা সেন' নামটি পাওয়া যায়। অবশ্য এই উপন্যাসটি কবির মৃত্যুর প্রায় ৩২ বছর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'বনলতা সেন' নামটি কবির আরো তিনটি কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে। কবিতাগুলি - 'হাজার বছর ধরে খেলা করে', 'একটি পুরনো কবিতা' এবং 'বাঙালি পাঞ্জাবী মারাঠি গুজরাটি'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'বনলতা সেন' কবিতাটি পাঠে বেশ কয়েকটি পার্থক্য সমালোচকেরা লক্ষ্য করেছেন।

কবির জীবনে সত্যিই অনুরূপ কোন রক্তমাংসের নারী এসেছিল কিনা, সে নিয়ে পাঠকের কৌতূহলের অন্ত নেই। নানা মত রয়েছে। জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ডঃ ভূমেন্দ্র গুহ। তিনি ২০০৭ সালে 'লিটেরেরি নোট্স্' অনুসন্ধান করে জানান, কবির জীবনে প্রেম এসেছিল। ঐ নোট্স্-এ উল্লেখিত 'ওয়াই' নারী সম্ভবত বনলতা সেন। অসুখকর দাম্পত্য জীবনে যখন কবি পীড়িত, তখন তাঁর জীবনে কাকা অতুলানন্দ দাশের মেয়ে বেবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁর প্রকৃত নাম শোভনা। গবেষক এমন দাবিও করেন, ১৯৩০ সালে লাবণ্যপ্রভা দাশের সঙ্গে বিয়ের আগেই কবি এই মেয়েটির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ভূমেন্দ্র গুহ

কৃত এই মন্তব্যের যথার্থতা নিয়ে আলোচনা এবং অনুসন্ধান চলতে পারে। ভিত্তিহীন না-ও হতে পারে। তার কারণ কবি তাঁর কাব্যে কবিতায় অনুপস্থিত, কিন্তু উপন্যাসে তাঁর সরব উপস্থিতি। জানা নেই, এই কারণেই তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এই গ্রন্থগুলি প্রকাশ করা থেকে বিরত ছিলেন কিনা।

অনেক আগে শুদ্ধসত্ত্ব বসু মন্তব্য করেছিলেন, ''বহু সমালোচিত 'বনলতা সেন' কবিতাটি সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। এতবড় রোমান্টিক কবিতা, এরকম সৌন্দর্য্য সাধনা, এরূপ অপূর্ব শব্দচিত্র সৃষ্টি হালের বাংলা কাব্যে ত' খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।... 'পাখির নীড়ের মত চোখ'-এর বর্ণনায় নাকি চিত্রাঙ্কণে ত্রুটি ঘটেছে বলে নালিশ হয়ে থাকে। কবিতা একেবারেই ফস্ করে সবটা বলে ফেলে না। হাল ভাঙা দিক্‌ভ্রান্ত নাবিকের কাছে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর সবুজ ঘাসের দেশ হঠাৎ চোখে পড়ে যাবার আনন্দে আবেগেই ত' বনলতা সেন এসেছে ক্লান্তপ্রাণ মানুষের জীবনে; পাখির নীড় যেমন সুস্নিগ্ধ, তেমনি স্নেহ ও প্রেমের প্রতীক বনলতা সেনের দুই চোখে শান্তি ও সম্মোহনের অঞ্জন, তাই প্রেম-গভীর দু'টি লুপ্তোপমা আর সহজ অভিব্যক্তি কী হতে পারে? জীবনানন্দ দাশের কাব্যোপলব্ধির সবচেয়ে বড় কথা হল চিত্রাঙ্কণের নিগূঢ় সমস্ত সৌন্দর্য্যকে লুঠ করে নিজেকে পরিতৃপ্ত করা।''

শীর্ষনামটি সুরেলা, ছন্দোময়, গীতিধর্মী এবং এর আবেদনও অপরিসীম। কবি আরো কয়েকজন নারীর নাম অন্যত্র উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেগুলির আবেদন এমন সর্বজনীন হয়ে উঠেনি। সাদামাটা আর পাঁচটা চরিত্রের মতই তাদের পরিণতি। কিন্তু এই নামটির সঙ্গে আরো উচ্চারিত 'নাটোরের'। কেউ কেউ স্থানটির মাহাত্ম্য নিয়ে ইতিহাস ও ভূগোলের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন। আমাদের বিবেচনায়, সম্ভবত ইতিহাস ভূগোলে তার অস্তিত্বের চেয়ে কবির মনোলোকে সুরমূর্চ্ছনায় তার গুরুত্ব। 'নাটোরের বনলতা সেন' গীতিময়তায় অপূর্ব, এর আবেদন প্রত্যক্ষভাবে রসিকের হৃদয়ে, এখানে বাস্তবের স্থান কালের গুরুত্ব ততটা নয়। কবির কল্পনায় সৃষ্টএই তিনটি শব্দের পাশাপাশি অবস্থান এক অসামান্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পাঠকের হৃদয়ে সুরের অনুরণন যেন থামতে চায় না। পূর্ণাঙ্গ কবিতাটি তাঁর চিত্রকল্প, পুরাণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান, ভাস্কর্য, দেশান্তরে দ্বীপ, সমুদ্র, উপসাগর নিয়ে সুষম এক প্রেক্ষিত রচনা করেছে। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি রূপক, উপমা, চিত্র সংবেদনশীল পাঠককে মোহিত করে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সবের ঊর্ধ্বে রয়েছে আঠারো লাইনের সংক্ষিপ্ত কবিতাটির দেহাতীত এক লাবণ্য। এই লাবণ্য যেমন নারীর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ডদেশ কিংবা তার কেশরাজি বা বর্ণ কোথাও পৃথকভাবে অবস্থান করে না এবং যাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না, সবের অতীত সেই লাবণ্য। প্রকৃত আবেদন তো তারই। 'বনলতা সেন' সম্পর্কে এ কথা প্রয়োগ সম্ভবত অতিশয়োক্তি বলে বিবেচিত হবে না।

বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সামাজিক ইতিহাস

সুকান্ত পাল

মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে দেখি একক মানুষ হয়ে উঠেছিল সমাজবদ্ধ জীব। এই সমাজ নামক বিষয়টি মানুষের একটি ধারণাগত নির্মাণ। যেমন আমাদের অনেক নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠানই ধারণাগত। ইতিহাসের চলমানতায় মানুষের এই সমাজের অনেক রূপান্তর ঘটেছে যুগের বিভিন্ন আশা, আকাঙ্খা, চাহিদা ও দাবি মেটানোর তাগিদে। একদিকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য যেমন তৈরি হয়েছে 'সিভিল সোসাইট' অন্যদিকে এই সমাজের যুথবদ্ধতা, ঐক্যকে ভেঙে ফেলারও চেষ্টা হয়েছে। এই ভেঙে ফেলার মধ্যেই বিচ্ছিন্নতা, ভেদাভেদের বীজটি নিহিত আছে। 'অপর' ধারণার নির্মাণও এই জায়গা থেকেই।

বর্তমান তথা আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে বিভিন্ন ভাঙন দেখা দিয়েছে। বিচ্ছিন্নতা তার মধ্যে একটি অন্যতম বিষয়। আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালকদের রাত্রির ঘুম কেড়ে নিচ্ছে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ক্রিয়াকলাপ। উন্নত দেশে থেকে শুরু করে অনুন্নত,উন্নতশীল দেশ, পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্য কোন দেশই বাদ যাচ্ছে না। এ এক ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রীয় অসুখ। 'রাষ্ট্রীয় অসুখ' শব্দবন্ধটি লিখেই নিজের মনে প্রশ্ন জাগছে রাষ্ট্রের এই অবস্থার আতুর ঘরটি কোথায় ? আমাদের আলোচ্য বিষয় সমাজ নিয়ে। তাই এবার দৃষ্টিক্ষেপ করার চেষ্টা করব একেবারে নীচুতলা থেকে।

বিচ্ছিন্নতাবাদের যত আলোচনা সবই রাষ্ট্র কেন্দ্রিক। কিন্তু রাষ্ট্রও তো একটা দেশের সমাজ বহির্ভূত নয়, আবার একটা সমাজও তো কোন পরিবারকে বাদ দিয়ে নয় এবং একটি পরিবারও তো একক ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়। তাহলে বিচ্ছিন্নতার বীজ একেবারে তলা থেকে অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষ থেকে পরিবার হয়ে সমাজে পরিব্যপ্ত হচ্ছে - এমন ধারণা করাটাও খুব একটা অমূলক নয়। কেন এমন মনে হল ?

এবার একটু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি। মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে যখন প্রকৃতিকে জয় করে টিকে থাকার দরকার ছিল তখন মানুষ ঐক্যবদ্ধতার প্রশ্নে সহমত হয়ে সমাজ সৃষ্টি করেছিল - নিজেকে সমাজবদ্ধ করেছিল। তৈরি করেছিল কিছু সাধারণ নিয়ম কানুন, রীতি ও পদ্ধতি। ক্রমে সভ্যতার অগ্রগতি তাকে উন্নত করল, তার সুখ, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য বেড়ে চলল। এরই সাথে বেড়ে চলল তার ভোগের স্পৃহা। একজন আরেকজনের থেকে বেশী সুখী,ধনী, ঐশ্বর্যশালী, ক্ষমতাবান হওয়ার প্রতিযোগিতাও শুরু হয়ে গেল। ভোগবাদী জীবন দর্শন আমাদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে প্রভাবিত করল। চিরাচরিত সংস্কৃতি একটি এথনিক গ্রুপের (কৌম গোষ্ঠীর) কাছে আর একমাত্র অবলম্বন ও মাননীয় হয়ে বিরাজ করল না। ভিন্নতার সুর বেজে উঠল তখনই। সমাজে বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত এখান থেকেই। ব্যক্তি মানুষের রুচি,ইচ্ছা,অনিচ্ছা অন্যের থেকে আলাদা হতেই পারে। কিন্তু একটি সাধারণ মাত্রা, যা দিয়ে একতার সুরটি বাঁধা থাকে তা আলগা হতে শুরু করল। Stanley Knick বলেন যে, প্রাচীন ও আধুনিক (traditional and modern)

সংস্কৃতির ভিন্নতার রূপও আদতে একই। কারণ উভয় সংস্কৃতিই তাদের পারিপার্শ্বিকতাকে মান্যতা দিয়েই এগিয়ে চলে। ফলত কয়েকটি সাধারণ কারণেই সামাজিক বিচ্ছিন্নতার চারাগাছটি ধীরে ধীরে লালিত পালিত হয়।

নগরায়নের যে ব্যাপকতা তার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে যেমন হয়ে পড়ছে আত্মকেন্দ্রিক তেমনই হয়ে পড়ছে সমাজ বিচ্ছিন্ন। আধুনিক নগর সভ্যতায় মানুষ যা চাইছে তাই সে হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছে। ফলে অন্য মানুষের সাহায্যের জন্য যেমন সে অপেক্ষা করছে না তেমনি নিজেও প্রতিবেশীর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার মানসিকতা হারিয়ে ফেলছে। এখানে মানুষ বড় একা হয়ে পড়ছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিপদেও এমনকি পরিবারের সদস্যের মৃতদেহ সৎকারের জন্যও তাকে ভাবতে হচ্ছে না। নগরায়ন ও আধুনিকতার সুফলকে অস্বীকার না করেও একথা বলা যায়, যে ঘুন পোকা সামাজিক ঐক্যবদ্ধতার বা সমাজবদ্ধতার জমাট পরিসরে বাসা বাঁধছে তাকে রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। সামাজিক ইতিহাসের এক অদৃশ্য আলেখ্য এর ফলে লেখা হয়ে যাচ্ছে নিয়ত।

ভারতবর্ষীয় সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবারের যে ভূমিকা তা বিশ্ববন্দিত। কিন্তু জনসংখ্যা হোক অর্থনৈতিক কারণ হোক, যে কোন কারণেই হোক না কেন তার ভাঙন শুরু হয়ে গেছে অনেকদিন আগে থেকেই। বাঙন মানেই বিচ্ছন্ন হওয়া। বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। পারিবারিক জীবনে যে ঐক্যবদ্ধতা তা যেমন একটি পরিবারকে সুসংহত রাখে তেমনি উন্নতির পথেও পরিচালিত করে। কিন্তু যখনই পরিবারের মধ্যে ভাঙন শুরু হয়, শুরু হয় বিচ্ছিন্নতা, তখনই সেই পরিবার দুর্বল হয়ে পড়ে নানা দিক থেকে। পরিবারের মতো সমাজেও দেখা দিচ্ছে ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতার নানা বিষয়। কারণ সমাজতো বিভিন্ন পরিবারের মানুষকে নিয়েই গঠিত। সেই একক মানুষ যখন পরিবারকে ভাঙছে, বিচ্ছিন্ন করছে, তখন সেই মানুষগুলোর মানসিকতার প্রতিফলন খুব সহজেই সমাজেও গিয়ে পড়ছে। সমাজের মানুষ হয়ে উঠছে স্বার্থপর ও স্বার্থ সর্বস্ব, একাকী ও বিচ্ছিন্ন। সামাজিক সংহতি, ঐক্যবদ্ধতা ও যুথবদ্ধতার বদলে এক নির্মম ও অসহায় বিচ্ছিন্নতার বোধ সমাজকে গ্রাস করছে প্রতিনিয়ত। একই সমাজে একই পাড়ায় গড়ে উঠছে বিভিন্ন গোষ্ঠী। ফলত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও রেষারেষি। এরই পরিণত ও বৃহৎ রূপ দেখতে পাওয়া যায় রাষ্ট্রে।

আমার মতে বিচ্ছিন্নতা রাষ্ট্রে নয়, বিচ্ছিন্ন মানসিকতা একক মানুষের মনের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে যা সমাজকে ভাঙছে। এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ফলে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক আর সেই হৃদ্যতার জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ঈর্ষা ও পরস্ত্রীকাতরতা, অহংকার আর ক্ষমতা প্রদর্শন, প্রতিবিশীকে হেয় প্রতিপন্ন করার মধ্য দিয়েই তার বিকাশ ঘটে যাচ্ছে প্রতি পলে। এক সময় ছিল যখন কারোর বাড়িতে আনন্দ উৎসব বা দুঃখের দিনে সবাই এসে অংশগ্রহণ করত এবং পাশে দাঁড়াত সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে। কিন্তু সে এখন ইতিহাস।

পারিবারিক ও সামাজিক এই বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা থেকেই একই রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করেও, একই রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও মানুষে মানুষে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি হচ্ছে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ। যা একটা দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয়

ঐক্যকে বিপদ সংকুল করে তোলে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় প্রাচীনকাল থেকেই এইরকম ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অসিহষ্ণুতা দেখা গেছে ঠিকই - কিন্তু মনে রাখতে হবে তখন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও রাজতন্ত্র কেন্দ্রিক। কিন্তু বর্তমানে যেখানে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটেছে। গণতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে, আইন ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে সেখানে এই মানসিক বিচ্ছিন্নতা ও অসহিষ্ণুতার যে গতিবৃদ্ধি ঘটছে তা যথেষ্ট চিন্তার কারণ।

এই যে সামাজিক ব্যবহারের পরিবর্তন, সম্পর্কের পরিবর্তন, এই ধীর অথচ অদৃশ্য প্রক্রিয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা জরুরী। যদিও এই ইতিহাস নির্মাণ করাটা যথেষ্ট শক্ত এবং গভীর মননশীলতার দাবি রাখে তবুও সামাজিক ইতিহাস রচনার এই দিকটির প্রতি নজর দেওয়া জরুরী। ইতিহাসবিদ সুরঞ্জন দাস তার একটি প্রবন্ধে (আনন্দবাজার পত্রিকা;৩০.১২.২০১৫) যথার্থভাবেই বলেন, "ভারতীয় ইতহাস বিষয়েও নতুনরকম আলোচনা শুরু হয়েছে। ইতিহাস সমানেই পূর্ণলিখিত হবে, এটাই নিয়ম। কিন্তু সে কাজটা করার কথা প্রথাগত ইতিহাসবিদদের বিষয়ের উপযুক্ত যুক্তি প্রণালী ও বিশে-ষণের মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় কর্তাদের অধীনে যদি তথ্য প্রমাণ ছাড়াই অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তিতে ইতিহাস পূর্ণলিখিত হয়, সেটা শিক্ষার অপমান। কিন্তু এখন তেমনই দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে কেবল একটি সংস্কৃতির ধারা কোনোদিনই বোঝানো হত না; হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, শিখধর্ম, গ্রিক ও পারসিক সংস্কৃতি এভাবেই মিলে থাকত। মৌর্য স্থাপত্যে দেখেছি পারসিক প্রভাব। রাজস্থানি চিত্রকলা বা তাজমহল হল ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পকলার নিদর্শন। সুফিবাদ বা ভক্তিবাদ দেখিয়ে দেয়, ভারতীয় সংস্কৃতির এই বিভিন্ন ধারা কিভাবে একত্রে মিলতে পারে। ব্রিটিশ শাসনের সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেরও মিলনক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। এই বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক সম্মিলনবাদ নিয়ে ভারতে রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় : "যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার / হেথায় সবারে হবে মিলিবারে, আনত শিরে / এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতার কারণ কি ? কি প্রক্রিয়ায় তার চলন এবং ফলত সমাজ ও রাষ্ট্রের যে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে এ যেমন সমাজতত্ত্বের বিষয় তেমনি ইতিহাসেরও বিষয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি এই ইতিহাসটা সঠিকভাবে জানতে না পারে তবে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ও সমাজই তাদের কাছে শুধু মান্যতাই পাবে না এই বিচ্ছিন্নতাবাদের আদর্শই হবে তাদের কাছে একমাত্র আদর্শ ব্যবস্থা। তাই ইতিহাস গবেষকদের সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই দিকটাতেও মনোনিবেশ করা জরুরী।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষাশৈলী

ডঃ শিশির কুমার বিশ্বাস
বাংলা বিভাগীয় প্রধান, হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

(১)

মানুষের মন প্রবৃত্তির দুটি দিক - ১. ফ্যাশান ও ২. স্টাইল। শিল্পী বা সাহিত্যিকের যথার্থ পরিচয় মেলে তাঁর স্টাইলে। ফ্যাশানের পূজারীরা গড়পড়তার জনতার ভিড়ে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন একাধিক কথাশিল্পী। তাদেরই অন্যতম অনন্য কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিক্ষুব্ধ ও অস্থির সমাজ পরিবেশে অবস্থান করেও তিনি অবিচলিত মনভঙ্গি নিয়ে স্বকীয় রীতিতে উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করে চললেন। তাই তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন, কাহিনী উপস্থাপন, চরিত্র নির্মাণ ও ভাষাপ্রয়োগ সর্বত্রই তাঁর স্বতন্ত্র শিল্পসত্ত্বা উদভাসিত হয়েছে।

কোন শিল্পীই তাঁর সমকালের সমাজভাবনা, প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী, সৌন্দর্য চেতনা সাহিত্যাদর্শকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। সেই সকল ভাবধারা প্রতিটি শিল্পীর সৃজনসত্ত্বাকে অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে, কখনো বা সচেতনভাবে আবার কখনো অজান্তে , অবলীলাক্রমে। বিভূতিভূষণের বাংলা সাহিত্যে পদার্পণের পূর্বেই ঘটে গেছে ভয়াবহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪)। এই যুদ্ধে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির আগ্রাসী মনোভাব সমরসজ্জা ও অভূতপূর্ব ধ্বংসলীলা দেখে বিশ্বনাগরিক সমাজ স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত।অসংখ্য মানুষের জীবনদীপ নিভে যায় নিমেষে। এই ভয়াবহ যুদ্ধ মানব সভ্যতাকে নতুন প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট। পুরাতন মূল্যবোধগুলি ভেঙে খান খান হয়ে যায়। চির ধরে শাশ্বত মানবিক সম্পর্কে।

পৃথিবীর সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯১৭ খ্রীঃ রাশিয়ার বলশেভিক বিপ-ব নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই রক্তক্ষয়ী বিপ-বের ফলে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার সংগ্রামীদের এই অভাবনীয় সাফল্যে সারা দুনিয়ার মেহনতি মানুষেরা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

মনোবিদ সিডমন্ড ফ্রয়েড মানবমনের রহস্য উন্মোচনে তার গতিপ্রকৃতি বিশে-ষণে প্রবৃত্ত হলেন। অসামান্য চেষ্টায় তিনি মানবমনের গতিপ্রকৃতি ও যৌনতার সম্পর্ক নির্ণয় করেন। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা ও বৈজ্ঞানীক আবিষ্কার বাংলা কথা সাহিত্যের চালচিত্রকে বদলে দেয়।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শিল্পবিপ-বকে হাতিয়ার করে ধনতন্ত্রের বিজয়রথ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আর প্রচলিত সামন্ততন্ত্র নববলীয়ান ধনতন্ত্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থার বিশ্বস্ত রূপকার হয়ে উঠলেন - তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম সাম্যবাদী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বাংলা উপন্যাস রচনায় সচেষ্ট হন। আবার মানবমনের রহস্য উন্মোচনে বৈজ্ঞানীক মন নিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন মনস্তত্ত্বের জটিল কারখানায়। সেখানে তাঁর

প্রধান পাথেয় ফ্রয়েডিয়ান মনস্তত্ত্ব। অবশ্য এইসকল আমদানীকৃত ভাবাদর্শ থেকে বিভূতিভূষণ অনেকটা দূরে অবস্থান করেছেন। তিনি সাময়িক উত্তেজনার চেয়ে চিরায়ত প্রবহমান সংস্কৃতির স্রোতে অবগাহন করতে অধিক স্বস্তি অনুভব করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাঙালী তরুণদের মধ্যে বিলক্ষন ভাবগত পরিবর্তন দেখা গেল। পুরাতন বিশ্বাস, ধর্মবোধ, মানবিক সম্পর্ক, নীতি নৈতিকতা ও প্রচলিত সাহিত্যভাবনায় তাঁদের আর কোন আস্থা রইল না। ইউরোপীয় সভ্যতার যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞান মনস্কতা ও নানা বিকার তাদেরকে একপ্রকার গ্রাস করল। কলে-াল, কালিকলম, প্রগতি পত্রিকাকে ঘিরে নবভাবধারায় অনুপ্রাণিত তরুণ কবি সাহিত্যিকরা একত্রিত হলেন। বিজাতীয় রচনায় প্রকাশ করলেন তাদের নবতর চেতনা। তাদের মধ্যে জ্যোতিষ্কের অভাব ছিল না। কিন্তু যুগ ও জীবনের অস্থির আবর্তের মধ্যে পড়ে এরা বিভ্রান্ত হয়ে আপন শক্তির অপচয় ঘটিয়েছেন। যথার্থ বাস্তবতা প্রতিষ্ঠার নামে তাঁরা সাহিত্যে শ-ীল অশ-ীল ভেদ মানতে চাননি। তাই অনেকক্ষেত্রে তারা পুষ্পের সৌরভের চেয়ে নোংরা আবর্জনার দুর্গন্ধের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনা তাঁদেরকে তীব্র রবীন্দ্রবিরোধিতায় প্ররোচিত করেছিল। তাতে রুচি বিকারের ভাব অস্পষ্ট থাকেনি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন এই তরুণদের মধ্যে অন্যতম।

কলে-াল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকেরা পাশ্চাত্যের হামসুন, গোর্কী, কোয়ার প্রমুখ সাহিত্যিকের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রায় অলঙ্ঘনীয় প্রতিভাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিল, প্রবর্তন করতে চেয়েছিল বাংলা সাহিত্যের নবযুগ। সে ব্যাপারে তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। অভাব ছিল বিশুদ্ধ চেতনা ও অখন্ড বিশ্বাসের। তবে তাঁরা বিশ্বস্তভাবে সমকালীন যুগযন্ত্রণা, হতাশা, দৈন, আস্থাহীনতা, নাস্তিকতা ও অধিকার সচেতনাকে রূপায়িত করেছেন।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকের সংশয়, বিক্ষোভ, হতাশা, অধিকার সচেতনা ইত্যাদির মধ্যে অবস্থান করেও বিভূতিভূষণ ছিলেন আশ্চর্য রকম নির্লিপ্ত। তিনি মার্কসীয় সাম্যবাদ, ফ্রয়েডীয় যৌনতা ও নাগরিক জীবনের কদর্যতাকে বাংলা সাহিত্যে আমদানী করেননি। কিংবা রবীন্দ্র বিরোধিতার আবর্তে পড়ে বিপথগামী হননি। নবতর ও বাস্তবধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির বাসনায় কুরুচিকে বরণ করেননি। তিনি যেন অবিচলিত চিত্তে সাধকের মতো আপন চেতনায় নিজস্ব ভঙ্গিতে সাহিত্য রচনা করেছেন। সেখানে নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতার চেয়ে গ্রামীণ জীবনের সহজ সরল দিকটিই অধিক পরিস্ফুট সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মতে —

"সাহিত্যের আকাশ যখন ভরে উঠেছে নতুন সমাজ চেতনায়, বিচিত্র বাস্তব জীবন সমস্যা - সেই মুহূর্তে বিভূতিভূষণ নিয়ে এলেন এক শান্ত নির্লিপ্ত লিরিক সুরের নির্জন অবকাশ। বিশুদ্ধ জনজীবনের কর্ম কোলাহল থেকে অনেক দূরে পল-ীর নির্জন পথে, ধু ধু করা উধাও মাঠে, গহন রাত্রির নিঃসঙ্গ আকাশের তলায় .....।"

কৃত্রিম নাগরিক জীবন নয়, সহজ সরল অনাড়ম্বর ছায়াশীতল গ্রাম্য জীবনই তাঁকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট করেছিল। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁর অভিন্ন মনোভাব

প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা যেন আটপৌরে গ্রাম্য জীবনের প্রতিরূপ। তাঁর দেহে নাগরিক জীবনের কৃত্রিম পালিশ ও আবিলতা বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। যে কারণে তাঁর ভাষা পাঠকের মনে মনে রুচিবিকার ঘটায়নি।

(২)

শিল্পীমনের নিগূঢ় অনুভূতি প্রকাশের পথ খুঁজে ফেরে। আর একজন সাহিত্যিক তাঁর আপন অনুভূতিকে বাঙময় রূপ দিতে চান। কখনো তা হয়ে ওঠে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি। তাই শিল্পীর সামগ্রিক চেতনালোক ও প্রকরণ রীতির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ বর্তমান। একজন কথাশিল্পীর বিষয় নির্বাচন, কাহিনী উপস্থাপন, চরিত্র সৃষ্টি, ভাষা ব্যবহার যেন অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে অন্বিত। বিভূতিভূষণের ভাষারীতি বিশে-ষণে এই সত্যটি স্মরণে রাখা আবশ্যক। তার অখন্ড চেতনার বহিঃপ্রকাশ ও ভাষারীতি যেন পরস্পরের দোসর।

উপন্যাসের বিষয়বস্তু না আঙ্গিকের গুরুত্ব অধিক এই নিয়ে বিতর্কের অবসান আজও ঘটেনি। তবে একথা সত্য আধুনিক লেখকেরা অতিমাত্রায় আঙ্গিক সচেতন। যেখানে বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে কখনো অতিরিক্ত মাথা ঘামাননি। তিনি আঙ্গিককে পৃথক সত্ত্বা বলে মনে করেননি। বিষয়বস্তু ও তার প্রকাশকে অচ্ছেদ্য বলে মনে করেছেন। তাই অনেক তাঁকে আধুনিক কথা সাহিত্যিকদের গোত্রভুক্ত করতে নারাজ।

আধুনিকতা নিয়ে শিল্পী বিভূতিভূষণের কোন মাথাব্যথা ছিল না। স্থিতধী পুরুষের মতো মান্ত, সংযত ওসমাহিত চিত্তে সাহিত্য সৃজন করেছেন। আর তার সহজাত সহজসরল অনাড়ম্বর প্রকাশরীতি তার আনুকূল্য করেছে। প্রসঙ্গত, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মর্তব্য ঃ

"বিভূতিভূষণের রচনার যে একটা সহজ সংযম দেখা যায়, তা আমাদের পাঠক সমাজে চিত্তের শালীনতা এমনকি শূচিতাকে অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করবে।"

তাঁর উপন্যাসের কাহিনী ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত। সেখানে নবাগত ধনতান্ত্রিক ও নাগরিক সভ্যতার গতি চাঞ্চল্য দেখা যায়নি। আকস্মিক উদ্ভাস বা ক্ষণিক চটুল আবেগ কিংবা চিত্তাকর্ষী চমক সৃষ্টি করতে চাননি। আধুনিক সমাজ ও জীবনের অস্থিরতা, ভোগস্পৃহা, কদর্যতা তাঁর সাহিত্যকে স্পর্শ করেনি, এ যেন চরম Paradox।

বিশিষ্ট শিল্পরূপের কারণে উপন্যাস বিবিধ শিল্পরীতিকে অনায়াসে আত্মসাৎ করেছে। বর্ণনা, কবিত্ব, নাটকীয়তা ইত্যাদি বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গিতে পরম আস্বাদ্য হয়ে ওঠে উপন্যাসের অবয়ব। এই সকল উপকরণের তারতম্য হেতু উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষার প্রভেদ ঘটে থাকে। আবার ঔপন্যাসিকের নিজস্ব মনভঙ্গির কারণে তার উপন্যাসে কাব্যধর্মীতা, নাটকীয়তা না বর্ণনা প্রাধান্য পাবে তা নির্ধারিত হয়। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে কাহিনীতে প্রায়শই প্রকৃতির অপার্থিব আনন্দ সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। আর সেখানেই লেখক তার কবিত্বসুলভ অনুভূতি প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছেন। অনিবার্যভাবে সেই সকল বর্ণনার ভাষা সুক্ষ্ম অনুভূতিঋদ্ধ ও কবিত্বমন্ডিত। কিঞ্চত দৃষ্টান্ত ঃ

"দিকচক্রবেলা দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। ....এর জ্যোৎস্না, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য, এর

মানুষজন, পাখির ডাক, বন্য ফুলশোভা — সবই মনে হয় অদ্ভুত। মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যা কখনো কোথাও পাই নাই। ..... কী রূপলোকযে ইহারা ফুটাইয়া তোলে দুপুরে, বিকালে, জ্যোৎস্নারাতে কি উদাস চিন্তার সৃষ্টি করে মনে।” (আরণ্যক)

তবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ভাষায় নাটকীয় চমক সৃষ্টি করেননি। কিংবা ওজো গুণসুলভ ধ্বনি ঝঙ্কার সৃষ্টিতে তিনি আগ্রহ দেখাননি। যেমনটা দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের বীরত্বপূর্ণ বর্ণনাংশে। তাঁর ভাষা যেন স্বচ্ছ তোয়া নদীর মত — যেমন তাঁর স্বাভাবিক গতি তেমন তার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ।

উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও তার বর্ণিত ভাষার মধ্যে রয়েছে অনিবার্য মেলবন্ধন। বিষয়বস্তুর তারতম্যে উপন্যাসে প্রযুক্ত ভাষার প্রভেদ ঘটাটাই অবসম্ভাবি। বিষবৃক্ষের মত সামাজিক উপন্যাস, কপালকুন্ডলার মত রোমাঞ্চধর্মী উপন্যাস এবং রাজসিংহের মত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাষা এক হতে পারে না। দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনায় লেখক দীর্ঘবাক্যে অতীত ইতিহাসের ঘনঘটা ও তার গতিবেগ যেভাবে সঞ্চারিত করেছেন তা বিষবৃক্ষের মত সামাজিক উপন্যাসে প্রত্যাশিত নয়। লেখকের বর্ণনায় —
“৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিল। দিনমণি অস্তাচলে গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকান্ড প্রান্তর, কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরনাস্থি পীড়িত হইতে হবে।”

এই স্বল্পায়তন বর্ণনায় লেখক অতীত ইতিহাসের দূরদমনীয়, গতিবেগ বাক্যজালে প্রতিভাত করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্ণনা পটুতায় ও শব্দ ব্যবহারের নিপূণতায় দ্রুতগামী অশ্ব যেন অপ্রতিরোধ্য কালপ্রবাহের দ্যোতক।

একই লেখকের হাতে যখন ‘বিষবৃক্ষ’, ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ বা ‘রজনী’র মত সামাজিক উপন্যাস রচিত হয়েছে অনিবার্য কারণে তার ভাষাও গেছে বদলে। সেখানে ইতিহাসের শৌর্য, বীর্য ও রণদুন্দুভি অন্তরিত হওয়ার সাথে সাথে সবই যেন নিস্তরঙ্গ উদার উন্মুক্ত পলী প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেছে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে নদী তীরবর্তী মাঠ ঘাটের যে বর্ণনা লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন তার কিয়দংশ এই রূপ ঃ
“জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে, কৃষকে লাঙল চষিতেছে, গোরা ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে।”

বিভূতিভূষনের উপন্যাসে মুখ্যত তিনটি বিষয় মানুস, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। তাঁর অনুভূতিতে প্রকৃতি ও মানুষ যেন পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রকৃতির স্নেহাঞ্চলে পত্র পুস্পের মত তার বেড়ে ওঠা। আর আজকের সমাজ অতীতের সমাজ ও তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সত্ত্বা নয়। অপরদিকে মানুষকে ভালোবেসেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া

যায়। লেখকের এই স্বতন্ত্র ও নিজস্ব অনুভূতি তাঁর লেখনীতে অভিনব ভাষা রূপে ধরা পড়েছে। মলয় বাতাসের মতো প্রকৃতি বিষয়ক উপন্যাসের ভাষা ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত। সেকালের নিশ্চিন্দিপুরের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখকের বর্ণনা —
“নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙ্গা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরের ধারে প্রকান্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত।”

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাষা আর বিভূতিভূষণ বর্ণিত এই ভাষার ব্যবধান বিস্তর। বরং সাহিত্য সম্রাটের সামাজিক উপন্যাসের ভাষা ও বিভূতিভূষণের ভাষা অনেকটা কাছাকাছি। আবার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ভাষা যতটা পরিশীলিত, শব্দগুলো যতটা সুক্ষভাবের ব্যঞ্জনা দ্যোতক — বিভূতিভূষণের ভাষায় সেই সুক্ষ ব্যঞ্জনা প্রায়শই অনুপস্থিত। তবে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যানুভূতি ও তার কবিত্বময় বর্ণনার ক্ষেত্রে উভয় শিল্পীর মধ্যে যথেষ্ট নৈকট্য পরিলক্ষিত হয়।

(৩)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’(১৮৬৫) তার প্রথম নিদর্শন, অবশ্য ভিন্ন মতে ‘আলালের ঘরে দুলাল’। এই তথ্যের বিতর্কের আবর্তে প্রবেশ না করে বলা যায় উনিশ শতকের সূচনা লগ্নে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের আত্মপ্রকাশই উপন্যাসের আবির্ভাব ক্ষণকে ত্বরান্বিত করেছিল। কেননা উপযুক্ত গদ্য ভাষা ছাড়া উপন্যাসের কথা কল্পনা করা যায় না। প্রশ্ন ওঠা সঙ্গত - ভাষা উপন্যাসের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করে ? সাধারণভাবে বলা যায় ঘটনার যথাযথ বর্ণনা উপস্থাপন বা কাহিনী নির্মাণই উপন্যাসের ভাষার প্রধান কাজ। এ ব্যাপারে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত মত —
“স্বল্প সম্বল, অভিজ্ঞতা শূণ্য ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের ভাষাকে ভাবেন ভারবাহী পশু উপন্যাসের একে অযথা আবেগপ্রকাশের কাব্যিক রাজপথ, কখনও ভেবেছেন - বর্ণনাঢ্য তাই বুঝি এর কাব্য, আবার কখনও ভেবেছেন বর্ণান্ধতাই এর বাস্তবতা।”

উপন্যাস শিল্পের ভাষা ভারবহনক্ষম বাহন, ঘটনা বর্ণনা, আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশের মাধ্যম বা বহিরঙ্গের অলংকার মাত্র নয়। একজন ঔপন্যাসিক উপন্যাস ও ভাষা এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ । তাদেরকে এক একটি বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা ভেবে আলোচনা করা অসংগত। উপন্যাসের ভাষার মধ্যে লেখকের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন প্রকাশ পায়। রচয়িতার মনোভাবের পার্থক্য শুধু উপন্যাসের ভাষার বাক্য গঠন, বাক্যের দৈর্ঘ্য, শব্দ ব্যবহার, সরলতা বা বাগবৈদগ্ধ ইত্যাদির তারতম্য ঘটে থাকে। শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, রামমোহন, অক্ষয়কুমার প্রমুখের হাত ধরে বাংলা গদ্য বিচিত্র ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে সাবালক হয়ে ওঠে। আর বিদ্যাসাগরে শিল্পিত ছন্দবদ্ধ গদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপযুক্ত মাধ্যম হয়ে উঠল।

সাহিত্য সম্রাটের প্রতিটি উপন্যাস সাধু গদ্যে রচিত। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছির সুদৃঢ়, দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যুক্তিনিষ্ঠ হৃদয়ে অপার সহানুভূতি, স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ ও পরহিতব্রতে অনুপ্রাণিত। তাঁর দৃষ্টিতে ছিল আকাশচারী, রোমান্টিক কল্পনা বিলাস ও সৌন্দর্যমুগ্ধতার ভাবোচ্ছ্বাস। তাই কপালকুন্ডলা উপন্যাসে সমুদ্রের সৌন্দর্য দর্শন করে নবকুমার আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন ''আহা! কি! দেখিলাম জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না।''

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারি ভাষা বেগবান, শাণিত ও ধ্বনিগাম্ভীর্যময়। ঐতিহাসিক ও স্বদেশ প্রেমমূলক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য অধিক সত্য। বিপরীতে রোমাঞ্চধর্মী উপন্যাসে আবেগের আতিশয্য ও সৌন্দর্যমুগ্ধ কল্পনার জাল বপন করে ভাষাকে করে তুলেছেন কমনীয়, প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য ও ভাবোচ্ছ্বাসের বাহন। কপালকুন্ডলার ঔষধি সংগ্রহের কালে রাত্রিকালীন নির্জন বনের বর্ণনা এই রূপ —

"যামিনী মধুরা, একান্ত শব্দমাত্রবিহীনা মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখন্ড সকল উত্তীর্ণ হইতেছে। পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষ, লতা সকল তদ্রুপ নীরবে শীতল চন্দ্র করে বিশ্রাম করিতেছে। নীরবে বৃক্ষপত্রে সকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে।"

সাধুগদ্য ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পর্বের উপন্যাস গুলিতে। পরবর্তীতে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকার প্রভাবে ও খানিকটা যুগের দাবি মেনে তিনি চলিত গদ্যকে উপন্যাস রচনার মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। অবশ্য শরৎচন্দ্র সাধুগদ্যেই তাঁর উপন্যাসগুলি প্রকাশ করেন। যদিও তিনি তাঁর ভাষায় সাধু গদ্যের কাঠামোটি গ্রহণ করলেও ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম ছাড়া তাকে ঠিক সাধু গদ্য বলা চলে না। এই গদ্যের প্রকৃতি অনেকাংশেই চলিত গদ্যের অনুরূপ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্তত প্রাথমিক পর্বে তার উপন্যাসে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অনেকটা শরৎচন্দ্রের অনুসারী। গঠনের দিক থেকে সাধুরীতিকে বরণ করে নিলেও তার অন্তপ্রকৃতিতে ধ্বনিত হয়েছে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর চলিত গদ্যের স্পন্দন।

বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মত যত্নবান ছিলেন না। প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'তে তিনি সাধুরীতি ব্যবহার করেন। যদিও তাকে বিশুদ্ধ সাধুগদ্য বলা চলে না। কেননা প্রায়শই তিনি বাকমুখে প্রচলিত শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। তার প্রকাশ সহজ, সরল এবং চলন মৃদু মন্দ বেগে প্রবাহিত। একটু দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি স্পষ্টতর হতে পারে ঃ—

"খুকী সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে তাহার পিসিমা নাই, অদ্য দুই মাসের উপর হইল একদিন তাহার মায়ের সঙ্গে কি ঝগড়াঝাটি হওয়ার পর রাগ করিয়া দূর গ্রামে কোন এক আত্মীয় বাড়ীতে গিয়া আছে।"

উদ্ধৃতাংশের বাক্যের সূচনায় লিপিবদ্ধ 'খুকী' শব্দটি একান্তই গ্রাম বাংলায় লোকমুখে প্রচলিত শব্দ। তা মোটেই সাধু গদ্যে ব্যবহার উপযুক্ত নয়। বরং খুকীর স্থলে 'কন্যা' শব্দটির ব্যবহার অধিক প্রত্যাশিত ছিল। আবার একই অনুচ্ছেদে বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ 'অদ্য' ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মোটের উপর উক্ত উপন্যাসে সাধুরীতিই অনুসৃত হয়েছে। দ্বিতীয় উপন্যাস অপরাজিতেও অভিন্ন সাধুরীতির পরিচয় মেলে। তাঁর তৃতীয় উপন্যাস

'দৃষ্টিপ্রদীপ' থেকে তার ভাষা রীতির বদল ঘটেছে। সেখানে তিনি চলিত গদ্যকেই উপন্যাস রচনার বাহন করে তুললেন। একটু দৃষ্টান্ত ঃ—

"জ্যাঠাইমা বাধা দিয়ে বললেন আমার চোখে তো এখনো ঢ্যালা বেরোয়নি সেজবৌ? অম্বলতা দিয়ে বাসন মাজলে অমনি ছিরি হয় বাসনের ? কাকে শেখাতে এসেচ? কি বলব; ভুবনের মা হেঁসেলের কাজ সেরে সময় করতে পারে না, নইলে বাসন মাজা কাকে বলে —"

'আরণ্যক' উপন্যাসের ভাষারীতি চলিত গদ্য। কিন্তু মাঝে মধ্যে সাধুরীতির অসতর্ক প্রয়োগ সহজেই চোখে পড়বে। উপন্যাসের আঙ্গিক তথা ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি যদ খুব যত্নবান হতেন তাহলে এই ত্রুটি দেখা যেত না। এই উপন্যাসে নায়ক সত্যচরণ একাদশ পরিচ্ছেদে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথের সূচনার বর্ণনা এইরূপ ঃ—

" আমার সঙ্গের লোকজন খুব ভোরে বাক্স বিছানা ও জিনিসপত্র মাথায় রওনা হইয়াছির, মোহনপুরা ফরেস্টে সীমানায় কারো নদী পার হইবার সময় তাহাদের সহিত দেখা হইল।"

আলোচ্য উদ্ধৃতাংশে মূলত চলিত গদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'হইয়াছিল'. 'হইবার', 'সহিত' ইত্যাদি শব্দগুলি সাধুরীতির নিদর্শন। এইরূপ গুরুচন্ডালী দোষ আরণ্যক বিপীনের সংসারের মত দুই একটি উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয় — অন্যত্র তার ভাষা এই ত্রুটিমুক্ত।

ভাষারীতি ব্যবহার অনুসারে তার উপন্যাসমালাকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্বে পথের পাঁচালী ও অপরাজিতে মূলত সাধুরীতি অনুসৃত হলেও তার অন্তরে ছিল চলিত ঢঙ। 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'বিপীনের সংসার', দুই বাড়ি থেকে অনুবর্তন পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব। যেখানে প্রধান চলিত রীতি ব্যবহৃত হলেও কখনো কখনো সাধুরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয় পর্বে দেবযান থেকে অশনি সংকেত তার ভাষা অনেকটা পরিপাটি ও স্বচ্ছন্দ। দেবযান উপন্যাসে যতীনের পূর্বপুরুষ নির্মিত পুরাতন বাড়ির পরিচয় দিতে গিয়ে লেখকের বর্ণনা ঃ—

"যতীনের পৈতৃক বাড়ীটা নিতান্ত ছোট নয়। পূর্বপুরুষেরা এক সময়ে মনের আনন্দে ঘরদোর করে গিয়েচেন। এখন এমন দাঁড়িয়েচে যে সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না। পূর্বদিকের আলসেটা কাঁঠালের ডাল পড়ে জখম হয়ে গিয়েচে বছর দুই হোল। মিস্ত্রী লাগানোর খরচ হাতে আসেনি বলে তেমনি অবস্থাতেই পড়ে রয়েচে।"

তাঁর ভাষারীতির একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বাক্যের মধ্যবর্তী স্থানে বা অন্তিমে '...' চিহ্নের ব্যবহার। সাধারণভাবে কোন অনুচ্ছেদের শেষে তাঁর বক্তব্যের ব্যাপ্তিকে বিস্তারিত করার প্রয়াসে এই ডটডট চিহ্নের ব্যবহার করেছেন। তবে এই রীতি অনুসরণ করে লেখকের একাধিক অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে। অগণিত কথা, অসীমকালে চেতনা, অবর্ণনীয় সুখ দুঃখ ভালবাসা, অশেষ কষ্ট ও অত্যাচার, বিশেষ ঘটনা ও দৃষ্টান্তের সাধারণীকরণ ইত্যাদি নানাবিধ অর্থব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে তিনি এই রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। দেবযান উপন্যাসের বর্ণনার কিয়দংশ ঃ—

" গত ত্রিশ বৎসরের কত পদচিহ্ন এই বাড়ির উঠানে। বাবা ... মা ... বউদিদি ...মেজোদিদি ... পিসিমা ...দুই ছোট ভাই ... আশা ... খোকা ... খুকীরা ....

কত ভালবাসতো সবাই ... সব স্বপ্ন হয়ে গেল ... কেউ নেই আজ ... ।”

বিভূতিভূষণের ভাষা ব্যবহারে কোন সংযম ছিল না- অনেকেই এমন অভিযোগ করে থাকেন। আমরা তাদের সঙ্গে একই সুরে তান ধরতে অনিচ্ছুক। ক্ষেত্রবিশেষে এই অভিযোগের মান্যতা দেওয়া যায়, সর্বত্র নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়ে নাতিদীর্ঘ বর্ণনায় অনেকটা বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন। এখানে শব্দ ব্যবহারের সংযমও প্রশংসনীয়। আরণ্যক উপন্যাসে সত্যচরণ ও বনোয়ারির পাটোয়ারির যাত্রাপথে রন্ধনের স্থান নির্বাচন, তার প্রস্তুতি, রন্ধন ক্রিয়া সমাপন, ভোজনাদির কাজ সেরে রওনা হওয়া ইত্যাদি ঘটনার বর্ণনার জন্য লেখক ইচ্ছা করলে অন্তত কুড়িটি বাক্য ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু অসাধারণ সংযমে মাত্র একটি বাক্যে সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন ঃ—

“আহারাদির কাজ খুব সংক্ষেপে সারিলেও সেখান হইতে রওনা হইতে একটা বাজিয়া গেল।”

তাঁর বর্ণনার ভাষা শান্তিপ্রিয় নিস্তরঙ্গ পল্লীর মলয় বাতাসের মতো মৃদু মন্দ বেগে প্রবাহিত। সেখানে কোথাও ধ্বনির তরঙ্গের ঢেউ ওঠেনি। বঙ্কিম সুলভ ধ্বনিঝঙ্কারও অনুপস্থিত বিশেষণের পর বিশেষণ বসিয়ে বাক্যকে দীর্ঘায়ত ও শক্তিশালী করার চেষ্টাও দেখা যায় না। উপমাদি অলংকার ব্যবহার করে বাক্যের মনোহারিত্য বৃদ্ধি করতে তার কোন আগ্রহ ছিল না। ধ্বনিগাম্ভীর্যশূন্য ছোট ছোট শব্দে নাতিদীর্ঘ বাক্যে, অচপল গতিতে, নিস্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বিবিধ ঘটনা, দৃশ্যাবলী ও মানবীয় সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সকল বর্ণনায় লেখকের সংযত ও পরিশীলিত ভাষার পরিচয় মেলে ঃ—

“ছোট ছোট মাটির ঘর, খাপরার চাল - বেশ পরিষ্কার করিয়া লেপা - পোছা। দেওয়ালের গায়ে মাটির সাপ, পদ্ম, লতা প্রভৃতি গড়া। ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম করিতেছে। কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের সুঠাম গড়ন ও নিটোল স্বাস্থ্য, মুখে কেমন সুন্দর একটা লাবণ্য প্রত্যেকেরই।” (আরণ্যক)

(৪)

উপন্যাস গদ্যভাষায় লিখিত আমাদের গদ্যময় জীবনের কথাকাহিনী। স্বভাবতই উপন্যাসে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চাওয়া পাওয়া কঠোর জীবন সংগ্রাম, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি ইত্যাদি প্রাধান্য পায়। তবে আমাদের জীবনের দুটি দিক - একটি নিতান্তই গদ্যময় বাস্তবতার, অপরটি স্বপ্নময় কবিত্বের জগৎ। রূঢ় বাস্তবতার উর্দ্ধে মানবমন কল্পনার জগতে স্বাচ্ছন্দ্যে পাখা মেলতে চায়। প্রবেশ করতে চায় স্বপ্নময় সৌন্দর্য্যের বাতায়নে। লেখক বিভূতিভূষণ আমাদের জীবনের এই দ্বিবিধ প্রবণতার কথা মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তবে সেখানে অতীত স্মৃতিচারণ, স্বপ্নময়তা, মাধুর্য্য, কল্পনার পর্যাপ্ত অবসর সেখানেই তাঁর ভাষা চরম স্ফূর্তি লাভ করেছে। অন্যত্র তাঁর ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও নিরাভরণ। প্রসঙ্গত সমালোচক চিত্তরঞ্জন ঘোষের মন্তব্য স্মরণ করা চলে -

“তাঁর ভাষার গুণগুলো দানা বাঁধে সেইসব জায়গায়, যেখানে তাঁর মন সবচেয়ে বেশি জেগে ওঠে। যথা - প্রকৃতি - সৌন্দর্য্য বর্ণনায়, স্মৃতি রোমন্থনে প্রভৃতি। অন্যত্র তাঁর সাদামাটা ভাষা

এই উচ্চ মাধুর্যের পর্যায়ে থাকে না। থাকাটা সম্ভব নয়, কারণ জীবনের প্রতিটি প্রসঙ্গে মাধুর্যের সুযোগ নেই। আর এই সাদামাটা অংশগুলিতে লেখকের যেন আনন্দ কম; তিনি এই অংশগুলিকে সুযোগ সূত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর অভীষ্ট প্রসঙ্গগুলিকে গেঁথে তোলবার জন্য।”

প্রকৃতিকে আশ্রয় করে কবিত্ব শক্তির স্বাভাবিক স্ফূরণ ঘটে। যে কারণে কবিরা সিংহভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রেমী হয়ে থাকে। বিভূতিভূষণের ছিল কবিত্বসুলভ সহজাত অনুভূতি ও সৌন্দর্য্যমুগ্ধ দৃষ্টি। গ্রাম্য প্রকৃতি, গাছপালা, পশুপাখির সান্নিধ্যে কবি জীবনানন্দের কবিত্বসুলভ অনুভূতি লীলায়িত হয়ে উঠত। অনুরূপ গ্রাম্য প্রকৃতির সান্নিধ্যে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের কবিত্বসুলভ অনুভূতির বিকাশ ঘটেছে। স্বভাবতই সেই সকল অনুভূতির প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর ভাষাও হয়ে উঠেছে কাব্যগুণময়। ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’, ‘আরণ্যক’, ‘ইছামতী’ প্রভৃতি উপন্যাসের একাধিক স্থলে তাঁর কবিত্বময় ভাষার নমুনা মেলে।

তাঁর ‘ইছামতী’ উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন নায়িকা ইছামতী। তার অবারিত জলস্রোত কত ইতিহাসের সাক্ষী। কত চিতা ভস্ম মিশে গেছে তার জলে। কত সুন্দরী বধূর পায়ের ছাপে চিহ্নিত হয় ঘাটের পথ, কত পৌঢ়ার পদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয় কালের নিয়মে। বিপুল জলরাশি যায় অনন্ত সমুদ্রে। ইছামতী বারিধারার মতো লেখকের কবিত্বসুলভ কল্পনা পাড়ি দেয় অসীম অনন্তলোকে ও সীমাহীন জগতে।

“কত লোকের চিতার ছাই ইছামতীর জল ধুয়ে নিয়ে গেল সাগরের দিকে, জোয়ারে যায়, আবার ভাঁটায় উজিয়ে আসে। এমনি বারবার করতে করতে মিশে গেল দূর সাগরের নীল জলের বুকে। ..... কত তরুণী সুন্দরী বধূর পায়ের চিহ্ন পড়ে নদীর দুধারে ঘাটের পথে, আবার কত প্রৌঢ়া বৃদ্ধার পায়ে দাগ মিলিয়ে যায় ..... বর্ষার দিনে এই ইছামতীর কূলে কূলে ভরা ঢলঢল রূপে সেই অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখতে পায়কেউ কেউ। কত যাওয়া আসার অতীত ইতিহাস মাখানো ঐসব মাঠ, ঐসব নির্জন ভিটের ঢিপি - কত লুপ্ত হয়ে যাওয়া মায়ের হাসি ওতে অদৃশ্য রেখায় আঁকা আকাশের প্রথম তারাটি তার খবর রাখে হয়তো।”

বিভূতিভূষণ প্রধানত প্রকৃতির রূপকার। তাঁর প্রকৃতির ওপর বর্ণনা যেন চিত্র অঙ্কনের সমতুল্য। তাঁর জীবনের মতই উপন্যাসের লিপিবদ্ধ প্রকৃতি শান্ত স্নিগ্ধ ও মধুর। তাঁর বর্ণনার ভাষাও পল্লী প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা গাছপালা, তরুলতার মতোই সরস, সতেজ ও প্রাণবন্ত। দৃষ্টান্ত ঃ—

“মাঠের ঝোপঝাপগুলা উলুখড়, বনকলমী, সোঁদাল ও ফুলগাছে ভরা। কলমীলতা সারা ঝোপগুলোর মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটাকাঁটা ও নীলবন অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা পাখীর ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য্য, রাজার মত ভান্ডার বিলাইয়া দেন কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পন্য নাই।”

প্রকৃতি একদিকে যেমন অফুরন্ত রূপ সৌন্দর্য্যের ডালি নিয়ে হাজির হয় তেমনি

সে রহস্যময়ী। অমাবস্যার নিশীথে লোকালয় হতেত কোন নির্জন স্থানে জ্যোৎস্না রাতের নিস্তব্ধতায় প্রকৃতি মায়াবী ও রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের রচনায় প্রকৃতি অনেক সময় রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। তখনি তিনি প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বর বা কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। সেই সকল অনুভব ও রহস্যময়তা প্রকাশ পেয়েছে স্নিগ্ধ মধুর ও ব্যঞ্জনাময় ভাষায়।

প্রকৃতির অপূর্বতা ও রহস্যময়তা অনুভূত হয়েছে পথের পাঁচালীতে অপুর কল্পনায় আরণ্যকে সত্যচরণের চেতনায় এবং ইছামতীতে ভবানীর বাস্তব অভিজ্ঞতায়। ইছামতী উপন্যাসে জ্যোৎস্নাপ-াবিত শরৎ রজনীর স্তব্ধতায়, কাঠঠোকরার শব্দ ও শিয়ালের ডাকে যেন রহস্যময়ী রূপ ধারণ করেছে। সেই রহস্যময় প্রকৃতির পটভূমিতে ভবানীর হৃদয়ে উঁকি মেরেছে এক দেবতা ঃ

"ভবানী অনেক রাত্রে বাড়ি রওনা হলেন। শরতের আকাশে অগণিত নক্ষত্র, দূরে বনান্তরে কাঠঠোকরার তন্দ্রাস্তব্ধরব, কৃচিৎ বা দু'একটা শিয়ালের ডাক, সবাই যেন তাঁর কাছে অতি রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল। আজ ভগবানের নিভৃত নিস্তব্ধ রসে তাঁর অন্তর অমৃতময় হয়েছে বলে তাঁর বার বার মনে হতে লাগল। রহস্যময় বটে, মধুরও বটে। মধুর ও রহস্যময় ও বিরাট ও সুন্দর ও বড় আপন সে দেবতা। একমাত্র দেবতা, আর কেউ নেই।"

বিভূতিভূষণ ছিলেন আবেগপ্রবণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই তাঁর উপন্যাসে প্রচুর করুণ দৃশ্যের সমাবেশ ঘটেছে। অনিবার্য কারণে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে উপন্যাসগুলিতে। তাঁর উপন্যাসে দুর্গা, অপর্ণা, হরিহর, সর্বজয়া, মালতী প্রভৃতি চরিত্রের মৃত্যুর নিদারুণ হৃদয় বিদারক। অনুরূপ একাধিক মৃত্যুর দৃশ্য হাজির করেছেন ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি। তাঁর উপন্যাসে হেনচার্ড, সুসান, গাইলস, জুড, টেস, ইউচাস্টিয়া প্রমুখের মৃত্যু মর্মান্তিক। অনেকেই বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী ও অপরাজিতাতে যে মৃত্যুর মিছিল দেখানো হয়েছে তা শিল্পসম্মত হয়নি বলে অভিযোগ এনেছেন।

এ স্থলে করুণ বা মৃত্যুর দৃশ্যের আবশ্যকতা নির্ধারণ করা আমাদের আলোচ্য নয়। সেই সকল করুণ দৃশ্যের প্রকাশভঙ্গি কতটা শিল্প সম্মত তাই আমাদের বিচার্য। এই সকল আবেগদীপ্ত করুণ দৃশ্যের বর্ননায় বিভূতিভূষণ অসাধারণ সংযম ও পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়েছেন। কোথাও আবেগের উচ্ছ্বাস ভাষার স্বাভাবিক সংযমকে লঙ্ঘন করেনি। উদাহরণ হিসাবে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে দুর্গার আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা স্মরণে আসে। কিন্তু শিল্পী বিভূতিভূষণ উক্ত দৃশ্যের বর্ণনায় নিরাসক্তভাবে শিল্পোচিত অসাধারণ সংযম রক্ষা করেছেন।

"পরদিন ঝড় থামিয়া গেল- আকাশের মেঘ কাটিতে শুরু করিল। নীলমণি মুখুজ্যে দু'বেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড় বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতেই দুর্গার জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। তাই শোকের দৃশ্যগুলি উভয় শিল্পীর বর্ণনায় অতিরিকতার কোনো অভাব ছিল না।

বিভূতিভূষণ ভাবুক প্রকৃতির ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেও প্রয়োজনে লঘুহাস্য

পরিহাস করতে ছাড়েননি। তাতেই তাঁর হাস্যরসের রসিক মনটি ব্যক্ত হয়েছে। হৃদয়ের প্রশান্তিহেতু বিশুদ্ধ পরিহাস। 'ইছামতী' উপন্যাসের একটি পরিহাসের দৃষ্টান্ত ঃ

"রাজারাম রায় কারো কাছে ঘুষ নেবার পাত্র ছিলেন না। তবে কার্য অন্তে কেউ একটা রুইমাছ, কি বড় একটু মানকচু কিংবা দু'ভাঁড় খেজুরের নলেন গুড় পাঠিয়ে দিলেন ভেট স্বরূপ, তা তিনি ফেরৎ দেন বলে শোনা যায়নি।"

তাঁর পরিহাস - প্রিয়তার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে তাঁর শেষ উপন্যাস 'অশনি সংকেত' উপন্যাস থেকে ঃ

"বৃদ্ধ নবদ্বীপ ঘোষাল বললে, এসব হাঙ্গামা কতদিনে মিটবে মশাই ? শুনছি নাকি কি একটা পুর জারমান নিয়ে নিয়েচে? বিশ্বাস মশায় বললে সিঙ্গাপুর নবদ্বীপ বললে,- সে কোন জেলা ? আমাদের এই যশোর, না খুলনে ? মামুদপুরের কাছে ?"

বিভূতিভূষনের ভাষার প্রধান ত্রুটি তিনটি প্রথমত; ক্লান্তিকর একঘেয়েমি, দ্বিতীয়ত; শব্দ বিপর্যয় ঘটেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে, তৃতীয়ত; ভাষার সংহতি সর্বত্র যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয়নি। এই ত্রুটিগুলি পরস্পর সম্পর্কিত। এই সকল অসঙ্গতির কারণ ভাবমুগ্ধ আত্মভোলা মনোভার ও প্রযত্নের অভাব। তাই তাঁর শিথিল এ একঘেয়ে বর্ণনা পাঠ করতে করতে পাঠক একসময় ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে।

উলি-খিত ত্রুটি থাকা সত্বেও তাঁর ভাষার প্রধান গুনগুলি- নিরাভরণ সৌন্দর্য, স্বচ্ছ অনায়স গতি ও সহজাত অনুপম প্রবৃত্তি। প্রকৃত অর্থে তিনি জীবনকে খন্ডবিচ্ছিন্ন করে ভাবেননি। নিজস্ব সহজাত ভাষা দিয়ে বিবিধ রচনার মধ্যে সেই চিরায়ত জীবনের আলেখ্য লিপিবদ্ধ করেছেন সার্থকভাবে। সেখানেই তাঁর ভাষার চরমসিদ্ধি এবং তাঁর গদ্যশৈলীর পরম গৌরব।

(৫)

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে একঝাক উপন্যাসিকের আবির্ভাব ঘটে। বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের নানা দিক থেকে নতুনত্ব আনেন। ভাষা ব্যবহারেও নবতর রীতির আমদানি করেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক সাংস্কৃতির ও অন্তজ শ্রেণির জীবন আলেখ্য রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। 'পঞ্চগ্রাম' 'গনদেবতা' 'কবি' 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' এদিক থেকে স্মরণীয় রচনা।

তারাশঙ্কর উপন্যাসে বিষয় মুখ্যত তাঁর জন্মভূমি রাঢ় অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কখনও বা বিশেষ সম্প্রদায়ের জীবচর্যা ও তাদের সংস্কৃতি উঠে এসেছে তাঁর উপন্যাসে। কখনও বা নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চল ও সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে সগৌরবে বাংলা উপন্যাসের খাসমহলে হাজির করেছেন। বীরভূমের কোপাই নদীর তীরবর্তী প্রত্যন্ত বাঁশবাদী গ্রামের নিম্নবৃত্ত ও বিশিষ্টি সংস্কৃতির ধারক বাহক কাহারদের জীবনবেদ লিপিবদ্ধ হয়েছে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে। এই সকল আঞ্চলিক ও বিশিষ্ট গোষ্ঠীগত বৃত্তান্তকে আরও বিশ্বাসযোগ্য এবং চরিত্রগুলিকে আরও প্রণবন্ত করে তোলার জন্য তিনি আঞ্চলিক

ভাষা ব্যবহার করেছেন অনায়াসে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে বসনের মা সুচাঁদ- তার কথাবার্তায় অনর্গল আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি বনোয়ারীর সঙ্গে দৈবদুর্বিপাক সম্পর্কে বলেন ঃ

"তবে মরবি ?- তা কি করবি বল ? ভগবানের বিধানে যে তাই তো হবেন। গাঁয়ের দক্ষিণ দিকে আগুলে যখন আছি, আর আমারাই যখন কি বলে ছিষ্টির ওঁচা, থখন আগেই আমদিকে মরতে হবে বইকি।" কিংবা - "সুচাঁদ বললে কি ? কি বললি ? কিছু লয় গো। তোমাকে বলি নায়। ব'স দিকি তুই।"

উক্ত উপন্যাসে লেখন অনায়সে সুপ্রচুর আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা হেই, এতটুন, লটবরের, লোব, ই বছর, অঙ ইত্যাদি। কিন্তু বিভূতিভূষণ এই জাতীয় আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। নদীয়া, যশোর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকমুখে প্রচলিত ভাষাকে অবশ্য তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। তাকে গ্রাম্য ভাষা বললেও আঞ্চলিক ভাষা বলা চলে না। তাঁর দৃষ্টি ছিল উদার ও প্রসারিত। তাই বিশেষ অঞ্চল ও বিশেষ গোষ্ঠার ভাষাকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে চাননি।

বাংলা উপন্যাসে আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ভাষা আমদানির ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিরিখে তাঁর স্মরণীয় উপন্যাস 'পদ্মা নদীর মাঝি'। যেখানে পদ্মা নদীর তীরবর্তী ধীবর পলীর জেলেদের জীবন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে। লেখক অনায়াসে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহার করেছেন। বিপর্যস্ত ধীবর পলীতে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে হোসেন মিয়া বলে ঃ

"টাকা কর্জ দিমুনা, ছন দিমু, বাঁশ দিমু, নিজে খাটাইয়া তোমাগো ঘর তুইল্যা দিমু শ্যাষে নিকাশ নিয়াখত লিখুম, একটা কইরা টিপ দিবা।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তিত্বের অধিকারী তাই তিনি বাংলা উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি নিয়ে বিশেষণ ধর্মী ভাষা ব্যবহার করেন। সেই ভাষার বার্তিরসদ জুগিয়েছেন ফ্রয়েডিও মনোবিশেষণের তাগিদ। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়কের জন্ম গ্রামে, শিক্ষা শহরে। ফলে তাঁর চিন্তায় চেতনায় পিতার অর্থলিপ্সা মধ্যবৃত্ত শহর মুখিতা, মানবিক দায়িত্ববোধ, সৌন্দর্য চেতনা ইত্যাদি নিয়ে তাঁর মনে জটিল দ্বন্দের পুর্নাবর্তন রচিত হয়। লেখকের বিশেষণধর্মী ভাষঅয় তার রূপায়ণ ঃ

"হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য। শহর তাহার মনে যে ছাপ দিয়াছিল তাহা মুছিবার নয়, কিন্তু সে শুধু ছাপ, দাগ নয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরণের বিশেষণধর্মী ভাষা ব্যবহার করেনি। তাঁর ভাষা ছিল সহজ সরল বর্ণনা ভাষা। কদাচিৎ তিনি কোনো চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব রূপায়ণ করেছেন। অন্যপক্ষে সমকালের কথাশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর গদ্যশৈলী ও বিভূতিভূষণের গদ্যরীতি বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। প্রথমজন বুদ্ধিদীপ্ত নাগরিক বাগ বৈদগ্ধতায় সিদ্ধহস্ত, অপরজন অনুভূতিনিষ্ঠ গ্রাম্য সারল্যের উপাসক। সমালোচক চিত্তরঞ্জন ঘোষের ভাষায় ঃ—

" প্রমথ চৌধুরী নাগরিকতা পরিশীলিত, বিভূতিভীষণ গ্রামীণতা পরিপালিত; একজনের

স্টাইল নিখুঁত কেতা দুরস্ত ভব্যতা আর একজন একেবারেই কেতা নিরস্ত। একজন কথায় এলোমেলো ভাবটা একেবারেই বরদাস্ত করেননা। কথাগুলিতে কড়া ইস্তিরির ক্রীজ চড়িয়ে তবে সভাসমাজে তিনি বেরোন, আর একজন কথাটায় কোনরকম পরিচ্ছন্নতা এলেই খুশি শানানো ক্রীজের জন্য তার মাথা ব্যথা নেই।

বিভূতিভূষণ তাঁর কথাসাহিত্যে আঙ্গিক নির্মাণে তথা ভাষা প্রয়োগ পূর্ববর্তী ও সমকালের ধারণা লেখককে অবিকল অনুকরণ করেননি। কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল স্বতন্ত্র ও নিজস্ব। ভাষা ব্যবহারেও সেই স্বকীয় ছাপ স্পষ্ট। যে কারণে তাঁর সমকালে একদল কথা স্বকীয় ছাপ স্পষ্ট। যে কারণ তার সমকালে একদল কথাসাহিত্যিকের মধ্যে থেকেও তার ভাষা অনন্য ও অননুকরণীয়।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঃ মন ও শিল্প - গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

খ. বিভূতিভূষণ — চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

গ. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস - ক্ষেত্রগুপ্ত।

ঘ. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঙ. মধ্যাহ্ন থেকে সায়হ্নে — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

চ. কালের প্রতিমা — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

ছ. বিভূতি রচনাবলী — প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় খন্ড।

জ. বঙ্কিম রচনাবলী

ঝ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঞ. পদ্মা নদীর মাঝি — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই প্রসঙ্গে

ডঃ বাবলু সাহা

মূল কথা হলো কোন কিছু থেমে থাকে না, এগিয়ে চলে development-এর দিকে — তা না হলে এগোনোর কোন মানে হয় না। যে কোন সমৃদ্ধ ভাষার সাহিত্য তার মর্জির পরিবর্তন ঘটিয়ে একটা বাঁক নেয়। আধুনিকতার দিকে, নতুন অভিমুখের দিকে, যা কিনা সম্পূর্ণ একটি নতুন শৈলীশিল্পের আনকোরা আঘ্রানে সুবাসিত ম ম করা আবেশ জড়িত পরিমন্ডল এমনভাবে নির্মাণ করে দেয় যে তার প্রতি ভোক্তা পাঠক, সমালোচক পাঠক, নিষ্ঠ পাঠক, সাধারণ পাঠক কৌতুহল উদ্দীপক হয়ে প্রজাপতি রঙ মন নিয়ে তার মধুরস পানের জন্য উন্মুখ উৎকন্ঠ হয়ে ওঠে। আর তখন গুঞ্জিত হতে থাকে তার নব অনুরাগ সৌন্দর্য বাখানি, ঠিক সেই মুহূর্তে বিষয়টি লোকশ্রুতির রভসে দেশদেশান্তরে পাড়ি দেয় আরো বেশি করে পাঠক শ্রোতার কান তৈরী করার জন্য —এই আধুনিকটা এই কালান্তরটা একটা সদর্প ঘোষণা রাখে, বলে — অহং জাতঃ, তার অনতিবিলম্বেই বোঝা যায় সে স্বয়ম্ভু এবং এটা কোন আকস্মিক পরিবর্তন নয়, ক্রম প্রস্তুতির সংগঠিত রৌদ্র প্রকাশ, আর এধরণের প্রকাশের কারণেই অনেকে আনকোরা বিষয় না বুঝতে পেরে বকাবকি শুরু করে দেয়, অবশ্য এগুলি অযথা বকাবকি নয়, নতুনের সহায়ক প্রসারমূলক প্রকাশ, যার মধ্য দিয়ে নতুন কালান্তরের বিষয় আরো পাঠক শ্রোতার কানের ব্যাপ্তি ঘটায়। তার পরিসর বেড়ে যায়, যেমন পাঁচালি গানের মধ্যে হঠাৎই কবি শ্রীমধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদ বধ' বাংলা বৈদিক ভাষায় অর্পণ করলেন, অমনি একদম কলকোলাহলে বাংলা কাব্যসাহিত্যের আকাশ বাতাস হিলো-লিত হয়ে গেল, চলল তার পায় তারা দেশদেশান্তরে, কেননা তেমনটি আর এর আগে পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। তার মধ্যে innovative appeal থাকে বলেই এমন হয়। একটা প্রচলিত অভ্যাস থেকে কিংবা ভাব থেকে অন্যতর কিছু মুখোমুখি হলেই তাকে গ্রহণ করতে বিমুখ হয়, কিন্তু এই পরিবর্তিত প্রকাশ সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, তার রৌদ্রতেজ তার স্বকীয়তাকে প্রমাণ করে ছাড়ে যে সে স্বয়ম্ভু। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' -এর আবেদন এমনই যেন।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসের উৎসমূলে গিয়ে দাঁড়ালে দেখি প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখছেন। অবশ্য এটি সর্বৈব উপন্যাস নয়, উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বললেই ঠিক হয়। প্রায় সমসাময়িককালে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' দুই খন্ড রচনা করেন। যদি প্যারীচাঁদ উপন্যাসের মত কিছু একটা রচনা করেন,তবে আমি বলব কালীপ্রসন্ন ছোটগল্পের মত কিছু রচনা করেন প্রতিটি নকশার বিন্যাসে।

প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' মূলত এক ধনীর দুলালের অতিমাত্রায় খামখেয়ালীপনা এবং তার বয়ে ক্ষয়ে যাবার একটি কাহিনী মাত্র। এটিও নকশা জাতীয়

একটি দীর্ঘ কাহিনী। বলা যেতে পারে সমসাময়িককালের এটি একটি পারিবারিক বৃত্তের সামাজিক নকশা। কোন উচ্চাঙ্গের মনোস্তত্ত্ব এই উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়নি এবং তা হওয়া সম্ভবত ছিল না। কেননা তিনিই প্রথম উপন্যাসের মতো কিছু রচনায় হাত দিলেন। অনুসরণ করার মতো কোন কিছু তার সামনে ছিল না। মূলত " অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের কলকাতার সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার বর্ণনায় তিনি যে ধরণের সরস কৌতুকরীতি ব্যবহার করেছেন, তার জন্যই তিনি অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছেন। তা নইলে চরিত্র সৃষ্টি, মনস্তাত্ত্বিক বিশে-ষণ - এসবের বিশেষ কোন পরিচয় তাঁর উপন্যাস থেকে পাওয়া যায় না।" তবে কালীপ্রসন্নের নকশাগুলো শুধু নকশা বা কৌতুকের বিষয় নয়। "এর মধ্যে রয়েছে অতীত কলিকাতার হারিয়ে যাওয়া বহু বিচিত্র ছবির অ্যালবাম। আর এই অ্যালবামটি আমাদের হাতে তুলে দিয়ে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। আরেক হিসাবে তাঁর এই গ্রন্থটিকে কলিকাতার ঐতিহাসিক ডায়েরীও বলা চলে।"২

''আলালের ঘরের দুলাল" - এর রচনাকাল ১৮৫৮, হুতোম প্যাঁচার নকশার রচনাকাল (প্রথম খন্ডের) ১৮৬২, আর এই দুইখন্ড একসঙ্গে প্রকাশকাল ১৮৬৫ সাল। স্মর্তব্য এই যে ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসখানি। এর থেকে বোঝা যায় যে,খুব দ্রুত বাংলা কথাসাহিত্যের জগৎ পালটাতে থাকে। ইন্দিরা (১৮৭৩), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল(১৮৭৮), আনন্দমঠ(১৮৮২) এবং দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪) — এই ছয়টি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক উপন্যাসের ডায়মেনসনটাকে নানাভাবে বিন্যস্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাস তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে। তারপর রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে সামাজিক উপন্যাসের ব্যক্ততা নানা রূপ রঙে ভরে আসে।

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর রচনায় তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি কিন্তু অভিনবত্বের দাবি রাখে। উপন্যাসটিতে তাঁর আত্মমনের একান্ত কথার প্রকাশ বিন্যস্ত করা হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতে উপন্যাসটি একদম সাদামাটা। এধরণের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে কিন্তু একটাও নেই। এই অর্থেই উপন্যাসটি অভিনব। অপু - দূর্গা সেই সময়ের হতদরিদ্র পরিবারের শৈশবের অভিব্যক্তি।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে দুঃখ কষ্ট আছে, কিন্তু কোন অভিযোগ নেই এমন একটা ভাবনা জায়মান আছে। কিন্তু তাঁর 'ইছামতী' (১৯৫০) ও 'অশনি সংকেত' (১৯৫৯) উপন্যাসদুটিতে জনতার সংগ্রাম, প্রতিরোধ ও আন্দোলনের ঢেউ বিভঙ্গে চমৎকার আন্দোলিত। 'ইছামতী' উপন্যাসখানি বহু অতীতের সুখ দুঃখের অলিখিত ইতিহাস, মূক জনগণের ইতিহাস, আসল জাতীয় ইতিহাস হিসাবেই বিভূতিভূষণ পরিগণিত করেছেন। 'বিভূতিভূষণ ঐতিহাসিক বাতাবরণে বাংলার জনজীবনকে ধরতে চাইলেন। উপন্যাসের বিষয় ইছামতী নদীকে কেন্দ্র করে যে জনজীবন নদী প্রবাহের মতোই ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগিয়ে গিয়েছিল তার বিচিত্র কাহিনী। যে সময়টিকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন তা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।'৩ আর এই উপন্যাসে সমকালের প্রেক্ষার জনতা এবং ক্রমপরিবর্তমান সামাজিক বিন্যাসে চলে

আসা জনতার ছবিতে ধরতে চাওয়া হয়েছে একটি প্রবহমান জীবনের ছবি। নীলচাষ বিরোধী জনতার সংঘর্ষমুখর উত্তেজনায় উপন্যাসটি ব্যাপ্ত। এই জনতা সমকালের কৃষক প্রজা। পাঁচু সেখ, বিপিন গাজি, নবু গাজির মতো সম্পন্ন চাষীরা নীলচাষ বিরোধী গণ আন্দোলনের জনতার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসেও একটি ঐতিহাসিক বাতাবরণ ধরতে চাওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই ঐতিহাসিক বাতাবরণের মধ্যে যে ব্যক্তুতা ধরা পড়েছে তার মনস্তাত্ত্বিক অভিভাব ঐতিহাসিক বাতাবরণের সমান্তরাল একটি জটিল বিশেষক রেণু হিসাবে প্রত্যায়িত হয়েছে। আবার বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' যেন বিজন ভট্টাচার্যের নবান্নের মতোই বেশ খানিকটা মাত্রা পেয়েছে। বিভূতিভূষণ যেমন সমসাময়িক জীবনযন্ত্রণার মাত্রিকতার অভিভব ও অভিভাব দেখাতে চেয়েছেন ঠিক তেমনি আখতারুজ্জামানও দেখিয়েছেন, কিন্তু যুগান্তরিত মানসিক চেতনাগত জটিলতার আবর্তটা কিন্তু একদম অভিনব, অনুভবে সঞ্চারিত হয় মাত্র।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯). গণদেবতা(১৯৪২), পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪), হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ইত্যাদি উপন্যাসে আন্দোলন আলোড়নের ভূমিকা আছে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক চাপের কারণে মুখর হয়ে উঠতে পারেনি। সামন্ততান্ত্রিক চাপ যত হ্রাস হবে, ততই কথাসাহিত্যের জটিল প্রকাশ মুখর হবে। " .... উপন্যাস পাঠকের কাছে রস পিপাসা এবং জীবন পিপাসা প্রায় একীভূত ব্যাপার। জীবন আধুনিক যুগে যত ফিউডাল কাঠামোকে ভেঙে ভেঙে নানা দিকে নিজেকে বিকশিত করতে চেয়েছে, ততই সে হয়েছে বিচিত্র এবং কৌতুহলোদ্দীপক।"৪ তারাশঙ্কর ফিউডাল কাঠামো না ভেঙে আন্দোলন শাণিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ফিউডাল ও পুঁজি কাঠামোকে ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। 'দর্পণ' (১৯৪৪) উপন্যাসে বস্তি আর গ্রামের মানুষের সংগ্রামের কাহিনী উত্তাল হয়ে উঠেছে। তারা জয়ী হয়েছে। কিন্তু শহরতলীর যশোদারা পরাস্ত হয়েছে। স্বাধীনতার সমকালের প্রেক্ষার দুটি উপন্যাস 'চিহ্ন' (১৯৪৭) ও 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১) আন্দোলনে,মিছিলে, সমাবেশে টান টান। 'চিহ্নঃ দৃঢ়চেতা জনতার উপন্যাস আর 'স্বাধীনতার স্বাদ' মুক্তিকামী জনতার বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে উৎকেন্দ্রিক চাপ দ্বিধা করতে চায়, কিন্তু তারা জয়ী হয়।

একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট, মানব সভ্যতার ইতিহাসটাই হলো জীবনসংগ্রামের। যখন মানুষের কথা ফোটেনি, যখন তাদের বন্যজীবন, ইশারায় ও নানা উৎকট শব্দে কাজকাম চালাতো, আগুন জ্বালাতে যখন শেখেনি তখনও তারা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই জারি রেখেছে। তারা কত লড়াই করেছে। আমি বলছি না যে সেটা ছিল Struggle for the fittest — কেননা সংগ্রাম করে করেই মানবজাতিকে যোগ্যতার পরিচয় দিতে হয়েছে। মানব জাতির মধ্যে যারা সংগ্রাম জারি রাখার তরে আত্মত্যাগ করল তারাই তো নির্ভিক, তারাই যোগ্যতার মানদন্ড মানবজাতির হাতে দিয়ে গেছে তাদের উত্তরাধিকার হিসাবে। আজ সভ্যজগতের অনেক মানুষ লড়াই সংগ্রামের কথা শুনলে নাক সিটকায়, কিন্তু মানবসমাজের লড়াই তো থেমে যায়নি। বরং আমরা আজ আরো কঠিন লড়াইতে পড়ে গেছি। সেই লড়াই নানা ধরণের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রনৈতিক অপনিয়মের শাসনের বিরুদ্ধে,

আর এই সব বলতে গেলে শেষ হবে না। মানুষ একটি বৃহৎ সংগ্রাম শেষ করে আবার আরেকটি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে বাধ্য হয়।

অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের জন্যই অতিসাধারণ মানুষের নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। মনোজ বসুর 'জল - জঙ্গল'(১৯৫১) ও 'বন কেটে বসত' এই দুটি উপন্যাসে যেন রয়েছে বনচর মানুষের সংগ্রামকথা। আখতারুজ্জামানের 'খোয়াবনামা'(১৯৯৬) উপন্যাসটিতে যে অলৌকিক বিশ্বাস, দুরভিগম্য রহস্যময়তা,লোকবিশ্বাস ইত্যাদি বিনির্মিত হয়েছে, তারই প্রাকৃত নির্মাণ ঐ দুটি উপনাসে জায়মান। নদী, জল, বন হল মাটির মানুষের জীবন জীবিকার ক্ষেত্র। অদ্বৈত মল-বর্মনের 'তিতাস একটি নাম', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', সমরেশ বসুর 'গঙ্গা', অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেষ' ইত্যাদি উপন্যাসে শ্রমজীবী আর শ্রম সুবিধাভোগীর দ্বন্দ্ব আর বেঁচে থাকার ছন্দ কেমন যেন পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবে গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার' (১৯৫৭), মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা'(১৯৭৪), সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া'(১৯৭৭),সমরেশ মজুমদারের 'কালপুরুষ'(১৯৮৫) বিশেষ উলে-খযোগ্য এই কারণে যে সচল সমাজের দেহের মধ্যে মানুষের যে দাহ তারই প্রতিবিধানের জন্যে মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়, কখন জেতে কখন হারে — এই হারজিতের মধ্য দিয়েই সংগ্রাম এগিয়ে চলে। মানুষ চায় স্বপ্নসুন্দর শান্তির সমাজ, ন্যায়ের সমাজ - তারই খোঁজ চলেছে বিশ্বজুড়ে। আখতারুজ্জামানের 'চিলেকোঠার সেপাই' সেই খোঁজ করতে আরেক সংগ্রামের পথে হাঁটে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি এক একটি ধরণে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচলিত রীতির বিন্যাসে নয়, দাঁড়িয়ে আছে সমাজ ব্যবস্থা আর আন্দোলনের অধিকাঠামো ঘেঁষে। বাংলা উপন্যাসের নির্মাণ শৈলীর আরেক কালান্তরের বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে এই উপন্যাস। নায়ক নায়িকার প্রেমের খোলা বার্তা এই উপন্যাসে নেই, প্রেমের প্রত্যাখ্যানও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় মোড়া বিষাদ আবেগের বোঝা হয়ে আছে।

চিহ্ন এবং চিলেকোঠার সেপাই ঃ

'চিহ্ন' উপন্যাসের পটভূমি ও প-টের বাস্তবতাটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আবার 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসেও এই ব্যাপারটা মুখ্য। "১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে দেশব্যাপী তুমুল বিক্ষোভ দেখা দেয়। এ বছরের নভেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনজন নায়কের বিচার ও দন্ড হওয়ায় সমগ্র দেশে বিক্ষোভ চরমাকার ধারণ করে। এই বিক্ষোভ ক্রমে পুলিশ ও সৈন্য বাহিনীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।"৫ এই বাস্তবিক ঘটনার রূপায়ণ হল 'চিহ্ন'। এই উপন্যাসের ঘটনার গতি অতি দ্রুত, চরিত্র সংখ্যা অগনন। "প্রখর ঘটনার প্রবাহে চরিত্র মিছিলের স্রোত অবশ্য একমুখী। মানিক বহুজনের হৃদয়ে ধৃত দেশপ্রীতি ও আদর্শকে নিরীক্ষণ করেছেন নিজের জীবনাদর্শের আলোকে।"৬

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের বাস্তবিক ঘটনা প্রেক্ষাটাও ছিল জনতার বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল। "১৯৬৬ সালের ১৯ এপ্রিল শেখ মুজিবর রহমানকে যশোরে গ্রেফতার করা হয়। জামিনে মুক্তি দিয়ে ২৩ এপ্রিল পুনরায় তাঁকে জামিন অযোগ্য ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করা হয়। তারপর থেকে তার বিরুদ্ধে উপযুপরি মামলা দায়ের হতে

থাকে। এক জেল থেকে আরেক জেলে স্থানান্তরিত হতে থাকেন তিনি। শেষে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে।"৭ সম্পূর্ণ একটি মিথ্যা মামলায় শেখ মুজিবরের সঙ্গে আরো রাজনৈতিক নেতা ও সরকারী কর্মচারীদের ফাঁসানো হয়। "বলা হয়, ভারত সরকারের মদতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে 'স্বাধীন পূর্ববাংলা' প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল এবং ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী পি.এন. ওঝা এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত। অভিযুক্তদের কয়েকজন আগরতলায় গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদেরর সঙ্গে চক্রান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেছিল।"৮ এই কারণে এই মামলার নাম দেওয়া হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা বা সরকারী কর্মচারীর নাম ক্রমান্বয়ে জনমনে উহ্য হয়ে যায়, একমাত্র শেখ মুজিবরের নামই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্যমণি হয়ে ওঠে এবং তাকে মুক্ত করে আনার জন্যে জনমনের প্রতিদিন বিস্তার ঘটতে থাকে, আর শেখ মুজিবরের আওয়ামী লিগ দলের প্রতি জনগণের আনুগত্যও বাড়তে থাকে। এই পটভূমিতে আখতারুজ্জামান প-ট বা আখ্যানভাগ বা কাহিনীর ছক নির্মাণ করেন।

প-ট / আখ্যান / কাহিনী বিন্যাস ঃ

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের গঠনরীতি পর্যবেক্ষণ করলে বেশ বোঝা যায় এর কাহিনী ভাগ মোটেই সরল প্রকৃতির নয়। আবার যে সুগ্রথিত তাও নয়। যেহেতু এই উপন্যাসের পটভূমি দুটি দিগন্তে প্রসারমান। বড় দিকটা ঢাকা কেন্দ্রিক এবং অপরটি গ্রামকেন্দ্রিক - বৈরাগী, ভিটা, চন্দনদহ, ডাকাত মারা চর, ধারাবর্ষার চর, গোটিয়া, তালপোঁতা, পদুমশহর, চিথুলিয়া, কার্ণিবাড়ি, কামালপুর, গোলাবাড়ি প্রভৃতি এলাকা ব্যাপী বিস্তৃত। অর্থাৎ এই উপন্যাসের প-টটা জটিল।

উপস্থাপন পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 'চিলেকোঠার সেপাই' এর প-ট প্যানোর‍্যামিক বা বিস্তৃত ও শিথিল ধাঁচের আখ্যানভাগ। প্যানোর‍্যামিক প-টে অনেক চরিত্রের ভীড়; চরিত্রেরা যতখানি 'টাইপ' - ধর্মী ততখানি ব্যক্তিস্বভাব বিশিষ্ট নয়, চরিত্র ও ঘটনা সম্পর্ক এখানে কিছুটা শিথিল, জীবনের বিস্তৃত ও বিচিত্র বাস্তবতাকে প্রতিবিম্বিত করার অভিপ্রায়ে প্যানোর‍্যামিক প-টের পটভূমি বিশদ ও ব্যাপক হয়।"৯ আবার গঠনগত দিক থেকে এই উপন্যাসটি বৃত্তাকার নয়। এই উপন্যাসটি পন্থাকার ও হর্মাকার এই দুয়ের মিশ্রণে গঠিত। বৃত্তাকার প-ট দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে থাকে। পন্থাকার প-টের গঠন শিথিল হয়। জীবনের টুকরো ছবি, একটি ভাবদৃষ্টি ও কিছু চরিত্রের সমাহারের সরল স্বতঃস্ফূর্ত তার গতি। কোন এক পান্থ জনের জীবন পরিক্রমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা গ্রথিত এ প-টের নির্মাণে।১০ হর্মাকার প-ট জীবনের বিস্তৃত প্রেক্ষিতে নির্মিত এক জটিল গঠনরূপ। মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর সংযোগে, বহুসংখ্যক ও বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশে, ঘটনা ও পরিস্থিতির বৈচিত্র্যে হর্মাকার প-ট চমৎকারভাবে বিন্যস্ত।

কাহিনীর মূল উপাদান চরিত্র এবং ব্যক্ততার বিন্যাস। 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের ব্যক্ততা শুরু হয়ে যায় অদ্ভুত আকস্মিকতার মোড়কে, ওসমানের স্বপ্নচারিতার মধ্য দিয়ে ওসমানের শৈশবের উদ্বেগ উৎকণ্ঠ হয়ে পাঠককে তীব্র কোহল

সন্ধানে নিয়োজিত করে দেয়। 'রঞ্জু' নামটা নিয়েই প্রথমে পাঠকও একটু বিভ্রমে পড়ে যায়। কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়ক চরিত্র ওসমান নিজেও বিভ্রমে পড়ে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও গোলমেলে অবস্থায় ফেলে তার চেতনায় শান দেয়। এ হলো আখতারুজ্জামানের অভিনব প্রয়াস।

আবার মনোবিজ্ঞানগত শিজোফ্রেনিয়ার যে অ্যাকুট ম্যানিয়া বা অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও অস্থিররতার কারণে অলীকবীক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, যাকে আমরা দিবাস্বপ্নের বিন্যাসেও ভাবতে পারি — এমন ধরণের বীক্ষণের পাশাপাশি বিশ্বসুন্দরীর পুরুষ্টু উরুর প্রতিভাসে ওসমানের যৌন তাড়না প্রণোদিত হয়েও আবার থিতিয়ে যায়। সকালবেলা স্বপ্নে দেখা তার বাবার লাশের স্পর্শ তখনও সে পায়।

এরপরই রঞ্জু আসে ওসমানের কাছে আবুতালেবের গুলিতে নিহত হবার সংবাদ নিয়ে - ওসমান ঢুকে যায় মকবুল হোসেনের ঘরে, সেখান থেকে রাস্তায়, কাঁধে লাশের খাট, পুলিশের গাড়িতে সওয়ার।

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের দুটি প-ট, দুটি প-টেই সংগ্রামী জনতার ভিড়। মূল কাহিনী আবর্তিত হচ্ছে শেখ মুজিবরের মুক্তি আন্দোলনের মিছিল মিটিং সমাবেশের বিক্ষুব্ধ আলোড়নে, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বার্থের নানা দিকও উপন্যাসের কাহিনীর একটি সমান্তরাল বিষয়, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুষঙ্গগুলি। এই উপন্যাসের বয়ন শিল্পের জন্যই এসেছে। এবার প-ট দুটির বিন্যাস - বুনোটের বিষয়টি দেখা যাক —

প-ট নং -১ ঃ মূল কাহিনী ভাগ ঃ

ওসমান ও চিলেকোঠা ।। ওসমান, রানু ও রঞ্জু ।। খিজির, খিজিরের মা ও ফালু মিস্ত্রি ।। খিজির, খিজিরের মা ও ররহমতউল-া ।। জুম্মান, জুম্মানের মা ও খিজির ।। জুম্মানের মা ও রহমতউল-া ।। খিজির ও আলাউদ্দিন ।। জুম্মানের মা ও কামরুদ্দিন ।। খিজির ও বজলু।। আলাউদ্দিন ও রহমতউল-া ।। আলাউদ্দিন ও সিতারা ।। মকবুল হোসেন ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য।। ওসমান, শওকত, আনোয়ার, আলতাফ ও সিকান্দার ।। জুম্মান, খিজির ও ওসমান।। ঢাকার রাস্তা, মিছিল জনতা, পল্টনের ময়দান, বায়তুল মোবাররম ময়দান এবং সমাবেশ।।

প-ট নং -২ ঃ উপকাহিনী ঃ

চেংটু ও বেরাগী ভিটা ।। আনোয়ার ও জালাল মাস্টার ।। আনোয়ার ও খয়বার গাজী ।। আনোয়ার ও আফসার গাজী।। আনোয়ার ও হোসেন আলি ফকির।। খয়বার আলি ও হোসেন আলি ফকির ।। আনোয়ার, চেংটু ও আলিবক্স ।। নবেজউদ্দিন, করমালি ও পচার বাবা (শুকরা মন্ডল)।। আনোয়ার, নাদু ও চেংটু ।। আনোয়ারের বড় চাচা ও মেজোমামা (ইয়াসিন)।। ধারাবর্ষা ও ডাকাত মারা চর ।। গরুর বাথান ও খোয়াড়।।

'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটিতে কেবলমাত্র প-ট নং ১ বা মূল কাহিনী থাকলেই যথেষ্ট হতো, প-ট নং ২ বা উপকাহিনীর কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। মূলকাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর কোন সংযোগ নেই। আছে সুতোর মতো একটি প্রায় অদৃশ্য সংযোগ রেখা, সে হল আনোয়ারকে লেখা জালাল মাস্টারের চিঠি। এই চিঠিতে জালাল

মাষ্টার তাকে তাদের গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছে। তাদের গ্রামাঞ্চলে খুব গরু চুরি হচ্ছে। তাদের বাড়িতে বছর কামলা হিসাবে কাজ করে নাদু পরামাণিকের গরু চুরির ঘটনার উলে-খ আছে, তার এজাহার থানায় নেয়নি, বরং পরদিন তাকে কারা যেন পাল্টি দিয়ে খুব মারে। তার ছেলে চেংটু খুব বেড়েছে, ওর জন্যেই পরিবারটির সর্বনাশ হবে - ইত্যাদি ইত্যাদি। এই চিঠি ওসমান পড়ে মাত্র। আনোয়ার তাকে পড়তে দিয়েছিল। ওসমানকে গ্রামে যাবার জন্যে সে প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু সে যায়নি। ওসমান মানসিকভাবে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে করমালি তার সেবা শুশ্রুষা করে্

মূলকাহিনী যেমন আকস্মিক শুরু হয়েছে ওসমানের স্বপ্নের অনুভব দিয়ে, ১৪ অধ্যায়ে উপকাহিনীও আকস্মিক শুরু হয়ে যায়। এখানে কোন স্বপ্ন নেই। একদম বাস্তব। খয়রার গাজী জিজ্ঞাসা দিয়ে — 'আকবর ভায়ের ব্যাটা?'

আসলে উপকাহিনী সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র কাহিনী বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে এই কাহিনীর সঙ্গে একটা সহ সম্পর্ক আছে। তাই এই কাহিনীকে উপকাহিনী না বলে সহকাহিনী বলা ভালো।

এবার আমি মূল কাহিনীর আলোচনায়। মূল কাহিনীকে সুডৌল কোন গল্প নেই। ওসমান ও রানুর প্রেমের গল্প? সেও তেমন মাখো মাখো নয়, তাত্ত্বিকতায় তা আতুসি। ওসমানের মধ্যে যৌনতার বেশ উত্তাপ আছে, যেমন যুবকদের থাকে আর কি। মাখো মাখো প্রেমের পরিবেশ বেশ ছিল, যদি দেহজ চাহিদার কথাই ধরা যায় তার পরিবেশ ও সময় রানু তো দিয়েছে, দেবদাস মার্কা প্রেমের কথা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ওসমান তো প্রস্তুতি নিতেই সময় পার করে দেয়। একটু স্পর্শ আসঙ্গ, চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেওয়ার উত্তাপ ইত্যাদি ওরাল অ্যাফেয়ার বেশ হতে পারতো, এতে যৌনতার অবদমন জনিত বিভ্রাটের সম্ভাবনা মুছে যেত। কিন্তু ওসমান যেভাবে যৌনতার ওরাল অ্যাফেয়ার অবদমিত করেছে, তাতে তার মনোবিকালন ও মনোরোগী হবার পক্ষে যথেষ্ট। আবার রানুর ভাই রঞ্জুর প্রতি তার প্রেম আছে, সে তার আত্মরতি।

রহমতউল-ার বাড়ির চিলেকোঠার বাসিন্দা ওসমান। শিক্ষিত চাকুরীজীবি হিসাবে বাড়ির মালিক তাকে গুরুত্ব দেয়। দোতলার ভাড়াটে মকবুল হোসেনের অনুপস্থিতিতে তার বড়ো ছেলে পুলিশের গুলিতে নিহত হলে তাকে রহমতউল-া রঞ্জুকে দিয়ে ডেকে আনে। সেই থেকে মকবুল হোসেনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক ও সম্বন্ধের পথ প্রশস্ত হয়। মকবুল হোসেন তার কালোপানা মেয়ে রানুকে তার কাছে প্রাইভেট পড়তে পাঠায় হিসাব করেই, কলেজ - টলেজ তো ওই ওসমান, রানু তো বুঝে নিয়েছেই, তার সঙ্গে তার ভাইও পড়তে যায়, তার সঙ্গেও তার বেশ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে।

ওসমান রানুর সেকেন্ড ব্রাকেট মার্কা ঠোঁট সৌন্দর্যের উপরে ঢেউ খেলানো জায়গাটায় এবং নাকের উপরে জমে ওঠা লবনাক্ত স্বেদশিশির বিন্দুগুলি যেদিন একদম শুষে নিতে ছটফট করে, সেদিন রঞ্জুতো কায়দা করে ওদের সুযোগ করে দিতে তাদের মায়ের ফাইফরমাস খাটতে যায়। না ওসমান, ঠোঁট দিয়ে শুষে নিতে সাহস পায়নি। সে তার ডান হাতের মধ্যমা ও তর্জনী দিয়ে ব-টিং এর মতো ঠেসে ধরে মুছে দেয়। রানু হয়তো এর

চেয়ে বেশি কিছু চেয়েছিল।

এই উপন্যাসে ওসমানের সমান্তরালে রয়েছে খিজির। খিজিরের জীবনবৃত্তের শৈশবটাই ছিল ঠেলা খাওয়া। ফালু মিস্ত্রির কাছে তার মা যখন ছিল তখনও তাকে আয় করে খেতে হত। রহমতউল-ার কাছে যখন তার মা এলো তখনও তাকে তার মহাজন রহমতউল-ার ফাইফরমাস খাটতে হতো। বড়ো হয়েও সে নিঃস্ব, কাজ করে ঠিকই, কিছুই থাকে না। রহমতউল-ার গ্যারেজে কাজ করত সে, রাজনীতি করার জন্য তাকে সরতে হয়। রহমতউল-ার ভাগ্নে আলাউদ্দিনের গ্যারেজে কাজ শুরু করে দেয়। জুম্মানের মায়ের সঙ্গে বিয়ে হবার পরও সে কোন রকমে বাড়িভাড়াটুকু দেয়। আবার খিজিরের মা এবং জুম্মানের মা উভয়েই রহমতউল-ার যৌনলিপ্সার বলি।

ওসমান রাজনৈতিকভাবে অ্যাকটিভ নয়, কিন্তু সংশ্রবে থাকতে চায়। খিজির রাজনৈতিকভাবে অ্যাকটিভ।মিছিল সমাবেশের নাম শুনলে কিংবা দেখলে সে সেখানে লাফিয়ে পড়ে। সে হল আন্দোলনে উন্মত্ত।

প্রেমে বা রাজনীতিতে ওসমান নিজেকে যখন সময়ে জড়াতে পারেনা। সম্ভবত এই কারণেই ধীরে ধীরে সে মনোরোগীতে পরিণত হয়। অলীকবীক্ষণ তার স্বভাবগত ব্যক্ততা। অবশ্য চিলেকোঠার আবদ্ধতাও তার মনোবিকল্পের অন্যতম কারণ। কারাফ্যুর কারণে সকলকেই আবদ্ধ থাকতে হয়। ওসমানকেও থাকতে হয়।

সবচেয়ে মুশকিল এই উপন্যাসের প-টিং ধরা। কেননা মিছিল সমাবেশ কারফ্যু কখন যে শুরু হয় আর কখন যে গুলি, টিয়ার গ্যাস চলে বোঝা যায় না, যখন তখন রাস্তার যেকোন প্রান্ত থেকে মিছিল বেরোয়, শোনা যায় শে-াগান — 'শ্যামসুজ্জেহার রক্ত' — 'বৃথা যেতে দেব না', 'জেলের তালা ভাঙবো' —'শেখ মুজিবাক আলবো'(পৃঃ ২৩২)। কখনো সমাবেশ বায়তুল মোকারমে, কখনো পল্টন ময়দানে। রেস্টুরেন্ট, বিতর্ক, পথ, মিছিল, কারফ্যু, গুলি, মৃত্যু, টিয়ার গ্যাস প-টিং-এর বিশেষ অঙ্গ। এইসসব একসঙ্গে ধরা মুশকিল। আবার বিক্ষুব্ধ জনতার নানা অ্যাকটিভিটিজও এই প্রসঙ্গে স্মরনীয়ঃ " মওলানা ভাসানীর মিটিং থেকে বেরিয়ে মিছিলের লোকজন বর্ধমান হাউসের পাশে আগরতলা মামলার ১ নম্বর জজসাহেবের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিলো, আর অনেকের সঙ্গে খিজির আলি তখন ঐ জজসাহেবকে খুঁজছিলো হন্যে হয়ে।" (পৃঃ ২২৬)।।

এক ওসমানের কল্পচারিতা, স্বপ্নচারিতা ও অলীকবীক্ষণের প্রসঙ্গগুলি যদি সাজানো যায় অন্যান্য প-টিংগুলি ঢাকা পড়ে যায়। কেননা মিছিল মিটিং ও সমাবেশের প-টিংগুলি মূলকাহিনীর সহসাংসর্গিক ডায়মেনসন। যখন পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবরের জেল মুক্তির আন্দোলন, মিছিল, সমাবেশ চলছিল তখন আনোয়াররাও তাদের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে কাজ করছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনগুলি যৌথভাবে কর্মসূচিও গ্রহণ করেছিল। এইসব টুকরো টুকরো ছবি জনতার সমাহারে স্বতঃস্ফূর্ত গতি নিয়ে উপন্যাস জুড়ে সঞ্চারমান। এগুলি প-টের পন্থাকার বৈশিষ্ট্যকে বেশ খানিকটা সমর্থন করে।

আবার ওসমানের ব্যক্তিমানসের ভেতরকার সংশয়, স্ববিরোধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, চৈতন্যের বিবশ বিভ্রম ইত্যাদির প্রেক্ষিতে এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হর্ম্যকার প-ট নির্মিতের পদ্ধতিকে সমর্থন করে। অবশ্যই এইসব কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়।

রানুর সঙ্গে ওসমানের চলতি প্রেমের একটু জড়াজড়ি চলতেই পারতো, চলতে পারতো আরো কিছু, সেক্ষেত্রে ভাবনার কোন অবসর রাখার প্রয়োজন ছিল না। বাংলা উপন্যাসের চরিত্র খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। প্রচলিত প্রথার বাইরে হাঁটা অনেক দিন শুরু হয়েছে। সময়ের হাত পড়েছে তার গায়ে। "ব্যক্তি ও সমাজের অন্বয়ে অনন্বয়ে, সংঘাতে ও সংযোগে ব্যক্তিস্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে নানা ভাবে। বাস্তবের সমস্যা ও শিল্পের সমস্যাকে একই প্রেক্ষিতে স্থাপন করে, স্বরমাত্রায় নানা লয়, নানা স্তর আরোপ করে লেখকেরা প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন আজকের সময়ের, সমাজের তথা জীবনের চলচ্ছন্দকে। পাল্টে যাচ্ছে গল্প বলার, ধরতাই, বুনুনি ও বিন্যাসের ধারা ধরণ।"১১ তাই ইলিয়াস মনের যৌথ কথাকে উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরেছেন নির্দ্বিধায় —

১. "নিজের তীব্র রক্তস্রোতের ঘন নির্যাস রানুকে সমর্পণ করে ওসমান তার চোখের পানি পুষিয়ে দেবে।" (পৃঃ ২০৮)।।

আরেকটি দৃষ্টান্ত যদিও ওসমানের এসব ঘটে বিভ্রম বাতুলতায় —

এদিকে রানুর বুকে হাত দিতে গিয়ে দ্যাখে, সেখানে খয়েরী সূতার এম্ব্রয়ডারি করা প্যাগোডা আঁকা হাওয়াই সার্টের পকেট। তাই তো রানুর ঠোঁট পরিণত হয়েছে রঞ্জুর ঠোঁটে। রঞ্জুকেই সে অবিরাম চুমু খেয়ে চলেছে। এটা হলো কি করে? রঞ্জুকে নিয়ে সে করবেটা কি ? তার চাই রানুকে। (পৃঃ ২০৮)।।

রাজনৈতিকভাবে কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকার কারণেও ওসমানের উপর একধরণের প্রভাব পড়ে। এতেও তার মনে কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হয়। এও অবদমনের ফল। এই অনুষঙ্গে তার মাথায় একটি কবিতার লাইন হয়ে ওঠে — 'কারফ্যু দাগানো পথ, রাত্রিবেলা ছাদের ওপরে থাকি আমি একেলা!'

ওসমানের মনোবিকল্প আরো তীব্র হয়। রঞ্জুকে নিয়ে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে সেনাবাহিনীর লোককে শিক্ষা দিতে চায়। আবার ওসমানের গালে দু-তিনটে চুমু খায়। ভীত দেখে তাকে ঠাস করে চড়ও মারে। শওকত বুঝতে পারে সে সিক। সে এলোমেলো ভাবনাচিন্তা করে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে মূল কাহিনীতে খিজিরের মা, জুম্মানের মা, ফালু মিস্ত্রি, কামরুদ্দিন, রহমতউল-া প্রভৃতি চরিত্র এসেছে সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতার ছবিটা তুলে ধরার জন্য। খিজিরকে আনা হয়েছে এই অর্থে এবং আন্দোলনের অনুষঙ্গে। সে-ই আন্দোলনের মুক্ত পাখি। জুম্মানকে ওসমান ও খিজিরের (মৃত) মধ্যে যোজকের ভূমিকায় রাখা হয়েছে।

খিজির গোটা সাতেক লোক নিয়ে মিছিলে চলে যায়, ক্রমে সেই মিছিল স্ফীত হয়। শে-াগানের আওয়াজে আওয়াজে মিছিল বৃহতাকার হয়ে ওঠে। মিছিলে গুলি বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। লাশ পড়তে থাকে। খিজিরের বুকের বাঁদিকে ও পেটের ঠিক ওপরে এই দুই জায়গায় গুলি লাগে। ব্যাপারটা ঠিক সে বুঝতে পারে না, গালাগালি করার জন্যে মুখ হাঁ করে মাত্র। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল তার দেহ।

ওসমানের মানসিক অবস্থা আরও খারাপ হয়। সে প্যারানয়েড শিজোফেনিয়ার রোগীতে পরিণত হয়। সে খিজিরকে শূন্যে ঝুলতে দেখে। শওকমত ধমক দেয়। জুম্মান

খিজিরকে দেখতে চায়। খিজিরকে তার স্ক্রু-ডাইভার আর প-ায়ার পৌঁছে দিতে চায় ওসমান। জুম্মান সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়।

এখন ওসমান আনোয়ারের কড়া পাহারায়। কিছুতেই সে চিলেকোঠা থেকে বেরোতে পারে না। এতই সে চিত্ত বিভ্রমে পড়ে গেছে যে কাউকে সে চিনতে পারছে না। ওসমানের এই যে বিভ্রম, এর পিছনে সামাজিক বিশৃঙ্খলাও দায়ী।

রহমতউল-া বিছানায় পোড়ো হয়ে গেছে। তাই আলাউদ্দিনের অনেকদিনের স্বপ্ন সফল হয়। সে রহমতউল-ার একমাত্র মেয়ে সিতারাকে বিয়ে করে একদম বড়ো মালিক বনে যায়। সে ঘরভাড়া বাড়াতে থাকে ব্যাপকভাবে। মকবুল সায়েব অন্যত্র বাসা নেয়। যাবার আগে মকবুল হোসেন ওসমানের সঙ্গে দেখা করতে আসে। সে মকবুল হোসেনের কথা শুনছিল না।সে তাকাচ্ছিল রঞ্জুর দিকে। 'ছাদের রেলিঙে ভর দিয়ে রঞ্জু তখন পাড়াটাকে ভালো করে দেখে নিচ্ছে।' আর রঞ্জুকে দেখতে দেখতে সে বিড়বিড় করে। অলীকবীক্ষণে সে দেখতে পায় খিজির যেন রঞ্জুকে আক্রমণ করতে আসছে। তাই সে বলে — '..... আরে খিজির রাখো রাখো, মেরো না। ওটাকে আমার ওপর ছেড়ে দাও !'(পৃঃ ২৮৩)।। তারপর সে রঞ্জুকে জাপটে ধরে চুমু খায়, ঠোঁটের মাংস ছিঁড়ে নেয়, — 'রঞ্জু, এই শেষবার ! ফাইন্যাল! বিদায় ?' তারপর তাকে রেলিঙের ওপারে ফেলার চেষ্টা করে। তার চিৎকারে সকলে ছুটে আসে। তাই সে প্রাণে বেঁচে যায়। "মাত্রাতিরিক্ত আত্মমগ্নতায় চিত্তভ্রংশী বাতুলতারোগে আক্রান্ত ওসমান এক্ষেত্রে মকবুল হোসেনের পুত্র রঞ্জুর মধ্যে নিজেকে, নিজের শৈশবস্মৃতি ও স্মৃতির অনুষঙ্গকে গুলিয়ে ফেলে, - তার বিভ্রম তার রোগের বাড়াবাড়িরই।"১২ এই ব্যাপারটা কিন্তু প-টিং-এর ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রঞ্জুর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ওসমানও বিধ্বস্ত। রঞ্জুকে তার হাত থেকে মুক্ত করতে গিয়ে পারভেজ ও ফরমালি মার খায়। এতে তার মানসিক অবস্থা আরো বিপন্ন হয়। "আলাউদ্দিন মিয়া এসে রাগের মাথায় মুখে একটা ঘুষি দিয়েছিল, আবার রঞ্জুর বড়ো বোনের হাজব্যান্ড এসেছিল, ওসমানের কপালে সেও একটা বে-া লাগায়।" (পৃঃ ২৮৪)।। এতে তার কপাল ও ঠোঁট কাটে। এটা ওসমানের আদলগত পরিবর্তনেরও একটি প্রয়াস বটে। কি ঘটনা ঘটে গেল। কি হলো না হলো ওসমান তার কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না। সে শুধুমাত্র একটি আবেগে পরিণত হয়।

আখতারুজ্জামান এই অসংলগ্ন কাহিনীভাগের মধ্যে এক লহমায় একটি বিষাদের ছবি আঁকেন। আনোয়ার সেই ছবি দেখে। ''লটবহর নিয়ে ঠেলাগাড়ির সঙ্গে গেল মকবুল হোসেন। ১টি রিকশায় রানু ও রানুর মা। আনোয়ার ছাদের রেলিঙে ঝুঁকে তাদের দেখলো। চোখ মুছতে মুছতে রানুর মা বারবার ওপর দিকে তাকাচ্ছিলো। রানুও তাকিয়েছিল একবার। দিন বড়ো হচ্ছে, বিকাল ৫টাতেও রানুর চুলে রোদ পড়েছে, কিন্তু তার মুখের ওপর বিকালবেলার ছায়া। রানুর মুখ ঝাপসা।" (পৃঃ ২৮৫) আনোয়ার কিন্তু স্পষ্ট করে মেয়েটিকে দেখতে পেল না। বিধ্বস্ত ওসমানও দেখতে পেল না। একটি বিষাদমূর্তি সূর্যাস্তের মতো দিগন্তে ডুবে গেল।

করমালি চলে গেল যে ওসমানকে দেখাশোনা করতো। আনোয়ার একলা পড়ে

যায়। ওসমানের সঙ্গে আনোয়ার রেস্টুরেন্টে খেতে যায়। ওসমানের জন্যে খাবার ও অন্যদের চা নিয়ে আনোয়ার চিলেকোঠায় প্রবেশ করে। আলতাফ বিচলিত। জুম্মান এসে কী যেন ইশারা করে আর ওসমান চলে যায় ছাদে। ঝুলন্ত খিজিরকে স্ক্রু -ডাইভার আর প-ায়ার দিতে চায় সে। কিন্তু নাগালে পায় না। খিজিরও স্পর্শ করে না। ওসমমান ওগুলো চাইতেই জুম্মান দিয়ে দেয়। ওসমান ছুঁড়ে দেয় যন্ত্রদুটো। খিজির ধরতে পারে না। স্ক্রু - ডাইভারটা পড়ে ছাদের কোণে। আর প-ায়ার পড়ে যায় নিচে। নিচে গিয়ে জুম্মান সেটি খুঁজতে থাকে। দৌড়োতে দৌড়োতে ওসমান হাঁপিয়ে যায়, ধপাস করে ছাদে বসে পড়ে। আনোয়ার গিয়ে কাঁধে হাত দিতেই সুবোধ বালকের মতো তার সঙ্গে চলে যায়। ওসমান ওকে বিছানায় বসিয়ে দেয়। এই ঘটনায় ওসমানের মনোজগৎ আরো পরিবর্তিত হয়। আনোয়ার আর আলতাফ তার অপরিচিত। তারা দুজনে কর্নেল। সে মুক্ত হতে চায়। অর্থাৎ সে বলে — 'আগডুম বাগডুম ইন খোলা মাঠ'। কিন্তু বন্ধ কপাট। সে আবৃত্তি করে — 'দুইজন কর্নেল একখানা খাট, বন্ধ কপাট ইয়েস বন্ধ কপাট।' সে বাইরে বেরোতে চায়। খিজিরের সঙ্গে মিলতে চায়।

ওসমানের ছড়া আরো বড় হয়। সে গুনগুন করে। ওসমান রিলিজ চায়। আনোয়ার তাকে বাড়িতে দেবে বলেছিল বলে মনে করে। আসলে সে বাড়িতে যেতে চায় কিনা তা সে জানতে চেয়েছিল।

সব কিছু ঠিকঠাক বন্ধ। আনোয়ারের খুব ঘুম পায়। সে অভঙ্গ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়। তার পায়ের ধাক্কায় ওসমান জেগে ওঠে। খিজির ওসমানকে তাড়া দেয় বাড়িতে যাবার জন্যে। ওসমানের পেচ্ছাব পায়। লুঙ্গি তুলে শুরু করে সে, পাইপ দিয়ে পাণি ঢালার মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের মধ্যের সব কিছুর উপর পেচ্ছাব করে ভিজিয়ে দেয়, বাকি যেটুকু ছিল সেটুকু দিয়ে ভিজিয়ে দেয় 'উপুর হয়ে শোয়া সেন্টির(আনোয়ারের) নাদুসনুদুস পাছাখানি।' কিন্তু আনোয়ারের এতেও ঘুম ভাঙেনি। ওসমান বালিশের তলা থেকে চাবিগোছা নিয়ে নেয়। দরজার তালা খুলে ফেলে। কিন্তু বেরিয়ে যাবার কপাট খুলতে পারে না। অবশেষে জোড়া পায়ের লাথিতে ওসমান কপাট খুলে ফেলে। ''ওসমানের এই সব তৎপরতা আনোয়ারের কানে নিশ্চয়ই ধাক্কা দিচ্ছিল। কিন্তু সে তখন আমূল ঘুমে বিদ্ধ। (পৃঃ ৩০১)।।

কপাটে জোড়া পায়ের লাথিতে কপাট খুলতে গিয়ে গতি সৃষ্টি হয়,ফলে ওসমান গিয়ে পড়ে রাস্তার উপর চিৎপটাং হয়ে। খিজিরের ধমকে ওসমান লাফ দিয়ে ওঠে। ওসমান পা বাড়ায়। রাস্তার জনস্রোতে ভেসে সে চলেছে জনসন রোডের মোহনায়। সে খিজিরের সঙ্গে পাল-া দিয়ে পারে না। সে বলে, 'আহেন! ...এক্টু জলদি করেন ওসমান সাব!' এই পর্যন্ত ওসমান মানসিক বিভ্রমের আবেগে চলে। এরপর মূল কাহিনী আবার বাঁক নেয়।

ভিক্টোরিয়া পার্কে এসে দুচক্কর দেওয়ার পর ওসমানের সঙ্গে খিজিরের সংযোগ কেটে যায়। তাকে এবার একাই পথ খুঁজে নিতে হবে। বুড়িগঙ্গা পার হতে পারলে তাকে ঠেকায় কে?

এখন আর প্যাসন নেই, নেই বিভ্রম। জলজ্যান্ত একটা শরীর নিয়ে ওসমানের হাঁটা ছাড়া তো গতি নেই। অবশেষে ওসমান সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা পায়। সে হয়ে ওঠে এক পরিবর্তিত নতুন ব্যক্তৃতার প্রতীক। ''কারো সাধ্য নেই যে তাকে সেই ওসমান গতি বলে

সনাক্ত করে।' (পৃঃ ৩০৪)।।

একটি দেশব্যাপ্ত আন্দোলন চললে কেবল সেই দেশের মাত্র শহর নগর ব্যাপ্ত আন্দোলনের প্রকৃতি, ব্যক্তি ও ব্যক্তৃতা তুলে ধরলে চলে না। তাই ঐ ব্যাপ্ত আন্দোলনের কালসীমায় গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতিও প্রাসঙ্গিক। নচেৎ সম্পূর্ণতা আসে না। তাই 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে আনোয়ারদের গ্রাম ও অন্যান্য সংলগ্ন গ্রাম ও তার অধিবাসীদের জীবনজীবিকার ছবি তুলে ধরা হয়েছে।

শহরের তুলনায় গ্রামের নিম্নবিত্ত কিংবা ব্রাত্য জনতার অবস্থা অনেকখানিই খারাপ হয়ে থাকে। কেননা তুলনামূলকভাবে গ্রামে সামন্ততান্ত্রিক চাপ বেশি থাকে,আর থাকে নানা বদ্ধমূল সংস্কার ও অলৌকিক ধ্যান ধারণা, যা সামন্ততান্ত্রিক শক্তিকে সমর্থন করে। বৈরাগী ভিটা এমন একটি বশবর্তী ধারণার বিষয়।

খয়বার গাজী গ্রামের মাতব্বর, তার কথাতেই সকলে ওঠে বসে। ডাকাত মারা চরে তার বিশাল বড় গরুর বাথান হোসেন আলি ফকিরের অধীনে আছে। সে তার ঠকবাজির সাকরেদ। পার্শ্ববর্তী নানা গ্রাম থেকে রাতের বেলা তাদের লুটেরাবাহিনী গরু বলদ লুঠে এনে জমা করে ঐ বাথানে। নবেজউদ্দিন, শুকরা মন্ডল (পচার বাপ), করমালি, নাদু পরামানিকদের গরু বলদ চুরি হয়ে যায়। এ ধরণের চুরি সকল গ্রামে চলতে থাকায় গরিব মানুষেরা তাদের চাষের কার্যক্ষমতা হারায়, সকলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

আনোয়ার ঢাকা থেকে তাদের গ্রামে আসে কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন করা যায় কিনা৷ তার জন্যে। নাদু পরামানিকের ছেলে চেংটু কমিউনিষ্ট আন্দোলনে নেতা আলিবক্সের অনুগামী। তারা গ্রামে গ্রামে নিপীড়িত মানুষকে সংগঠিত করে খয়বার গাজী, আফসার গাজী, হোসেন আলি ফকিরদের বিরুদ্ধে চেংটু আলিবক্সেরা হোসেন আলি ফকিরকে পুড়িয়ে মারে।

জালাল মাষ্টার খয়বার গাজীর সঙ্গে আনোয়ারকে পরিচয় করিয়ে দেয় দুজনেই দুজনকে মাপে।

বৈরাগী ভিটা গণ আদালত বসবে। চেংটু ওই ভিটার ওপরে প্রসারিত বটগাছের ডাল ঝুড়ি ইত্যাদি পরিষ্কার করে অনেকেই মনে করে এইজন্য তার উপর জিন ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

বৈরাগী ভিটায় গণআদালত বসে। খয়বারের মৃত্যুদন্ড ঘোষিত হয়। আফসারের সব সম্পত্তি জনগণের মধ্যে বেটে দেবার সিদ্ধান্ত হয়। চেংটু ধারালো কুঠার নিয়ে তৈরী, আদেশ পেলেই সে খালাস হবে। জালাল মাষ্টার আর আনোয়ারের অনুরোধে খয়বার জুম্মার নামাজ পড়বার জন্য বেশ সময় পেয়ে যায়। আর সেই ফাঁক দিয়ে খয়বার পালিয়ে যায়। অবশ্য এই কাজে আওয়ানী লীগের ছাত্র সংগঠন শেয়ালে বুদ্ধি খাটিয়ে পাহারার রক্ষণভাগ আলগা করে দেয়।

শেষ মুজিবর রহমান মুক্তি পাওয়ার ফলে আওয়ানী লীগ আইয়ুবপন্থী গণতন্ত্রীদের দলে নেওয়া শুরু করে। সেটা শহরে শুরু হয়েছে আগে, পরে গ্রামেও শুরু হয়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আফসার গাজী। চেংটুকে লোক দিয়ে মেরে দেয়। আলিবক্স ফিরে আসে না। সে ধরা পড়ে খুনের মামলায়। আফসার বাজীর আয়োজনে বৈরাগী ভিটায় আওয়ানী লীগের সভা চলে। আওয়ানী লীগের ডানার তলায় সামন্তপন্থী প্রভুরা ঠাঁই নেয়। আন্দোলনের তাড়া

শহরে ও গ্রামে কমে যায়। তারা শেখ মুজিবরের বাণী উদ্ধৃত করে। এই কয়দিনে কারফ্যু দিয়েও আগুন নেভানো যায়নি। আজ এতো মানুষ বেরিয়ে এলো শালার আগুন একেবারে নিভে ভালো?" (পৃঃ ২৫৯)।। হ্যাঁ নিভে গেল তো। নেতারা জল ঢালতে শুরু করে সর্বত্র জাতীয়তাবাদী বক্তৃতায় — "ভাইসব, ... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাত থেকে মুক্ত করে এনেছি। এই ক্লাব, এইসব দালানকোঠা - সব এখন আমাদের সম্পত্তি। ... এসবের ক্ষতি সাধন করা মানে নিজেদের বাড়িতে আগুন লাগানো।' (পৃঃ ২৬০)।। আবার গ্রামে গ্রামে বৈরাগী ভিটার জনসভাতেও প্রায় এই কথারই রণন শোনা যায়। —'ভাইসব, অনেক সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে আমাদের আন্দোলন আজ সাফল্যের দ্বার প্রান্তে। বাঙালীর জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বাংলার মানুষ আজ পশ্চিমাদের কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে। ... আমরা যদি নিজেদের মধ্যে হানাহানি করি। বাঙালী হয়ে বাঙালী বাড়ি জ্বালাই, একে হত্যা করে, ওর ফসল কেটে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করি তার সুযোগ নেবে কারা ? অর্থাৎ এইসব নেতা মানুষকে তাদের বৃহত্তর মুক্তির আন্দোলনের পথে যেতে নিষেধ করে এবং যারা আগুন পাখি তাদের আন্দোলন নানা ভাবে নিভিয়ে দেয়।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত, শেখ মুজিবরের মুক্তি লাভ পর্যন্ত, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনেতিক প্রেক্ষাপট বিন্যাস করতে গিয়ে শহর ও গ্রামের উভয় ক্ষেত্রের সামগ্রিকতার নানা দিক ছবির মতো তুলে ধরেছেন। এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি তার 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে মূল কাহিনী ও উপকাহিনী বা সহকাহিনীর মধ্যে সমান্তরাল সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং তা হলো বাঙালী জাতীয়তাবাদী ধারণার নেশা ধরানোর আবেগসৃজন। অবশ্য লেখক এটা চাননি। তিনি তো ওসমানকে নতুন পথে চালিত করেছেন। "ওসমান ও আনোয়ারের অভিনব যুগল চরিত্র বিম্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নির্মোহ ও কঠোর সমালোচনা করার পরেও কিন্তু লেখক সেই শ্রেণির মধ্যেও 'নতুন দাগ' খুঁজে পান; নিম্নবর্গীয় খিজির ও চেংটুর ক্রোধ ও দ্রোহে, তাদের 'সময়হীন' বৈপ-বিক অভিযাত্রায় পরিবর্তিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংবেদনশীল অংশের একদিন শামিল হওয়ার সম্ভাবনা দেখেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।১৩

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'শূদ্র জাগরণ' প্রবন্ধে যে শূদ্র ধারণা দিয়েছেন,. মূলগতভাবে তার মধ্যে শ্রেণিগত ব্যক্ততা নেই, আছে সমষ্টিগত অভিব্যক্তি; বিত্তগত দিকটিও নেই, আছে চতুর্বর্ণগত অবস্থানক্রম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালের যাত্রা' বা রথের রশি নাটকে যে শূদ্রদের নির্দেশ করেছেন, তা মূলত সমাজের পিছিয়ে পড়া বা পিছিয়ে রাখা মানুষের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন। আর আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বললেন পিতৃপরিচয়হীন পিচ্চিদের কথা, গরিব মানুষগুলোর কথা সহানুভূতিশীল মধ্যবিত্তের একটি অংশের শামিল হবার কথা।

ব্রিটিশ শাসনাধীন সমগ্র ভারতবাসীকেই তো বিবেকানন্দ শুদ্র বলে অভিহিত করেছেন, সমগ্র ভারতবাসীর জাগরণও ঘটেছিল, তাই তারা আজ স্বাধীন, কিন্তু ভারতীয়দের শাসনাধীন যে সমস্ত ভারতবাসী অবহেলিত প্রান্তবাসী প্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতাহীন হয়ে পড়েছে, তাদেরও একদিন জাগরণ ঘটবে। আর আখতারুজ্জামানও আশা করেন যে সহায়ক শক্তির সহযোগে নিম্নবর্গীয়দের একদিন উর্দ্ধতন ঘটবে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার বিবর্তনের বিভিন্ন দিক

ডঃ শর্মিলা দাস

সহঃ অধ্যাপিকা, শিমুরালী শচীনন্দন কলেজ অফ এডুকেশন

সাধারণভাবে ধরা হয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সূচনা ঘটে 'আর্য আক্রমণ' এর সময় থেকে।১ আর্যরা ভারতে আসার পর থেকে ভারতে লিখিত উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়, তার উপর ভিত্তি করেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সময়কালকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা - প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ২০০০ খ্রীঃ পূর্ব থেকে ২০০ খ্রীঃ পূর্ব এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ২০০ খ্রীঃ পূর্ব থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত।২ এই পর্যায় দুটি বিভাজিত হয়েছে মূলত ধর্মের ভিত্তিতে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম প্রাচীন ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ধর্ম শুধু যুগ বিভাজনেই নয়, গভীর প্রভাব ফেলেছিল মানুষের জীবনচর্যায় এবং সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থায়। আর্য সভ্যতায় সমাজ জীবনে অন্যতম স্তম্ভ ছিল জাতি ব্যবস্থা। গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই চারটি বর্ণের। এই বর্ণ ব্যবস্থার একটি অঙ্গ ছিল চতুরাশ্রম ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে মানুষের জীবনকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এই চারটি পর্যায়ের প্রথমটি হল ব্রহ্মচর্যাশ্রম অর্থাৎ শিক্ষা লাভের সময়কাল। এরপর ছিল গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস জীবন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উলে-খ পাওয়া যায় ঋক - বৈদিক যুগ থেকে।৩ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম তিনটি বর্ণের মানুষ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত, কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে ধীরে ধীরে সমাজে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতির অধিকার সঙ্কুচিত হয়। গুরুর আশ্রমে প্রাকৃতিক - শান্ত পরিবেশে, শিক্ষার্থীকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করতে হত। গুরু ও তাঁর পত্নী ছিলেন শিক্ষার্থীর পিতামাতা স্বরূপ, গুরু বা শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ছিল পিতা ও সন্তানের ন্যায়। উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা আরম্ভ হত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরিবারের ছেলেরা প্রথম দিকে উপনয়নের অধিকার পেতেন, মেয়েদেরও পুরাকালে উপনয়ন হত বলে স্মৃতিশাস্ত্রকার যম ও হারীত মন্তব্য করেছেন। তবে ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে এধরণের কোন উলে-খ পাওয়া যায় না।৪ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় সত্য জ্ঞান লাভ ও আত্মার মুক্তির উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হত, এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষার্থী - শিক্ষকের কাছ থেকে বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করতেন, পরবর্তীকালে আরও দুই ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের কথা জানা যায় — (১) বিতর্ক সভা বা পরিষদ - যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি হল উপনিষদ। অনৈক্য যা তার বাইরে, ভিতরে মানব জাতি এক ও একাত্ম, এই মূল ভাবের উপর উপনিষদ রচিত। (২) পন্ডিতদের সমাবেশ সভা, অনেক সময় রাজারা এই ধরণের সভা আহ্বান করতেন।৫ তবে ব্রাহ্মণ্য

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে বিভিন্ন বর্ণের মানুষের কর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করে জাতিগত বিভেদকে ধীরে ধীরে প্রকটিত করা হয়, ফলে বৈদিক শিক্ষা জাতি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জগৎ দ্বারা এই সময় মানুষের জীবন আবর্তিত হত। শিক্ষার দ্বারা মানুষ এই দুই জগতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য উপযোগী হয়ে উঠতে চেষ্টা করতেন। এর সঙ্গে গুরুত্ব পেত শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মূলত তিনটি - সত্য - জ্ঞান আহরণ, সামাজিক কর্তব্য ও ধর্মীয় আচার - আচরণ পালনে শিক্ষালাভ এবং এই সবের উর্ধ্বে চরিত্র গঠন। এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যাকে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মন্ডুকো পনিষদে অঙ্গিরা বলেছেন, 'ঋক, সাম, যজুর, অর্থর্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত,ছন্দ ও জ্যোতিষ এবং এই ধরণের সকল কিছুই হল অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত, পরাবিদ্যা হল শুধুমাত্র পরম পুরুষ লাভের হেতু।৬ শুধুমাত্র পুরুষ শিক্ষার্থীরাই নয়,মহিলারাও বৈদিক সাহিত্য পঠন পাঠন করতেন, এমনকি বহু বিদূষী মহিলা বৈদিক সাহিত্য রচনা করেছেন এমন প্রমাণ বহু উপাদান থেকে পাওয়া যায়, বৈদিক যুগে বিদূষী মহিলা মন্ত্র রচয়িতারা ঋষিকা এবং ব্রহ্মবাদিনী নামে পরিচিত হতেন। বৈদিক যুগের উলে-খযোগ্য ঋষিকা হলেন - রোমসা, লোপামুদ্রা, অপালা, ঘোষা, পৌলমী প্রমুখ। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে নারীদের স্বাধীনতা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়, তাদের শিক্ষালাভের অধিকারও হ্রাস পায়, এরপর ক্রমশ তারা অন্তঃপুরে বিভিন্ন বিধিনিষেধে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

বৈদিকোত্তর যুগে ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়, যাগ-যজ্ঞ প্রধান ও ব্যয়বহুল বৈদিক ধর্ম আর মানুষকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারল না। বৈদিক যুগের শেষ পর্বে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার গুরুত্ব হারায়, মূলত দুটি প্রতিবাদী ধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রাধান্য হ্রাস করে। এই দুই ধর্ম শুধু সমাজ অর্থনীতিতে নয় সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবই ছিল শিক্ষার উপর যথেষ্ট বেশী ও সুদূরপ্রসারী। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুগৃহের কোন অস্তিত্ব ছিল না, এখানে শিক্ষা দেওয়া হত বৌদ্ধ সংঘ ও বিহারে। এখানে বৌদ্ধ দর্শনের উপরে ভিত্তি করে শিক্ষা প্রদান করা হত। তবে বৌদ্ধ শিক্ষার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কোন সাদৃশ্য ছিল না একথা বলা যায় না তবে বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট বেশী। উভয় শিক্ষার লক্ষ্যই ছিল মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ। তবে বৌদ্ধ দর্শনের প্রভাবে শিক্ষার উপর ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র প্রাধান্য খন্ডিত হয় এবং বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। এখানে যোগ্যতাই ছিল শিক্ষার প্রধান মাপকাঠি, জাতি বা বর্ণ নয়। তবে প্রথম দিকে মেয়েদের জন্য কোন ব্যবস্থাই বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছিল না।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় রাষ্ট্রের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। পাঠ্যক্রম রচনা থেকে শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার্থী নির্বাচন বা ভর্তি সকল বিষয়ই নির্ভর করত শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর। এমনকি প্রাচীন ভারতে শিক্ষকের নামের উপরে শিক্ষাকেন্দ্রের জনপ্রিয়তা অনেকাংশে নির্ভর করত। তবে রাষ্ট্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার

জন্য অনুদান প্রদান করত, শুধু রাজা বা রাষ্ট্র নয় সমাজের বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি বা উচ্চরাজকর্মচারী শিক্ষা ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্ম বা শিক্ষার জন্য নিষ্কর জমি (অগ্রহার) বা গ্রাম দানের বহু নিদর্শন প্রাচীন ভারতে পাওয়া যায়।৭ তবে এই জমি দানের প্রবণতা গুপ্ত যুগেই সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ২০০০ খ্রীঃ পূর্ব থেকে ২০০ খ্রীঃ পূর্ব মধ্যবর্তী সময়ে আধ্যাত্মিক বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পাওয়ার কারণে এই সময় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যাগ - যজ্ঞ, বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা এবং কৃচ্ছসাধনা। এই সময় মোক্ষ বা মুক্তি লাভই ছিল চূড়ান্ত লক্ষ্য। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব, পেশাভিত্তিক জীবনের জটিলতা বৃদ্ধি, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ইত্যাদি মানুষকে বাস্তবমুখী করে তোলে এবং খ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্ব থেকেই ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব কমতে থাকায় আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি গুরুত্ব পায় বাস্তবমুখী এবং হাতেকলমে শিক্ষা। বিবর্তিত সময়ে প্রাচীন ভারতে সাহিত্য , ব্যাকরণ, রাষ্ট্রতত্ত্ব, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, কারিগরী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয় যেমন - চিকিৎসাশাস্ত্র, সামরিকশাস্ত্র, গ্রহ বিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি ইত্যাদি এছাড়া যাদুবিদ্যা ও শিল্পভিত্তিক প্রযুক্তি বিষয়রূপে গুরুত্ব পায়।৮ এইসব বিষয়গুলির মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান খ্রীঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে যা ভারতের বাইরে থেকে আগত বিদেশীদের কাছে মূলত গ্রীকদের কাছে বিশেষ আকর্ষনীয় বিষয়ে পরিণত হয়। বৈদিক যুগেও চিকিৎসা ছিল একটি উলে-খযোগ্য পেশা। অথর্ববেদে 'পৌষ্টিকানি সূত্রাণি' অধ্যায়ে নানাধরণের ব্যাধির ও তার প্রতিকারের উলে-খ আছে। তবে চিকিৎসকরা প্রয়োজনে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে যেতেন তাই সমাজপতিরা চিকিৎসকদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। তখনকার সমাজে চিকিৎসকদের অশ্রদ্ধার বিষয়টি শত পথ ব্রাহ্মণের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়।৯ তবে পরবর্তীকালে চিকিৎসকদের গুরুত্ব চিকিৎসাশাস্ত্রের জনপ্রিয়তার সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছিল। জীবকের গল্প থেকে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান সম্পর্কে জানাযায়। জীবক নিজে তক্ষশীলায় সাতবছর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ণ করেছিলেন।১০

তক্ষশীলা ভারতের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। কথিত আছে রাজা তক্ষকের নাম অনুসারে তার পুত্র ভরত এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। এটি প্রাচীন গান্ধারের রাজধানী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে তক্ষশীলা খ্রীঃপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই খ্যাতির চরম শিখরে পৌছায়। তবে এই খ্যাতি অনেকাংশেই এই প্রতিষ্ঠানের যোগ্য শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল ছিল। প্রসেনজিৎ, জীবক, পানিণী এবং কৌটিল্য এরা সকলেই ছিলেন তক্ষশীলার ছাত্র।১১ এই প্রতিষ্ঠানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধশিক্ষা একই সঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন, বৌদ্ধ ধর্মমত ভারতের প্রচলিত ধর্মের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করতে চেষ্টা করেনি। তাই বহু শতাব্দী ধরে দুই ধর্মমত (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ) পাশাপাশি অবস্থান করে একে অপরের প্রতি সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।১২ তবে এই প্রাচীন ঐতিহ্যশালী বিশ্ববিদ্যালয়টি ৪৫৫ খ্রীঃ নাগাদ হুণদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।১৩

পঞ্চম শতাব্দীর পর নালন্দা অন্যতম উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে ওঠে। তবে এই প্রতিষ্ঠানটি অশোক তার জন্মস্থান সারিপুত্রে গড়ে তুলেছিলেন বলে জানা যায়। এই শিক্ষাকেন্দ্রটি গুপ্তযুগ, হর্ষযুগ এমনকি পালযুগেও তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিষয়গুলিতে বিশেষীকরণের সুবিধা ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স ছিল ২০ বছর। তবে একমাত্র যোগ্য ছাত্ররাই তাদের মেধাবী ভিত্তিতে নালন্দায় পড়ার সুযোগ পেতেন। এর পঠন পাঠনের মান এত উন্নত ছিল যে বিদেশের বহু ছাত্র এখানে শিক্ষালাভে উৎসাহী হন। এখানে বহু ছাত্র এসেছিলেন চীন, সিংহল, সুমাত্রা, জাভা ও তিব্বত থেকে। কিন্তু পাল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।১৪

নালন্দা ছাড়াও উত্তরভারতের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি হল - বিক্রমশীলা, বলভী, জগদ্দল প্রভৃতি। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিরও যথেষ্ট সুনাম ছিল। দক্ষিণ ভারতে মন্দিরের অনুদানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলি। পল-ব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট এবং চোলদের বিভিন্ন প্রশস্তি এবং তাম্রফলকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুদান প্রদানের নিদর্শন পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের উলে-খযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল রাষ্ট্রকূট রাজত্বে সালোৎগি, পল-ব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এছাড়া ছিল তিরুভোবরাইউর ও মালকাপুরম নামে উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র।১৫

সুতরাং প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বিশেষ উন্নততর, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থার আশ্রম শিক্ষা সমগ্র প্রাচীন যুগে তার গুরুত্ব সম্পূর্ণ হারায়নি। তার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার একাধিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল যেখানে উভয় ধর্মেরই যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তবে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় ব্রাহ্মণদের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সেই প্রাধান্যকে অনেকাংশে খর্ব করে শিক্ষায় গণতান্ত্রিকরণ ঘটায়। এছাড়াও শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে দর্শন সাহিত্য ছাড়াও ব্যবহারিক বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষানুরাগী মানুষ ও পর্যটকেরা এই শিক্ষা ব্যবস্থার আকর্ষণে প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে ভারতে আসেন। তবে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার এই গুণমান ও বিশ্বখ্যাতি বহিঃশত্রু প্রধানত মুসলিম আক্রমণে অনেকাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সমগ্র মধ্যযুগে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্টানে সেই গুণগতমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় আপ-ুত হয়ে দেশবাসী যখন পুরাতন ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিলেন তখন ধ্রুপদী যুগের শিক্ষার গুরুত্ব পুনঃপুতিষ্ঠিত হয় তবে তাকে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব হয়নি।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. The Making of Early Medieval India - B.D. Chattopadhyaya, Oxford,New Delhi,2005 (4th Impression) PP.4

২. Milestones in Ancient and Medieval Indian Educa tion - Biswa Ranjan Purkait,New Central Book Agency (P) LTD,Calcutta,2001,PP. 17

৩. ভারত ইতিহাসের সন্ধানে(১ম) — দিলীপ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যালোক, কলকাতা,২০০০, পৃঃ ১৩১ - ১৩২

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩০

৫. Ibid B. R. Purkait, PP. 16

৬. Education in India: Past, Present, Future - Jyoti Prasad Banerjee, Central Library, Koikata,2007 (7th Edition),PP. 48

৭. প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে - রণবীর চক্রবর্তী, আনন্দ, কলকাতা, ১৪১১ (২য় মু.) পৃঃ ২৭২ - ২৭৪

৮. Ancient India - R. C. Majumder, Motilal Banarasidass, Delhi, 1971 (6th Edition),PP 452.

৯. প্রাগুক্ত, দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩৫

১০. WWW. Education System in Ancient India _ SciForums _ com.htm (15th Nov.2009)

১১. Ibid , J. P. Banerjee,PP. 70

১২. Civilization in Ancient India - R. C. Dutta,PP. 127.

১৩. Ibid, R. C. Majumder,PP 456 & WWW. Education System in Ancient India _ SciForums _ com.htm

১৪. Ibid , J. P. Banerjee,PP. 72

১৫. Ibid , J. P. Banerjee,PP. 77

ভারত তীর্থে মহামানবের সাগর তীরে

কুমুদ রঞ্জন দাস

ভারতবর্ষ একটি ঐতিহ্যবাহী সুমহান দেশ। যে দেশ ত্যাগ ঐশ্বর্য ও জ্ঞান গরিমায় পরিপূর্ণ এবং প্রেমাদর্শ ও মহানুভবতায় সবিশেষ অনুপ্রাণিত এক সমষ্টিগত জাতিসত্ত্বা। তদুপরি জগৎ কল্যাণে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে, মহান উদার্যে ও পরম সহিষ্ণুতায় এক অদ্বিতীয় মানবধর্মে নিবেদিত জাতি সমষ্টি। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সনাতন ধর্ম মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে মানুষের মূল চাহিদা পূরণ করে মানুষকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করে মানুষের মাঝেই দেবত্বের প্রতিষ্ঠা করে। তাই জাত - পাত এবং ধর্ম বৈষম্যের বিভেদ ভুলে বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল মন্ত্রে স্বয়ং বিশ্বকবির সুললিত কন্ঠে উচ্চারিত হয়েছে —

“হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য. হেথায় দ্রাবিড় - চীন,
শক হুণ দল, পাঠান মুঘল এক দেহে হ’ল লীন।”

ধর্ম কখনো বিচ্ছেদের ব্যবধান নয়, ধর্ম হলো এক পবিত্র মিলনের সেতু। এ কথাটি ধর্মপ্রাণ মানুষ মাত্রেই বিশ্বাস করে থাকেন। হিন্দুধর্মেরও মূল বৈশিষ্ট্য হলো তার বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল মন্ত্রে জগৎকল্যাণ ও সার্বজনীনতা। প্রকৃত হিন্দু ধর্মের অর্থ হলো সর্বদা বিশ্বকল্যাণে নিবেদিত আদর্শবাদীতা। তবে হিন্দুর কোনও বিশেষ জাত নেই। তারা কেবলমাত্র মানব জাতি অর্থাৎ মনুরই সন্তান। “মন” অর্থ সেই মন্ত্রময় পুরুষ, যার প্রকৃত অর্থ হলো দেবভাব গ্রহণ করে সুপরিকল্পিত ও সুভাবিত আদর্শ মানুষ। সুবিশাল হিমালয় পর্বতমালার আদি অক্ষর যেমন “হি” ও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতী বিন্দুর শেষ অক্ষর “ন্দু” নিয়ে গঠিত, তেমনই এর ব্যুৎপত্তি হলো হি + ন্দু = “হিন্দু” শব্দটি এভাবেই গঠিত। বিশেষত হিন্দুধর্মের পরিমন্ডলটি হিমালয়ের ন্যায় যেমন বিশাল ও উদার এবং পরম সহিষ্ণু এক মানবিকতার অনুভূতিতে পরিপূর্ণ যেখানে জাতিগত ভেদ বৈষম্য ও সংকীর্ণ মানসিকতার কোনও স্থান নেই।

কিন্তু মানুষ কি কখনও এর হিংস্র কবল থেকে মুক্ত হতে পারে ? এ প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। কারণ, মানুষ এ পৃথিবীতে এস সর্বদা সুখ - ঐশ্বর্যের আনন্দ উপভোগে বিভোর থাকতে চায়। কিন্তু সবাই কি সেটি লাভ করতে পারে? পারে না, কারণ এ পৃথিবী হলেঅ এক দুঃখ - বেদনার উৎস স্থল। প্রতিটি মানুষ এই উৎসস্থলের সহযাত্রী। তাই প্রতিটি মানুষকেই বইতে হয় এই দুঃসহ বেদনার অফুরন্ত ভার। এ জগৎ সংসারে প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই ‘আমার আমার’ ভাবনাটি প্রকট থাকায় প্রকৃত আসল আমি কে হারাতে হয়। এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে অহংকারের উৎপত্তি বিভিন্ন সময়ে সমাজটাকে সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। কারণ অধিক ক্ষমতাশালীরা সর্বদা নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার ক্ষমতাশালী মানুষ ধর্মের নামাবলীর অন্তরালে এক শ্রেণীর মানুষকে প্রকারন্তরে শোষণ করে চলেছে। এমনকি প্রকৃত ধর্ম প্রাণ মানুষকে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। “ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বধু ঐখানে থাকো”

- এ কথার অন্তরালে মূলত মনুষ্যত্বেরই অবমাননা করা হয়েছে। সেই পরম মন্ত্রময় মনুরই অপব্যাখ্যা করে গোটা সমাজকে কলুষিত করেছে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী অশুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

হিন্দু সমাজ জীবনে বর্ণ বিভাজন কিন্তু জাত পাতের নিদর্শন নয়। বিশেষত এটি কেবলমাত্র সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল কর্মবিন্যাসেরই নামান্তর বলা চলে। তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুললিত কন্ঠে ধ্বনি তুলেছেন - “ চতুর্বর্ণ্যংময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাজনঃ।” যার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল — গুণ ও কর্ম বিভাজনের মধ্য দিয়ে চতুবর্ণের প্রচলন করা। সুতরাং এই বর্ণ বিভাজন কখনোই জন্মগতভাবে লাভ করা যায় না। এটি নিঃসন্দেহে মানুষের কর্মাধীন মাত্র।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পর মানুষের মন নানা বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং বহির্মুখী হয়ে সাধন কার্যেও অপরিণত হয়। এই বহির্মুখী চঞ্চল মনকে সংস্কার করে অর্থাৎ সদ্‌গুরুর দীক্ষা গ্রহণের দ্বারা অন্তর্মূখী করা হলে মোহাচ্ছন্ন বিষয়গুলি অপসারিত হয়ে আত্মজ্ঞানের উন্মেষ ঘটে এবং প্রকৃত সাধন জীবন শুরু হয়। তারপর “তম” গুণ পরাভূত হয়ে সত্ত্বা মিশ্রিত “রজঃ” গুণের প্রাধান্য বদ্ধ হলেই ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ লাভ করে। এ কথার যথার্থ সত্যতা প্রমাণিত হয় পৌরাণিক মহাভারতের অজগর প্রশ্নটির ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিম্নোক্ত উত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে।

“জন্মানা জায়তে শুদ্রঃ সংস্কারা দ্বিজ উচ্চতে।
বেদ পাঠাবোদ্বি প্রৌ ব্রাহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ।”

শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্যানুসন্ধান কিংবা অনুধাবন না করে একজন স্বার্থ সচেতন ব্যক্তি নিজেকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে শাস্ত্র সম্পর্কে অর্থের বিনিময়ে নিত্যনতুন অপব্যাখ্যা করে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে “জল - অচল” ব্যাখ্যায় এক শ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে। যে কারণে হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে এক চরম অধঃপতনের সম্মুখীন হয়েছে। এই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অধঃপতিত সমাজের পুনর্মিলন ঘটাতেই স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ছিলেন নদীয়ার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাই তিনি সগর্বে উচ্চারণ করেছিলেন —

“কিংবা বিপ্র কিংবা ন্যাসী শুদ্র কেনে নয়।
সেই কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা সেই শুরু করো॥”

শূদ্র জাতি রায় রামানন্দের সঙ্গে “সাধ্যসাধন তত্ত্ব” সম্বন্ধে আলোচনা করে খুশি হয়ে শ্রীমহাপ্রভু রায় রামানন্দকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তৎকালীন জাতপাতের অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পন্ডিতগণের উপস্থিতিতে মহাপ্রভুর প্রতি তারা সবিশেষ আসক্ত অথচ তাঁর আচরণে ত্যক্ত - বিরক্ত হয়ে লেখীধারণ করেছেন —

“এই তো সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শুদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করিছেন ক্রন্দন ?”

যার প্রকৃত অর্থ হলো — “এ আবার কি ধরণের সন্ন্যাসী? যে স্পৃশ্য অস্পৃশ্য কিছুই মানে না।” আসল কথা, মানুষের মধ্যে সাম্যজ্ঞান তথা ভেদরহিত প্রকৃত জ্ঞান জন্মালে মানুষ নিজেকে আর ভাবতে পারে না। সে জাতিতে হিন্দু মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়

কিংবা শুদ্র যা-ই হোক। তখন তাঁর দিব্যচোখে সকল মানুষকেই আপন বলে মনে হয়। সে তখন নিজেকে অপরের মধ্যে অনুভব করতে শেখে। সে তখন নিজেকে ভাবাতে শেখে যে সেও স্বয় ং মনুরই সন্তান, কেউ তার নিকট পর নয়, সবাই তার আপন জন। "অমৃতস্যঃ পুত্রী" অর্থাৎ সেই অমৃতেরই সন্তান।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন। কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনি ভেদাভেদ রহিত শুভবুদ্ধিতে বোঝাতে চেয়েছেন। একটি সুশীতল জলাধারের চারটি সিঁড়ি, যার একটি দিয়ে 'হিন্দু' নামে, অপরটি দিয়ে 'মুসলমান' নামে আর একটি দিয়ে 'খ্রীষ্টান' এবং অবশিষ্টটি 'জৈন' নামে চিহ্নিত হয়। পরমহংসদেব বলেছেন, 'সবাই ঘাটে নামে জল সংগ্রহের জন্য। আবার যে যার গন্তব্যপথে চলে যায়, আসলে সবার উদ্দেশ্যই জল সংগ্রহ করা। তাহলে বিভেদটা কোথায়? প্রকৃতপক্ষে এই বিভেদটা মানুষই সৃষ্টি করে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই উলে-খ করা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব"আচন্ডালে কোল" দিয়ে অপরিসীম মানবিকতা প্রদর্শনের মহাকার্য সম্পাদন করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে পরম হৃদয়বান স্বামী বিবেকানন্দ 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'-র মহামন্ত্র প্রবর্তন করে এক মহান কার্যের সূত্রপাত করেছেন। যার ফলশ্রুতি হিসাবে সমগ্র ভারতের অস্পৃশ্য দলিত ও দারিদ্রের প্রতিকার ও উন্নতি সাধনে সামাজিক অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছে। একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা চলে। বলাবাহুল্য, নবদ্বীপ তখন ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে গোটা হিন্দু সমাজের মধ্যে এক চরম বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেব সেই বিভেদের প্রতিবন্ধকতাকে দূরে রেখে সবাইকে প্রেমডোরে আবদ্ধ করার মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এমন কি নদীয়া তথা বাংলার মাটিকে তিনি পবিত্র প্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিলেন বিশেষত চন্ডাল - হিন্দু জনসমাজকে। এদের নিয়ে তিনি শুরু করলেন এক জনমুখী ধর্মীয় আন্দোলন। যার ফলে উচ্চ - নীচ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর এই প্রেম বিতরণ সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি করেছিল।

এই প্রেম ধর্ম প্রতিষ্ঠার মহালগ্নে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কম দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। এমনকি বাদশা হুসেনশাহের অশুভ নির্দেশে কাজী ও তার নগরপালগণ সাধারণ মানুষের উপর চরম অত্যাচার চালিয়েছিল। বাংলার জাতীয় জীবনে তখন এক অন্ধকারময় দুর্যোগের ঘনঘটা। গোটা হিন্দু সমাজ তখন জাত পাতের অমানবিক ঘৃণ্য আবর্তে দোদুল্যমান। যেখানে সর্বত্র চলছে প্রতিবাদহীন চরম অত্যাচার। এহেন জটিল সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে মহান ধর্মবীর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দুর্ভেদ্য প্রতিবাদের এক লেলিহান শিখা সমগ্র বাংলার বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানে সামিল হয়েছিলেন দেশের আপামর জনগণ। বিশেষত নদীয়ার অবৈষ্ণবগণের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করেও হিন্দুধর্ম সংস্কারে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। শ্রীচৈতন্যদেবের শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল নগর সংকীর্তনের প্রভাব তখন সমগ্র নদীয়া ও নবদ্বীপকে উত্তাল করে এক বিশাল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

অবশেষে সমস্ত অত্যাচার ও উৎপীড়নকে উপেক্ষা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকল

ধর্মের মানুষকে একই ছত্রছায়ায় একসূত্রে গ্রথিত হয়ে একমনে একই সুরে পরমেশ্বর গুণকীর্ত্তনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বিচ্ছিন্ন করে সমগ্র নদীয়াবাসীকে সেই পরম কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। নদীয়ার নিমাই যেন প্রতিটি মুহূর্তে উর্ধে দুই হস্ত প্রসারিত করে নৃত্য সহকারে নগরকীর্তনে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো —

"হরি হরায় নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদনঃ।"

আবার নৃত্যের তালে তালে উচ্চারিত হতে লাগলো —

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

সেই সময় নবদ্বীপের রাজকর্মচারী কাজীর অত্যাচারে সেখানকার প্রায় প্রতিটি মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এমনকি নবদ্বীপের দুই অনুচর তথা ব্রাহ্মণ সন্তান জগাই মাধাই। যাদের চরম অত্যাচারে মা ও বোনেরা পর্যন্ত তাদের ইজ্জত হারাতে বাধ্য হতেন। কিন্তু এই সমস্ত অসামাজিক নারী নির্যাতন সবাই নীরবে মুখ বুজে সহ্য করতেন। প্রতিবাদ করার মতো সৎসাহস কারও ছিল না। অবশেষে সমস্ত অত্যাচারিত নগরবাসীগণ নিমাইয়ের শরণাপন্ন হলেন। বলাবাহুল্য, তাঁকেই এর ত্রাণকর্তা হিসাবে মনোনীত করে যথাযোগ্য প্রতিকারের অনুরোধ জানালেন। নিমাই তখন অত্যন্ত শান্ত স্বরে অনুগামী ভক্তবৃন্দকে বললেন —
"তাঁদের পাপ কার্যের কথা মনে পড়লে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়। আমি জানি এ জটিল ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ 'হরিনাম'। নিমাই তখন বিনীত কণ্ঠে আদেশ দিলেন —

"আনহ যেখানে যত আছে ভক্তগণ
মিলিয়া সকল লোক কর সংকীর্ত্তন।"

তাঁর এই মহান নির্দেশ শিরোধার্য করে নবদ্বীপের বহু সহস্রাধিক মানুষ এই মহাসম্মেলনে একত্রিত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে যোগ দিয়ে দু'বাহু তুলে নৃত্যরত থেকে এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদী মহামিছিলে সামিল হলেন। বিরোধী পাল্টা স্রোত এবার অনুকূলে প্রবাহিত হতে লাগলো। গোটা নবদ্বীপ ধামে এবার শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হলো। প্রসঙ্গত এ স্থলে যবন হরিদাস সম্পর্কে কিছু কথা উলে-খ করা প্রয়োজন। যবন হরিদাস মূলতঃ জাতিতে ছিলেন মুসলমান। যে সময় নিমাই ব্রাহ্মন্যবাদীদের জাত পাতের বিরুদ্ধে মহানাম সংকীর্তনে প্রেমের মধুর আলিঙ্গনে নবদ্বীপবাসীকে হরিনামে উন্মত্ত করে তুলেছেন। এই অভূতপূর্ব প্রেমের বন্যায় গা ভাসিয়ে দিলেন যবন হরিদাস। স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁকে সমাদরে বক্ষে আলিঙ্গন করলেন। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় যবন হরিদাসকে যথেষ্ট অত্যাচারিত ও অপদস্ত হতে হয়েছিল। তবে শত বাধা বিপত্তির মাঝেও তিনি কখনও 'কৃষ্ণনাম'-এর মহামন্ত্র থেকে বিচ্যুত হননি। বরং মনে প্রাণে তিনি হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে?'

নিমাই যথাসময়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে যখন নবদ্বীপ ত্যাগ করে নীলাচলে গমন করলেন হরিদাস তখনও তাঁর একান্ত অনুগামী হয়ে তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন। জগন্নাথদেবের

পুরী তখন তীর্থধামে পরিণত হলেও উচ্চ-নীচ ও জাতপাতের সীমারেখার অমানবিক বেষ্টনীতে আবদ্ধ ছিল। স্বয়ং মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নীচু জাতিদের জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। এমনকি তাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকারও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তবে সেখানে যবন হরিদাসের পুরী মহানগরীতে প্রবেশ ঘটায় এক অশুভ ইঙ্গিতের সূচনা হয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অপূর্ব মহিমায় স্বল্পকালের ব্যবধানেই তাঁর ভেদাভেদরহিত সদভাবনা ও মধুর বাক্যালাপে সবাই মুগ্ধ হলেন। ফলে তিনি সবিশেষ প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হলেন। এমনকি রাজগুরু বাসুদেব সার্বভৌমকে পান্ডিত্যের লহরায় নিষ্কাম ও অদ্বৈতবাদী সার্বভৌম বেদান্ত ভাষ্যের সেই অদ্বৈতবাদের অসারতা বুঝতে পেরে শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হয়ে উঠলেন এবং তিনি তাঁর শাস্ত্রে লিখলেন —

"তর্কশাস্ত্রে জড় আমি খৈছে লৌহদন্ড,
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচন্ড ৷৷"

এতদ্‌সত্ত্বেও মহাপ্রভুর একান্ত শ্রীচরণাশ্রিত যবন হরিদাসকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমনকি তাঁকে কিছুকাল পুরীর একপ্রান্তে একটি নির্জন কুটিরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। এইভাবে দীর্ঘ ২৪ বছর সেখানে অবস্থানকালে কোনওদিন তাঁকে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে দেওয়া হয়নি। শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভুর নির্দেশক্রমে হরিদাস প্রভাতকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দর্শন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন সমুদ্র স্নান সমাপন করে হরিদাসের পর্ণকুটিরে তুলসীবেদীর সামনে দাঁড়াতেন। যবন হরিদাস তখন তাঁর পদ বন্দনায় ব্রতী হয়ে গুরুমন্ত্র জপ করতেন। প্রতিদিন তিনি তিন লক্ষ জপ সম্পাদন করে নিত্যকর্মে ব্রতী হতেন।

স্বাভাবিকভাবে বয়সোচিত কারণে হরিদাস এবারে বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর মধ্যে নানারকম শারীরিক বৈকল্য দেখা দিয়েছে। তিনি এবার পার্থিব জগতের সমস্ত আসক্তি সংবরন করে মুক্তিলাভের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন। হরিদাসের এরূপ মনোবাসনায় অশ্রুসজল নয়নে মহাপ্রভু বললেন - "তুমি চলে গেলে আমি থাকবো কাকে নিয়ে। তোমার ন্যায় আদর্শ ভক্ত ত্রিভূবনে আর কে আছে বলো?

মহাপ্রভুর এই অশ্রুসিক্ত মর্মব্যথায় হরিদাসও তাঁর চরণযুগল স্পর্শ করে ক্রন্দন স্বরে বলতে লাগলেন - "আমি তো এক ক্ষুদ্র কীট, আমি চলে গেলেও তোমার কোনও অভাব হবে না সুতরাং তোমার এ অন্যায় কথা কেন প্রভু ! হরিদাস বললেন - 'না না আমাকে ছেড়ে দাও প্রভু। আমি এবার চলে যাই। তোমার পাদপদ্ম হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করে তোমার সুদর্শন চন্দ্রবদন পরখ করে আমি এবার চির বিদায় নেবো। তুমি আমায় অনুমতি দাও।'

একথা বলতেই হরিদাস ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন। তাঁর নয়নযুগল থেকে অবিরত প্রেমধারা বর্ষিত হতে লাগলো। ক্রমশ তাঁর চক্ষুদ্বয় স্থির হয়ে প্রাণবায়ু নির্বাপিত হলো। হরিদাসের নিথর দেহখানি কোলে তুলে নিলেন স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। তারপর ক্রন্দনরত অবস্থায় সেই মৃতদেহ নিয়ে তিনি নৃত্য করতে লাগলেন।

সমুদ্রের বালুকাময় তটে যবন হরিদাসের অন্তেষ্টিক্রিয়ার বন্দোবস্ত করা হলো। মৃতদেহটি যথারীতি শকটে করে বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো সেই বালুকাময় সমুদ্রতটে। চারিদিক হরিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। সবার অগ্রভাগে মহাপ্রভু নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। পিছনে অনুগামী ভক্তবৃন্দ। সমুদ্রতীরে নিজ হস্তে মহাপ্রভু হরিদাসের মৃতদেহটি স্নান করালেন। তিলক চন্দনে সাজিয়ে তাঁর দেহ কীর্তন করতে করতে বালুকাময় সমাধি স্থলে সেই নশ্বর দেহখানি সমাহিত করা হলো।

মহাপ্রভু এবার হরিদাসের ভান্ডারার নিমিত্ত নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে গেলেন। সে যেন এক অপূর্ব দৃশ্য। তারপর নিজের পরনের উত্তরীয়টি মেলে ধরে তিনি উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, বৈষ্ণব, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষকেই যত্ন সহকারে ভোজন করালেন। উপরোক্ত দৃশ্যটির বর্ণনায় মনে হবে যেন কারও পিতৃবিয়োগ ঘটেছে।

"মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্পনা আইসে
একপাত্রে পঞ্চজনের ভক্ষা পরিবেশং।"

যবন হরিদাসের ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে সমগ্র পুরী নগরীতে এক মহামিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

"হরিদাস মিলনোৎসব যে কৈল দর্শন
সেই তাহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্তন।"

সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূল হোতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিভেদ বর্জিত এই আদর্শ সমাজ গঠনের আহ্বান করাই হোক আমাদের এক পবিত্র ও মহান কর্তব্য।

বাংলার নারী জাগরণে মহীয়সী বেগম রোকেয়া

ডাঃ মোনালিসা দাস

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ তথা বাংলার মুসলিম মহিলা সমাজ ছিল নানাবিধ কুসংস্কার ও অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিশেষ করে পর্দাপ্রথার অন্তরালে তখনকার মুসলিম নারীজাতি ছিল অবরুদ্ধ এবং কার্যত গৃহবন্দিনী। ক্রমাগত এভাবে পর্দানসীন থাকার ফলে তাদের মানবিক অধিকার (Human Rights) থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবনীশক্তিও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বিশেষত মুসলিম নারী সমাজের এই অনগ্রসরতা দূর করে তাদের মধ্যে নতুনভাবে শিক্ষা চেতনা ও জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেবার ক্ষেত্রে মহীয়সী বেগম রোকেয়ার অবদান যেমন অনস্বীকার্য তেমনই অবিস্মরণীয়।

মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে তিনিই প্রথম মহীয়সী নারী, যিনি সমগ্র মুসলমান সমাজে পুরুষের ন্যায় নারীজাতিরও সমানাধিকারের দাবী জানিয়েছিলেন এবং নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এমনকি নারী শিক্ষা প্রসারে এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র নারী সমাজকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন।

মহীয়সী বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহম্মদ আবু আলী হায়দর। রোকেয়ার বাল্যনাম ছিল রাবেয়া খাতুন। বিশেষত এই নামেই তিনি সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

তৎকালীন মুসলিম প্রথানুসারে হায়দর পরিবারেও পর্দাপ্রথার কঠোর অনুশাসন প্রচলিত ছিল। রোকেয়াসহ তাঁর অন্যান্য সহদরাগণেরাও নির্মমভাবে এর শিকার হয়েছিলেন। রোকেয়া শৈশবকালে আরবী ও ফার্সী ভাষায় কিছুটা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত তাঁদের ভাগ্যে কোনও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটেনি। তবে তাঁর বিদ্যোৎসাহী অগ্রজা করিমুন্নেসার স্নেহযত্নে রোকেয়া বাংলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৮৯৬ সালে তৎকালীন বিহার প্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে রোকেয়ার বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।তাঁর স্বামীর নাম ছিল সৈয়দ শাখাওয়াৎ হোসেন। তিনি ছিলেন বিপত্নীক এবং প্রায় পৌঢ়ত্বের নির্দিষ্ট সীমায় পৌছে গেছেন। তবে তাঁর পুরুষোচিত রূপ যৌবনের চাইতেও রোকেয়া তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সুতরাং রোকেয়া তাঁর দাম্পত্য জীবনে কখনও অসুখী ছিলেন না। একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

শাখাওয়াৎ হোসেন তাঁর শিক্ষাজীবনে যথেষ্ট মেধাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি পাটনা কলেজ থেকে সগৌরবে স্নাতক উত্তীর্ণ হন। ইংরাজী সাহিত্যেও তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। কৃষি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে শাখাওয়াৎ বিলেত যাত্রা করেন। সেখান থেকে শিক্ষা সমাপন করে তিনি উচ্চপদে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। তারপর প্রায় ১২ বছর সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করে ১৯০৯ সালের ৩ মে, বার্ধক্যজনিত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়েছিল। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং জীবনাবসান ঘটে।

স্বামীর মৃত্যুর পর বেগম রোকেয়া মুসলিম সমাজের সর্বাত্মক নারীমুক্তি আন্দোলনে, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ ও সর্বোপরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি ভাগলপুরে শাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এখানে আসার পর বেগম রোকেয়া স্বামী স্মৃতি রক্ষার্থে ১৯৯১ সালে শাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু স্কুল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তাঁকে বর্ধিষ্ণু গোড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের তীব্র সমালোচনা, বিরোধিতা ও নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি তাঁকে প্রতিনিয়ত হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে স্কুলটিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। তাছাড়া তখনকার রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের ঘোর বিরোধিতার ফলে সেখানে বাংলা বিভাগটি খোলার চেষ্টা করেও সফল হতে পারছিলেন না। এছাড়াও স্কুল শিক্ষিকার অভাব, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ এবং সর্বোপরি ছাত্রী সংগ্রহ সমস্যা বেগম রোকেয়াকে অনেকাংশে বিচলিত করে তুলেছিল।

অবশেষে ১৯১৭সালে মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক ছাত্রীদের ঐ বিদ্যালয়ে বেগম রোকেয়া বাংলা বিভাগ চালু করেন। কিন্তু পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে সেটি আবার বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে ১৯২৯ সালে পুনরায় সেখানে বাংলা বিভাগ চালু করা হয়। ইতিমধ্যে মুসলিম সমাজে অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তা সত্ত্বেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজপতি ও ধর্মান্ধ মৌলবীরা অশুভ বুদ্ধির পরিচয় দান করে বিদ্যালয়ের ক্ষতিসাধনে তৎপর হলেন। কিন্তু বেগম রোকেয়ার সৎচিন্তা ও শুভবুদ্ধি এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে বিদ্যালয়টির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নয়ণমূলক কাজ সম্পন্ন হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সেটি সরকারী অনুমোদন লাভ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মহীয়সী বেগম রোকেয়া এইভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনগ্রসর মুসলিম বালিকাদের উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগদান করে নারী শিক্ষার উন্নতি সাধন করতে চেয়েছিলেন। যাতে তারা শিক্ষা চেতনায় উচ্চ আদর্শের অধিকারিনী হয় এবং সুকন্যা, সুগৃহিনী এবং সুমাতা রূপে নিজেদের পরিচয় দানে সক্ষম হয়। তাই দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন — " Our girls should not only obtain university degree,but must be ideal daughters,wives,mothers or in must say obedient daughters loving sisters beautiful wives and intractive mothers."

দেশের নারী সমাজকে বিভিন্ন উপায়ে দেশ ও জাতির সেবা করার মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করাও তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মহীয়সী বেগম রোকেয়া তাই "নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি"র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সমিতির বহুমূখী কর্মধারা ছিল। বিশেষত এই সমিতির প্রধান কাজ ছিল স্বাবলম্বিতা ও আত্মনির্ভরতা সম্বন্ধে মহিলাদের সচেতন করে তোলা এবং তাদের যোগ্যতাসম্পন্না করে

উপযুক্ত জীবিকার সুযোগদান করা। এছাড়া কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকদের বিভিন্নন কাজে সহায়তা করা।

বেগম রোকেয়া প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক স্রোতধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তরাল থেকে তিনি নীরবে স্বদেশের জন্য অনেক উন্নয়ণমূলক ও সেবামূলক কাজ করেছেন। ১৯১৭ সালের কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যে স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠিত হয়েছিল তাতে বহুসংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ কের সেটিকে সাফল্যমন্ডিত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী মহিলানেত্রী। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনেরও একনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা ও পূর্ণ সমর্থক। তবে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের ঘোর বিরোধী। কেননা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি রোকেয়ার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। তিনি তাদের ঘৃণার চোখেই দেখতেন। যেহেতু তারা দেশের শত্রু।

প্রসঙ্গতঃ একটি প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া লিখেছেন — "আমরা শুধুমাত্র হিন্দু, মুসলিম বা পার্সী, খ্রীষ্টান অথবা বাঙালি, মাদ্রাজী, মাড়োয়ারী কিংবা পাঞ্জাবী নই, সর্বপ্রথম আমরা ভারতবাসী, তারপর অন্যান্য জাতি। বেগম রোকেয়া বাংলাভাষাকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন। এবং মুসলিমদের মধ্যেও বাংলাভাষাকে ব্যাপকভাবে প্রচলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত অধিকাংশ প্রবন্ধই বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় লেখা। বাংলার মুসলিম সমাজে নারী মুক্তি আন্দোলনে ও নারী জাগরণেরও তিনি ছিলেন মহান অগ্রদূত। বিশেষত মুসলিম নারী সমাজের পর্দাপ্রথা, অশিক্ষার অন্ধকার এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি দূর করার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম চালিয়ে ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মাত্র ৫২ বছর বয়সে তিনিহিধাম ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। শুধুমাত্র বাংলা নয়, তিনি ছিলেন গোটা ভারতবর্ষেরই গর্ব ও অহংকার। এবার ১৩৫তম প্রয়াণবর্ষে এই মহীয়সী আদর্শ নারীর প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নবদ্বীপের "বঙ্গবিবুধ জননী সভা"

ডঃ শিহরণ চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ সাহা, সত্যম রাজ সাহা

Objectives of the Study

কোন একটি প্রকল্প গ্রহণের পিছনে কিছু মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। 'Local History Project' হিসাবে "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র ইতিহাস অনুসন্ধানের পিছনেও সেইরকম কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা —

১। "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা" ইতিহাসের পথে অবলুপ্তপ্রায় একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তির ইতিহাস আমরা এর থেকে জানতে পারব।
২। অতীত ভারতবর্ষে নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃত চর্চার একটি পীঠস্থান। "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা" নবদ্বীপের সংস্কৃত চর্চার গৌরবকে আরও কতটা গৌরবান্বিত করেছিল তা আমরা জানব।
৩। এই সভায় বিভিন্ন ভারতবিখ্যাত বিদগ্ধ পন্ডিতসমূহ কিভাবে ভারতের চতুষ্পাঠীকেন্দ্রিক ধ্রুপদী শিক্ষাব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন সে বিষয়ে আমরা অবগত হব।
৪। বহু প্রাচীন এবং গৌরবান্বিত এই সভা কিভাবে ধীরে ধীরে অবলুপ্তপ্রায় হয়ে গেল তার কারণগুলি জানতে পারব।
৫। এই সভার পুনরুজ্জীবনের জন্য নবদ্বীপের পন্ডিতমন্ডলী তথা সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিবর্গ বর্তমানে কিভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, তা আমরা জানতে পারব।
৬। এই সভার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি তা আমরা জানতে পারব।

Importance of the Study

ঐতিহাসিক দিক থেকে "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না।

১। দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দী ধরে নবদ্বীপের সংস্কৃত চর্চার ঐতিহ্যকে এবং চতুষ্পাঠীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাকে আগলে রেখেছিল ঐতিহ্যবাহী এই "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"।
২। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমৃত্যু এই সভার সভাপতি ছিলেন।
৩। এই সভার পরিচালনায় নিয়মিত 'আদ্য', 'মধ্য' ও 'উপাধি' বিভাগে পরীক্ষা নেওয়া হত এবং কৃতকার্যদের 'রত্ন' উপাধি প্রদান করা হত।
৪। এই "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"রই ভবনে ১৯৪৯ সালের ৩রা নভেম্বর নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
৫। এই মহাবিদ্যালয়ের চতুষ্পাঠীকেন্দ্রিক পাঠ গ্রহণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকেও অনেক শিক্ষার্থী এখানে আসতেন।

৬। ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ২০১৪ সালের আগষ্ট মাসে গঠিত নতুন পরিচালন সমিতি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

Use of Sources

নবদ্বীপের "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র এই আঞ্চলিক ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমি দুই রকম উৎসের সাহায্য নিয়েছি। যথা - Primary Source এবং Secondary Source.

Primary Source

১। সাংখ্যতীর্থ পন্ডিত গোপেন্দুভূষণ (১৩৭১ সাল), নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কান্তি প্রেস, নবদ্বীপ।

২। আঞ্চলিক ইতিহাসের একজন সচেতন শিক্ষার্থী হিসাবে আমি "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র বর্তমান সম্পাদক মাননীয় ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় জানতে পারি।

৩। এছাড়া রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের তৎকালীন করণিক মাননীয় সুবোধ কুমার মহাশয়ের কাছে থেকেও সেই সময়ের মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি।

Secondary Source

১। "সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়; একটি সমীক্ষা"। — ডঃ শুভেন্দুকুমার সিদ্ধান্ত।
[নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ স্মারকগ্রন্থ (১৯৯৯ সাল), তৃতীয় বর্ষ সংখ্যা, প্রকাশক, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ]

২। "বিশ্বকোষ" (Encyclopaedia indica , সপ্তম ভাগ)
[Publisher : BR Publishing Publication, Delhi, 1886]

Delimitation of the Study

১। নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চার ইতহাসন।

২। "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র উদ্যোগে নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সারস্বত সাধনা।

Analysis and Interpretation

সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃত চর্চার অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে নবদ্বীপের এক বিশেষ খ্যাতি ছিল। নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, নব্যতন্ত্র, বৈষ্ণবদর্শন এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের মতো সংস্কৃত চর্চার উলে-খযোগ্য ক্ষেত্রগুলিতে নবদ্বীপের অবস্থা বিশ্ববন্দিত। বিশিষ্ট নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম, তার সুযোগ্য ছাত্র তার্কিক চূড়ামণি, রঘুনাথ শিরোমণি ও সাধক চূড়ামণি, তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগামবাগীশ, স্মার্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নবদ্বীপের গৌরবকৃত সন্তানদের বৈদগ্ধ দ্যুতি আজও সমুজ্জ্বল। স্বনামধন্য অধ্যাপকগণের অন্তেবাসী হয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রে পারঙ্গম হওয়ার মানসে দেশ, বিদেশের বহু ছাত্র সমবেত হত এই নবদ্বীপে। নালন্দা, তক্ষশীলা, মহাবিহারের মতো নবদ্বীপের বিভিন্ন টোল চতুষ্পাঠী সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয় দেশী - বিদেশী ছাত্রের কলতানে সদা মুখরিত থাকত। প্রাচীন সাহিত্যে এবং ঐতিহাসিকদের রচনায় এর বহু উলে-খই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এ প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত "শ্রীচৈতন্যভাগবত" এর একটি উদ্ধৃতির উলে-খ করতে পারি।

"নানাদেম হইতে লোকে নবদ্বীপ যায়
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়।"

জীবনের উন্নতিসাধন করতে হলে বিদ্যা শিক্ষা আবশ্যক। কেবলমাত্র কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করার নাম বিদ্যাশিক্ষা নয়। যে বিদ্যা শিক্ষা করলে মানুষ দেবভাব ধারণ করে ও অশেষ গুণরাশির আধার হয় সেটিই হল প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা। চতুষ্পাঠীর গুরুগণ সেই শিক্ষাই ছাত্রদের দিতেন। তারা জানতেন ছাত্রদের অন্তঃকরণকে নির্মল করতে না পারলে অন্তর ও বাহ্য বিষয়ের পূর্ণ প্রতিবিম্ব তাতে পড়তে পারে না ও বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্ফূরণ না হলে তাতে জ্ঞানাত্মিকা বুত্তি উৎপন্ন হয় না। এইজন্য জ্ঞানোপদেশের পূর্বে মানসিক নির্মলতা আবশ্যক।

১৮৮৬ খ্রীঃ বিদগ্ধ পন্ডিতমন্ডলী সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য 'সংস্কৃত বিদ্যা বিবর্ধনী বিদগ্ধ জননী সভা' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। পাইক পাড়ার রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিং এবং বিশিষ্ট পন্ডিত রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ওই সভার নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গ বিবুধ জননী সভা' রাখা হয় এবং নির্বাচিত সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে নদীয়ার মহারাজা ক্ষীতিশচন্দ্র রায় এবং বিদগ্ধ পন্ডিত সর্বেশ্বর সার্বভৌম কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সভার পরিচালনায় নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে নিয়মিত বিভিন্ন বিভাগে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির সূচনা হয়। এবং কৃতকার্যদের রত্ন উপাধি দানের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন সময়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র সভাপতি ও সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন। তাদের মধ্যে সভাপতি হিসাবে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার দ্বারকানাথ চক্রবর্তী, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ও রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র) প্রভৃতির নাম সবিশেষ উলে-খযোগ্য। উলে-খ করা

যেতে পারে যে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমৃত্যু এই সভার সভাপতি ছিলেন। ১৯০৭ সালে "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্যার আশুতোষের ঐতিহাসিক ভাষণটি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন - " **নবদ্বীপের হৃত গৌরবকে রক্ষা করার জন্য আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যেতে প্রস্তুত। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি বহু গুণীসভায় আসন অলংকৃত করেছি, সম্বর্ধিত হয়েছি, কিন্তু নবদ্বীপের এই পন্ডিত সমাজের সভাপতির আসন অলংকৃত করা আমার কাছে বিশেষ গৌরবের ও অনুভবের বিষয়।"** দেশের রাজাগণ, জমিদার শ্রেণী ও বহু ধনী ব্যক্তি এই সভাকে অর্থ সাহায্য করেন এবং তার দ্বারা দুস্প্রাপ্য পুঁথি ও পুস্তক সংরক্ষণ ও সম্পত্তি ক্রয় সম্ভব হয়। পন্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের বাস্তুভিটায় যে চতুষ্পাঠী ছিল, তা লক্ষ্ণৌবাসী জনৈক ধনী বাবুলাল আগরওয়ালের টাকায় ইটের ঘর তৈরী হয় যা পাকাটোল নামে নবদ্বীপে পরিচিত ছিল। সেই জীর্ণ বাড়িটি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের এক অধঃস্তন বংশধর যখন বিক্রির প্রস্তাব দেন, তখন ১৯৩৫ সালে "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা" ঐ বাড়িটি কিনে নেয় এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার ও নতুন ভবন নির্মাণ করায়।

"বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র সূচনা লগ্নের কার্যবিবরণী মূদ্রিত আকারে অদ্যাবধি গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থের গ্রন্থে (পৃঃ ৩৪) মূদ্রিত আছে যা নিম্নে বর্ণিত হল।

"মূলতঃ বর্ণাশ্রম - ধর্ম্ম ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা ছাড়াও সভা দুঃস্থ ব্রাহ্মণ পন্ডিতগণকে নানাভাবে সাহায্য দান করেন।

সভা, স্কুল কলেজের এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও ছাত্রছাত্রীগণ মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারার্থে সভার প্রাক্তন সভাপতি ঁবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে 'বিজনস্মৃতি প্রতিযোগিতা' প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর সংস্কৃত আবৃতি, রচনা ও ভাষণ প্রতিযোগিতায় পদক ও পুরস্কারাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

সভার পাঠাগারে সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। উপযুক্ত গৃহের অভাবে এই কার্য্য আশানুরূপভাবে পরিচালিত হইতে পারিতেছে না। সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি প্রার্থনীয়।

বিবিধ দৈব ও পৈত্রকার্য্যের জন্য যাহাতে পুরোহিতগণ উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে সভা নিজস্ব ভবনে একটি পৌরহিত্য শিক্ষা দান সংস্থা গঠন করিয়াছেন। এখানে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীগণকে হাতে কলমে পৌরোহিত্য শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। এই সংস্থার পরিচালক পন্ডিত শ্রীমনোরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ।

সংস্কৃত ভাষায় ভাষণদানে যাহাতে দেশবাসী অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষ হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে সভা একটি সংস্কৃত ভাষণদান সংস্থা পরিচালন করিতেছেন। ইহার পরিচালনা করিতেছেন - পন্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ।

এতদব্যতীত সংস্কৃত শাস্ত্রাদির গবেষণা কার্য্য পরিচালনার জন্যও সভা আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থাভাবে এই বিভাগের কার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এ বিষয়ে মাননীয় সরকার বাহাদুর ও সংস্কৃতানুরাগী দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করা যাইতেছে।

স্বাধীনতা লাভের অব্যহিত পরেই "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা" কে কেন্দ্র করে নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চার প্রবাহকে অক্ষুন্ন রাখতে বিভিন্ন মহল থেকে উদ্যোগ গ্রহণ শুরু হয়। নবদ্বীপের কৃতী সন্তান বিশিষ্ট সংস্কৃতানুরাগী সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ডঃ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় হরেন চৌধুরী মহাশয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় এবং নবদ্বীপের পন্ডিতমন্ডলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"রই ভবনে ১৯৪৯ সালের ৩রা নভেম্বর নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং নবদ্বীপ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উৎসভূমি হিসাবে "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা" ইতিহাসে সম্বোর্ধনাযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এই "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা" য় চতুষ্পাঠীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠক্রমের মধ্যে যে সকল বিষয়গুলি পড়ানো হতো, সেগুলি হল ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতিশাস্ত্র, প্রাচীন ন্যায়, নব্য ন্যায়, বৈষ্ণব দর্শন, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি উলে-খযোগ্য।

যে সকল ভারত বিখ্যাত পন্ডিত "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা" য় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপনা করতের তাদের মধ্যে উলে-খযোগ্য হলেন পন্ডিত ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ, পন্ডিত মনোরঞ্জন স্মৃতিতীর্থ, পন্ডিত আশুতোষ ন্যায়াচার্য্য, পন্ডিত যাতবেন্দ্র ন্যায়াচার্য্য, পন্ডিত আশুতোষ সিদ্ধান্ত, পন্ডিত সুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, পন্ডিত হিমাংশুদাস স্মৃতিতীর্থ, পন্ডিত বনমালীচরণ তর্কতীর্থ, পন্ডিত কানাইলাল অধিকারী, পন্ডিত পূর্ণচন্দ্র আচার্য্য।

প্রায় এক শতাব্দী সাফল্যের সঙ্গে সমস্ত বিভাগে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও বিংশ শতকের সাতের দশক থেকে এই সভার তথা নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। বিভিন্ন বিভাগ শূন্য অধ্যাপক পদে নিয়োগ বন্ধ হয়। মেধাবী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকে। সর্বোপরি সমগ্র রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি সরকারী অবহেলা এবং নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণের গতি স্তব্ধ হওয়ায় সমগ্র রাজ্যের অন্যান্য সংস্কৃত চর্চার প্রতিষ্ঠানের মতো "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র অধগমনও ত্বরান্বিত হয়। উপযুক্ত ভবিষ্যতের পথ বন্ধ হওয়ায় শিক্ষার্থী ও অধ্যাপক উভয় পক্ষই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। বর্তমানে এই অন্তিম অবস্থা একেবারে শেষ লগ্নে পৌছেছে।

ইতিহাস অনুসন্ধান করে আমরা জানতে পারি বঙ্গদেশের সংস্কৃত শিক্ষার উপর আঘাত ইতিপূর্বেও এসেছে। সেন রাজাদের আমলে মুসলমান আক্রমণের সময় নবদ্বীপের বহু পন্ডিত মহাশয়কে .... হেনস্থা সহ্য করতে হয়েছিল, বহু মূল্যবান পুঁথি বিনষ্ট হয়েছিল। সংস্কৃত চর্চার পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তথাপি কিন্তু নবদ্বীপের দৃঢ়চেতা পন্ডিতমন্ডলী উৎসাহ হারায়নি। সমস্ত প্রতিকুলতাকে কাটিয়ে সংস্কৃত চর্চার প্রবাহকে বহমান রেখেছিলেন। বর্তমানে সরকারী উদাসীনতায় "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র শিক্ষা পরিকাঠামোটি ক্রম ক্ষয়িষ্ণুমান হয়ে পড়েছে। অধ্যাপক নিয়োগের অভাবে ২০০২ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রায় নিভে যাওয়া প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য নীরব নিরলস প্রচেষ্টারত রয়েছেন নবদ্বীপের দুই প্রবীণ বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিত্ব - এরা হলেন পন্ডিতপ্রবর ডঃ কুমারনাথ ভট্টাচার্য্য এবং অধ্যাপক

ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী। ২০১৪ সালের আগষ্ট মাসে গঠিত বর্তমান "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র পরিচালন সমিতিতে পন্ডিত ভট্টাচার্য্য এবং চক্রবর্তী যথাক্রমে সভাপতি এবং সম্পাদকের আসন অলংকৃত করছেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নবদ্বীপে সম্প্রতি ৭ ও ৮ই মে সম্পন্ন হয়ে গেল 'প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলন'(Conference on Orinetal Studies) যার মুখ্য উদ্দেশ্য নবদ্বীপের সংস্কৃত চর্চার পুনরুজ্জীবন (Rejuvenation of Chatuspathi-centric studies in Nabadwip)।

"বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র বর্তমান সম্পাদক ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তীর কাছে থেকে এই সভার প্রাচীন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পন্থা সম্পর্কে যেটুকু জ্ঞান লাভ করে আমরা সমৃদ্ধ হলাম, তা নিম্নরূপ —

১৯৩৮ সালের দলিল অনুযায়ী "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র অবস্থান ছিল ১ একর ৫ শতক জায়গা জুড়ে, বর্তমানে যা মাত্র ১৫ কাঠা জমিতে পরিণত হয়েছে। বাকি জমি বেদখল ও হস্তান্তর হয়েছে। নবদ্বীপের এই ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যমন্ডিত স্থান পরিদর্শন করে এবং ডঃ চক্রবর্তীর কাছে থেকে জানা গেল যে এই মহাবিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য একটি বড় হল ঘর ছিল যেখানে একসাথে ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন পন্ডিত মহাশয় বিভিন্ন বিষয় পড়াতেন। এছাড়া ছিল অধ্যক্ষ মহাশয়, অফিস লাইব্রেরীর জন্য এক একটি কক্ষ। এই মহাবিদ্যালয়ে বাইরে থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য ৭টি কক্ষ ছিল। এছাড়া "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র বিভিন্ন প্রশাসনিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যাবলীর জন্য একটি অফিস ছিল। কিছুটা সংস্কার করা হলেও অধিকাংশ কক্ষগুলি বর্তমানে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত রয়েছে। পন্ডিতপ্রবর বুনো রামনাথের স্মৃতি বিজড়িত তেঁতুল গাছ আজ আর নেই। আছে শুধুমাত্র একটি কুয়ো। অত্যন্ত তাজ্জবজনক ব্যাপার এই যে এত স্বনামধন্য এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনারত পন্ডিতেরা সেই সময় থেকে ২০02 সালে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত lower division clerk- এর বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন পেতেন। গত বছর "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র উদ্যোগে এখানে সংস্কৃতে কথা বলার একটি অবৈতনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রতি রবিবার এই সভার কার্যালয়ে গীতাচর্চার আয়োজন করা হয়েছে। আশার কথা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্থানে পুনরায় মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

MAJOR FINDINGS

উপরোক্ত গবেষণামূলক নিবন্ধ থেকে যে মুখ্য আবিষ্কারগুলি (major findings) চিহ্নিত করতে পারি, সেগুলি হল —

১। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের সারস্বত সাধনার একটি উৎসবিন্দু হল (epicentre) নবদ্বীপের "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"।

২। অতীত গৌরবের ঐতিহ্য বহন করে বর্তমান চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও তার দীপশিখাটি নিভে যায়নি, সজীব প্রতিষ্ঠান (living institution) হিসাবে বিরাজ করছে।

৩।আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় Education কে বলা হয় Behaviourial Science। এক্ষেত্রে Counselor (শিক্ষক) হিসাবে শিক্ষকদের আচরণ শিক্ষার্থীর আজীবন গঠনের একমাত্র সহায়ক শক্তি (Guiding Force)। "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র যে সকল আচার্যের নাম উলি-খিত হয়েছে তারা জীবনের আচরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করে শিক্ষা নামের সার্থকতা বজায় রেখেছিলেন।

৪। আজকের শিক্ষাবিজ্ঞানে Curriculum, Syllabus এবং Text Book স্বতন্ত্র তিনটি প্রয়োজনীয় কাঠামো হিসাবে সতত বিরাজ করে। কিন্তু ভারতবর্ষের ধ্রুপদী শিক্ষা ব্যবস্থার নিদর্শন হিসাবে চতুষ্পাঠীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক নিজেই ছিলেন পাঠক্রম (Teacher was himself a curriculum)। "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র আচার্যদের মধ্যে এরূপ বহু উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়।

৫। "বঙ্গ বিবুধ জননী সভা"র আচার্যদের পাঠদানের প্রক্রিয়া (Pedagogy) থেকে যে বিশেষ প্রয়োজনীয় দিকটি সতত উদ্ভাসিত হত, তা হল Ethology (Science of Character) । "Example is better than precept"- এই মহাবাক্যটির জীবন্ত বিগ্রহ হয়ে ওঠে তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থায় যে প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন, তার সংরক্ষণ আশু প্রয়োজন।

References

১। "সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়; একটি সমীক্ষা"। — ডঃ শুভেন্দুকুমার সিদ্ধান্ত।
[নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ স্মারকগ্রন্থ (১৯৯৯ সাল), তৃতীয় বর্ষ সংখ্যা, প্রকাশক, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ]

২। "বিশ্বকোষ" (Encyclopaedia indica , সপ্তম ভাগ)
[Publisher : BR Publishing Publication, Delhi, 1886]

৩। সাংখ্যতীর্থ পন্ডিত গোপেন্দুভূষণ (১৩৭১ সাল), নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস, প্রথম খন্ড, কান্তি প্রেস, নবদ্বীপ।

বুদ্ধিজীবিরা যখন স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী ঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট

সুভাষ ভট্টাচার্য

এই প্রবন্ধের একেবারে গোড়াতেই আমার মনে বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে কতগুলি কৌতুহল ও প্রশ্ন জেগে ওঠে। তাই প্রবন্ধে আমি আমার মনে জেগে ওঠা প্রশ্নগুলির অবতারনা করেছি এবং তার যথাযথ মীমাংসা করার একটা ক্ষীণ প্রয়াস করেছি। আশাকরি প্রশ্ন ও উত্তর মীমাংসাগুলি সর্বজনগ্রাহ্য ও স্বীকার্য হয়ে প্রবন্ধটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবে। প্রশ্ন ও উত্তর মীমাংসায় আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা ও অপ্রাসঙ্গিকতা বিচারের দায়ভার পাঠকবর্গের উপরই বর্তায়। আশারাখি প্রবন্ধের গোড়ায় প্রশ্ন ও তারপর বিশে-ষণধর্মী আলোচনা প্রবন্ধটিকে বুঝতে ও এর সমান প্রাসঙ্গিক যৌক্তিকতা বিচারে অগ্রণি ভূমিকা পালন করবে। প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে প্রশ্নগুলি নিম্নে ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হল —

১) বুদ্ধিজীবি বলতে আমরা কী বুঝি ?
২) এই বুদ্ধিজীবিরা কত প্রকারের হয় ?
৩) এরা পেশাগত দিক থেকে কী করেন ?
৪) সমাজে এরা কাদের উপকারে লাগেন বা উপকার করেন ?
৫) এদের আবিষ্কারক কে বা কারা ?
৬) সমাজে এদের কী প্রয়োজনীয়তা ?

এককথায় বলতে গেলে বুদ্ধিজীবি বলতে আমরা যা বুঝি যারা নিজেদের বুদ্ধিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন তারাই বুদ্ধিজীবি। আরেকটু বিস্তৃত পরিসরে বললে বলতে হয় সমাজের একদল উচ্চশিক্ষিত, ব্যক্তিস্বাধীন, রুচিশীল, ন্যায়নীতি পরায়ন, নির্ভীক একশ্রেণীর মানুষ যারা শ্রেণী তথা সমাজের স্বার্থে বৃহত্তর ক্ষতি বা অরাজক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে , সর্বোত্তু বিশারদ হয়ে কলুষিত সমাজকে কলুষতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য উপায় বা পথ বাতলে দেন। যারা নিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে শাসকের অপশাসনের বিরুদ্ধে নিজস্ব মতামত বা প্রতিবাদ জনসমক্ষে প্রকাশ করতে দ্বিধা -দ্বন্দ্ব - কুণ্ঠাবোধ করেন না। অর্থাৎ একজন বুদ্ধিজীবির বিচার হওয়া উচিত তাঁর বৌদ্ধিক প্রকাশ, চিন্তার গভীরতা ও স্বচ্ছতা দিয়ে। **লেলিনের মতে, 'পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণী আনুগত্য ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বুদ্ধিজীবিকুল বস্তুত বিভিন্ন উপাদানে গঠিত এবং শাসক ও শোষিত উভয় শ্রেণী থেকেই তাঁদের গঠন প্রক্রিয়া ঘটে। বুদ্ধিজীবিদের বিভিন্ন গোষ্ঠী গড়ে ওঠে সামাজিক বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর থেকে যাদের মতাদর্শগত, রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত রূপই তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন।'**

বুদ্ধিজীবিদের শ্রেণী বিভাজন করতে গিয়ে আনতেনিও গ্রামশি তাঁর রচনায় বলেছিলেন - **'বেঁচে থাকা মানেই পক্ষ বেছে নেওয়া ... আমি বেঁচে আছি। আমি পক্ষ বেছে নিই। তাই যে পক্ষ বেছে নেয় না, তাকে আমি ঘৃণা করি। আমি**

উদাসীনতাকে ঘৃণা করি।' অর্থাৎ গ্রামশির কথা অনুযায়ী সমাজের সকল বুদ্ধিজীবিরাই কোন না কোন পক্ষ বেছে নেন। অবশ্যই সেটা তাঁর মৌলিক অধিকারের আওতাধীন। তাহলে আমরা এর থেকে নিরূপণ করতে পারি যে, বুদ্ধিজীবিরা দুই প্রকার। এক — যারা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, নিজস্ব বিচার বিবেচনার আওতাধীন, স্বেচ্ছাধীন, নিজস্ব বিবেক - বোধ - বুদ্ধির উপর নির্ভর করে শাসক - বিরোধী কারোর চোখ রাঙানিকে ভয় না করে মাথা উঁচু করে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে সমাজ তথা দেশের সামগ্রিক কল্যাণে নিজস্ব মতামত নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে, অকপটে প্রকাশ করতে দ্বিধা - দ্বন্দ্ব বা কুণ্ঠাবোধের শিকার হন না। আরেকদল — যারা বুদ্ধিজীবির ভাগ করে দল ভারী করে জনসমক্ষে নিজেদের জনপ্রিয়তা বারাবার জন্য বারে বারে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সামনে ন্যায় অন্যায়ের লাগাম ছাড়া দাবী তুলে শেষ পর্যন্ত 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' -র সুযোগ সুবিধা ক্ষমতার ছত্রছায়া, অর্থের লালসা অথবা মহত্তর ভোগবাদী স্বার্থে শাসকদলের পৃষ্ঠপোষক ও দলদাসে রূপান্তরিত হন। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবিবর্গের মনে রাখা উচিত তাঁদের কথায় হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত, নিরক্ষর, নীরিহ সাধারণ মানুষগুলি প্রভাবিত হয়ে নিজেদের মনে আলোচ্য সেই বিষয়ে একটা কাল্পনিক ধারণার জন্ম দিয়ে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করেন সাধারণ নির্বাচনের সময়। তখন কী তাঁদের উচিত নয় সমাজ তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আসল সত্য প্রকাশ করে স্বার্থান্ধ, সুবিধাভোগী না হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বিধা - দ্বন্দ্বহীনভাবে একত্রে একসুরে গর্জে উঠে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া ? যদিও প্রথাগত বুদ্ধিজীবি সম্পর্কে গ্রামশি বলেছেন —**'প্রথাগত বুদ্ধিজীবিরাও কোন শুদ্ধ, স্বতন্ত্র, স্বাধীন শ্রেণী নয়, তাঁদের শ্রেণী পরিচয় তথা শ্রেণী আনুগত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে মাত্র।'**

পেশাগত দিক দিয়ে এক একজন এক এক পেশার অন্তর্গত। এঁদের কেউ সাহিত্যিক, কেউ কবি, কেউ নাট্যকার, কেউ নাট্য অভিনেতা, চিত্র পরিচালক, চিত্রশিল্পী, বিভিন্ন পেশার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে এই বুদ্ধিজীবিরা সমাজে খ্যাতি, যশসম্পন্ন, স্বনামধন্য, স্বগৌরবান্বিত, উচ্চশিক্ষিত মানুষ যারা নিজেদের বুদ্ধিকে উপজীব্য বা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে নিজেদেরকে সমাজের এক সম্মানীয় বিশিষ্ট শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে জনসমক্ষে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও বর্তমান ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় এঁরা নিজেদের আসল কাজ বা নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র ছেড়ে কোন পত্রপত্রিকা বা গণমাধ্যমটির ও নিজস্ব জনপ্রিয়তা বাড়াতে ন্যায়- অন্যায়ের নিয়মিত বিধান দিয়ে বেড়ান। তখন তারা সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা ভুলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুবিধাবাদী পক্ষ অবলম্বন করে প্রচারের শিরোনামে থাকতে উদগ্রীব হয়ে থাকেন।

বুদ্ধিজীবিরা আসলে কাদের উপকার করেন সে বিষয়ে আমি খুবই সন্দিহান ও সংশয়াতীত। একটা বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বুদ্ধিজীবিরা যেকোন প্রতিক্রিয়ায় পক্ষ নিতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা কখনো দেশের মানুষের স্বার্থে, মানুষের শিক্ষা প্রসারে, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করে মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। মানব সম্পদ উন্নয়নের সূচক বৃদ্ধি করার জন্য কখনো কোন সময় ব্যয় করতে এবং নিজেদের সে ধরণের কাজে নিযুক্ত রাখতে কখনোই প্রয়াসী হন না। এক্ষেত্রে এক শিল্পী সাহিত্যিক কবি

শ্রী পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছেন, **'আমরা যারা গজদন্ত মিনারে বসে শিল্প, সাহিত্য ও নানা কাজে যুক্ত আছি তাদের গাঁয়ে - গঞ্জে কাদামাখা মানুষদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের স্বার্থে সাক্ষরতা প্রসারে কিছু কাজ করা উচিত।'** সত্যিই তো বর্তমান বুদ্ধিজীবিরা নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবি পরিচয় দিয়ে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে গর্জন করেন, তাঁরা কতজনে মনে করেন যে তাঁরা গজদন্ত মিনারে বসে কাদামাখা মানুষের পক্ষে কথা বলেন? তাঁরা কখনোই এই হিসাব করেন না। তাঁরা নিজেদেরকে জনপ্রিয় করে তুলতে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় নিজেদেরকে জাহির করতে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। এই প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা বলা যায় তিনি হলেন মাও সে -তুং। তিনি বলেছিলেন — **'আমি একথা অনুভব করলাম যে শ্রমিক ও কৃষকদের তুলনায় নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেনি এমন বুদ্ধিজীবিরা মোটেই পরিচ্ছন্ন নন এবং শেষ বিচারে শ্রমিক ও কৃষকেরাই হচ্ছে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন লোক, আর যদিও তাদের হাত কাদামাখা, পায়ে লেগে রয়েছে গোবর তবু তারা বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন।'** অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবিদের একটা বড় অংশ সুকৌশলে সাধারণ কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষগুলির প্রতি প্রেমপ্রীতিতে গদগদ হয়ে কখনো সখনো শরীরের ঘাম ঝরাতেও কুণ্ঠাবোধ বা পশ্চাদগামী হন না। যদিও সমাজের সকল বুদ্ধিজীবির ক্ষেত্রে একথা সর্বজনগ্রাহ্য ও সমান প্রযোজ্য নয়।

বুদ্ধিজীবি শ্রেণী হল সমাজের অলংকার স্বরূপ। আর আমার প্রবন্ধানুযায়ী এদের আবিষ্কারক কে বা কারা ? কী উদ্ভট প্রশ্ন তাই না? সত্যি আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু এই প্রশ্নটিও সমান প্রাসঙ্গিক। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবি নিজেরাই নিজেদের কর্মক্ষেত্র থেকে যথেষ্ট প্রশংসনীয়, সুনাম খ্যাতির অধিকারী হয়ে বুদ্ধিজীবি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় হয়ে আছেন। আবার কিছু বুদ্ধিজীবির আবিষ্কারক হিসাবে অনেক সময় অনেক সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের এক বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা বর্তমান। এক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় সংবাদ মাধ্যম নির্দিষ্ট কিছু বুদ্ধিজীবিকে নিজেদের চ্যানেলের জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্য তোষামোদ করে ন্যায় অন্যায়ের বিধান বাতলে দেবার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা সত্যিকারের সাধারণ মানুষের হয়ে কথা বলেন, নিজেদেরকে নিজেদের কর্মক্ষেত্রেই বেশী ব্যস্ত রাখেন, পরনিন্দা, পরচর্চা করতে একটু কম পছন্দ করেন, নিজেদের প্রচারের আলোকে আনতে বিরত থাকেন, তাঁরা কিন্তু ব্রাত্যই থেকে যান। আর এই সংবাদ মাধ্যম যাদেরকে জনদরদি নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবি হিসাবে আমাদের সামনে পরিবেশন করাতে চান পরবর্তীকালে দেখা যায় তারাই গিরগিটির মতো রং পালটে রাতারাতি মন্ত্রী হবার অবদমিত স্বাদের লালসাকে সংবরণ করতে না পেরে মেকি জনদরদি নেতা বা মন্ত্রীতে প্রতিপন্ন হন। এক্ষেত্রে নোয়াম মস্কির কথায়, **" ...... বুদ্ধিজীবিরা এতই আদর্শবাদী যে, তাঁরা বুঝতেই পারে না তাঁরা শক্তির সেবা করছে। তাঁরা মনে করে, তাঁরা শক্তিবর্গের বিরোধী সাহসী সব মানুষ, যারা কিনা মানবাধিকারের স্বার্থে কথা বলে। এই মনে করাটা সর্বৈব মিথ্যা।'** এখানে আরেকটু সংযোজন করলে বিষয়টি আরেকটু খোলসা হয় আনন্দবাজার পত্রিকার (২৭.০৫.২০০৮) স্বীকারোক্তি — **'এতদিন যাঁরা রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে মানবাধিকার রক্ষায় আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাদের একাংশ পরোক্ষে হলেও হয়ে উঠলেন রাজনৈতিক।'**

উদ্ভিদের বেড়ে উঠতে গেলে জল, আলো,মাটি, বাতাস প্রয়োজন, শিশুর বেড়ে উঠতে গেলে মায়ের প্রয়োজন, পাখির উড়তে ডানা প্রয়োজন, দৌড়তে গেলে পা প্রয়োজন তেমনি সভ্য নাগরিক সমাজে বুদ্ধিজীবিদের প্রয়োজন। যদিও এঁরা জন্ম থেকে বুদ্ধিজীবি হয়ে জন্মায় না। নিজেদের কর্মক্ষেত্র, মৌলিক চিন্তাধারা, শৈল্পিক সত্ত্বা, স্বাধীনচেতা,উচ্চশিক্ষা সর্বাঙ্গিন দিক দিয়ে নিজেরাই নিজেদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম এদেরক আবিষ্কার করে থাকে। এই দিক দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরা ভয়ঙ্কর লোভী, সুবিধাবাদী গিরগিটি প্রকৃতির হয়ে থাকেন। 'আজকাল' পত্রিকায় (০৮.১২.২০০৭) বুদ্ধিজীবি প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, **'আমরা সেই তিক্ততা নিয়ে চিন্তিত যা কিনা পাবলিক স্পেসকে (নাগরিক পরিসর) দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে। অসেতুসম্ভব দূরত্ব তাদের মধ্যে তৈরী হয়েছে, যারা মূলত একই মূল্যবোধের শরিক এবং এটাই আমাদের পীড়িত করেছে।'** লেনিন আরো এক কদম এগিয়ে বলেছেন, **'বুদ্ধিজীবিরা তাঁদের নির্দিষ্ট জীবন ও কর্মধারার বৈশিষ্ট্যে নির্বৃত্তদের চেয়ে অনেকবেশি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। তাঁদের জীবন ও কর্ম প্রত্যক্ষভাবে কোন বৃহৎ যৌথ প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত নয়। সংগঠিত, সমষ্টিগত শ্রমের মধ্য দিয়ে তা সরাসরি সমৃদ্ধও হয় না।'** এই প্রসঙ্গে ম্যাক্সিম গোর্কির মতে, **'...... আমরা শিল্পী বুদ্ধিজীবিরা বিভিন্ন মানসিকতায় চলি। অন্যভাবে বলতে গেলে শিল্পী বুদ্ধিজীবিরা প্রায়শই আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজ করে যা অন্য সব বিবেচনাবোধকে অবদমিত করে দেয়।'** অর্থাৎ এই বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠীর মন্তব্যগুলি সাধারণ মানুষের মনে এক ব্যাপক ও বহুল পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে তাদের মৌলিক চিন্তাধারাকে নাড়া দিয়ে ভিন্ন পথে চালিত করে। এঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন - **'একটু চুপ করে, একটু স্থির হও, অত বাড়িয়ে বোলো না, অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চলো না।'** এখানে কবিগুরু বুঝতে পেরেছেন যে, বুদ্ধিজীবিরা শুধুমাত্র বলেই না, তার সঙ্গে অনেক কিছুই করে। এই সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিজ্ঞানাচার্য জোলিও ক্যুরির মতে, **'সম্প্রতি যা কিছু ঘটছে, তার ধাক্কায় অনেক বুদ্ধিজীবি এমন সব কথা বলেছেন আর আমাদের এমন সব আহ্বান জানাচ্ছেন যা এক এক সময় অপমানকর মনে হয়।'** আর বিশেষত সংবাদপত্র, গণমাধ্যমের তৈরী মেকি জনদরদি ও স্নেহধন্য বুদ্ধিজীবিদের প্রসঙ্গে এবং তাঁদের শাসক বা নির্দিষ্ট কোন বিশেষ দলের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ স্বরূপ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর লেখা 'উলঙ্গ রাজা' কবিতাটির প্রথম স্তবকটির অবতাড়না করা হল,

'সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ,তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছেঃ শাবাশ,শাবাশ
কারও মনে সংস্কার, কারও ভয় ;

কেউ বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে;
কেউ বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক;
কেউ ভাবছে, রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সুক্ষ্ম, চোখে
পড়ছে না যদিও, তবু আছে
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।'

হ্যাঁ সত্যিই আজ বুদ্ধিজীবিরা নিজেদের বুদ্ধিকে অন্যের কাছে বন্ধক দিয়ে বিবস্ত্র রাজার বস্ত্র পরিধানের পরামর্শ না দিয়ে শাবাশি দিয়ে প্রশংসিত ও কৃপাপ্রার্থী হন। এই সমস্ত সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবিরা গণমাধ্যমের সামনে বসে চিৎকার করে নিজের ফন্দিবাজি মতামতকে সত্যি হিসাবে উপস্থাপন করে প্রতিষ্ঠিত করতে একবারের জন্যও কুন্ঠাবোধ প্রকাশ করেন না। এঁরা হয়ত আসল সত্যিটা ভুলে যান যে চেঁচিয়ে বললেই সত্যি প্রমাণিত হয় না। সত্যি বলতে চেঁচানোর প্রয়োজন হয় না। সেটা মানুষ নিজেরাই স্বচক্ষে দেখে, ভেবে, অনুধাবন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৩ সালে 'ভারতী ' পত্রিকায় বলেছিলেন, **'একটা কথা উঠিলেই হয় অমনি বাংলা খবরের কাগজে মহা চেঁচামেচি পড়িয়া যায়। কথাটা হয়ত বোঝাই হয় নাই,ভালো করে শোনাই হয় নাই। হয়তো সে বিষয়ে কিছু জানাই নাই, কিন্তু আবশ্যক কী? বিষয়টা যত কম বোঝা যায়, বোধকরি ততোই হো হো করিয়া চেঁচাইবার সুবিধা হয়?'**

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ব্যতিক্রমী কিছু বুদ্ধিজীবিরা বাদে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবিই সুবিধাভোগী, কৃপাপ্রার্থী, আনুগত্যে লালিত পালিত, ছত্রছায়ায় অনুপ্রাণিত কোন একটি পক্ষ অবলম্বন করে রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত রূপই প্রকাশ করেন। যাদের সবথেকে বেশি খবরের কাগজের শিরোনামে এবং গণমাধ্যমের পর্দায় নিয়মিত ভাষণ দিতে দেখা যায়, যার সঙ্গে জড়িত থাকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্য। যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থেকে যায় লোক চক্ষুর আড়ালে। তাই সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, শিক্ষিত, সচেতন, স্বাধীনচেতা মানুষদের প্রতি আমার এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বিনীত অনুরোধ এই সমস্ত সুবিধাবাদী, স্বার্থপর, মেকি জনদরদি বুদ্ধিজীবিদের বিভীষিকামায় স্বার্থোম্বেষী যুক্তির ফাঁদে পা না দিয়ে; নিজস্ব, স্বকীয় মৌলিক চিন্তা চেতনা, বোধবুদ্ধি, বিচার বিবেচনার ক্ষমতাকে প্রাধান্য দিয়ে অল্প শিক্ষিত, নিরক্ষর, শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত মানুষগুলিকে একটু দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে সমাজ সচেতন মৌলিক চেতনার প্রকাশ করে, সমাজ তথা দেশের সার্বিক উন্নয়ণের স্বার্থে জাতি - ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে একমন্ত্রে ব্রতী হবার আহ্বান রইল। আশা করব এই মেকি জনদরদি বুদ্ধিজীবিদের লোক দেখানো যুক্তির ফাঁদ থেকে নিজে যেমন মুক্ত থাকবেন, তেমনি অপরকেও সচেতন করে সমাজের সার্বিক উন্নয়ণে আপনিও সামিল হবেন।

বিপ-বের কেন্দ্র চন্দননগর ও যুগান্তর দল

শর্বরী দে সরকার
গবেষক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে ২০ ৫০`৩০ `` উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২২ ৫৩`৩০ `` উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮ ২১`৩০ `` পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৮৮ ২৩`৩০ `` পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এই সুপ্রাচীন নগরী চন্দননগর অবস্থিত। এই শহরের পশ্চিম দিকে এখনও ক্ষীণকায়া সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব আছে। পূর্বে ভাগীরথী নদী, উত্তরে চুঁচুড়া ও দক্ষিণে ভদ্রেশ্বর শহর। তবে 'চন্দননগর' নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এখানকার সম্মুখস্থ গঙ্গা নদীর ভৌগোলিক আকৃতি অর্ধ চন্দ্রাকৃতি বলে অনেকের ধারণা, এই স্থানের নাম চন্দ্রনগর বা চন্দননগর। স্যার উইলিয়মি জোন্স তাঁর রোজনামচায় লিখেছিলেন যে, ফরাসীরা 'চন্দন সোঁ লিপোয়ামে ধাম' প্রথানুসারে শহরটি সুসজ্জিত করেছিল বলে এর নাম হয়েছে 'স্যান্ডেল নগর' অর্থাৎ চন্দননগর। কারো মতে মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত চাঁদসওদাগরের নাম থেকেই এই নগরটির নাম হয়েছে চন্দননগর। ফরাসী গ্রন্থে লেখা আছে এখানে এক সময় চন্দকাঠের ব্যবসা ছিল। সেই থেকে চন্দননগর নাম হয়েছে। চন্দননগর নামটি প্রথম পাওয়া যায় ১৬৯৬ খ্রীঃ একটি ফরাসী নথিতে, কেউ কেউ বলেন চন্দননগর নামটির প্রচলন হয় সম্ভবতঃ ফরাসী উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে ফরাসীরা এখানে আসার পর এই শহরটি 'ফরাসডাঙ্গা' নামে পরিচিত হয়।

দীর্ঘ দশক ধরে চন্দননগরে ছিল ফরাসী উপনিবেশ। দীর্ঘদিন এখানকার মানুষ ফরাসী শাসনের অধীনে বসবাস করত। তথাপি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পায়ের তলায় পড়ে থাকা ভারতবর্ষের মানুষের জন্য চন্দননগরবাসীর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। বিপ-ব যজ্ঞে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে চন্দননগরে গঠিত হয়ে উঠেছিল বিপ-ব মানসের রূপরেখা। চন্দননগরবাসীকে ক্রমশ লড়তে হয়েছিল ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী বৈষম্যের বিরুদ্ধেও। বাইরের বিপ-ব প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা অন্যদিকে চন্দননগরের বুকে নতুন বিপ-বী আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ-ব মানস গড়ে তোলা শিল্পনগরের বিপ-বী সন্তানদের অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়ায়।১

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে চন্দননগরের জনসমাজে বিশেষত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ভিতরে শিক্ষার বিস্তার বাড়ে। এসময় ফরাসী ও ব্রিটিশ উভয় ভাষায় শিক্ষাস্রোত চন্দননগরে প্রবাহিত হত। বৃটিশ অধীনস্থ ভারতের মানুষের তুলনায় ফরাসী অধীনস্থ চন্দননগরের মানুষ বেশি স্বাধীনতা ভোগ করত এবং সমাজজীবন খুব একটা জটিল ছিল না। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির তীব্রতা এখানে খুব বেশি না থাকার কারণে চন্দননগরের সামাজিক মানসিক জগৎ অনেকখানি মুক্ত ছিল। এখানে প্রচলিত উৎসব প্রমাণ করে যে এখানকার মানুষ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে অনেকখানি মুক্ত ছিল।২

অবস্থানগত কারণেও চন্দননগর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে গঙ্গানদীর

তীরবর্তী শহর এবং অন্যদিকে ফরাসী শাসনের অধীনস্থ। ফলস্বরূপ এখানে বৃটিশ সরকার সহজে অনুপ্রবেশ করতে পারত না। সেই কারণে বৃটিশ আক্রমনের সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কারণে মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৮৮২ সন থেকে এখানে 'প্রজাবন্ধু' নামক পত্রিকার প্রকাশ হতে থাকে যেখানে নাগরিক স্বাধীনতার কথা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই 'প্রজাবন্ধু' পত্রিকাকে অনুসরণ করে প্রকাশিত হয় 'মাতৃভূমি', 'দর্শক', 'স্বদেশি বাজার' পত্রিকা। যা মানুষের মধ্যে জাগরণ ঘটাতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে চন্দননগরে বিপ-বকেন্দ্র তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।৩

এই সময় বঙ্গের বৈপ-বিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ১৮93 খ্রীঃ ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর আবির্ভাব হয়। তিনি ছিলেন বরোদা রাজ্যের গায়কোয়াড়ু কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক, পরে সহকারী অধ্যক্ষ। তিনি যখন ইংল্যান্ডে অবস্থান করছিলেন তখন ইংল্যান্ডের 'লোটাস এন্ড ড্যাগার' নামক গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন। বরোদা প্রবাসে থাকাকালীন সময়ে মহারাষ্ট্রের চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের ও রানাডের আত্মাহুতির অগ্নিশিখা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। মনে প্রাণে বাল গঙ্গাধর তিলকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পুনার বিপ-বী নেতা ঠাকুর সাহেবের প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষিত হন এবং 'গণতন্ত্রীভারত' নামক সংগঠন গুজরাট শাখার সভাপতির দায়িত্বগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশে বিপ-বী আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য আর এক বিপ-বী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় পাঠান। এই সময় ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র যিনি পি. মিত্র নামে সর্বাধিক পরিচিত. সরলাদেবী ও জাপানী চিত্রকলার অধ্যাপক কাউন্ট কাকুজো ও কাকুরা এক সভায় মিলিত হয়ে একপি গোপন সমিতি গঠন করেছিলেন। বাংলার বিপ-ববাদী আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্ঠা কলকাতায় পি. মিত্র ও সরলাদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ১০৮ নং সার্কুলার রোডে আখড়া স্থাপন করে প্রাথমিকভাবে কাজকর্ম শুরু করেন।৪ অরবিন্দ তাঁর ভ্রাতা বারীন্দ্রকে ১৯০২ সাল নাগাদ বাংলাদেশে পাঠান। বারীন্দ্র বাংলাদেশের জেলাগুলিতে পরিভ্রমণ করে বিপ-বের অনুকূল পরিবেশ না দেখে তখনকার মতো বরোদায় ফিরে গিয়েছিলেন।

১৯০২ খ্রীঃ ২৪ শে মার্চ তারিখে দোলপূর্ণিমার দিনে কলকাতায় প্রমথনাথ মিত্রের নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় অনুশীলন সমিতি। ক্রমশ এই সমিতির শাখা অন্যত্র বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। বিপ-বী আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে অরবিন্দ ঘোষ নিজে ১৯০২ ও ১৯০৪ এই দুই সালে বাংলায় আসেন। এই দুইবারই তিনি চন্দননগরের ডুপে-ক্স কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বিপ-বী আন্দোলনে তার কতটা সহযোগিতা রয়েছে সেকথা জানতে তখন অধ্যাপক রায় ও তাঁর স্বপ্ন এবং সাধনার কথা অরবিন্দ ঘোষের কাছে একান্তভাবে জানিয়েছিলেন। তিনি অধ্যাপনার পাশাপাশি চন্দননগরে বিপ-বী কেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিপ-বী মানস তৈরীতে তাঁর ভূমিকা ছিল সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।৫

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'প্রজাবন্ধু' পত্রিকাটির প্রকাশ করেন অর্থাৎ ১৮৮২ সাল থেকে চন্দননগরে রাজনৈতিক সচেতনতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯০৪ সাল নাগাদ

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত চন্দননগরের একদল প্রবীণ ও নবীন মানুষ গড়ে তোলেন 'সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়'। এদের নেতা ছিলেন মতিলাল রায়। এছাড়াও আরো তিনজন সদস্য ছিলেন। তারা হলেন সাগরকালী ঘোষ, ননীলাল দে ও সত্যচরণ কর্মকার। যারা চন্দননগরের বিপ-ব মানস তৈরীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মতিলাল রায়ের লেখা থেকে জানা যায় বিবেকানন্দের 'বীরপানী' যাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে তা চন্দননগরের এই সংগঠন। অর্থাৎ এটা বলা যেতে পারে বিবেকানন্দই এখানে বিপ-ব মানস তৈরিতে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তিনি হয়ত বিপ-বী আন্দোলন এখানে গড়ে তোলেননি। তাঁর ছায়াপাত ছিল বিপ-ব মানস তৈরিতে প্রথম অভিক্ষেপ। 'সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়' প্রথম পল-ীতে পল-ীতে ঘুরে নিজস্ব পদ্ধতিতে বিপ-বের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।৬

চন্দননগরে বিপ-ব প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উলে-খনীয় হলেন চারুচন্দ্র রায়। তিনি শহরের মধ্যঅঞ্চলে বসবাস করতেন। তাঁকে কেন্দ্র করে চন্দননগরে গড়ে উঠতে থাকে একটি বিপ-বী সংগঠন। বিপ-ব প্রচারক হিসাবে চারুচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে উলে-খযোগ্য। তাঁর কাছে বিভিন্নন শ্রেণীর মানুষেরা আসতেন এবং তাদের অনেককে তিনি বিপ-বী মন্ত্রে দীক্ষিত করতেন। সখারাম গণেশ দেউস্বার,ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর কাছে আসতেন। 'যুগান্তর' পত্রিকার লেখক ও 'যুগান্তর' দলের বিশিষ্ট কর্মী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছাত্র ছিলেন। এই বিপ-বী আন্দোলন জাগরণের অন্যতম পুরোধা হওয়ার কারণে সাধারণত অনেকে তাঁকে 'কর্তা' বলে সম্বোধন করতেন। প্রকৃত শিক্ষক চারুচন্দ্র তাঁর প্রিয় ছাত্রদের দেশের কাজে ব্রতী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। এসব ছাত্রের মধ্যে বিপ-ব চিন্তার উন্মেষ চারুচন্দ্রের বাড়ি থেকেই হয়েছিল। দেশের মুক্তির জন্য বিপ-বী আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।৭

চন্দননগরে বিপ-ববাদের অন্যতম ক্ষেত্র গড়ে উঠতে গোন্দলপাড়া সমিতি এবং গোন্দলপাড়া লাইব্রেরীর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। এটি শহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। এই লাইব্রেরীটি ধীরে ধীরে সদ্য দীক্ষিত ও ভাবী বিপ-বীদের অন্যতম মিলনস্থলে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে গোন্দলপাড়া সমিতি এবং লাইব্রেরীর মাধ্যমে বেশ কিছু যুবককে বিপ-বী দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। গোন্দলপাড়া সমিতি 'গোন্দলপাড়া বান্ধব সম্মিলনী' নামে (কোন কোন সূত্রে ভ্রমবশত সুহৃদ সন্মিলনী বলা হয়েছে) অভিহিত ছিল। হুগলী কলেজের অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ডাফ কলেজের উপেন্দ্রনাথের দুই সহপাঠী উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরামপুরের হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল এবং নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত বন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বান্ধব সম্মিলনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। চারুচন্দ্র রায় এই সম্মিলনীর সভাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।৮

চন্দননগরের শহরের উত্তরাঞ্চলের কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন মতিলাল রায়। চারুচন্দ্র রায় যেমন এখানে বিপ-বের কেন্দ্র তৈরীতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেইরূপ মতিলাল রায় বিপ-বের পটভূমি তৈরীতে এক অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়'ভুক্ত সদস্যদের বিপ-বের ক্ষেত্র তৈরীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে মতিলাল রায় তাঁর কর্মধারা পাল্টে

ফেলেন। বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনে তিনি যথেষ্ট কর্মশক্তি নিয়োজিত করলেন। চন্দননগরে তিনটি বিপ-বী কেন্দ্র গড়ে উঠছিল। এরমধ্যে বোড়াইচণ্ডীতলা কেন্দ্রটির বিপ-বী নেতা ছিলেন মতিলাল রায়। অপর দুটি ছিল চারুচন্দ্র রায়ের নিজস্ব গৃহে এবং গোন্দলপাড়া অঞ্চলে। শহরের বিভিন্ন স্থানের যে বিপ-বী কেন্দ্রগুলি তার মধ্যমণি ছিলেন চারুচন্দ্র রায়।৯

তাছাড়া চন্দননগর যেহেতু ফরাসী শাসনের অধীনে ছিল সহজেই ইংরেজ সরকার চন্দননগরের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারত না। ফরাসী শাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও সেইরূপ বিশেষ কঠোরতা না থাকার কারণ হেতু সহজেই অন্য স্থানের মানুষেরা এখানে প্রবেশ করতে পারত ইংরেজদের অন্তরালে। এই স্থানটি ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। নদীর তীরে অবস্থিত থাকার কারণেও স্থানটি থেকে যাতায়াতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয়নি। তাই বিপ-বীরা এখানে সহজেই নিজেদের গোপন রাখতে পারত। বিভিন্ন স্থানের সাথে বৈপ-বীক সম্পর্ক গড়ে তুলতে অত্যন্ত সহায়ক ছিল এই স্থানটি। বিভিন্ন বিপ-বী বিভিন্নভাবে তাদের বৈপ-বীক কার্যক্ষেত্র গড়ে তুলেছিল এই স্থানটিতে।১০

চন্দননগরের শাসন কর্তৃপক্ষ সেই সময় অস্ত্র আমদানীর উপর কোনও রকম নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ না করার কারণে চন্দননগর আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিপ-বীদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র এখান থেকেই আমদানী করা হত। রক্তাক্ত বিপ-ব সংগ্রামে আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া ব্যাপকভাবে অস্ত্র সরবরাহের জন্য যে অস্ত্রটির কথা ভাবা হচ্ছিল তা হচ্ছে বোমা। আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ কেন্দ্রস্থল হওয়ার পাশাপাশি বোমা তৈরীর অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল চন্দননগর। প্রথমে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন হাটখোলা নিবাসী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি রিপন কলেজের রসায়নের অধ্যাপক সুরেশচন্দ্রের নিকট এই বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।১১

মতিলাল রায়ের বোড়াইচণ্ডীতলার যে বিপ-বী কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল সেখানে মনীন্দ্রনাথ নায়েক নামক এক বিপ-বী আসা যাওয়া করতেন। সেখানে অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র ঘোষ বোমা তৈরীর কৌশল মনীন্দ্রনাথ নায়েককে প্রদান করেছিলেন। তিনি সুরেশবাবুর বাসগৃহ থেকে উন্নততর বোমা তৈরীর কৌশল শিখে চন্দননগরকে বোমা তৈরীর কেন্দ্র গড়ে তোলেন। মনীন্দ্রনাথ নায়েকের তৈরী বোমা ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয় বিভিন্ন বৈপ-বীক কার্য সম্পাদনের জন্য।১২

অরবিন্দ ঘোষের নির্দেশে বিপ-বী অবিনাশ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ও স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮০ - ১৯৬১) সম্পাদনায় কলকাতার ২৭ কানাইলাল ধর লেন থেকে বিপ-বীদের মুখপত্র রূপে সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খ্রীঃ ৩ রা মার্চ। পত্রিকাটির নাম দেওয়া হয়েছিল' 'যুগান্তর' নামে শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত সামাজিক উপন্যাস থেকে। 'যুগান্তর' পত্রিকাকে অবলম্বন করে যে সকল বিপ-বীরা সমবেত হয়ে কাজ শুরু করেছিলেন পুলিশের নথিপত্রে তার পরিচয় হল 'যুগান্ত র দল'।১৩ বৈপ-বীক সংগ্রামের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে চন্দননগরে 'যুগান্তর' দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯০৭ সালে বিজয়া দশমীর দিন অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সন্ন্যাসীর বেশে চন্দননগরের রানীঘাটে এসে উপস্থিত হন। তাকে কেন্দ্র করে এই স্থানে যুগান্তর দলের প্রভাব পড়ে। যুগান্তর দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় চারাচন্দ্র রায়ের সংগঠন।১৪

'যুগান্তর' দলের নেতৃবৃন্দ সর্বপ্রথম চন্দননগরকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের অন্যতম ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছিল। দলের দুই সদস্য বারীন্দ্র ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্য উভয়ে মিলে চন্দননগর নিবাসী কিশোরীমোহন সাঁপুই নামক এক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করেছিলেন। কিশোরী ছিলেন বারীন্দ্র ও অবিনাশের বন্ধু। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ফরাসী দেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করে সেই অস্ত্র বারীন্দ্র ও অবিনাশের হাতে তুলে দেয়। ১৯০৭ খ্রীঃ মধ্য সময় পর্যন্ত এই অস্ত্র সংগ্রহের কাজ চলছিল। চন্দননগরের ফরাসী শাসন কর্তৃপক্ষ সেই সময় আগ্নেয়াস্ত্র আমদানীর উপর কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ না করার কারণে এই আমদানীর কাজ হয়েছিল।১৫

চন্দননগরের বোড়াইচণ্ডীতলায় মতিলাল রায়ের যে বিপ-বী কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল সেখানে কানাইলাল দত্ত,মনীন্দ্রনাথ নায়েক, সাগরকালী,শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বিপ-বীরা সমবেত হতেন। এই সভায় বিপ-বীদের লাঠি শিক্ষা দেওয়া হত। সভায় প্রত্যেক বিপ-বীকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা হত। পরবর্তীকালে এরা চন্দননগরে বিপ-ব মানস তৈরীতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।১৬

১৯০৫ সালে বিপ-বী আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন চন্দননগরের বিখ্যাত বিপ-বী চারুচন্দ্র রায়। উপেন্দ্রনাথের মানিকতলা গুপ্ত বিপ-বী সমিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। চারুচন্দ্রের বাড়িতে উপেন্দ্রনাথের সাথে কানাইলাল দত্তের সাক্ষাৎ হয়েছিল। স্বল্পভাষী কানাইলালের চরিত্র মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে উপেন্দ্রনাথ তাঁর সাথে গোপনে আলাপ করতে ইচ্ছুক হন। কানাইলাল নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন। উপেন্দ্রনাথের কথামত নরেন্দ্রনাথ কানাইলালকে চন্দননগরের স্ট্যান্ডে নিয়ে আসেন। মানিকতলা বাগানের কাজ সম্বন্ধে কানাইলালের সাথে উপেন্দ্রনাথের আলোচনা হয়। এই সময়কালে উপেন্দ্রনাথ 'যুগান্তর' দলভুক্ত ছিলেন এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে মানিকতলা অঞ্চলে ৩২, মুরারিপুকুর রোডে তাদের বিপ-বী আন্দোলন সংক্রান্ত যে কার্যকলাপ চলছিল তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। উপেন্দ্রনাথের সাথে নিভৃতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কানাইলাল 'যুগান্তর' দলের বিপ-বী কর্মধারা সম্বন্ধে জেনেছিলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্তব্যের হদিশ পেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি গুরু চারুচন্দ্র রায়ের কাছেই স্বদেশি দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং এজন্য তিনি প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন।১৭

১৯০৭ সালের শেষের দিকে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মারফৎ যুগান্তর দলের সঙ্গে কানাইলালের যোগাযোগ হয়। তাঁকে কাজের কিছু ভার দেওয়া হলেও মানিকতলা বাগানের বিপ-ব প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি যুক্ত হননি। চন্দননগরে ফিরে এসে দলের কর্মক্ষেত্র প্রসারের জন্য কানাইলাল কিছু শাখা সমিতি স্থাপন এবং মানিকতলা বাগানের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে চন্দননগর অঞ্চলে পাঁচ - ছটি

শাখা সমিতি গড়ে তুললেন। তাঁর মন্ত্রগুপ্তি এত অসাধারণ ছিল যে, সমিতিগুলিতে বিপ-বের কোন সংস্রব আছে তা বোঝা যেত না।১৮

যুগান্তর দলের পক্ষ থেকে ১৯০৭ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবর তারিখে ছোটলাট এন্ড্রুজ ফ্রেজারের রাঁচি যাওয়া উপলক্ষ্যে মানকুন্ডু ও চন্দননগর ষ্টেশনের মাঝে তাঁর ট্রেনটি লাইনচ্যুত করার জন্য কুমিল-ার উল-াসকর দত্তের সাহায্যে একটি মাইনের সাহায্য নেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর প্রাণনাশের পরিকল্পনা করেন বারীন ঘোষ,সহকারী ছিলেন উল-াসকর দত্ত ও প্রফুল- চাকী। কিন্তু লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বিশেষ ট্রেনটি ভিন্ন পথে কোলকাতায় পৌঁছায়।১৯

১৯০৭ খ্রীঃ শেষের দিকের চন্দননগরের হাটখোলায় যে স্বদেশি সভার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে অন্যতম জাতীয় নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আহত হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মেয়র অর্নিভ্যালের নির্দেশ অনুযায়ী সিপাহীরা জোর করে সভাক্ষেত্র দখল করে এবং সভার কাজ বন্ধ করে দেয়। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তরুণরা। তারা সিদ্ধান্ত নেয় লাঠি, সড়কি ও বন্দুক সংগ্রহ করে মেয়রের বাড়ি আক্রমণ করবে। 'যুগান্তর' দলের সদস্যরা তাদের নিরস্ত্র করে এবং জানায় এই বিষয়ে তারা যথাসময়ে ব্যবস্থা নেবেন। এই বিশেষ ঘটনা পরম্পরার ফলশ্রুতিতে চন্দননগর শহরে রক্ত বিপ-বের প্রথম বিস্ফোরণ ঘটেছিল।২০

১৯০৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল চন্দননগরে আহূত এক সভায় মেয়র অর্নিভ্যালের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশ করে বন্ধ করে দেওয়ার কারণে তাদের মধ্যে ক্ষোভ বিশেষভাবে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। ১১ এপ্রিল অর্নিভ্যাল যখন নৈশ ভোজে ব্যাপৃত ছিলেন তখন জানলার মধ্যে দিয়ে হেমচন্দ্র দাসের তৈরী একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বোমা বিস্ফোরিত না হওয়ার কারণে মেয়র প্রাণে বেঁচে যান। পুলিশ রিপোর্ট অনুসারে এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 'যুগান্তর' দলের বারীন ঘোষ,ইন্দুভূষণ রায় এবং নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বোমাটি ছুঁড়েছিলেন।২১

মঁশিয়ে অর্নিভ্যালের বাড়িতে বোমা নিক্ষেপের পর থেকে মুখ্যত যুগান্তর দলের বিপ-ব মানস অনুসারী চন্দননগরের তরুণেরা সশস্ত্র রাজনৈতিক প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। কার্যক্ষেত্র তখন শুধুমাত্র চন্দননগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কানাইলাল দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী বসু প্রমুখেরা সারা বাংলাব্যাপী কার্যক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়তে থাকেন।২২

'যুগান্তর' দল চন্দননগরে অতি সক্রিয় হয় এবং কানাইলাল ক্রমে বিপ-বী কার্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। তাঁর মনে তখন জাগ্রত হয় যেভাবেই হোক Action করতে হবে। তার এই বোধ তাঁকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করেছিল। বারীন্দ্রকুমার তাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে বিপ-বী কার্যের সঙ্গে দ্রুত তাঁকে নিয়োজিত করবে। পরে তাঁর বিপ-বগুরু চারুচন্দ্র রায়কে না জানিয়ে মুরারীপুকুরের গোপন বিপ-বী 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন এবং সর্বপ্রকার বিপ-বী প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করেন।২৩

শ্রীশচন্দ্র ঘোষের মারফত মতিলাল রায় জানতে পারেন যে কানাইলাল উপস্থিত হেমচন্দ্র দাসের কাছে বোমা বানানোর শিক্ষা গ্রহণ করতে গেছে। তারজন্য তাঁরা মানিকতলা

বাগানকে শিক্ষাকেন্দ্র না করে ভবানীপুরের ৭৮ নং রোডে সরোজ কুমার মজুমদারের বাড়িতে বোমা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলে। মজঃফরপুরে বিপ-বীদের বোমা নিক্ষেপ ইংরেজ শক্তিকে আর স্থির থাকতে দেয়নি। ১৯০৮ সালের ১লা মে রাতেই পুলিশ কমিশনারের বাড়িতে ঐ বিপ-বী ঘাঁটিগুলি তল-াশি বিষয়ে পরামর্শ হয়। ২রা মে সকাল থেকেই বিভিন্ন বিপ-বী ঘাঁটিগুলি পুলিশ খানাতল-াশি করে। মুরারীপুকুর ঘাঁটি বৃটিশ সরকার তছনছ করে বহু বিপ-বীকে গ্রেপ্তার করে। এই সকল বিপ-বীগণের মধ্যে কানাইলাল ও চারুচন্দ্র রায় ছিলেন অন্যতম। ১৯০৮ সালে কানাইলাল দত্ত ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের ফলে চন্দননগরের বিপ-ব প্রচেষ্টা এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। চন্দননগরের বিপ-ব মানস স্থিমিত হয়ে যেতে বসলে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও মতিলাল রায় বিশেষ উদ্যোগে চন্দননগরকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায় বিপ-বের বহ্নিশিখা জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করে। এই সময় থেকে চন্দননগরে বহু বিপ-বী আসতে শুরু করে। বলা যেতে পারে চন্দননগর বিপ-বীদের তীর্থভূমি হতে শুরু করে এই সময় থেকে।২৪

১৯০৮ সালের ঠিক মাঝামাঝি সময় যুগান্তরপন্থী চারজনের গোপন সভা হয় চুঁচুড়া ষ্টেশনের কাছে একটি বাগানে। এই চারজন হলেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ,মতিলাল রায়, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও সখারাম গণেশ দেউস্করের ভাগ্নে বাবুরাম পরাকর। এই সভায় স্থির হয়েছিল শ্রীশচন্দ্র ঘোষ সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা বাঁচিয়ে রাখবেন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিপ-বীদের সংহতি পুনর্গঠন করবে। বাবুরাম পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করবে আর সবকিছুর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে মতিলাল রায়ের উপর।২৫

'চন্দননগর গ্রুপে'র সশস্ত্র রাজনৈতিক প্রতিবাদের মাত্রা আরো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। তা শুধু চন্দননগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। চন্দননগরের বিপ-বী তরুণরা কানাইলালম উপেন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী বসু, পশুপতি সিংহ,ইন্দুভূষণ রায় প্রমুখেরা সারা বাংলাব্যাপী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। সারা বাংলা জুড়ে যে গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে বিপ-বী তথা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলছিল চন্দননগরের যুবকেরা তাতে জড়িয়ে পড়েন।

নিরস্ত্র জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের অঙ্গন থেকে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে উন্নীত হওয়ার বছরটি ১৯০৭ সাল। এই সময়কালে যুগান্তর দলের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। চারুচন্দ্র রায়ও বিপ-ব সংগঠন করতে গিয়ে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই সময়কালে যুগান্তর দল যেমন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে বিপ-বী সংগঠন গড়ে তুলতে বিশেষ উৎসাহী ছিল তেমনই তারা অভিজাত ওস্বদেশপন্থী ধনীদের নিজেদের সংগঠনে আনতে প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু প্রাথমিকভাবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ মতিলাল রায়ের লেখা থেকে জানা যায় চারুচন্দ্র রায় প্রথমেই চন্দননগরের ধনকুবের ভূঙ্গেশ্বর শ্রীমানীকে দলভুক্ত করার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই ক্ষেত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। সরকারী কর্মচারীরা যাতে এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয় তার প্রচেষ্টাও চারুচন্দ্র রায় করেছিলেন। শুধু তাই নয় পুলিশ ও কোতোয়ালকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এই বিপ-বী দলের অন্তর্ভুক্ত করার চারুচন্দ্রের প্রচেষ্টা সেইভাবে সাফল্যমন্ডিত

হয়নি।২৬

সর্বশ্রেণীর মানুষকে হয়ত এই বিপ-বী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি তথাপি চারুচন্দ্র রায় ও মতিলাল রায়ের নেতৃত্বে বিপ-বী আন্দোলন এক নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। তাদের নেতৃত্বে চন্দননগর যেমন ফরাসী অধীনতাভুক্ত হয়েও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। বহু বিপ-বীকে স্থান দিয়েছে। বহু তরুণ যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। শুধু সুযোগই পায়নি বিভিন্ন বিপ-বী কর্মকান্ডের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের গুপ্ত সমিতির সঙ্গে তারা যুক্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে তারা কারাবরণ করেছে এমনকি ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিতেও তারা দ্বিধাবোধ করেনি। বৃটিশ অধীনতার বাইরে থেকে পরাধীন ভারতের মানুষের জন্য তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন, এখানকার মানুষ মুক্ত তা সবই এসকল মানুষের কর্মফলে সম্ভব হয়েছে। চন্দননগরের ভিতরে রয়েছে অনেক অজানা ইতিহাস। অনেক অজানা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তারই কিছুটা নিদর্শন এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১) নরহরি কবিরাজ, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা' (পরিমার্জিত ও পরিমার্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৬১), পৃষ্ঠা - ২২৮।

২) হরিহর শেঠ, 'সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়', প্রকাশনা, প্রবর্তক, পৃষ্ঠা - ৭০।

৩) ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপ্যাধায়, 'চন্দননগরের বিপ-ব মানসের গতিপথ (১৮৮২ - ১৯১৬)' প্রবন্ধ, গণপ্রগতি, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৯৭।

৪) পূর্বোক্ত

৫) J.C.Nixon,op.cit, chapter v,vide A.K. Samanta, op.cit, vol.ii, p - 548

৬) মতিলাল রায়, 'আমার দেখা বিপ-ব ও বিপ-বী', প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৫৭, পৃষ্ঠা - ১৯।

৭) 'Bipalabi Sahayogi Chandannagar' part ii by Amal kumar Mitra in Smaranika published by Bipalabtirtha Chattagram Smriti Samstha on the occation of the in anguration of Sahid Surya Sen Bhavan, january 18, 1987, p - 41.

৮) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২২

৯) ডঃ অজিত নিয়োগী লিখিত প্রবন্ধ 'বিংশ শতকের প্রথমে চন্দননগরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি', কানাইলাল জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ 'কানাইলাল শতবর্ষের প্রণাম ১৮৮৮ - ১৯৮৮, পৃষ্ঠা - ৭৮।

১০) C.A. Tegart, 'Note on the Sitnation in Chandannagar', dated March 10,1917,vide A.K. Samanta, op.cit, vol.iii, p - 282.

১১) সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের বৈপ-বীক সংগ্রামের ইতিহাস(১৯৫৫)', প্রকাশনা, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ২১৫ - ২১৬।

১২) J.C.Nixon,op.cit, chapter v,vide A.K. Samanta, op.cit, vol.ii, p - 548.

১৩) ডঃ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপ্যাধায়, 'চন্দননগরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' চন্দননগর পৌর নিগম, পৃষ্ঠা - ৪৫।

১৪) Confidential Report, Home (political), file no. (234 of 1911), entitled .... return of ' Arabindo Ghosh.'

১৫) পূর্বোক্ত

১৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫১

১৭) Confidential Record, POLL (poll) department, file no. (No file no. / 1909), page - 1-6 Note on Jugantar Gang.

১৮) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপ্যাধায়, 'রক্তাক্ত বিপ-বের এক অধ্যায়' (প্রথম সংস্করণ), ১৩৬১ সাল, প্রকাশনা জানা নেই, পৃষ্ঠা - ১৯.

১৯) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ২০

২০) মতিলাল রায়, 'বিপ-বী শহীদ কানাইলাল' (তৃতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭), প্রকাশনা, প্রবর্তক, পৃষ্ঠা - ৩৪-৩৫.

২১) F.C.Daly, 'Note on the Growth of the Revolutionary Move ment in Bengal', op.cit., vol.i. p - 20.

২২) পূর্বোক্ত

২৩) পূর্বোক্ত

২৪) Confidential Report, Home (political) department, file no. (194A of 1910),page (14 - 16) entitled 'Maniktalla Bomb Case.'

২৫) পূর্বোক্ত

২৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৫০ - ৫১

জীবনানন্দ দাশ - কাব্যবীক্ষণ - ২

বিকাশ মৈত্র

জীবনানন্দের কাব্য সংগ্রহের একটা সংকলন আরবি প্রকাশনী ২০01 জানুয়ারিতে ও তার পূর্ণ মুদ্রন ২০০৪ এপ্রিলে প্রকাশ করেছে। এ পর্যন্ত যত বই প্রকাশিত হয়েছে মোটামুটিভাবে যথাযথ প্রকাশ বলেই মনে হয়। এই বইটিকে কেন্দ্র করে আমি কাব্য আলোচনায় নিজেকে যুক্ত রাখতে চাই। দেখা যাচ্ছে মোট বাংলায় লেখা কাব্য ও কবিতা করেছেন (এ পর্যন্ত যা প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও অনেক লেখা বাক্সবন্দি হয়ে আছে - শুনেছি) ৬৫৮ টি এবং ইংরাজি কবিতার সংখ্যা ১০টি। কবিতাগুলো নিম্নলিখিতভাবে কাব্যগ্রন্থে গ্রন্থিত হয়েছে —

ঝরা পালক — ১৯২৭ প্রকাশ (আশ্বিন ১৩৩৪)	মোট কবিতা	৩৫
ধূসর পাণ্ডুলিপি — ১৯৩৬ (অগ্রহায়ণ ১৩৪৩)	মোট কবিতা	১৭
রূপসী বাংলা — ১৯৫৭ (আশ্বিন ১৩৬৪)	মোট কবিতা	৬১
বনলতা সেন — ১৯৪২ (পৌষ ১৩৪৯)	মোট কবিতা	১২
বনলতা সেন — (এরপর সংযোজন করে প্রকাশ)		
১৯৫২ (শ্রাবণ ১৩৫৯)	মোট কবিতা	২১
মহাপৃথিবী — ১৯৪৪ (শ্রাবণ ১৩৫১)	মোট কবিতা	২৫
সাতটি তারার তিমির — ১৯৪৮ (অগ্রহায়ণ ১৩৫৫)	মোট কবিতা	৪০
শ্রেষ্ঠ কবিতা — ১৯৫৪ (বৈশাখ ১৩৬১)	মোট কবিতা	৫১
অগ্রন্থিত কবিতা		৩৯৬
ইংরাজি কবিতা		১০টি

কাব্যরচনা ছাড়া ১১টি উপন্যাস ১০০টি গল্প,৩৮টি প্রবন্ধ (বাংলায়)। এছাড়া ৯টি ইংরাজিতে লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আরো কিছু লেখা থাকবে বলেই মনে হয় তবে তা ভবিষ্যতের উপরে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। ছোটো গল্প জলের ন্যায় করেন তার লেখা কবিতার আদলেই রেখেছেন। নামকরণ আর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের ..... অসাধারণ। আকাঙ্খা - কামনার বিলাস,সঙ্গ - নিঃসঙ্গ, রক্তমাংসহীন, নিষ্কাম সত্ত্বা, মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণ, মেয়ে মানুষদের রক্তমাংস ইত্যাদি উলে-খযোগ্য।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর জীবিতকালে কবিতার বইত্যালোকে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করেন। আর এর মধ্য দিয়ে কবির অন্তর জগতের কিছু পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায়।

ঝরাপালক -কল্যানীয়াম, ধূসর পাণ্ডুলিপি - বুদ্ধদেব বসু, রূপসী বাংলা - আবহমান বাংলা, বাঙালী; বনলতা সেন - এক জায়গায় একটি কবিতাভবন প্রকাশিত হয়। মহাপৃথিবী — প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রিয়বরেষু, সাতটি তারার তিমির — হুমায়ুন কবির বন্ধুবরেষু।

জীবনানন্দ দাশের কবিতাপাঠের আলোচনার স্বার্থে কবির নিজস্ব কিছু বক্তব্য

এখানে তুলে ধরা দরকার — 'আবার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেউ বলেছেন এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজসচেতনার, অন্যমতে নিশ্চেতনার, কারও মীমাংসায় এ কাব্য একান্ত প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার,সুরিয়ালিস্ট, আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য - কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে, সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসাবে নয়, কিন্তু কবিতা সৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি মনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ তারতম্যের সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হতে হয়।

ইংল্যান্ডের প্রিব়্যাফালাইট এবং রোমইন্টক কবিদের মতো জীবনানন্দের কাব্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে গভীরতা ব্যাপ্তি এনেছেন। শব্দের ব্যবহারে স্পর্শানুভূতির সংযোজনা করেছেন তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্পূর্ণতই যুক্ত করেছেন। বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের এই দিকটিকে সঠিকভাবেই বিশে-ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কর্ম আধ্যাত্মিক, সবচেয়ে বেশি শারীরিক; তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয় নির্ভর। তাঁর এই বিশেষত্বই কীটস্ ও প্রিব়্যাফালাইটের কথা মনে করিয়ে দেয়।

জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ' চিত্রস্বরূপ'। জীবনানন্দকে বলা হয় বাংলা কাব্যের জগতে ইমপ্রেশনিস্ট ; আসলে ইমপ্রেশনিস্টরা যুক্তিবুদ্ধির উপর নির্ভর না করে মানসিক অনুষঙ্গকে বেশি গুরুত্ব দেয়। Subjective Naturalism কেই প্রধান মনে করা হয় এ ক্ষেত্রে। বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ পরবর্তীকালের কবিদের কবিতার যে পরিবর্তনের ধারা — তাতেও কিন্তু Subjective Naturalism এর প্রাধান্য পেয়েছে। এমনকি একবিংশ শতকের কবিতার ক্ষেত্রে ঐ একটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রবাহ লক্ষ্য করি।

বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থটি 'এক পয়সায় একটি নামে' কবিতা ভবন ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ১৯৪২ (পৌষ ১৩৪৯)। দাম চার আনা। বইটি কবির জীবিতকালেই প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণে মোট ১২টি কবিতা। এর পরে ১৯৫২ (শ্রাবণ ১৩৫৯) আরো কবিতা সংযোজন করে বইটি প্রকাশিত হয়। তখন তাতে ২১টি কবিতা সংযোজন করা হয়। প্রথম যে ১২টি কবিতা সংকলনে থাকে সেগুলি হল — ১। বনলতা সেন - পৌষ ১৩৪২, ২। কুড়ি বছর পরে - পৌষ ১৩৪২,৩। হাওয়ার রাত - চৈত্র ১৩৪২, ৪। আমি যদি হতাম - চৈত্র ১৩৪২, ৫। ঘাস - ঐ ৬। হয় চিল - ঐ, ৭। বুনোহাঁস - আষাঢ় ১৩৪৩, ৮। শঙ্খমালা - ঐ ৯। নগ্ন নির্জন হাত - আশ্বিন ১৩৪৩, ১০। শিকার - ঐ, ১১। হরিণেরা - পৌষ ১৩৪৩, ১২। বেড়াল - চৈত্র ১৩৪৩

এরপর আরো ২১টি কবিতা সংযোজন করে বনলতা সেন নাম দিয়ে ১৯৫২ সালে সংযোজিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ আগের ১২টি ও পরের ২১টি মোট ৩৩টি কবিতার সংকলন 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি যা এখন পাওয়া যায়। পরের ২১টি কবিতাগুলি হল — ১। সুদর্শনা - ১৩৫৮ আষাঢ়, ২। অন্ধকার - ১৩৫৬ চৈত্র, ৩। কমলালেবু - ১৩৪৪ পৌষ ৪। শ্যামলী - ১৩৫৬ (শারদীয়া দশ - এ প্রকাশিত) ৫। দুজন - ১৩৫৭ বৈশাখ, ৬।

অবশেষে - ১৩৪৮ বৈশাখ, ৭। স্বপ্নের ধ্বনিরা - ১৩৪৪ পৌষ ৮। আমাকে তুমি - ১৩৫৮ আষাঢ়, ৯। ধান কাটা হয়ে গেছে - ১৩৫৮ আশ্বিন, ১০। শিরীষের ডালপালা - ১৩৫৮ আষাঢ় ১১। হাজার বছর শুধু খেলা করে - ১৩৪৩ আশ্বিন ১২। সুরঞ্জনা - ১৩৫৪ শারদীয় (যুগান্তর) ১৩। মিতভাষণ - ১৩৫৫ শারদীয় (আনন্দবাজার) ১৪। সবিতা - ১৩৫৪, ১৫। সচেতনা - ১৬। অঘ্রান প্রান্তরে - ১৩৫৮ আশ্বিন, ১৭। পথ হাঁটা - , ১৮। আবহমান - ১৯৫৮ সংযোজনে আরো কবিতা, ১৯। ভিখিরি - ১৩৪৭ পৌষ (নিরুক্ত), ২০। তোমাকে - ১৩৪৮ বৈশাখ (পরিচয়)।

কবিতাগুলির রচনাকাল অথবা প্রকাশকাল ধরে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে প্রথম প্রকাশের সাথে সংযোজিত সংস্করণের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। প্রথম প্রকাশের কবিতাগুলির রচনাকাল / প্রকাশকাল ১৩৪২ এ ছয়টি কবিতা বাকি ৫টি কবিতা ১৩৪৩ এর সময়কালে। কিন্তু ১৯৫২ সালে সংযোজিত কবিতাগুলি লেখা হয়েছে ১৩৪৪ থেকে ১৩৫৮ এর মধ্যে। বনলতা সেন কবিতাটি লেখা হয়েছে ১৩৪২-১৩৫৮ সালের লেখা / প্রকাশিত কবিতাও এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। যেহেতু এটি একটি কাব্যগ্রন্থ - সুতরাং এই কবিতাগুলোর মধ্যে কোন মাধুর্য আছে কিনা সেটাও আলোচনার মধ্যে আসা উচিত বলেই মনে করি। কারণ ১৩৪২ ও ১৩৫৮ এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান বিস্তর। হয় কোন আঙ্গিক কিংবা বিষয়ের বিবেচনা এর মধ্যে সোজা সহৃদয় পাঠকের মধ্যে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

বনলতা সেন প্রেমের আশ্রয়। তবে সে আশ্রয় শৃঙ্খলিত নয় - মুক্ত। খুব সঙ্গোপন অনুভব আছে তাতে - একান্ত নিজস্ব। ছায়া প্রচ্ছায়া আছে কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব দ্বিধায় বিদীর্ন নয় সেই প্রেম। সেই অর্থে অমর প্রেমও নয় তা। কবিতায় শরীরী গন্ধ টেনে এনেছেন বটে তবে কিন্তু তা শরীরী হয়েও শরীরী গন্ধ মেখেও তা নির্জলা। অশরীরী প্রেম তো নয়ই। জীবনানন্দে রবীন্দ্র প্রেমের মাধুর্য্য খোঁজা নিস্ফল। নিরুত্তাপ আঁচহীন প্রেম - সকল জীবনের আশ্রয় কিন্তু সেখানে ইতিহাস পুরানের বাতাসে ঘোরা আসক্তি নিয়ে উপস্থিত। প্রেমের শরীরী গন্ধ থাকলেও তার দূরত্ব নিয়ে থাকা। না হলে বনলতা সেন আপনি সম্বোধনে দূরত্ব রক্ষা করেছেন। বনলতা সেন যুগ সমীক্ষার কবিতা - প্রেমের বন্ধন এই কবিতার আলোচ্য বিষয় নয়। যদিও প্রেমের রোমান্টিক আবহ কবিতাটিকে একটা অন্য মাত্রায় বরং অন্য মাধুর্যে নিয়ে গেছে। তুলনায় কবির চতুর্থ কবিতাটি 'আমি যদি হতাম, - এ ফাল্গুনের রাতে আকাশে রুপোলী শস্যের ভিতরে গা ভাসালে বনহংসী রূপ প্রেমিকা ও বনহংস রূপ কবি স্বয়ং প্রেমিকের কণ্ঠে হাওয়ার গান অনেক বেশি জীবনের অনেক বেশি বাস্তববোধের সাথে ধরা পড়ে। প্রেমের শক্তি পিষ্টনের উল-াস - এর উপলব্ধি কবিতার উপজীব্য বিষয়। প্রেম ধরা ছোঁয়ার আশ্রয় হয়ে উঠেছে কবি যখন বলেন, 'তোমার পাখায় আবার পালক / আবার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন। তুমি - আমি, বনহংস - বনহংসী, ফাল্গুনের রাত, আকাশের রুপোলী শস্যের ভিতর গা ভাসা - জীবনের স্বাদ কবির বাস্তব প্রেমের আস্বাদ এর স্পর্শ লেগে আছে। জীবন এখানে সবচেয়ে সজীব, সচল। মৃত্যুর কোন স্পর্শই এই প্রথম কোনো কবিতায় জীবনানন্দের মধ্যে পাই নাই। পাশাপাশি - নেই বরং প্রতিসময়ের মৃত্যুকে তিনি অতিক্রম করেছেন - প্রেমের স্পর্শে জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না। থাকত না

আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের এই ব্যর্থতা ও অন্ধকার। 'বনলতা সেন' নামের কবিতাটি যদি হয় রোমান্সের কুয়াশা তবে 'আমি যদি হতাম' কবিতাটি বাস্তবতার দৃঢ়তা নিয়ে জীবনের গান। বনলতা সেন এর কবিতায় জীবন সমুদ্রসমান -কিন্তু এই কবিতায় কবি 'আকাশের রুপোলী শস্যের ভেতর গা ভাসানো অথবা গুলির শব্দ,সেথায় পিষ্টনের উল-াস - কবির কণ্ঠে হাজার গান।

তবে প্রশ্ন জাগে, বনলতা সেন কবিতাটি কী প্রেমের কবিতা নয়? কিংবা অপ্রেমের কবিতা ? কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায় প্রেম এই কবিতার মূল বিষয় নয় কিন্তু কবির অস্থিরতা জীবনে প্রেমের আশ্রয়ের আকাঙ্খা আছে। প্রকৃতি ইতিহাস পুরানের ছত্রছায়ায় প্রেমের শান্তি বিরাজমান। সেই প্রেমের কাছেই এই কবিতার শেষে দুটি ছত্র —

'সব পাখি ঘরে আয়, সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন,
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বনলতা সেন নামক কবিতাটির একটা বিশেষ স্থান আছে - বিশেষ স্থানটি নির্দিষ্টকরণ করেছে কাল বা সময়। বাংলা কাব্যের কবিতার ইতিহাস নিছক কম নয়। অজস্র কবির প্রতিভার বিচ্ছুরণ বাংলা কবিতার ধারাকে আরো গৌরবোজ্জ্বল করেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এসবকে ছাড়িয়ে জীবনানন্দের বনলতা সেন -এর দীর্ঘতম চলা মানুষের মন ও মননকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অতিক্রান্ত সময় কবিতাটিকে আরো প্রজ্জ্বল করেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কী আছে এতে? কেনই বা আধুনিক মনকে আবিষ্ট করে রাখছে এই কবিতা। আমি প্রচলিত যে সমস্ত আলোচনা গ্রথিতযশা সমালোচক অধ্যাপকগণ করেছেন সেসবের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই কবিতাটির নিবিষ্ট পাঠক হিসাবেই বিষয়টিকে দেখছি। ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত বাংলা 'কাব্যবীক্ষণ' গ্রন্থে জীবনানন্দের বনলতা সেন সম্পর্কে লিখেছেন - 'বনলতা সেনকে অপ্রেম বা প্রেমহীনতার কবিতা বলা সঙ্গত নয়, কেননা এর ভিতরে প্রেমের স্বীকৃতি ও পরম প্রাপ্তির নিবিড় ও উজ্জ্বল ইঙ্গিত বর্তমান। আপাত বিরহের গভীরে প্রতিশ্রুত ও প্রার্থিত মিলন এবং বিসন্ন ও অনিবার্য দূরত্বের অন্তরালে নিশ্চিত ও অনিন্দিত সান্নিধ্য বনলতা সেনের ইতিবাচক প্রেমের বৈশিষ্ট্য।' বনলতা সেন কবিতায় প্রেমের স্বীকৃতি আছে কিন্তু পরম প্রাপ্তির নিবিড় উজ্জ্বল ইঙ্গিতের অবস্থান কোথায় ? সেটা দেখলাম না। প্রকৃতি - প্রেম - সময় - ইতিহাস - পুরান আর সেসব ছাড়িয়ে মৃত্যু আবার মৃত্যুর অবস্থান কে ছাড়িয়ে জীবনচেতনা জীবনবোধ - নিয়ে জীবনানন্দ। জীবনানন্দের বনলতা সেন ও অন্যান্য অনেক কবিতাতে যেখানে প্রেমের অস্তিত্বের ইঙ্গিত বর্তমান - সেগুলিকে আমি নিম্নলিখিত ভাবে সাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

১। প্রেম আছে তবে প্রেমে স্থিতি নেই। কোথাও প্রেম দাঁড়িয়ে থাকেনি।

২। প্রেমে অস্পষ্টতা আছে। অনেকটাই ঝাপসা ধুসরতা।

৩। বিদ্যুৎলতার মতন চমকে ওঠার মতন প্রেমের উপস্থিতি চমকিত করে কিন্তু আবার তার বিলিনতা আছে। বিলিন হয়ে যায়।

৪। প্রেমে নিবিষ্টতা নেই। বাস্তব থেকে দূরে - অস্পষ্ট আলোতে খুঁজে পেতে হয়। বেশ খানিকটা দূরত্ব আছে।

৫। বাস্তবতার মাটিতে প্রেমের অবস্থান রাখেন নি। এবং অতীতের লুপ্ত কোন গরিমায় - বিষাদে - মৃত্যুর পাখাতে তাকে অবস্থান রেখেছেন।

৬। যে কোন কবিতার মতন প্রেম প্রকৃতির সহাবস্থান জীবনানন্দের কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

৭। প্রেম মৃত্যু খুব কাছাকাছি অবস্থান।

৮। প্রেম ইতিহাস পুরান খুব কাছে প্রায় হাত ধরাধরি করে থাকে।

৯। ইতিহাস পুরান প্রেমে অদ্ভুত রোমান্সের সৃষ্টি করেছে।

১০। প্রেম রক্তমাংসের মানুষের যৌথ চেতনার দ্বারা আক্রান্ত নয় - আবার প্রেম ইউটোপিয়ায় নয়। প্রেমের অবস্থান শেষ পর্যন্ত 'দুর্দান্ত শান্তি' পাখির নীড়ের আশ্রয়ের শান্তি - প্রশান্তিতে।

পৃথিবীর সব রং মুছে যাওয়া - অন্ধকার (নাম আসলে খানিকটা অবসর আসে)। অবসরের আশ্রয় প্রেমে। প্রেমের স্থিতিতে কোন পরিণতি অন্তত বনলতা সেনের কবির ক্ষেত্রে নেই। সব পাখির, সব নদীর পরিণতির সাথে কবির পরিণতি ঐ একই আসবে। জীবনের লেনদেন ফুরোলে প্রেম থাকে কি? বাস্তব পৃথিবীতে? প্রেম কোথায়? মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন অনুপস্থিতা - রক্তমাংসের নারী নেই - পুরুষও নেই। একমাত্র একটা অবসরের প্রশান্তি থাকে কবির সম্মুখে।

'ধান কাটা হয়ে গেছে' - আট পংক্তিটির কবিতার প্রথম স্তবকে 'চার পংক্তি) অতিক্রান্ত সময়ের সংকেত। ' ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ যেমন নিবিড়। কালের নিয়মে অতিক্রান্ত জীবন। জীবন আর সময়। শেষ পর্যন্ত মানুষের অবসর অন্ধকারে শ্রান্তিতে একা একা শান্তির প্রত্যাশায়। দ্বিতীয় স্তবকে 'ঐখানে একজন শুয়ে আছে' - অনেকের মধ্যে ঐ একজন - কবি নির্দিষ্ট করলেন। তিনি শুয়ে আছেন। মৃত্যুর কালো চাদরের অন্ধকারের জ্যোৎস্না আছে কাঁথাটির মধ্যে। কিন্তু কে ঐ একজন? তার সঙ্গে কবির হৃদয়ের খেলা - খেলা প্রেম? অবশ্যই প্রেম। ঐ একজন কে হতে পারে? বনলতা সেন ? ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোকের মধ্যে বিশেষ করে ঐ একজন - এর মুখ কবি মনে করছেন। হৃদয়ের খেলায় কিছু অপরাধ করেছেন? জীবন নিয়ে কবি কোন সত্যকে গোপন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রেম নিয়ে কোন অপরাধী কবি কেন প্রেম প্রেম খেলা করে অনেকেই অপরাধী হন। ব্যাস ঐটুকুই শুধু সত্যই প্রকাশ। কিন্তু এখানে অশেষ স্মৃতিতেই তার আশ্রয় - প্রকৃতিতেই তাঁর আশ্রয় - অবস্থান। প্রেম আসে, প্রেম যায়; কিন্তু মানুষ প্রেম চলে যাওয়ার পরেও তাকে ধরে রাখতে চায় বা চেষ্টা করে। কিন্তু যাকে চেষ্টা করে ধরে রাখতে হয় সেটা তো অনিবার্য প্রেম নয়। প্রেমের অনিবার্য বিনাশ তার পরিণতিতে। প্রেমের অমরতা আসলে কোন একক প্রেমের পরিণতি নয়। প্রতিদিনের সূর্য ওঠার মত সেটা প্রতিদিনের সত্য হয়ে ওঠা। সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রেমের অবস্থান বা অবস্থিতি নয়। আর সেটা অমর প্রেমও নয়। প্রত্যেক প্রেম আলাদা সত্যকে বহন করে। জীবনানন্দের প্রেমে সেদিক থেকে পরিণতির প্রেম নয় বরং ক্ষনিক শান্তির অবস্থানে একক সত্ত্বা।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শিক্ষাচিন্তা

সংগীতা চক্রবর্তী
হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক দর্শন অত্যন্ত জটিল। সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করলেও তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত 'মানসী' কাব্রগন্থের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু - জার্মান ষড়যন্ত্র মামলার তথ্য প্রমাণ এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'গদর' ষড়যন্ত্রের কথা শুধু জানতেনই না, বরং উক্ত ষড়যন্ত্রে জাপানী প্রধানমন্ত্রীর সাহায্যও প্রার্থনা করেছিলেন। আবার ১৯২৫ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে স্বদেশী আন্দোলনকে 'চরকা সংস্কৃতি' বলে বিদ্রুপ করে রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় তার বিরোধিতা করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁর চোখে ছিল "আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলির রাজনৈতিক উপসর্গ।" তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বৃহত্তর জনসাধারণের স্বনির্ভরতা ও বৌদ্ধিক উন্নতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। ভারতবাসীকে অন্ধ বিপ-বের পন্থা ত্যাগ করে দৃঢ় ও প্রগতিশীল শিক্ষার পন্থাটিকে গ্রহণ করার আহ্বান জানান রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের মতাদর্শ অনেককেই বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯১৬ সালের শেষদিকে সানফ্রান্সিসকোর একটি হোটেলে অবস্থানকালে একদম চরমপন্থী বিপ-বী রবীন্দ্রনাথকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইটহুড' বর্জন করেন। 'নাইটহুড' প্রত্যাখ্যান পত্রে লর্ড চেমসফোর্ডকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন. "আমার এই প্রতিবাদ আমার আতঙ্কিত দেশবাসীর মৌনযন্ত্রণার অভিব্যক্তি।' রবীন্দ্রনাথের "চিত্ত সেথা ভয়শূণ্য" ও "একলা চলো রে" রাজনৈতিক রচনা হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। "একলা চলো রে" গানটি গান্ধীজির বিশেষ প্রিয় ছিল। যদিও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অম্-মধুর। হিন্দু নিম্নবর্গীয়র জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গান্ধীজি ও আম্বেদকরের মতবিরোধের সূত্রপাত হয়, তা নিরসনে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ফলে গান্ধীজি তাঁর অনশন কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

ভিখারী তৈরীর কারখানা

সুব্রত দাস

"আমি অরণি" একটি সাহিত্য ও গবেষণামূলক পত্রিকা। আমি নিজে এই পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক বা পাঠক হিসাবে দাবী রাখতে পারি না। এই পৃথিবীতে শ্রদ্ধার আসনে মা - বাবার পরেই আমি যাঁকে স্থান দিয়েছি, আমার সেই শিক্ষক, আমার জীবনের আদর্শ শ্রী গোপাল দে মহাশয়ের হাত ধরেই এই পত্রিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। পত্রিকাটির চতুর্থ বর্ষের বৈশাখ সংখ্যায় "আমি অরণি"র মতো একটি জনপ্রিয় পত্রিকার সঙ্গে আমাকে যুক্ত করার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। বর্তমানে আমাদের পারিপার্শ্বিক বাস্তবিক পরিস্থিতির নীরিখে আমার একান্ত ব্যক্তিগত একটি দৃষ্টিভঙ্গি আমি "আমি অরণি" পত্রিকার মাধ্যমে সকলের সামনে আনার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করছি।

পৃথিবী আজ একবিংশ শতাব্দীতে পা রেখেছে। আমরা এই পৃথিবীর সমস্ত জীবকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে দাবী রাখতে পেরেছি। স্বমহিমায় প্রচার করছি আমরা আত্মনির্ভরশীল। আমরা আজ পৃথিবীকে করে তুলেছি আধুনিক থেকে আধুনিকতর। এই আধুনিক পৃথিবীর অনেক দেশের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ হল একটি আধুনিক দেশ। এই ভারতবর্ষ আজ বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবদিক থেকেই অনেক এগিয়ে। বর্তমানে ভারতে প্রায় ১২৫ কোটি জনসংখ্যা। এই অতি আধুনিকতার যুগে এসেও আমরা এই ভয়াবহ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমান্ত রালভাবে বেড়ে চলেছে ভারতীয়দের মানসিক ভিখারী বৃত্তির প্রবৃত্তি।

ভারতবর্ষ আজ ভিখারী তৈরীর কারখানা। তবে এই ভিখারী এক অন্যরকমের ভিখারী যাদেরকে আমার মনে হয় মানসিক ভিখারী। ঈশ্বরবাদ মানে বর্তমানে অনেকটা ভিখারীবাদের সমান। ঈশ্বরের কাছে আমরা বিভিন্ন জিনিস ভিক্ষা চাইছি অর্থাৎ মানসিকভাবে আমরা প্রথমেই ভিখারী। আর পরে সত্যিকারের ভিখারী। আমরা ভগবানকে অল্প ঘুষ দিচ্ছি বেশী লাভের আশায়। গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, "আমি মার্গদাতা, মোক্ষদাতা নই।" অর্থাৎ পথ প্রদর্শক। আজ আমাদের দেশে নেতা - নেত্রীরা কেউ মার্গদাতা (পথ প্রদর্শক) নন, সবাই মোক্ষদাতা অর্থাৎ কিছু পাইয়ে দিয়ে (ভিক্ষা দিয়ে) ভিখারী বানাচ্ছেন। পুরোহিত শ্রেণীও ভগবানের কাছে কিছু ভিক্ষা চাইতে বলছেন।

ফলে সাধারণ মানুষ বলছেন ঠাকুর চাকরি পাইয়ে দাও, বড়ো বাড়ি, গাড়ি দাও, টাকা দাও, ছেলে সন্তান দাও, পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দাও, আরো অনেক কিছু দাও। শুধু দাও - দাও - দাও - দাও .....। এইভাবেই জন্ম থেকেই আমরা ভিক্ষা চাইতে শিখছি। তাই মানসিক দিক দিয়ে আমরা ভিখারী। আজ তার বাস্তব প্রতিফলন আমরা সবাই সত্যিকারের ভিখারী।

বুদ্ধ আরো বলেছেন, "আত্মদীপ ভবঃ" অর্থাৎ নিজেকে প্রজ্জ্বলিত কর। কিন্তু

আমরা যেখানে সেখানে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছি। পায়ে গড়িয়ে পড়ছি, আর ভিক্ষা চাইছি। আজ বিশ্বে সবচেয়ে বেশী দরিদ্রের সংখ্যা ভারতে, অথচ ভারতবর্ষই বিশ্বে সবচেয়ে সুজলা সুফলা দেশ। আজ আমরা বেকার যুবকেরা নিজেদের যোগ্যতার মাপকাঠি বিচার না করে কখনো ঠাকুরকে বলছি চাকরি দাও, আবার কখনো কোনো রাজনীতিবিদকে তোষামোদ করছি চাকরি দেওয়ার জন্যে। এটা কিন্তু এই আধুনিক ভারতের অন্য একরকম ভিক্ষাবৃত্তি। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমন এক শ্রেণীর মানুষের যারা টাকার লোভে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যোগ্যতা বিচার না করেই চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। ফলে অধিকাংশ যোগ্য প্রার্থীরা আজ বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে টাকার জালে। এইরকম একটি ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পাবো বা বর্তমান এই অবস্থাকে কিভাবে পাল্টানো যাবে তার সঠিক কোনো উপায় আমরা জানা নেই। তবে একথা অবশ্যই বলতে পারি যে, নিজেদের অধিকার নিজেদেরই প্রতিষ্ঠা করতে হবে নইলে বিদেশী কোম্পানী আমাদের জল আমাদেরকেই বিক্রি করে আমাদেরকে ভিখারী বানিয়ে যাবে বা হয়তো যাচ্ছে। পরিশেষে, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় একথা বলা যেতেই পারে —

"ওঠো জাগো আর নিজের পাওনা বুঝে নাও।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের অবদান

আসিবা খাতুন

বাংলা তথা ভারতেরইতিহাসে উনিশ শতক নিয়ে এলো নবজাগরণের জোয়ার। সেই সূত্রে সমাজ ও সাহিত্যে প্রবেশ করল নবচেতনার অরুণ আলো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘‘বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন।”উনবিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ লগ্নে ‘বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব’। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের ঊষালগ্নে বরণডালা নিয়ে যিনি হাজির হলেন তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র। বাংলা গদ্যে যে পালাবদল ক্ষেত্র রচিত হয় তার পেছনে ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দীপ্ত ব্যক্তিত্ব, বরণীয় প্যারীচাঁদ মিত্র, যিনি টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামেই বেশি প্রসিদ্ধ।

প্যারীচাঁদ প্রধানত জ্ঞানসাধনার পথিকৃৎ ছিলেন। স্ত্রী সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন ছিল তাঁর একমাত্র অভিপ্রায়। তিনি শিক্ষা সংস্কৃতি গ্রন্থাগার, কৃষিবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে সজীব কৌতূহলের সুস্পষ্ট পরিধি অঙ্কন করেছিলেন। বাঙালি ও ইংরেজ সমাজের তিনিই ছিলেন যোগসূত্র।

প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘরের দুলাল’ নামক ব্যঙ্গ আখ্যান তাঁকে সমকালে ও পরবর্তীযুগে বিখ্যাত করেছে। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগুলি হল - ‘কৃষিপাঠ’ (১৮৬১), ‘যৎকিঞ্চিৎ’ (১৮৬৫),‘ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত’(১৮৭৮)। কথোপকথন ও গল্পমূলক রচনা হল - ‘রামারঞ্জিকা’(১৮৬০), ‘অভেদী’(১৮৭১), ‘আধ্যাত্মিকা’(১৮৮০), ‘বামাতোষিনী’(১৮৮১)। ব্যঙ্গাত্মক গদ্যরচনা ও তাঁর এক স্বতন্ত্র অনবদ্য সৃষ্টি - ‘আলালের ঘরের দুলাল’(১৮৫৮)। এছাড়াও ‘মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়’ (১৮৫৯)।

প্যারীচাঁদ মিত্রের স্বকীয় সৃষ্টি - ‘আলালের ঘরের দুলাল’। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে নগরজীবনের উৎশৃঙ্খলতা ও অধঃপতিত সমাজের চিত্রই তিনি এই গ্রন্থে সুনিপূণ হস্তে অঙ্কন করেছেন। সুনীতি, চারিত্রিক আদর্শ ইত্যাদি ব্রাহ্মসমাজের নীতি ও আদর্শ প্রচারে তাঁর প্রবণতা এত বেশি ছিল যে, এর কাহিনী বা চরিত্রে কথা সাহিত্যের লক্ষণ ফুটে উঠতে পারেনি। তাঁর চরিত্রগুলো হয় সর্ম্পূণ সৎ, আদর্শে মোড়া আর না হয় ষোলো আনা ঠক বন্ধক। এদিক থেকে হয়তো তাঁর অঙ্কিত একপেশে চরিত্র উপন্যাসের আবহাওয়াকে কৃত্রিম করে তুলেছে। তবুও তিনি তাঁর স্বতন্ত্র মহিমার স্থলে প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর উপন্যাসের দু’চারটি খল চরিত্র চমৎকারিত্বের গুণে বিশ্বস্ত দলিল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাবু - রামবাবু, ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম, স্বয়ং নায়ক শ্রীমান মতিলাল - এ চরিত্র অধিকাংশ সময় ‘টাইপ’ ধরণের হলেও সরসতা ও কৌতুকের দ্বারা লেখক তাদের আচার আচরণ ও সংলাপে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

তাঁর ‘আলালের ঘরের দুলাল’ গ্রন্থে - বৈদ্যবাটীর জমিদার রামরাম বাবুর পুত্র মতিলাল কিভাবে অতিরিক্ত আদরে ও কুসঙ্গে মিশে অধঃপাতে যায় এবং পরে আবার দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে কিভাবে মতিলালের স্বভাবের পরিবর্তন হয় — সেটিও দেখিয়েছেন। নীতিকথা প্রচারের সার্থক রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে তিনি বরদাবাবু, রামলাল, বেণীবাবু প্রভৃতি

প্রতীকী চরিত্র গুলির অবতারণা করেছেন। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি ঠকচাচা কবিকঙ্কনের ভাড়ুদত্ত বা মুরারীশীলের উত্তরসূরি। কলকাতার সমকালীন শিক্ষাবিভ্রাটের পরিচয় প্যারীচাঁদ এভাবে দিয়েছেন -

“প্রত্যেক ক্লাসের প্রত্যেক বালকের প্রতি সমান তদারক হইত না - ভারি ভারি বহি পড়িবার অগ্রে সহজ সহজ বলি ভাল রূপে বুঝিতে পারে কিনা,তাহার অনুসন্ধান হইত না।” সর্বোপরি তিনি তৎকালীন কলকাতার নগরজীবনের ব্যভিচার ও শিক্ষাদীক্ষার সজীব চিত্র সুনিপুণতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর গদ্যের ক্ষেত্রে পন্ডিতী রীতি গ্রহণ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ উপলব্ধি করেছিলেন বিদ্যাসাগরের ভাষা বড় বেশি সংস্কৃত ঘেষা ও ক্লাসিক বর্মে চর্মে আবৃত। ভাষার মধ্যে ঘরোয়া রূপকে আনতে চেয়েছিলেন প্যারীচাঁদ। বিদ্যাসাগরী গদ্যের যেটি অভাব,যেমন - দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্যতার অভাব - সেটিকে প্যারীচাঁদ উপলব্ধি করে তাঁর গদ্যরীতিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। যেমন - ‘কৃষিপাঠ’ গ্রন্থের ভাষায় - ‘গাছের প্রতি পরিশ্রমের বেতন পোষাইবার সম্ভব।’

বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা খনিত্র হাতে নিয়ে কথা সাহিত্যের উপল - ঊষর ক্ষেত্রে আবির্ভুত হন এবং খাত কেটে রসের প্রস্রবণ বইয়ে দেন। তবে একথা স্বীকার্য - প্যারীচাঁদ সর্বপ্রথম সহজ মানুষের দুষ্ট, খল চরিত্রের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়ে উপন্যাসের বাস্তবতার পথ প্রস্তুত করেছিলেন। প্যারীচাঁদের গদ্যকে ‘আলালী গদ্য’ বলা হয়ে থাকে। মধুসূদন এই ভাষাকে জেলেদের ভাষা বললেও বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সাথে বলেছেন -

‘“তিনিই প্রথম দেখাইল যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা করিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।”

প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল গ্রন্থের ভাষা সহজ সরল। তাঁর ভাষারীতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় — “বাবুরাম বাবু টো গোঁপপা - নাকে তিলক - কস্তা পোড়ে ধুতিপরা, ফুলপুকুরে জুতা পায় - উদরটি গণেশের মতো - কোঁচানো চাদরখানি কাঁধে - একগাল পান - ইতস্তত বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন - ওরে হরে !”

তাঁর রচিত আলালী ভাষায় সংস্কৃত শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ, সন্ধিবাদ পদের ব্যবহার কম, বরং তদ্ভব দেশী শব্দের ব্যবহার ভাষাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আলালী ভাষাতে লোকের প্রচলিত কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এককথায়, বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ এর ভাষা একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করেছিল।

তাঁর ‘আলালের ঘরের দুলাল’ প্রণয়নের অনতিলগ্ন থেকেই বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। তিনি যেন শুষ্ক তরুর মূলে জীবন বারি নিষিক্ত করলেন। সরস কৌতুকের ভাষায় এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে বাঙালির সমসাময়িক বাস্তব জীবনকে যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন বলেই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় স্থান অধিকার করে থাকবেন।

বাংলার আদিবাসী সংস্কৃতি

সুকুমার বিশ্বাস (শ্রাবণীকুঞ্জ)

আদিবাসী কথাটির অর্থ হ'ল আদিম নিবাসী। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও এক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবনবোধ নিয়ে অন্যান্য সকল শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে এদেশে এদের সহাবস্থান সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। এই বাংলায় বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে প্রধানত দুটিভাগে ভাগ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দঃ ২৪ পরগণা, সুন্দরবনাঞ্চলে বসবাস করে সাধারণতঃ সাঁওতাল, কোল, ভীল, ওঁরাও,ভূমিজ, মুন্ডা, কোড়া, খেড়িয়া,মাহামি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক। এরা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং মূলতঃ দ্রাবিড় ভাষাভাষি। আর উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী গারো,লেপচা,মেচ, রাভা, টোটো প্রভৃতি সম্প্রদায় মোঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত এবং চীনা বা তিব্বতী ভাষাভাষী।

আদিবাসীরা গোষ্ঠীতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতার অধিকারী। এরা দরিদ্র হলেও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং আপন ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। জাতিভেদের কুসংস্কারে এরা বিশ্বাসী নয়। বিভিন্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে আপন সমাজ ও সংস্কৃতিকে এরা সযত্নে লালন করে চলেছেন। এদের অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে আশ্বিন মাসে সমাজের মঙ্গল কামনায় পালিত হয় করম অনুষ্ঠান। করম কথার অর্থ গাছের ডাল। পূজা ও নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠান সহকারে পালিত হয় এই উৎসব। কার্তিক মাসে 'সহরাই' উৎসব, পৌষ মাসে 'সাকরাত' উৎসব, মাঘ মাসে 'মাঘসীম' উৎসব, ফাল্গুন - চৈত্র মাসে 'বাহা' বা 'সারহুল' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 'বাহা' বা সারহুল উৎসব বসন্ত উৎসবেরই নামান্তর। শাল মহুয়ার ফুল দেবতার (দেবীর) উদ্দেশ্যে নিবেদন করে গ্রামবাসীর সর্বাঙ্গিন মঙ্গল কামনা করা হয়। আর আষাঢ় মাসে অধিক ফসল উৎপাদন কামনায় 'এরাকসিম' উৎসব পালন করা হয়। তবে এই অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত বাংলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতাল, ওঁরাও, ভূমিজ, মুন্ডা ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসীরাই পালন করে থাকে।

বাংলার উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী ভূটিয়া, লেপচা ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসীরা কিছু পৃথক উৎসবানুষ্ঠান পালন করে। নববর্ষে এরা 'নামবান', বৈশাখে 'বুদ্ধপূর্ণিমা',এছাড়া 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ইত্যাদি উৎসবও পালন করে থাকে। আদিবাসী সমাজের পূজাপার্বন, গাননাটক, কথাকাহিনী ইত্যাদি এদের একান্ত আপন সংস্কৃতিকে যুগপরম্পরাক্রমে বহন করে আসছে। সমগ্র পৃথিবীতে যখন আধুনিকতার বিপ-ব দেখা যাচ্ছে, তথাকথিত সভ্য সমাজ আপন সামাজিক অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে এদের এই আপন সংস্কৃতিকে লালন ও রক্ষা করার প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ করে ব্যক্তি মাত্রই অভিভূত হয়ে যান।

আদিবাসীরা তাদের চিরাচরিত সামাজিক কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলিতে তাদের

একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতির প্রাচীন গান গুলিই ব্যবহার করে থাকেন। যেমন বিবাহ অনুষ্ঠানে পূজাপার্বনে ভিন্ন ভিন্ন নাচগানের ব্যবস্থা আছে। এইসব নাচগানে সাধারণতঃ মাদল, নাগরা, শিঙ্গা, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ফুল আদিবাসী রমণীর অত্যন্ত প্রিয়। এরা ফুলে ফুলে সজ্জিত হয়ে নাচতে ভালবাসেন। সৌন্দর্যপ্রিয় আদিবাসীদের চিত্রকলার উলে-খ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এরা ঘরের দেওয়ালে ও দরজায় নানা জীবজন্তুর চিত্র এবং আলপনা এঁকে রাখেন। এগুলি অতিরমনীয় ও সৌন্দর্যময় এবং তা নিঃসন্দেহে এদের শিল্পীমনের পরিচয় বহন করে।

একদা অরণ্যাচারী আদিবাসী সমাজের অবস্থান তথাকথিত শিক্ষিত আধুনিক কৃত্রিম নগর সভ্যতা থেকে বহুদূরে অবস্থিত ছিল। নিবিড় অরণ্যময় শান্ত পরিবেশই ছিল তাঁর প্রধান কেন্দ্রস্থল। যা তাঁদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতিকে এক পৃথক ধারায় প্রবাহিত করার সুযোগ ঘটিয়েছিল। ভাষা ও সংস্কৃতির পরিপুষ্টি ও লাণর পালনের উপযুক্ত চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানসিকতা থাকার জন্যই আদিবাসী সংস্কৃতি শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হারিয়ে যায়নি। কোন জাতি বা গোষ্ঠীর সভ্যতা উন্নয়ণের মাপকাঠি হিসাবে যদি সেই জাতির সংস্কৃতিকে ধরে নেওয়া যায় তাহলে আদিবাসী সমাজের নাম নিঃসন্দেহে সভ্য সমাজ বিশিষ্ট দেশের তালিকার অন্তর্ভুক্তির দাবী রাখে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসী সংস্কৃতির স্বীকৃতি ও উন্নয়ণের জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। বিভিন্ন মানবতাবাদী সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের দৌলতে আজ আমরা আদিবাসী সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্পর্কে বিশেষভাবে জানার সুযোগ লাভ করেছি ও তাদের সাথে ও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছি। সাঁওতাল গোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব ভাষা 'অলচিকি' ভাষার সাথে এখন অনেকেই পরিচিত হয়েছেন। আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য পরীক্ষামূলকভাবে দেশের নানা স্থানে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক অনুশীলন স্পৃহা দেখা দিয়েছে। বেতার, দূরদর্শন, যাত্রা থিয়েটারের মাধ্যমে এই অনুশীলনীর ধারা অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা চলেছে নিরন্তর। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ দূরদর্শন প্রচারিত 'ইষ্টিকুটুম' সিরিয়ালের 'বাহামণি' চরিত্রটি এখন আমাদের স্নেহাধন্যা। একান্ত আপনজন হিসাবে আমাদের মনে অবলীলায় ঠাঁই করে নিয়েছে। অদূর ভবিষ্যৎ সমাজ কল্যাণকামী জনগণের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় আদিবাসী সমাজের কৃষ্টি, শিল্প - সংস্কৃতির ধারা পত্র পুষ্পে পল-বিত হয়ে বিস্তৃতি লাভের সুযোগ পাবে এবং আদিবাসী কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটাবে এই আশা রাখি।

তথ্যসূত্র ঃ আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা — অমলকুমার দাস।

এক আশ্চর্য গণিত প্রতিভা - রামানুজন

শুভদীপ ব্যানার্জ্জী

আধুনিক ভারতবর্ষে যে অল্প কয়েকজন ব্যক্তি গণিত বিষয়ে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রীনিবাস রামানুজন। কোন প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই তিনি গণিতের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অবিভক্ত ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীনিবাস রামানুজন। তাঁর পিতা কে. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ছিলেন এক কাপড়ের দোকানের হিসাবরক্ষক। পাঁচ বছর বয়সে তাকে পাঠানো হয় এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই অল্প বয়সেই রামানুজনের গণিত প্রতিভা শিক্ষকদের গোচরে আসে। সংখ্যা নিয়ে তিনি যেন খেলা করতেন। একবার শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে ভাগ শেখানোর সময় প্রশ্ন করেন, "১৫টি আম ৫ জন ছাত্রের মধ্যে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কতগুলি আম পাবে?" এই প্রসঙ্গে রামানুজন প্রশ্ন করে, "স্যার, শূন্য সংখ্যক আম শূন্য জন ছাত্রের মধ্যে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কতগুলি আম পাবে?" অর্থাৎ শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কি হয়? শিক্ষক মহাশয় তার এই প্রশ্নে বিস্মিত হন। গণিতে অসামান্য দক্ষতার জন্য তিনি বিশেষ বৃত্তি অর্জন করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডি পার হতেই তার হাতে আসে S.L. Looney ত্রিকোণমিতির একটি বই। শুরু হয় লুকিয়ে ত্রিকোণমিতি শেখার চেষ্টা। তিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় অল্প কয়েক মাসে S.L. Looney আরও করে ফেলেন। সংসারের আর্থিক অনটনে কাগজ কেনা কঠিন হত, তাই স্লে-ট পেনসিলে প্রথমে সমস্যার সমাধান করতেন এবং রেজাল্টগুলি একটি খাতায় লিখে রাখতেন। স্কুলের সকলেই রামানুজনের গাণিতিক প্রতিভার সম্পর্কে জানতে পারে। এই সময়ে তার এক বন্ধু G.S.carr এর synopsis of elementary result in pure and applied mathematics বইটি পড়তে দেয়। রামানুজন এই বইয়ের প্রদত্ত গাণিতিক সূত্রগুলির সত্যতা পরীক্ষা শুরু করেন। এগুলি ছিল মূলতঃ শৈলিক গবেষণার মত কারণ তার কাছে আর কোন সহায়ক গ্রন্থ ছিল না। ১৬ বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন এবং বৃত্তি লাভ করে কুম্ভকোনাস সরকারী কলেজে ভর্তি হন। কলেজে গণিতে অতিরিক্ত মনোযোগের কারণে তিনি ইংরেজী বিষয়ে ফেল করেন এবং F.A.পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন, ফলে বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। সংসারে অভাব অনটন আরও বৃদ্ধি পায় কিন্তু রামানুজন সারাদিন গণিত চর্চায় মগ্ন থাকে। বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় তিনি কলেজের গন্ডি পেরোতে ব্যর্থ হন। প্রথাগত শিক্ষা থেকে বেড়িয়ে রামানুজন স্বাধীনভাবে গণিতচর্চা শুরু করেন। গণিতচর্চার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় অর্থাভাব। আর্থিক অনটনে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাগজ কিনতে পারতেন না আবার স্লে-টে বারবার মুছতে হত তাই তিনি গণিতচর্চার জন্য ডাস্টবিন থেকে ময়লা নোংরা কাগজ জোগাড় করতে শুরু করেন। এদিকে ছেলের অতিরিক্ত গণিতপ্রীতি তার মায়ের কাছে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেকে সংসারী করে তোলার জন্য মা ১৯০৯ সালে তার বিবাহ দেন। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি স্বভাবের

বিপরীতে জীবিকা খুঁজতে থাকেন। দু-একটা ছোটখাটো চাকরী করার পর তিনি মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের অধীনে সামান্য পদে চাকুরীতে যোগদান করেন। গণিত চর্চার কাজ চলতে থাকে চাকুরীর ফাঁকে ফাঁকে। এইভাবে কয়েকমাস কাটার পর হঠাৎ এক দূর্ঘটনা ঘটে। রামানুজন Elliptic Integral-এর উপর গবেষণা করছিলেন এবং গবেষণার একটি কাগজ ভুলবশত কোন ফাইলের মধ্য দিয়ে মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান স্যার ফ্রান্সিস স্প্রিং এর হাতে পড়ে। গণিত অনুরাগী এবং কেমব্রিজের প্রখ্যাত গণিত অধ্যাপক G.F.Hardy-এর বন্ধু স্যার ফ্রান্সিস Elliptic Integral দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি প্রধান করণিককে যেকে জিজ্ঞাসা করেন - "কে অফিসের কাজের সময় এইসব আজে বাজে কাজ করে সময় নষ্ট করে? করণিক জানায়, 'বিশ্বাস করুন স্যার, আমি করিনি।' স্যার ফ্রান্সিস ব্যঙ্গ করে বলেন - আমি জানি, এ তোমার কর্ম নয়। অফিসে খোঁজখবর নিয়ে রামানুজকে নিয়ে আসা হয়। স্যার ফ্রান্সিস রামানুজনকে দেখে আশ্চর্য হন এবং সমস্ত গবেষণার কাজ দেখে তাঁর বন্ধু অধ্যাপক Hardy-র সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। অধ্যাপক Hardy রামানুজনের গলিত চর্চা সম্পর্কে জেনে তাকে কেমব্রিজে আনতে উদ্যত হন।১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রামানুজন কেমব্রিজ থেকে আমন্ত্রণ পত্র পান এবং ত্রিনিত্রি কলেজে ফেলোশিপ পেয়ে যান। এরপর তিনি ইংল্যান্ডে এসে কিছু প্রাথমিক গাণিতিক বিষয় শিখে Prime Number,infinite sehies, continued fraction-এর উপর গবেষণা শুরু করেন। তাঁর Highly composite number-এর উপর গবেষণার জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণায় B.Sc.ডিগ্রী প্রদান করে, যা পরবর্তীকালে P.H.D সমতুল্য হয়। তিনি প্রধানত অধ্যাপক Hardy এবং অধ্যাপক Littlewood-এর সাথে কাজ করতেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। অধ্যাপক Littlewood রামানুজনের সংখ্যাতত্ত্বের কাজে গভীরভাবে বিস্মিত হন এবং মন্তব্য করেন, "প্রতিটি অখন্ড সংখ্যা রামানুজনের ব্যক্তিগত বন্ধু।" যদিও রামানুজনের গবেষণা পদ্ধতি ছিল অনুমান নির্ভর এবং সমকালীন যুগের থেকে অনেকটা আলাদা।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামানুজন ভীষণ অসুস্থ হয়ে যান। তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হওয়ায় নিরামিশ আহার করতেন। তাই ইংল্যান্ডের ঠান্ডা সহ্য করতে পারেননি। দীর্ঘ এক বছর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি না হওয়ায় তাকে ভারতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১৯ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং কিছুকাল যক্ষারোগে ভোগার পর মাত্র ৩২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। রামানুজনের গবেষণাগুলি বিশেষভাবে Security code, Prime Number নির্ণয়, এমনকি Black Hole তত্ত্বেও ব্যবহৃত হয়েছে। ভারত সরকার ২০১২ সালকে 'জাতীয় গণিত বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করেন এবং এখন প্রতিবছর ২২শে ডিসেম্বর 'জাতীয় গণিত দিবস' হিসাবে পালিত হয়।

বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্য

রঞ্জিনা ভট্টাচার্য্য
হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

শিশু ও কিশোর সাহিত্যের স্মরণীয় লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে যোগীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী স্মরণী গ্রন্থে লিখেছিলেন,

" যাঁরা শিশুসাহি্যি রচনার ভার নেন, তাঁদের অনেকে প্রধানত দু রকম ভুল করেন। প্রথমত, কেউ কেউ বিষয় গাম্ভীর্য সহকারে উপদেশকের মতো শিশুমহলে গিয়ে কথকতা করতে চান। দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ মনে করেন, উচ্চতর রচনাপদ্ধতি বা কলাকৌশল ছেড়ে আজেবাজে ছেলে মানুষি করলেই ছোটরা তাঁদের লেখা পছন্দ করবে। তাঁরাও জানেন না, শিশুদের মধ্যে যথেষ্ট কাব্যরসগ্রহিতা আছে এবং তারা উপদেশকে ভালবাসে না।"

ছোটোদের লেখক বলতে যাঁদের আমরা আমাদের শৈশবে ও কৈশোরে বুঝতাম, সেই প্রজাতিটি ক্রমেই দুর্লভ হয়ে আসছেন। এখন যেসব পন্ডিতমানুষ অথবা বড়োদের লেখক অনুগ্রহ করে ছোটোদের জন্য লিখেছেন,তাঁরা ঠিক ওই দু-জাতীয় মনোভাব নিয়েই এক্ষেত্রে আবির্ভূত হচ্ছেন - কিছু সারবান উপদেশ তাদের দান করতে হবে, অথবা লঘু তরল ভাষায় তাদের আকর্ষণ করতে হবে। উপদেশ দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমন কথা জানান। অন্তত প্রতি পদে গুরুগম্ভীর শব্দাদি প্রয়োগ করে তার মাথায় একথা ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, শিশুরা খুশি হতে পারেনা। অথচ সত্যি কথা বলতে কী, সমস্ত রূপকথারই মূল শিক্ষাটা তো এই যে, পরের মন্দ করতে গেলে নিজের মন্দ আগে হয় - মিথ্যে কখনো চিরকাল জয়যুক্ত হতে পারে না। সত্যের জয় শেষ পর্যন্ত হয়ই। সেই উপদেশ প্রচ্ছন্ন আছে বলে পৃথিবীর কোন দেশের শিশু রূপকথার গল্প অর্থাৎ কিনা fairy tales শুনতে চায় না। পশুপাখি নিয়ে যেসব fables বা উপকথা প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যেও তো নীতি শিক্ষার বীজ সুপ্ত আছে। কিন্তু তাই বলে এসব গল্প তো শিশুদের মোটেই অপ্রিয় নয়। আজকের দিনে দূরদর্শনে animation film তো অনেক অভিজাত বিদ্যালয়ের শিশুদেরও সবচেয়ে প্রিয় বিনোদন।

বাংলা শিশুসাহিত্যের সার্থক সূচনা বলতে পারি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি'কে। স্মরণাতীত কাল থেকে ঠাকুরমা ও দিদিমার দল শিশুদের যে রূপকথা শুনিয়ে শান্ত ও মুগ্ধ করে রেখেছেন, দক্ষিণারঞ্জন তা উদ্ধার করেছেন একেবারে তাঁদের মুখের ভাষাসহ। গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

"দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি,তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূররক্ষাকরিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সুক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপূণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রথম উলে-খযোগ্য শিশুসাহিত্যের যে গদ্যভাষা আমরা পেলাম তার ক্রিয়াপদগুলি শুধু সাধু। অন্য সমস্ত দিকে তা গল্প বলার মৌখিক ভাষা। একটুখানি নমুনা দেওয়া হল —

"রণে ঝরনার পারে একশ বচ্ছুরে খুনখুনে এক একরত্তি বুড়ি।

কে বাহা আঁটকুড়ে কাঠুরিয়া ?

রূপকথার গল্প কথায় কথায় শে-াক, মুখে গল্প বলার সেই রীতিটিও একেবারে অবিকল ধরে রাখা হয়েছে। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র বিখ্যাত গল্প 'লালকমল-নীলকমল' থেকে সামান্য একটু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে —

'অজিতের ঘুম ভাঙিল
রাত যেন নিশে
মন যেন বিষে
দাদা কাছে নাই কেন ?

অজিত ধড়পড় করিয়া উঠিয়া দেখে, ঘর ছমছম করিতেছে, রানীর হাতে বালা কাঁকন ঝমঝম করিতেছে - দাদাকে রাক্ষসে খাইয়াছে। গায়ের রোমে কাঁটা, চোখের পলক ভাঁটা, অজিত ছুটিয়া গিয়া রাক্ষসের মাথায় এক চড় মারিল।

শিশু সাহিত্যের এক অন্যতম শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তিনি রূপকথার গল্প শোনান নি এমন নয়, তাঁর 'গল্পমালা'তে অন্যান্য ধরণের গল্পের সঙ্গে রূপকথাও আছে। কিন্তু তার সঙ্গে আরো এমন অনেক কিছু তিনি লিখেছেন যাতে ছোটদের চাহিদা অনেকখানিই পূর্ণ হয়ে উঠেছে। ছোটদের জন্য তিনি মহাভারত লিখেছেন, পৃথকভাবে 'মহাভারতের কথা' লিখেছেন। 'ছোট্ট রামায়ণ' লিখেছেন, 'ছেলেদের রামায়ণ' লিখেছেন এবং লিখেছেন আরো অনেক কিছুই। কিন্তু 'গল্পমাল' আর 'টুনটুনির বই' - এর জন্য তিনি আরো বহুরকম আমাদের বিস্ময়ের পাত্র হয়ে থাকবেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গল্প তাঁর আশ্চর্য কল্পনায় যে বিচিত্র এক রমণীর জগৎ তৈরী করেছিল, সেকথা যেমন সত্য , ঠিক তেমনি সত্য, ভাষাকে তিনি তাঁর এই কাল্পনিক জগতের সম্পূর্ণ উপযোগী করে গড়ে তুলতে পেরেছেন। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'গুপিগাইন ও বাঘা বাইন' থেকে সামান্য একটু অংশ আলোচনা করলেই এ কথা বোঝা যাবে —

"যখন সে ঘরে বসে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গাইত, তখন মাঠের যত গরু সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত।"

ছোটো ছোটো বাক্য, নদীর স্রোতের মত গতি, প্রায় সবটাই মুখের ভাষা — তৎসম শব্দ খুব কম, আর মাঝে মাঝে 'কিনা' যোগ করে একটা নিজস্বতা ফোটানো, খুব দরকার হলে প্রচলিত ছড়া - এই হল উপেন্দ্রকিশোরের ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য। যথা - 'গুপি কিনা একটা গান গাইতে পারতো'।

'টুনটুনির বই' উপেন্দ্রকিশোরের শ্রেষ্ঠ রচনা, অন্তত ভাষার দিক থেকে, কারণ

গল্পের কিছু প্রচলিত সংগ্রহ, কিছু তার নিজের বানানো। ভাষার একটু নমুনা দেওয়া হল ঃ
“টুনটুনি গিয়েছিল বেগুন পাতায় বসে নাচতে। নাচতে নাচতে খেল বেগুন কাঁটার খোঁচা। তাই থেকে তার হল মস্ত বড় ফোড়া।” কী অসাধারণ এই গদ্যভঙ্গি।

শিশুসাহিত্যের পরবর্তী শিল্পী প্রসঙ্গে অবশ্যই আসবে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নাম। হাসিখুশির কবি হিসাবে যিনি এখনও পর্যন্ত অবিস্মরণীয় খ্যাতির অধিকারী হয়ে আছেন। ‘হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পাড়াময়’ কিংবা ‘দাদখানি চাল মুসুরির ডাল’ পড়ে নি এমন মানুষ আজকের দিনে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ হবে না। শিশুসাহিত্যের জগতে যোগীন্দ্রনাথকে যে এক মুকুটহীন সম্রাট উপাধি দেওয়া যায়, একথা সেকালের হেমেন্দ্রকুমার রায় থেকে একালের লীলা মজুমদার পর্যন্ত প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন।

শিশুসাহিত্যের গদ্যে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়। তিনি যেমন ছিলেন অসাধারণ চিত্রশিল্পী, ঠিক সেই একইরকম বাণীশিল্পী — রচনা কর্মকে তিনি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। শিশুদের রূপকথা রচনা করেছেন, ‘বুড়ো আংলা’র মতো কল্পবিজ্ঞান রচনা করেছেন, ‘বাদশাহী’ গল্পের মতো উদ্ভট সব গল্প লিখেছেন। লিখেছেন ‘রাজকাহিনী’র মতো কিশোরপাঠ্য রচনা। তাঁর ভাষায় কখনো কথকতার ঢং, কখনো ঋদ্ধ ঋজুভাষা — শিল্পীর হাতে দুইটি সমান। কিছু উদাহরণ দেওয়া হল —
“ বাণীর ঝগড়ার রকম সকম দেখে নাতি - নাতনীরা হেসে বাঁচে না, ঠিক সেই সময় রাজার বিদূষক এসে উপস্থিত - গোলগাল নউর যেন গণেশ ঠাকুরটি। গল্প গেল তল, বিদূষকের চেহারা দেখেই হাসির রোল উঠল।”

বাংলা গদ্য যে অবনীন্দ্রনাথের শিশু ও কিশোর সাহিত্যে ছবি হয়ে ফুটেছে। এর দৃষ্টান্ত দিতে গেলে তাঁর সমগ্র রচনাই এখানে উপস্থিত করতে হয়। ‘বুড়ো আংলা’ থেকে সামান্য একটু অংশ উদ্ধার করা গেল ঃ
“ এই বুড়ো আঙুল যতটুকু, গণেশটি ঠিক ততটুকু ! পেটটি বিলিতি বেগুনের মতো রাঙা টিকটিকে, মাথাটি শলা, শুঁড়টি ছোটো একটি কেঁচোর মতো পেটের উপর গুটিয়ে রয়েছে।”

অবনীন্দ্রনাথ যেখানে শেষ করেছেন, সুকুমার রায় সেখান থেকেই শুরু করেছেন বলা যায়। সমস্যা হল এই যে, ‘খাই খাই’ এবং ‘আবোল তাবোল’ এর সুবাদে সুকুমার রায় কবি হিসেবেই এমন চিহ্নিত হয়ে গিয়েছেন যে,তিনি এর চতুর্গুন গদ্য রচনা করলেও আমরা কবিরূপেই তাঁর মূল্যায়ণ করতে চাই।

শিশুসাহিত্যিক হিসাবে অতঃপর নাম করতে হবে সুনির্মল বসুর। শুধু ছোটোদের জন্যই লিখেছেন সারাজীবন এবং বড়োদের জন্য কিছু লেখার ব্যাপারে প্রবুদ্ধ হননি। এই চরম যে স্বর্ণযুগটির কথা আমরা আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করেছি। সেই যুগের শেষ উলে-খযোগ্য শিল্পী বোধহয় সুনির্মল বসু। একথার অর্থ এই নয় যে সেই সময়ে বা তার পরে শুধু ছোটোদের লেখা তেমন কেউ লেখেননি - কারণ আমরা জানি সেরকম লেখক আজও আছেন এবং তাদের নিয়ে আমরা গর্বও করতে পারি।

হাসির গল্পেই সুনির্মল বসুর বিশেষ সিদ্ধি, তাই চরিত্রের নামকরণে তিনি একটু

হাস্যোদ্রেকের সুযোগ দিতেন। যে ব্যাপারে পরশুরামের কথা আমদের মনে পড়বেই। সুনির্মল বসুর চরিত্রগুলির নাম সাধারণত এইরকম হয় ‘ডিন্ডিম’ কাগজের সম্পাদক বঙ্গেশ্বরবাবু, বিশ্বম্ভর বটব্যাল, ভন্ডুলরাম ঝুনঝুনওয়ালা প্রভৃতি।

সুনির্মল বসুর ‘অসম্ভব দুনিয়া’ উপন্যাসে এমন অনেক জোড়কলম শব্দ তৈরী করেছেন যা পড়লে সুকুমার রায়ের ‘হাঁস ছিল সজারু ও ব্যাকরণ মানি না’ নামক বিখ্যাত কবিতাটি আমদের মনে পড়বেই। এই কবিতার ‘হাঁসজারু’, ‘বকচ্ছপ’ প্রভৃতির মতো আমরা এখানে পাই ব্যাধি এবং দূর মিলিয়ে ‘ব্যাদ্দুর’, ‘মালাই আর পুডিং’ একসঙ্গে জুড়ে ‘মালাইডিং’ - এইরকম আরো অনেক কিছু।

আলোচনার উপান্তে এসে আমরা এমন একজন সাহিত্যিকের নাম করবো যিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার - অবশ্যই বড়োদের এবং সেইসঙ্গে একজন জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক। তিনি রূপকথা, হাসির গল্প, গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন এবং লিখেছেন কল্পবিজ্ঞানের গল্প। এই লেখকের নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুই গোয়েন্দা বড়োদের পরাশর বর্মা এবং ছোটোদের মামাবাবুও একসময় জনপ্রিয় হয়েছিলেন।

কবিমানুষ হওয়ার জন্যই বিভিন্ন ধরণের উপমা প্রয়োগে প্রেমেন্দ্র মিত্র একসঙ্গে উদ্ভাবনী প্রতিভা এবং রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। শিশুসাহিত্য ও তার গদ্যরীতি আরো বিশদভাবে বিশে-ষণ করা যেত এবং আরো পান্ডিত্যের ভারে প্রপীড়িত করে - অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগ, কাব্যের অন্বয়, চলিত ও সাধু রীতির প্রথাগত লক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে এবং কিছু রেখাচিত্র ব্যবহারের দ্বারা তাকে আরো সারবান করে তুলি। কিন্তু বিষয়টা শিশুসাহিত্য বলেই সেই ভারবৃদ্ধির যন্ত্রণা থেকে নিজেকে বিরত রাখা সমীচীন বিবেচনা করেছি।

অববাহিকা পরিকল্পনা ও বর্তমান পরিবেশ

শান্তনু বেরা

হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

সম্পদ উন্নয়ণের পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা আদর্শ ও কার্যকরী একক হল নদী বেসিন। এমনকি ভৌমজল ও ভূ পৃষ্ঠের জলের সমন্বয়মূলক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও একটি বেসিনকে ভিত্তি করে করা সুবিধাজনক। তবে কিছু ক্ষেত্রে ভৌমজল বেসিনের সীমানা লঙ্ঘন করতে পারে।

বৃষ্টিপাতের সঙ্গে পৃষ্ঠপ্রবাহের সম্পর্ক বেসিনের চরিত্রের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে এবং একটি বেসিনের জলবিস্তারের মধ্যে সেই অঞ্চল সম্পর্কে জানা যেতে পারে। সাথে সাথে সুসংবদ্ধভাবে পরিকল্পনা করা যেতে পারে, যার দ্বারা প্রাকৃতিক মানবীয় ভূগোলকের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা সম্ভব।

আঞ্চলিক পাঠের ক্ষেত্রে নদী বেসিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক বিভাজন। একটি বেসিনকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক আঞ্চলিক এককে প্রশাসনিক পরিকাটামো গঠন করা সম্ভব যার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ধরণের পরিকল্পনা এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে।

আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও মনুষ্য কার্যাবলী সংগঠনের Areal একক হিসাবে বেসিন অঞ্চল বর্তমানে গৃহীত হচ্ছে। কারণ এখানে মৃত্তিকা এবং উদ্ভিদের আন্তঃসম্পর্ক এবং Hydrological Balance নিহিত আছে। শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী সমস্যাগুলির অভিজ্ঞতা যেমন - বন্যা, পলিসঞ্চয়, ভূমিক্ষয়, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, নৌ যোগাযোগ, পরিবেশ সংরক্ষণ, নদীদূষণ ইত্যাদির ফলে সমন্বয়মূলক পরিকল্পনা ও নীতিগ্রহণে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি বেসিনকে একক হিসাবে দেখার প্রবণতা বাড়িয়েছে।

সাধারণত জলবিভাজিকা এবং Surface ও Sub-surface drainage মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সাগর বা হ্রদে পতিত হবার বিষয় Hydrological Study Logical Areal Unit গঠন করে যা এককথায় বেসিন দ্বারা বোঝানো হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষ জলসম্পদকে আরো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে।

জলবিভাজিকা ও নদী বেসিন ঃ -

বৃষ্টিপাত ও বরফগলার সাথে সাথে জলরাশি প্রথমে ভূমিভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং নদী, হ্রদ বা কৃত্রিম হ্রদে পতিত হয়। যে ভূমিভাগ ভূপৃষ্ঠে প্রবাহ সহায়তা করে তাকে Watershed বলে। এই ভূমিভাগের আয়তন কয়েক একর থেকে কয়েক বর্গমাইল হওয়া সম্ভব। একটি বড় Watershed অনেকগুলি ছোট Watershed নিয়ে গঠিত হতে পারে।

Basin হল নদী, তার শাখানদীর খাতগুলির সন্নিহিত অঞ্চল। Watershed ও Basin এর পার্থক্য হল Basin এর Surface run off এবং ground water discharge দুটিকেই বিবেচনা করা হয়। ভূ-পৃষ্ঠ প্রবাহ Watershed

থেকে নদী বা শাখানদীতে পতিত হয়। যে ভূমিভাগ দুটি Watershed কে পৃথক করে তাকে বলে divide, এটা সাধারণত কোন শৈলশিরা বা পর্বতের দ্বারা হয়ে থাকে।

ভূ-তাত্ত্বিক বিশে-ষণ ঃ -

বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে দেখা যাবে, মৃত্তিকা ও শিলা প্রভৃতি storage system-কে নির্ধারণ করে সেখানে বৃষ্টিপাত ও বরফগলা জল পতিত হয়। কত পরিমাণ জল বাষ্পীভূত হবে বা transpiration হবে তা ঐ অঞ্চলে topography ও geology দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। Geological factors গুলিকে দুভাবে ভাগ করে বিচার করা যায় - Lithology ও structure । মৃত্তিকা ও প্রস্তরের বিভিন্নরকম ক্ষয় প্রতিরোধের ফলে পার্থক্যমূলক drainage system গড়ে ওঠে।

ভূমিরূপ তত্ত্ববিদ্যা ও নদী বেসিন ঃ -

R.E.Horton, Strahler, Langbin ও অন্যান্যদের প্রদত্ত ধারণায় বেসিনের মাধ্যমে সংখ্যার দ্বারা কোনো বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়। Basin এর geometry-কে সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় দৈর্ঘ্য, সময় ও ভরের প্রাথমিক মাত্রিকতার দ্বারা।

কোন বেসিনের topography, hydrulic ও hydrological একত্রীকরণ R.E.Horton এর morphometric system-এর ভিত্তি এবং যা বর্তমানে মৌলিক ভূ-দৃশ্যের উপকরণ হিসাবে পরিগণিত হয়, কারণ -

(i) এটি সীমাবদ্ধ, সুবিধাজনক , সুষ্ঠু topographical একক এবং যা নদীক্রমের সামঞ্জস্যপূর্ণ স্তরবিন্যাসে (hierarchy)-র মাধমে পাওয়া যায়।

(ii) বৃষ্টিপাত ও সৌরবিকিরণ input ও discharge, বাষ্পীভবন ও পুনর্বিকিরণের output-এর পরিপ্রেক্ষিতে physical system গঠন করে।

বেসিনের রৈখিক প্রকৃতি ঃ -

বেসিনের চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ ভূ-পৃষ্ঠ প্রবাহের দৈর্ঘ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। নদীর দৈর্ঘ্যের রৈখিক মাত্রিকতা কখনও কখনও নদীক্রমের ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন morphometric ও hydraulogic features এর Linear measure এর একত্রিত হওয়ায় নদীক্রমের স্তরক্রম গুরুত্ব পেয়েছে। সর্ববৃহৎ পদ্ধতিটি Strahler প্রদত্ত। এক্ষেত্রে finger tip channel 1st order stream নামে পরিচিত। দুটি 1st order stream মিলিত হলে 2nd order stream গঠিত হয়। দুটি 2nd order stream মিলে 3rd order সৃষ্টি করে। stream ordering-এর ব্যবহারিক উপযোগিতা হল এই যে, এই প্রকল্পের মধ্যে Watershed এর আকৃতি, নদীর মাতৃকতা, stream flow সবই stream order-এর সাথে আনুপাতিকভাবে সম্পর্কিত।

Areal Measurement : -

কোনো নদী অববাহিকা থেকে নির্গমনের পরিমাণ হল ঐ অববাহিকার স্থানিক বিস্তারের ফল। অর্থাৎ কোন Basin-এর স্থানিক বিস্তার কত তার উপরই ঐ Basin-এর মোট নির্গমনের পরিমাণ নির্ভর করে। এছাড়া অববাহিকার স্থানিক পরিমাণের মধ্যে

অনেকসময় drainage network এর আকার ও ঘনত্ব, drainage density ও stream frequency-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

Basin Gradient : -

বেসিন ও channel গুলির ঢাল ঐ অঞ্চলের Surface run off প্রক্রিয়ার ওপর লক্ষ্যণীয় প্রভাব বিস্তার করে।

Area - Elevation Relation: -

কোনো একটি Basin এর উচ্চতা এবং এলাকার মধ্যে সামঞ্জস্যের উপর ঐ অববাহিকার জলের প্রবাহ ও সঞ্চয় নির্ভর করে।

Drainage basin Dynamic :-

Geomorphology ও hydrology তে নির্ভরযোগ্য সংখ্যাভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। যে তথ্যগুলি বিভিন্ন veriable গুলির মধ্যে rational সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্কগুলি সাধারণত ভূমিরূপ ও সেই সমস্ত উপাদানগুলিকে যেগুলি ভূমিরূপকে রূপান্তরিত করে, তাদের আন্তঃক্রিয়াকে সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করতে চায়। পরবর্তীকালে geomorphic ধর্মগুলির সাথে hydrologic, climatic, vegetative উপাদান সম্পর্কিত সমীকরণ খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে অনেক সম্পর্কই কেবলমাত্র hydrologistদের কাছে অর্থবহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

নদী বেসিন পরিকল্পনা ও সংরক্ষণ ঃ -

মোটামুটিভাবে 4000 B.C.থেকে নদী অববাহিকাকে কেন্দ্র করে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। উদাঃ স্বরূপ নীল, টাইগ্রিস,ইউফ্রেটিস,সিন্ধু, হোয়াংহোর সাথে সাথে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর নাম করা যায়। নদী বা হ্রদের জলকে কৃষিকার্যে ব্যবহার করাই সম্ভবত জলের প্রাচীন পরিকল্পিত ব্যবহারের উদাহরণ সেগুলির মাধ্যমে সেচপ্রাপ্ত অববাহিকায় সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত জল পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করা গেছে। পূর্বে যেমন মরু বা মরুপ্রায় অঞ্চলে না হলেও আর্দ্র অঞ্চলগুলিতে নৌ চলাচলের প্রচলন ছিল তেমনি বর্তমানেও তাপবিদ্যুৎ তৈরীও করা হচ্ছে।

অতি সম্প্রতি বহুমুখী জলসম্পদ উন্নয়ণের সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা উপলব্ধি করা গেছে যা সমসাময়িক উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে বাস্তবায়িত করা সম্ভব। এইসব উন্নয়ণের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বেসিন একটি নির্ভরযোগ্য একক হিসাবে পরিগণিত হয়েছে যে এককটি বহুমুখী প্রকল্পগুলির সাথে একত্রিত।

কোনো একটি অঞ্চল বা দেশে জলসম্পদ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভৌগোলিক সত্ত্বা যেগুলি আন্তঃক্রিয়া system রূপে দেখা হয়, যেমন বিভিন্ন নীতিসংক্রান্ত সমস্যা, উন্নয়ণের সম্ভাবনা, জলের ব্যবহার, ভূমিসম্পদ, জলের গুণগত মান ইত্যাদির সমন্বয় action plan এর মধ্যে সঠিকভাবে হওয়া দরকার। এরকম ক্ষেত্রে নির্বাচিত এককটি অবশ্যই hydrologic একক হতে হয় এবং সেটি বেসিন হওয়াই সুবিধাজনক। কারণ এখানে নদী ও তার শাখানদীগুলি জলচক্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভৌমজল ও ভূ-পৃষ্ঠের জলের মধ্যের সম্পর্ক বেসিন অনুযায়ী প্রভাবিত হয়। যেসব কারণগুলির জন্যই

উন্নত দেশগুলির পরিকল্পনার একক হয়েছে বেসিন। এমনকি উন্নয়ণশীল দেশগুলিও অবশেষে এই এককই ব্যবহার হচ্ছে।

১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে The national water policyতে এই নীতিনামা হয় যে, জল হল একটি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এটি বেসিন বা উপবেসিনের মধ্যে নিজেদের চক্রায়িত করে। নদী বেসিন কমিশন উক্ত নীতির ভিত্তিতে এবং একককে action plan শুরু করে যা National Water Resource Council -এর নেতৃত্বাধীন।

নদী বেসিন কোন দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ণের পরিকাঠামোর উপর প্রাচীনকাল থেকেই প্রভাব বিস্তার করে আসছে। নদীই মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল যার ফলে সংস্কৃতি ও অর্থনীতির সমন্বয় ঘটেছে। আধুনিককালে মনে করা হয়, পরিবেশের সঙ্গে আর্থ সামাজিক উন্নয়ণের Multilateral সম্পর্ক জলের সাথে মিলে মিশে গেছে।

জলকে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ (অপরিসীম) বলে দেখলে হবে না, এই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ধারা ব্যাপক ও জটিল। জলের পার্থিব কিছু ঘটনা যেমন ঋতুভেদে জলের সঞ্চয়। জলের পুনর্ব্যবহার, স্থান ও সময়ের সাপেক্ষে প্রবাহ ধরণের পরিবর্তন, জলের Material গুণাগুণের রূপান্তর ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তথ্যসূত্র ঃ —

* বহমান প্রাণী — কাজী আবদুল রউফ
* নদী অববাহিকা — বিজ্ঞানী মরিশার
* উদক বিদ্যা — সুজিত কর
* উদক বিদ্যা — আদোক ও আদোক
* আন্তর্জাতিক পত্রিকাসমূহ

ঐতিহাসিক বেলে

গোপাল দে

বাঙালী মানেই মেছো বাঙালী। ভাতের সাথে মাছ ভাজা, বাঙালী আস্বাদে পাগল। বাঙালীর পাগলিয়ানায় ইলিশ মাছের সাথে সাথে একাধিক মাছের স্বাদ,গন্ধ,রূপ ইতিহাসের বাস্তবতার স্থান পেয়েছে। বাংলায় একাধিক মাছ আজ লুপ্ত বা দেখা গেলেও বাজারের দামের দীর্ঘরূপের কারণে বাঙালীর পাতে পড়ে না। বাঙালীর সাথে বেলে মাছের একটা সম্পর্ক রয়েছে। বেলে মাছের একাধিক নাম রয়েছে। মেদিনীপুর জেলায় বালকুড়া, অসমে বালিগড়া, পূর্ব বাংলায় বালিয়া বা বইল্যা কিংবা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ -এ বালকড়া নামে পরিচিত।

তবে স্থান বিশেষে এদের চেহারাটি বদলে যেতে থাকে। নদীর বেলের মধ্যে প্রধান হল 'জাতবেলে'। এদের নলের মতো শরীরটা ইঞ্চি দশেক। রং বালির মত হলদেটে, যার কোথাও কোথাও ধূসর ছোপ লেগে থাকে। তাই জলের নীচের বালির সঙ্গে এদের গায়ের রং মিশে যায়। প্রয়োজনে এরা তাকে হালকা বা গাঢ় করে নিতে পারে। এদের চোখ বড়,বোতামপানা ও চকচকে। এরা স্বভাবে শান্ত। এদেরই আরেকটি প্রজাতি হল 'কালো বা ভুতো বেলে।' এরা অত লম্বা নয়, আর চেহারায় ল্যাটামাছের আদল আছে। রং কালচে লাল বা কুচকুচে কালো। চোখ ছোট এবং ঘোলাটে ধূসর। এদের স্বভাব কুড়োমিতে পূর্ণ। এরা কুচো মাছ বা শামুক শিকারে খুব পটু। ভাগিরথী নদীতে শীতকালে লাল বেলে পাওয়া যায়। বছর পনেরো আগে কুমিলা ও নোয়াখালির মেঘনা নদীতে ঘষা কাঁচের মতো সাদা,সরু ও মাঝারি মাপের একটি অতি সুস্বাদু বেলেমাছ ধরা দিত - যার নাম ছিল 'তুলা - ডান্ডি'। এই মাছটির ঝুরিভাজা নাকি অকল্পনীয়। দুই বাংলার দক্ষিণ দিকের মোহনা অঞ্চলে একধরণের কমলা হলুদ বেলেমাছ ধরা দিত — যার নাম ছিল 'তুলা ডান্ডি'।

দুই বাংলার দক্ষিণ দিকের মোহনা অঞ্চলে একধরণের কমলা হলুদ বেলে মাছ পাওয়া যায়, যাদের গায়ে বাঘের মতো কালচে ডোরা টানা থাকে। খাঁড়ির নোনা জলের প্রভাবে সুন্দরবনের বাঘ যেমন হিংস্র, বাঘা বেলেরাও ঠিক তাই। খিদে পেলে নিজের বাচ্চাদেরও রেয়াত করে না। তবে যে কোনও নদী বেলের মতো এদেরও ঝাল ও রসা করলে খুবই ভাল জমে। সমুদ্রে পাতা জালে যে বেলেরা ধরা পড়ে, তাদের বালিরঙা শরীরটি প্রায় ফুটখানেক লম্বা আর গড়ন মাকুর মতো। এদের মোটামুটি তিনটি প্রজাতি। ছুঁচিয়া বেলের মুখ ছুঁচলো। ছ্যাঁচা বেলের মাথা ও পেটের দিক এমন চ্যাপ্টা যেন ওদের কেউ পিটিয়ে বা ছেঁচে দিয়েছে। আর গ্যাং বেলেরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর সরল গড়নের। সামুদ্রিক বেলের একটা আঁশটে গন্ধ থাকে। যা অন্যদের গায়ে থাকে না। এজন্য তাদের রান্নার আগে কিছুক্ষণ রসুন জলে ডুবিয়ে রেখে তারপর কালিয়া কষা করতে হয়।

বেলেদের মধ্যে যে প্রজাতি ফ্যাকাসে,সাদা,কাদাজলে খুব লাফালাফি করে, তাদের বলে লাফানি বেলে। একই রঙের ইঞ্চি তিনেক লম্বা ঘাট বেলেরা পুকুরঘাটে বাসনমাজার সময় ভাতের কণা খেতে ভিড় করে। বর্ষার সময় আগাগোড়া কালোরংয়ের ইঞ্চি

দুয়েকের 'ভুটিবেলে'রা খালে বিলে সাঁতরে বেড়ায় এবং আরও ছোট প্রায় ধানের মতো 'গুড়ি বেলে'রা ঝাঁক বেঁধে নয়ানজুলির জলে খেলা করে।

আজ থেকে বছর কুড়ি আগে শান্তিনিকেতনের শ্যামবাটি ক্যানেলে হাত ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে বসে এক আশ্চর্য বেলেমাছের সন্ধান পেয়েছিলাম। যার স্থানীয় নাম 'ভ্যাদভেদিয়া'। বেলেমাছের গা এমনিতেই নরম, কিন্তু এটা যেন মুখে দিলেই গলে যাচ্ছিল। না, না, নিজের ছিপে ধরা মাছ কিন্তু মোটেই খাইনি সেদিন। ওদের ছেড়ে দিয়েছিলাম ওই ক্যানেলেই। যার ডাইনিং-এ বসে ওই মাছের রসা খেয়েছিলাম, তিনি বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর স্বপনকুমার ঘোষ যার বেলেমাছের শরীরের চেয়েও নরম ও পরোপকারী মনটা নিয়ে ছড়া বেঁধেছিলেন খোদ শঙ্খ ঘোষ।

'উদীচি' হল তাঁর প্রাণের পত্রিকা। সেবার শান্তিনিকেতনে এসেই স্বপনদার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। হাতের লম্বাটে কাগজের স্লিপে সারাদিন আসা টেলিফোন নম্বরগুলোর ওপর একঝলক চোখ বুলিয়ে বলেছিলেন, আগামীকাল সকালে আমরা একসঙ্গে ভাত খাব তাড়াতাড়ি চলে এসো কিন্তু। কথামতো পরদিন ওদের বাগানপাড়ার বাড়িতে গিয়ে দেখি উনি ওর মোহরদির বাড়িতে ছুটছেন কী একটা জরুরী চিঠি হাতে। বললেন, 'তুমি বসবে, না যাবে আমার সঙ্গে ? আমি তো হাতে স্বর্গ পেলাম, স্বপনদা ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এ কিন্তু কবিতা লেখে।

ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়ি পরা রবীন্দ্রনাথের মোহর আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'ওমা তা-আ-ই ! আমি প্রায় মাটিতে মিশে গিয়ে ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলাম। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন আমাদের লেবুপাতা ভাসানো চিনির সরবত দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন দুটি ম্যাচা সন্দেশ আর কারিপাতা ছড়ানো চমৎকার নোনতা সুজি। কিন্তু গান শোনাননি একটাও। বাড়ি ফিরে খেতে বসে জেনেছিলাম শ্যামবাটির মোড়ে বসা এক স্থানীয় বিক্রেতার কাছ থেকে ক্যানেলের ওই টাটকা বেলেমাছ সকাল সকাল কিনে এনেছিলেন স্বপনদার মেজবোন, শুক্লাদি। তাতে সরষে বাটা, টমেটো আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে অপূর্ব রসা করেছিলেন স্বপনদার গিন্নি, মানে ভারতী বউদি। এইভাবে বেলের ইতিহাস - তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রাণোজ্জ্বল।

গ্রন্থসূত্র ঃ -

১। 'রোববার' সাপ্তাহিক পত্রিকা

২। 'উদীচি' পত্রিকা

৩। শঙ্খ ঘোষ - কবিতা সমগ্র

উত্তরপূর্ব ভারতের বৃহত্তম শিবলিঙ্গ নদীয়ার শিবনিবাম ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও এক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক মিলনকেন্দ্র

গোপাল মন্ডল

হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

ইতিহাস ধর্ম সংস্কৃতির এমন মেলবন্ধন খুব কম জেলাকে ঘিরেই রয়েছে। শুধু ক্লাইভ বনাম সিরাজদৌলা-র লড়াইয়েরর পলাশীর প্রান্তরের জন্যই নয়, বহু সাংস্কৃত নদীয়া জেলার ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। নদীয়া জেলার সাংস্কৃত বহনকারী গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান শিবনিবাস কেন, শিবনিবাসকে বেছে নিলাম কারণ শিবনিবাস অষ্টাদশ শতকের ইতিহাস স্মৃতি জড়িত স্থান এবং এখানে প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বর মন্দিরের সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন শিবলিঙ্গ। নদীয়ার এই শিবনিবাসেই এশিয়ার বৃহত্তম শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন অষ্টাদশ শতকে শিবনিবাস ইন্দ্রপুরী তুল্য।১ এখানে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি এশিয়ার বৃহত্তম কিনা এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরগুলি আজও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭২৮-৮২ খ্রীঃ) স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিবনিবাস স্থানটি নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত। আগে যে ষ্টেশনটির নাম ছিল শিবনিবাস, বর্তমানে তা মাজদিয়া নামে পরিচিত। চূর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত জায়গাটির নাম শিবনিবাস রাখেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। শিবনিবাস জায়গাটির নামকরণ নিয়ে দুটি বিশেষ মত আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রের নামেই এই শিবনিবাস স্থাপন করেন এরূপ একটি মত। এখানেই শেষ নয় কথিত আছে, সেই আমলে লক্ষ টাকা ব্যয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র বাঁদরের বিয়ে দেন এই শিবনিবাসেই।২ আবার অনেকে মনে করেন যে মহারাজা শিবমন্দির স্থাপন করে শিবের নামে নাম রাখেন শিবনিবাস।৩

শিবনিবাসে রাজার বসতি স্থাপন এক কৃষ্ণনগর থেকে শিবনিবাসে রাজধানী স্থাপনের বিষয়ে নানা কথা প্রচলিত থাকলেও তিনটি জনশ্রুতি খুবই প্রচলিত। রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় লেখেন যে মহারাজা একবার মৃগয়া করতে এসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এখানে রাজধানী স্থাপনের আদেশ করেন। রাজপ্রাসাদের নাম রাখেন শিবনিবাস।৪ সহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে বর্গী হামলা বৃদ্ধি পায়। তিনি এই বর্গী হামলার ভয়ে রাজধানী কৃষ্ণনগর থেকে চূর্ণী নদী তীরে শিবনিবাস নিয়ে আসেন। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় লেখেন যে, বর্গীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র এ জায়গাটা কৃষ্ণনগর অপেক্ষা নিরাপদ মনে করে এখানে রাজপ্রাসাদ ও শিবমন্দির নির্মাণ করেন।৫

অপর একটি মত প্রচলিত আছে যে, নসরত খাঁ নামে কুখ্যাত ডাকাত এখানে বসবাস করে তাকে দমন করার জন্য এখানে একটি শিবির সন্নিবেশ করেন। একদিন সকালে নদীতে স্থান করার সময় নাকি একটি রুই মাছ কৃষ্ণচন্দ্রের সামনে এলো তাঁর একজ্ঞাতি আনুলিয়া নিবাসী কৃপারাম রায় বলেন যে এই জায়গাটি মহারাজার বাসযোগ্য কারণ রাজভোগ্য দ্রব্য আপনা থেকেই হাজির হয়েছে। মহারাজা বর্গীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার করার

জন্য এই স্থান নিরাপদ মনে করলেন এবং দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের পরামর্শক্রমে এখানে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে নাম রাখলেন শিবনিবাস।৬

শিবনিবাস সম্পর্কে ভারতচন্দ্র রায় লিখিত অন্নদামঙ্গল কাব্যে আছে ঃ

কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান
কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সমান ॥
বিগ্রহ ব্রাহ্মণ্যদেব মূর্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া ॥৭

প্রাচীন মত অনুযায়ী এখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১০৮টি মন্দির তৈরী করেছিলেন। তবে মাত্র তিনটি মন্দিরই অষ্টাদশ শতকের ঐতিহ্যকে বহন করেছিলেন। দুটি বুড়ো শিবের মন্দির প্রথমটি রাজরাজেশ্বর আর দ্বিতীয়টি রাজ্ঞীশ্বর শিবমন্দির। এই শিবমন্দির তৈরীর পেছনেও নাকি স্বপ্নাদেশ কাজ করেছে। গোটা উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ শিবলিঙ্গটি এখানে অবস্থিত। উচ্চতায় ৭ফুট, স্পাউট সমেত বেড় ২১ ফুট ১০ ইঞ্চি। সারা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম শিবলিঙ্গগুলির অন্যতম এটি। অপরটি সাড়ে ৭ফুট উচ্চতার।৮

তৃতীয় মন্দিরটি রামসীতার মন্দির নামে বেশী প্রচলিত। এই মন্দিরের মধ্যে কাঠের সিংহাসনে উপবিষ্ট রামচন্দ্রের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সীতাদেবী। তাছাড়া এই মন্দিরের মধ্যে ৪ফুট উচ্চতার একটি শিবলিঙ্গ, কালী,গণেশ, হনুমান ও বারান্দার উত্তরদিকে একটি কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তিও (এই মূর্তিটি নাকি চূর্ণী নদীতে পাওয়া গিয়েছিল) আছে। মূল মন্দির থেকে একটু দক্ষিণমুখী জীর্ণ চারচালা মন্দিরে কালো পাথরের গর্দভাসীনা শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানে শীতলাদেবীর অবস্থান। দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকের তিনটি প্রবেশদ্বারের খিলান গথিক স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও মন্দিরটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বলেই মনে হয়। পাথরের অপরূপ শীতলা মূর্তিটি পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।৯

এখনো পর্যালোচনা করলে এই মন্দিরত্রয়ের ভিত্তিগাত্রে নিম্নলিখিত শে-াক দেখা যায় —

প্রথম শিবমন্দিরে (১৬৭৬ শক বা ১৭৫৪ খ্রীঃ স্থাপিত, লিঙ্গমূর্তি ৯ ফুট উচ্চ)

যো জাত ঃ খলু ভারতে সুরুত্তরুজৈ স্টাদিসী শাংশকে
সেনানী মুখ বাজিরাজ বিলসৎ সংখ্যাবতী দম্পুরে।
কৃত্বা মন্দিরসিন্দুচুম্বিশিখরং ভূপাল চূড়ামণিঃ
পোত্র শ্রীযুতে কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতিঃ শম্ভুং সমস্থাপয়ৎ ॥

দ্বিতীয় শিবমন্দিরে (১৭৬২ খ্রীঃ স্থাপিত, লিঙ্গ মূর্তি ৭ফুট উচ্চ)
যঃ সাক্ষাৎকৃতশৈব মূর্তি বসুধে শাংসকে সম্ভাবাৎ সংখ্যাতঃ
ক্ষিতিদেব রাজপদভাক্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভুঃ

তস্য ক্ষৌনিপতে দ্বিতীয় মহিষী মূর্তের লক্ষীস্বয়ম
প্রাসাদ প্রবরে প্রাসাদ সম্মুখং শম্ভং সমস্থাপয়ৎ।

শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খ্রীঃ স্থাপিত, লিঙ্গ মূর্তি ৪ ফুট উচ্চ)

দেব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ক্ষিতিপতি তিলকো ব্রহ্ম রাজর্ষিবংশে
যোহসৌ ভূকল্পশাখী শ্রুতি বসুবসুধে শাংশকে তুল্য সংখ্যে।
প্রয়স্যাস্তন্মহিষ্যাঃ পরমকৃতিকৃতে জানকি লক্ষণাভ্যাং
প্রাসাদে প্রাদুরাসীৎ ত্রিজগদাধিপতে শ্রীযুত রামচন্দ্রঃ।১০

শিবনিবাসের মন্দির স্থাপত্যের গঠন বৈশিষ্ট্য মন্দিরের ভিতরের ভাস্কর্যশৈলীর সুক্ষ্মতা অলঙ্করণের প্রবণতায় মুসলমানী রীতি স্পষ্ট। রাজরাজেশ্বর বা বুড়ো শিবের মন্দিরটি আটকোন প্রস্থচ্ছেদের এ মন্দিরের শিখর ছত্রাকার। খাড়াদেওয়ালগুলির প্রত্যেক কোণে মিনারের মত সরু আটটি থাম আছে। তিনটি প্রবেশদ্বারের নকল খিলানগুলি গথিক রীতি অনুযায়ী।

মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় আশি ফুট। পাশেই রাজ্ঞীশ্বর শিবমন্দির উঁচু ভিত্তির বেদীর উপর স্থাপিত বর্গাকার প্রস্থচ্ছেদের মন্দির। মন্দিরটি প্রায় ষাটফুট উঁচু। উত্তরদিক বাদে সবদিকে প্রবেশদ্বার। রামসীতার মন্দিরটি চারচালা,প্রতিটি পিঠ ত্রিভূজাকার না হয়ে অনেকটা ঘন্টার লম্বচ্ছেদের মত বিরল। মন্দিরের পাঁচটি প্রবেশখিলান ও গর্ভগৃহের তিনটি প্রবেশ খিলান গথিক রীতি অনুযায়ী। উনিশ শতকের জোড়ার দিকে রচিত কলকাতার লর্ড বিশপ হেবার সাহেবের ভ্রমণ বিবরণীতে শিবনিবাস মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কে জানা যায় Hebber's journal-এর প্রথম খন্ডে। শিবনিবাসের রামসীতার মন্দির হেবার সাহেবের ভাষায় 'a very handsome gothic Arch,with and arabesque barder' এবং বুড়ো মন্দির ' Octagonal house' বলে উলে-খিত হয়েছে।১১

এই শিবনিবাসেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহু পন্ডিতদের আমন্ত্রিত করে মহাসমারোহে 'অগ্নিহোত্র' ও 'বাজপেয়' যজ্ঞ করেছিলেন। শিবনিবাস সম্পর্কে আঞ্চলিক ছড়ায় আছে ঃ

"শিবনিবাসী তুলত কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা
উপরে বাজে দেবঘড়ি নীচে বাজে ঠনঠনা।।১২

তবে চূর্ণীর মঙ্গলবারির দেবঘড়ি এখন আর বাজে না, বাজে শুধু পূজারতির ঘন্টা। মাহাত্ম্যে কাশীধাম তুল্য এই স্থান মাহাত্মে আজও অটুট আছে। এখানে অনুষ্ঠিত শ্রাবণ সংক্রান্তি এবং ভৈমী একাদশী তিথিতে শুরু হওয়া এক পক্ষকালব্যাপী মেলা শিবনিবাস মাহাত্ম্যকে প্রসারিত ও বহন করে চলেছে। আজও শ্রাবণ মাসে প্রতি সোমবার জল ঢালার জন্য নবদ্বীপ থেকে বাঁকে করে দূর দূরান্ত থেকে শৈব ভক্তপ্রাণ মানুষেরা অপরিসীম কষ্ট সহ্য করে এসে এই শিবনিবাসে শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালে ভক্তি আর বিশ্বাসে। বিগত প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে শ্রী শ্রী তারকনাথেরও নাকি স্বপ্নাদেশ হয়। সেই থেকে শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে বারি হাঁটা

পথে শিবনিবাসে এন সেই গঙ্গাজল শিবের মাথায় দেওয়া হয়।১৩ হাজার হাজার মানুষের পরশে পবিত্র হয়ে ওঠে এই তীর্থনীড়। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন এই সংখ্যাটি হয় বর্তমান মন্দিরের প্রধান পুরোহিত স্বপন ভট্টাচার্য ও অন্যান্য সাক্ষাৎকার ব্যক্তির কথা অনুযায়ী ৩০,০০০ - ৪০,০০০ ভক্ত। মন্দিরের পুরোহিত কুল পরম্পরায় ভট্টাচার্য বংশ। এখানেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রজাদের আনন্দ বিনোদনের জন্য যে মেলার সূচনা করেছিলেন তা এখনো প্রবহমান। প্রতিবছর মাঘ মাসের ভৈমী একাদশী তিথিতে এই মেলা শুরু হয়, যা শেষ হয় শৈব চতুর্দশীতে।

মেলা সামাজিক ক্রিয়ারই ফল। শিবনিবাসে অনুষ্ঠিত মেলার পেছনে আছে ধর্মীয় প্রেরণা তবে এটা ঠিক মেলার যেমন একটি ভিত্তি ধর্ম আবার অর্থনীতিত্ব। মেলা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের স্তম্ভস্বরূপ, সেই অর্থে সংস্কৃতি মানব মনের সম্প্রসারণ ঘটায় এবং মানব দূরত্বের ঘটায় সংকোচন। সুতরাং মেলা ও বাঙালীর সংস্কৃতির উত্তরাধিকার এর একটি শুভ চেহারা হল ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। সমস্ত ভট্টাচার্য, এশিয়ার বৃহত্তম শিবলিঙ্গ বর্তমান পত্রিকা কলকাতা ১১/১০/২০০৯।
২। সুজিত কুমার রায়,রত্নগর্ভা নদীয়ার মাজদিয়া কৃষি সাহিত্য প্রকাশক, মাজদিয়া, ১৯৯৯,(১৪০৫ বঙ্গাব্দ)।
৩। ডঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রগোসিভ বুক ফোরাম,কলকাতা, ১৯৮৯। পৃষ্ঠা নং - ১৯১
৪। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৯১।
৫। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৯১।
৬। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৯১-১৯২।
৭। তদেব। পৃষ্ঠা নং - ১৯২।
৮। সুমন্ত ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত।
৯। মোহিত রায়, শিবনিবাস, কৃষিসাহিত্য প্রকাশক, মাজদিয়া ২০১২ (১৪১৯ বঙ্গাব্দ পঞ্চম সংস্করণ) পৃষ্ঠা নং - ৪-৫।
১০। কুমুদনাথ মলি-ক, নদীয়া কাহিনী - কমল চৌধুরী (সম্ভবং) নদীয়ার ইতিহাস, প্রথমপর্ব দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১২, পৃষ্ঠা নং - ৫০০ - ৫০১।
১১। প্রণব রায়, নদীয়া জেলার পুরকীর্তি, কমল চৌধুরী (সম্ভবং) নদীয়ার ইতিহাস দ্বিতীয় পর্ব কলকাতা ২০১২, পৃষ্ঠা নং - ৩১৬।
১২। প্রাগুক্ত।
১৩। মোহিত রায়, প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা নং - ২।
১৪। প্রধান পুরোহিত স্বপন ভট্টাচার্য ও অন্যান্য স্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার এর ভিত্তিতে এই তথ্য লব্ধ হয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সংকট ঃ একটি মূল্যায়ণ

অলোক বিশ্বাস
শান্তিপুর কলেজ

একটি সমাজের উন্নয়ণের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভিত্তি হিসাবে কাজ করে এবং এই ভিত্তিরও একটি উপরিসৌধ থাকে। নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ভিত্তির সকল উপরিসৌধের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো শ্রেণির পূর্বকল্পিত ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। বৃহৎ পুঁজিবাদী শ্রেণি উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, বিশ্বায়ন ইত্যাদির নামে অর্থনীতিকে বেঁধে রেখেছে।

'The Human Development Report 2002 (UNDP)' -এ বলা হয়েছে, বয়স্ক শিক্ষার হার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীর ১৭৩টি দেশের মধ্যে ১৪১তম স্থানে রয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয়িত হয়নি। অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়েকের মতে, '' Infact the proportional GDP that the white supermaclist South Africa State spent on the education,of the black majority even during the apartheid period,notwithstanding the massive drain on its excuequer that the maintennance of the highly Oppressive Police Military and intelligence apparatus entailed at the time, was higher than what the Indian State has even done throughout its entire post independence history."১

সাম্প্রতিককালে শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারিকরণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শিক্ষা একটি 'পণ্যে' রূপান্তরিত হয়েছে। সুকান্ত চৌধুরীর মতে, "Education itself becomes a consumer industry, starting from kindergarten."২ এ প্রসঙ্গে অমল গুহর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "But we should keep in mind that education is not a hpmogenous good, like steel or cement. It is rather fundamentally heterogeneous."৩

বর্তমানে আমাদের সমাজে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ও রক্ষণশীল শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকারক। এর ফলে উচ্চ শিক্ষার অবমূল্যায়ন ঘটেছে যা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শের আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশকে বৌদ্ধিকভাবে নিরস্ত্র করে তুলেছে।

বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির একমাত্র লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। "They charge exorbitant fees,which often force students to take education loan and to pay back these loans they have to turn themselves

into commodities, selling themselves to the buyers who offer the maximum prize."৪ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধুমাত্র পণ্যে রূপান্তরিত করেই ক্ষান্ত হয়নি। "The private education section converts education into a commodity and takes all creativity out of it."৫

১৯৪৭ - এ ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে শিক্ষা ব্যবস্থা যেরকম ছিল এখনও মূলত সেরকমই আছে। স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা সাধারণ মানুষ ও উচ্চশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের হার খুবই কম। উচ্চ শিক্ষার একচেটিয়া অধিকার প্রকৃতপক্ষে উচ্চশ্রেণি ও জাতির অধিকারে রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ব্যয়বহুল ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিযোগিতামূলক ভর্তির তুলনায় উচ্চশ্রেণির ছেলে-মেয়েরা অধিক সুবিধা পায়। অধ্যাপক গুন্নার মিরডাল বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখছেন, "conformed closely to the old colonial pattern of building up a highly educated elite with an attached lower rank subalterns,while leaving the population at large in a state of ignorance."৬

বিভন্ন শ্রেণির মধ্যে বিশেষ করে ধনী ও গরীব, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বেড়েই চলেছে। যেহেতু সাধারণ জনগণের ঐতিহ্যের মূলে শিক্ষা প্রোথিত নয়, তাই শিক্ষিত সমাজ তার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন কোর্সে একঘেয়েমী লেকচার বাস্তবের সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে। অচল মুখস্থ বিদ্যা, পাশফেল প্রথা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নৈতিক অবক্ষয় আজ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কর্মসংস্থানের ক্ষীণ প্রত্যাশা বিদ্যার্থীদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে হতাশ করে তুলেছে।৭

গ্রন্থপঞ্জীঃ

1. Prof.Prabhat patnaik : convocation address, seventh convocation, Nov.14,2003,University of Kalyani, in Amal Guha : Types of allienation towards Marx's Perception, Readers service,Kolkata, first published 2016, p - 224.

2. Sukanta Chaudhury : Education and equality, The Telegraph, 17 june & 18 june, 2013. In Amal Guha : Types of allienation towards Marx's Perception, Readers service,Kolkata, first published 2016, p - 224.

3. Amal Guha : Types of allienation towards Marx's Perception, Readers service,Kolkata, first published 2016, p - 224.

4. Prof.Prabhat patnaik : Learning as commodity. The Telegraph, 17th April, 2014.

5. Prof.Prabhat patnaik : Learning as commodity. The Telegraph, 17th April, 2014.

6. Gunnar Myrdal, Asian Drama, vol. iii, p - 1669

7. Amal Guha : Types of allienation towards Marx's Perception, Readers service,Kolkata, first published 2016, p - 226.

সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে নারীচরিত্র নির্মাণে লিঙ্গ বৈষম্য ঃ একটি আলোচনা

মোহন কুমার মন্ডল

সংস্কৃত বিভাগ, রানাঘাট কলেজ

নাট্যসাহিত্যে নারীকে ভোগ্যবস্তু ও পণ্যদ্রব্য হিসাবে পুরুষকে সাহস যুগিয়েছে পূর্ববর্তী বৈদিকসাহিত্য তথা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য। এক্ষেত্রে উপনিষদ, ধর্মশাস্ত্র ও মহাকাব্য ও পুরাণ গুলির অবদান সর্বাগ্রে। মূলতঃ মহাকাব্যিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে নাট্যসাহিত্যে নারীকে ভোগ্যত্ব ও পণ্যত্বেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। মহাকাব্যে রামচন্দ্র সীতাকে প্রত্যাখ্যান করবার সময় বলেছেন, পরহস্তগতা নারীকে তিনি ভোগ করতে পারবেন না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে প্রাচীন ভারতে নারীপুরুষের সম্পর্কের মূল রসায়নটা কী? কেন ধীরে ধীরে নারীর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে বস্তুতে পরিণত হল। ক্রান্তদর্শী নাট্যকারদের লেখনীতে তাঁদের চরিত্রের নবীকরণ কেন হল না। না ক্রান্তদর্শী কবিরাও নারীর স্বাধীন সত্ত্বাদানে প্রাচীনকে অনুসরণ করেছেন? এছাড়া সামগ্রিক ভাবে নারীকে এই পুরুষ সমাজ কিভাবে মূল্যায়ণ করেছেন, তার নাতিদীর্ঘ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কন্যা সন্তান অভিশাপের।১ তাই সন্তান সম্ভবা নারীর একটি অনুষ্ঠান পুংসবন। যার উদ্দেশ্য নারীর গর্ভস্থ সন্তানটি পুরুষ হবে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে পাই - হৃদয় দিয়ে নারীকে প্রার্থনা করা উচিত নয়। কিন্তু নারীকে ভোগ করার কোন বাধা নেই। "নারীং ন হৃদয়েন প্রার্থয়েৎ।"(আপস্তম্ব ১/২৭৭/১-১০)। নারীমিথ্যাচারিনী, দুর্ভাগ্যস্বরূপিনী, সুরা বা দ্যুতক্রীড়ার মত একটি ব্যসন মাত্র।২ অর্থাৎ নারী ছলনাময়ী, স্বার্থপর। পুরুষ যেন উৎকৃষ্টতর জীব এসব দোষ তার নেই, একা নারীরই আছে। সর্বগুণান্বিতা শ্রেষ্ঠ নারীও তাই অধম পুরুষের থেকে হীন।

এর পরবর্তী নাট্যসাহিত্য অনেকটা হলেও উদার নারী চরিত্র মূল্যায়ণে কেন না মৃচ্ছকটিকে শূদ্রক বলেছেন, "থামে বাঁধতে হয় হস্তীকে, লাগামে বাঁধতে হয় ঘোড়া, হৃদয় দিয়ে বাঁধা যায় নারীকে।৩ কোন প্রসঙ্গে, কার মুখ দিয়ে, কার সম্পর্কে একথা তিনি বলেছেন। তার মূল্যায়ণে না গিয়ে সামগ্রিকভাবে নারীর প্রশংসার যে মূল্যায়ণ তিনি দিলেন, সমস্ত পুরুষসমাজকে আজীবন হৃদয় দিয়ে তার অনুধাবন করতে হয়। আবার ' স্বপ্নবাসবদত্তম্' নাটকে স্ত্রী চরিত্র অঙ্কনে ভাস বলেছেন - "স্ত্রীস্বভাবস্তুকাতরঃ"। স্বপ্নবাসবদত্তম্ ৪/৮।৪ আবার কোথাও ব্যক্ত হয়েছে, 'আমার ভগিনী স্বভাবতঃ দয়ালু।'৫ ভবভূতিনারীর কোমলতাকে বোঝাতে সুকুমার কুসুমের তুলনা করেছেন। "পুরন্ধ্রীনাং চেতঃ কুসুমসুকুমারং হি ভবতি।"৬ উত্তররামচরিত। পরিশেষে বলতে পারি মহাকবি কালিদাস স্ত্রী চরিত্র অঙ্কণে এক অন্যমাত্রা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন - "স্ত্রীরত্ন সৃষ্টিরপরা।" অভিজ্ঞান/৩।৭ পরে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তাঁকে পাওয়ার অভিলাষ করা যেতে পারে। কেননা সে স্পর্শ যোগ্য রত্ন। "তদিদং স্পর্শক্ষমং

রত্নম্"। শকুন্তলা -১/২৫।৮
সামগ্রিক প্রশংসা সত্ত্বেও নাট্যসাহিত্যে এক অন্যচিত্রও ফুটে ওঠে। লোকেরা স্ত্রীচরিত্রের প্রতি অতীব অসহিষ্ণু। অসহিষ্ণুতা হল তাই, যা নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, স্বাধীনচিন্তা ও মতপ্রকাশ, বিশ্বাস ও ধর্ম উপাসনার স্বাধীন, সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠায় নারীর মর্যাদা ও নারীর ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করণে পুরুষশাসিত সামজের অনুশাসন ও বাধাদান। সমস্ত ক্ষেত্রে পুরুষের হস্তক্ষেপ নারীকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। একদা প্রথিতযশা নাট্যকার ববভূতি নারী চরিত্রের প্রতি পরনিন্দা ও পরচর্চারূপ গুণের প্রতি ব্যঙ্গ করে বলেছেন "যথা স্ত্রীণাং তথাবাচাংসাধূত্বে দুর্জনো জনঃ"। উত্তররামচরিতম্।৯ নারী সমালোচক জগতে অভাব নেই। উত্তররামচরিতে রাম সদ্যরাজ্য লাভের উদ্দীপনায় এবং তারুণ্যের উদ্দাম প্রেরণায় ঋষি বশিষ্ঠের আদেশকে যথোচিত মর্যাদার সাথে গ্রহণ করে বলেছেন "প্রজাবৃন্তের কল্যাণের জন্য তাদের সন্তোষের জন্য আমি স্নেহ, দয়া, সুখ এমন কি প্রিয়তমা পত্নীকেও অক্লেশে পরিত্যাগ করতে পারি।""স্নেহাংদয়াঞ্চ সৌখাঞ্চ যদি বা জানকীমপি। আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।।"(উত্তররামচরিত ১/১২)।১০ রামের উক্তিতে সীতা নির্দ্বিধায় সমর্থন করলেন এবং এমন স্বামীর জন্য গর্ব অনুভব করলেন। রামের চরমতম অসহিষ্ণুতা সত্ত্বেও সীতার এই বার্তা সমগ্র নারী সমাজকে সহিষ্ণুতারই শিক্ষা দেন।

নাট্যসাহিত্যে নারীর প্রতি নরের ঐকান্তিক সহানুভূতি যেন কোথাও প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে। কিসের এত সহানুভূতি, কাদের প্রতি সহানুভূতি। "উৎপত্তি পরিপূতয়াঃ কিমস্বাঃ পাবনান্তরৈঃ।" (উত্তররামচরিত ১/১৩)। ১১ জন্মবিধ পরম পবিত্র সীতার পবিত্রতা পরীক্ষার জন্য পাবকের প্রয়োজন নেই। হায় রাম এই সহানুভূতির কি বড় প্রয়োজন ছিল। কথাটা বড় হাস্যস্পদ বলে মনে হয় না। কারণ সকলে বোধহয় জানেন, সীতা নির্বাসনের পর যন্ত্রণায়, দুঃখে ও অভিমানে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। রামের এখানে সহানুভূতি না লব কুশকে পাওয়ার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। কেননা উত্তররামচরিতে অষ্টাবক্র বশিষ্টের সন্দেশ জ্ঞাপনকালে বলেছেন, 'সীতা বীরসন্তানের জননী হবেন।"১২ ভবভূতির বিখ্যাত উক্তি রামকে হয়তো অনুপ্রাণিত করে লৌকিকানং হিসাধুনামর্থংবাগনুবর্ততে ঋষীনাংপুনরাদ্যানাং বাচমর্থোহনুধাবতি।(১/১০) ১৩

নারী কি পৌরুষ্যত্বের স্বীকার ? উত্তররামচরিতের সপ্তম অঙ্কে অরুন্ধতী রামচন্দ্রকে বলছেন, -"সীতাকে তুমি তোমার সহধর্মচারিনী হিসাবে গ্রহণ কর।"১৪ তাহলে রামচন্দ্রের কিসের এত দ্বিধা যন্ত্রণা। না পৌরুষ্যত্ব। তাঁকে কেন স্মরণ করাতে হল সীতা তোমার সহধর্মচারিনী। অপরদিকে পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষ দন্ডমুন্ডের কর্তা। তাদের অনুমোদনই যেন নারীর স্বাধীনতা। অরুন্ধতী বলছেন, "হে নগরবাসীগণ ও জনপদবাসীগণ এখন একে গ্রহণ করা হবে কিনা, এ বিষয়ে আপনাদের মত বলুন। সীতাদেবী, সূর্যবংশের পুত্রবধূ যজ্ঞভূমি সম্ভবা। আমি অরুন্ধতী ভগবতী,ভাগীরথী এবং পূর্ণিমা প্রশংসা পূর্বক একে অর্পণ করলাম।"১৫ এরপর প্রজাগণ সীতাকে গ্রহণ করলেন। কালিদাসের নাট্যে নারী এক এবং অদ্বিতীয় গৃহিনী। তাই নারীর কর্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন - "তার কর্তব্য হল গুরুজনের

সেবা করা। স্বপত্নীদের সাথে সখীর মত ব্যবহার করা। পরিজনদের প্রতি যথেষ্ট দয়াদাক্ষিণ্য বজায় রাখা। নিজের ভাগ্যে গর্বিত না হওয়া। স্বামীর কর্কশ ব্যবহারেও স্থির থাকা। স্বামীর বিরুদ্ধে কিছু না করা। কারণ নারী এই সকল ব্যবহারে গৃহিণী পদবাচ্য হয়ে থাকে।"১৬ কর্ম্বমুনি শকুন্তলাকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন "তুমি তোমার অভিজাত স্বামীর গৌরবময় গৃহিনী পদে প্রতিষ্ঠিত হবে। ঐশ্বর্য্যের কারণে গুরুতর কাজে ব্যস্ত থাকবে। এবং এক পুত্রের জন্ম দেবে।"১৭ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "বর্ণাশ্রমধর্ম" গ্রন্থে বলেছেন - "গৃহীপুরুষের পক্ষে বিবাহ যদি'বিধি' হয় তবে নারীর পক্ষে ? নারীর পক্ষে বিবাহ একান্ত কর্তব্য। কারণ Marriage is the only security for woman. বিবাহই নারীর মুখ্য সংস্কার এবং গৃহচর্যাই হোমরূপ অগ্নিক্রিয়া। বস্তুত বিবাহেই নারীর সার্থকতা। এবং মাতৃত্বেই তার পরিপূর্তি।১৮ এ থেকে অনুমেয় মনুর সমাজ নীতি-ই যেন কালিদাসের নাট্যসাহিত্যে ধরা পড়েছে।

কালিদাসের নাট্যে নারীকে হতে হবে সতী ও স্বাধী। তাইতো তিনি বলেছেন, "স্বামী আছে এমন স্ত্রী লোক যদি সর্বদাই পিতৃকূলে থাকে তবে সেই স্ত্রীলোক নিতান্তই সতী ও স্বাধী হলেও লোকেরা তার সম্বন্ধে অন্যভাবে।"১৯ এই কথার মানে এটাই মনে হয় এই সমাজে নারী কি রকম হবে, কি খাবে, কি পরবে, কিভাবে চলবে, সবকিছুই শিখিয়ে পড়িয়ে একরকম সতী ও স্বাধী করতে পারলেই তাদের স্বার্থ চরিতার্থ হয়। অপরিচিত কাউকে তো পুরুষ সম্পত্তির অধিকারী করতে পারে না। তাই পুরুষের কাছে নারী হয়ে উঠেছে সন্দেহের আকর। নারী যে সন্দেহের আকর তা পাই দুষ্যন্তের কথাতেই। তিনি শকুন্তলার অম্-ন সৌন্দর্য্যে পরাভূত হলেও পূর্বে তাকে বিবাহ করেছেন কিনা এই বিচারে দোলাইত। সন্দেহ নিরসনে আজও ব্যর্থ। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছেন আমি না পারছি একে ভোগ করতে , না পারছি ত্যাগ করতে। পরিশেষে মূল সিদ্ধান্তে উপণীত হয়ে বলেছেন - "শুনুন তাপসেরা, আমি অনেক চিন্তা করেও একে বিবাহ করেছি কিনা মনে করতে পারছি না। এই অবস্থায় যে নারী অন্তঃসত্ত্বা এটা বোঝা যাচ্ছে একে গ্রহণ করলে পরোদাররত বলে প্রতিপন্ন হতে হবে। এই আশঙ্কা থাকতে কি করে একে স্ত্রী বলে স্বীকার করি।"২০ আসলে কথা হল সন্দেহের নিরসন না পর্যন্ত এই কন্যার গ্রহণ কোথাও যেন পিতৃধনে অবাঞ্ছিত কাউকে অধিকারী করা। সেটা পুরুষশাসিত সমাজ মান্যতা দেয়না সেখানেই যত আশঙ্কা।

কন্যা এই সমাজে মূল্যবান রত্ন। এই কন্যা সন্তানকে বলপূর্বক গ্রহণ করা যায়। সমাজ তাতে অনুমোদন দেয়। কারণ কর্ম্বমুনি পূর্বে এর অনুমোদন করেছেন। তিনি অপমাণিত বোধ করেননি। তাই শাঙর্গরব বলেছেন - "তার আপনার কাছ থেকে অপমানিত হওয়া উচিত। কেননা তিনি নিজের অপহৃত ধন দস্যুর মতো আচরণকারী আপনার হাতে আবার প্রত্যার্পণ করে আপনাকেই সেই ধনের অধিকারী করতে চেয়েছেন।"২১ কারণ সে সমাজ দ্বাদশ পুত্রের অনুমোদন দিলেও ঔরসপুত্র যে কাম্য সে কথা বারবার ফিরে এসেছে।

যেখানে শকুন্তলার স্বাধিকার পতিগৃহে গমন করা। সেখানে দুষ্যন্ত বলেছেন- "পাড়ভাঙা নদী যেমন স্বচ্ছ জলকে পঙ্কিল করে, তুমিও নিজের বংশকে কলঙ্কিত করতে এবং সেই সঙ্গে আমাকেও পতিত করতে চাইছো কেন।"২২ নারীকেই যেন সতী স্বাধী হতে

হবে। এক্ষেত্রে পুরুষের দায় কেন। নারীর হাতেই যেন বংশের কান্ডারী তুলে দেওয়া হয়েছে। তাই তাকে ধর্মপত্নী হতে হবে। ধর্মপত্নী কতটা কাম্য তা বলা বাহুল্য। প্রয়োজন কেবল নিজ ঔরসপুত্র লাভ। যার কাছ থেকে ইহকালে মুক্তি ও পরকালে পুণ্যত্ব লাভ করা যায় ও পরকালে পুত্রই পারে পিতার সাতকূলের পরিত্রাণ করতে। এক্ষেত্রে সেই প্রাচীন নীতিকেই মনে করিয়ে দেয়।

এছাড়া নাট্যসাহিত্যে নারী চরিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশে-ষণে এটা পরিজ্ঞাত হয় লজ্জাই নারীর ভূষণ। তাই কামনার প্রকাশ ও নারীকে হতে হয়েছে 'বিনয়বারিতবৃত্তিঃ মদনঃ'।(শকুন্তলা ২/১১)।২৩ কালিদাস তাই বলেছেন নায়িকা মুখোমুখি হলেও চোখাচোখিতে স্বলজ্জ হবে। অন্যকোন কারণে ঘটেছে ছল করে হাসবে। প্রেমের প্রকাশে নারীর স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। নারীপুরুষের প্রেমনিবেদনেও বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। রাজা দুষ্যন্ত বলেছেন - "সেই তন্বী শকুন্তলা কয়েক পা গিয়েই কুশের ডগায় পা বেধেছে এই ভাব করে অকারণেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। গাছের ডালে পরিধেয় বল্কল জড়িয়ে না গেলেও তা খোলার ভান করে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ছিল।"২৪ এটাই কি নারীর স্বাধীন সত্ত্বা ? বাৎসায়ন তার কামসূত্রে প্রথম যৌবনা মুগ্ধ নায়িকার যে লক্ষণ দিয়েছেন কোথাও যেন একসুতোয় বাঁধা বলে মনে হয়। "পথিব্যজনাৎ পরাবৃত্তাপিদর্শণম্"। কামসূত্র। বা ক্ষণং সরলবীক্ষণং ক্ষণংপাঙ্গবীক্ষণম। ক্ষণং রজসি খেলনং ক্ষণমতীব ভূয়াদর। ক্ষণং দ্রুততরাগতিঃ ক্ষণমতীবমন্দাগতিঃ। ক্ষণং ক্ষণং বিলক্ষণং জয়তি চেষ্টিতং সুভ্রুবঃ॥ শাস্ত্রী দ্বিবেদীতে উদ্ধৃত অংশটির কথা মনে পড়ে যায়। স্বলজ্জতাই কি নারীর যথার্থ চিত্র। সেই পথ দিয়ে বেশী অসহায়, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছে তাঁকে।

আমরা জানি কামার্ত ব্যক্তির প্রকৃতি অচেতন। তাই কালিদাস নাট্যে সেই তাপস কন্যা শকুন্তলা বিধাতার অনন্য সৃষ্টি হলেও - "সেই তাপস কন্যা যেন এমন এক ফুল যার ঘ্রাণ আগে কেউ গ্রহণ করেনি। এমন এক নতুন পল-ব যাকে কেউ এখনো নখ দিয়ে ছিন্ন করেনি।"২৪ জানি না একে ভোগ করার জন্য ভগবান কাকে এনে হাজির করবেন। "ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ।২৫ এখানে শকুন্তলার কান্তিমত্তা, মুগ্ধতা, হৃদ্যতা প্রভৃতি গুণ ধ্বনিত হলেও পরিভোগযোগ্যতাই যেন সবকিছুকেই ছাপিয়ে যায়।

মুদ্রারাক্ষস নাটকটি রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উজ্জীবিত করলেও নারীচরিত্রহীন মুদ্রারাক্ষস নাটকের রস রসিকজনের হৃদয়কে উজ্জীবিত করতে পারেনি। অপরদিকে মৃচ্ছকটিকে গণিকা নায়িকাচরিত্র তদানিন্তন যুগেও রসিকজনের হৃদয়কে আপ-ুত করেছে। কট্টর সমাজবাদীগণও মাথানত করেছেন গণিকার প্রেমের কাছে।

পরিশেষে একথাই বলতে চাই কালজয়ী এইসমস্ত মহান সাহিত্যিকই আজও আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁদের অমূল্য লেখনী আজও বিশ্বসাহিত্যের আতুরঘর। তাঁদের কাব্যনাটক সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপনে ধৃষ্টতাই আমার মত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র মানুষের নেই। সাহিত্য চলে তার আপন ভঙ্গিমায় এবং তার রূপ, রস ও গন্ধ আহরিত হয় এই সজীব সমাজ থেকে। আর তাই সমাজের চিত্রই সাহিত্যে ফুটে ওঠে। কিন্তু একথা সত্য যে সমাজে নারী যদি পুরুষ নামক পেষন যন্ত্রে সর্বদা নিষ্পেষিত হত তাহলে নারীর কোন

চিহ্ন থাকার কথা নয়। পাথর তো শত শত বছরে ক্ষয়ে বালুকায় পরিণত হয়। কিন্তু নারীর বিকাশ বৈ অবক্ষয় হয়নি। সমাজের তাগিদে মানুষ কতকিছু ফেলে এসে নতুনকে গ্রহণ করে। নতুনের মধ্যে নবজীবনের আশা ধরা থাকে। সমাজের স্বার্থেই তাই নতুনকে বরণ করে নেওয়া হয় সাহিত্যেও ঠিক একই ক্রম।

তথ্যসূত্র ঃ

১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৬/৩/৭/১৩) ২। মৈত্রায়ণী সংহিতা (১/১০/১১/৩/৬/৩) ৩। মৃচ্ছকটিকম্ (১/৫০) ৪। স্বপ্নবাসবদত্তম্ (৪/৮) ৫। স্বপ্নবাসবদত্তম্ / প্রথমাঙ্ক ৬। উত্তররামচরিত /প্রথমাঙ্ক ৭। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (২/৯) ৮। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১/২৫) ৯। উত্তররামচরিত (১/৫) ১০। উত্তররামচরিত (১/১২) ১১। উত্তররামচরিত (১/১৩) ১২। উত্তররামচরিত /প্রথমাঙ্ক ১৩। উত্তররামচরিত (১/১০) ১৪। উত্তররামচরিত /সপ্তমাঙ্ক ১৫। উত্তররামচরিত /সপ্তমাঙ্ক ১৬। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (৪/১৮) ১৭। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (৪/১৯) ১৮। মনুরবর্ণাশ্রমধর্ম। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রথমাঙ্ক ২০। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ পঞ্চমাঙ্ক ২১। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (৫/২০) ২২। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (৫/২১) ২৩। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (২/১১) ২৪। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রথমাঙ্ক ২৫। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (২/১০)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ২। উত্তররামচরিতাম্ ৩। মৃচ্ছকটিকম্ ৪। স্বপ্নবাসবদত্তম্ ৫। মুদ্রারাক্ষস ৬। মনুরবর্ণাশ্রমধর্ম। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ৭। আপস্তম্বধর্মসূত্র ৮। মনুসংহিতা ৯। প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য। সুকুমারী ভট্টাচার্য্য।

কৃপাহত্যায় নৈতিকতার স্থান ঃ একটি উপস্থাপনা

রণজিৎ বর্মন

"জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে।"
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

একথা সত্যি যে কালের নিয়মে একদিন আমাদের সকলকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সব বন্ধন, সব মায়া, সব সম্পর্ক ত্যাগ করে পরলোকে আমাদের গমন করতে হবে - কেউ আগে আর কেউ পরে। এই নিয়মের ব্যতিক্রমের উর্ধ্বে আমরা কেউই নয়। জন্ম, মৃত্যু এ যেন বিধাতার সৃষ্টি - একথা আমরা আজও অনেকে বিশ্বাস করি। তবু যেটুকু সময় পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকে তার মধ্যেই জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা সবকিছুতেই মানুষ তার অবদান রেখে যেতে চায়। তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হল মানুষ। সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে অদ্যাবধি যতসব অগ্রগতি ঘটেছে সবকিছুতে মানুষ যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তা অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে বিরল - এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রত্যেকটি মানুষ পৃথিবীতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে চায়। চায় অনাবিল সুখ শান্তি। মানুষের কামনা বাসনার তাই অন্ত নেই। একটি কামনা তৃপ্ত হতে না হতেই অপর কামনা মানুষের মনকে অধিকার করে। কিন্তু যখন ক্লেশ জীবনকে গ্রাস করে, যখন জীবনে পাওয়ার আর কিছুই থাকে না, চেতনা যখন ক্ষীণ হয়, মস্তিস্ক যখন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তখন মানুষের জীবনকে উদ্ভিদের মতোই মনে হয়। এরকম উদ্ভিদের মতো জীবনকে অর্থহীন ভাবে বহন করার তুলনায় মৃত্যুকেই তখন শ্রেয় বলে মনে হয়। এরকম পরিস্থিতিতে মানুষ কৃপাহত্যা বা স্বেচ্ছামৃত্যু (Euthanasia) প্রার্থনা করে।

প্রচলিত মত অনুসারে বহু সাধনার ফলে মানব জনম পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় এই দুর্লভ জনম পাওয়ার পরও কিছু মানুষের ক্ষেত্রে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায়। জীবন তখন তার কাছে অবহেলার পাত্র ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। যদিও জীবনের প্রতি এই অবহেলার অনেক কারণ থাকে। জীবন যখন এতটাই দুর্বিসহ হয়ে ওঠে যে তা সহ্য করা সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় জীবনের অন্তিম ছেদ টানার সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া ব্যক্তির আর কোন উপায় থাকে না। এরকম অসহায় পরিস্থিতিতে মানুষ কৃপাহত্যার প্রতি স্মরণাপন্ন হয়।

এখানে প্রশ্ন আসে কৃপাহত্যা কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় - কৃপাহত্যা হল একটি শান্ত ও সহজ উপায়ে মৃত্যু (a gentle and easy death)। কিন্তু বর্তমানে কৃপাহত্যা শব্দটিকে অ-নিরাময় যোগ্য রোগও নিদারুণ বেদনায় বা যন্ত্রণায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের আরও কষ্ট ভোগ থেকে নিস্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে হত্যা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই কৃপাহত্যা হত্যাজনিত হলেও যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় এই হত্যা তার কাছে শান্তি

ও মুক্তির বার্তা বহন করে। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ তাই অনেক ক্ষেত্রে কৃপাহত্যার প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

কৃপাহত্যা সাধারণত তিন প্রকার বলে মনে করা হয় - ঐচ্ছিক কৃপাহত্যা, অনৈচ্ছিক কৃপাহত্যা ও ইচ্ছা নিরপেক্ষ কৃপাহত্যা। নিহত ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনুরোধ অনুসারে যে হত্যা তাকে বলা হয় ঐচ্ছিক কৃপাহত্যা। কৃপাহত্যা তখনই ঐচ্ছিক বলে বিবেচিত হয় যখন একজন ব্যক্তির অনুরোধে এবং সেই ব্যক্তিরই স্বার্থে তাকে হত্যা করা হয়। আর যখন কোন নিহত ব্যক্তি তার নিজ মৃত্যু সম্পর্কে সম্মতি দিতে সমর্থ কিন্তু তিনি সম্মত দেননি, এক্ষেত্রে হয় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বা তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি এরকম ক্ষেত্রে যে হত্যা তাকে অনৈচ্ছিত কৃপাহত্যা বলা হয়। এখানে যেহেতু সম্মতি গ্রহণের প্রশ্ন নেই তাই কৃপাহত্যা এখানে অনৈচ্ছিক। আবার যখন জীবন ও মৃত্যুর প্রভেদ উপলব্ধির মতো যদি ব্যক্তির বোধশক্তি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট দুর করার জন্য তাকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তাকে ইচ্ছানিরপেক্ষ কৃপাহত্যা বলে। এই কৃপাহত্যায় ব্যক্তিগণ নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারে না।

কৃপাহত্যার এই ধারণা প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রিকযুগে বিকলাঙ্গ শিশুর হত্যাকে অনুমোদন করা হয়েছিল। পে-টো এবং অ্যারিষ্টটলের রচনায় কৃপাহত্যার ধারণা পাওয়া যায়। 'রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে পে-টো বলেছেন যে, রাষ্ট্র যে সকল শিশুকে দুর্বল এবং বিকলাঙ্গ বলে মনে করত তাদের একটি অজ্ঞাত রহস্যময় জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হত। অ্যারিষ্টটল তার 'পলিটিক্স' নামক গ্রন্থে তার পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে একই নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল কৃপাহত্যার ক্ষেত্রে কি নৈতিকতা থাকে; নাকি আদৌ কোন নৈতিকতা কৃপাহত্যার মধ্যে থাকে না? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ আমরা কৃপাহত্যার বিভিন্ন রূপকে দেখেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে যন্ত্রণা লাঘবের জন্য ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কৃপাহত্যা দেওয়া হয়। তবুও নৈতিকতার মানদন্ডকে কৃপাহত্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে কৃপাহত্যা নৈতিক না অনৈতিক।

কৃপাহত্যাকে অনেকে নৈতিক বলে মনে করেন। কারণ তাদের মতে, নিজের জীবনকে রক্ষা করা যদি প্রতিটি মানুষের নৈতিক কর্তব্য বলে মনে হয়, তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে কৃপাহত্যাকেও নৈতিক কর্তব্যরূপে গণ্য করতে হয়। জীবনের লক্ষ্য যদি সুখ,শান্তি হয় তাহলে এটা অবশ্যই মানতে হয় যে ব্যক্তির যেখানে এগুলির কোন কিছুরই আশা থাকে না সেক্ষেত্রে দুর্বিসহ জীবনের চেয়ে কৃপাহত্যা অনেক বেশী শ্রেয়। তাছাড়া মানুষের যেমন সুখ শান্তি কামনা করার অধিকার থাকে তেমনি মৃত্যুকে কামনা করার অধিকারও মানুষের থাকা উচত। এছাড়া মানুষের নিজের জীবনের উপর পূর্ণ অধিকার থাকে। সে ইচ্ছা করলে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সে তার জীবন ত্যাগও করতে পারে। যে জীবন ধারণের অধিকারী সে তার জীবনকে ত্যাগ করারও অধিকারী। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে মনে হয় কৃপাহত্যা কোন অনৈতিক নয়।

ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ এত যন্ত্রণা ভোগ করে যা আমাদের ধারণারও অতীত। এই যন্ত্রণা এত প্রচন্ড আকার ধারণ করে যে সাধারণ মানুষ সেসব যন্ত্রণার বিবরণ পাঠও করতে পারে

না। তাদের পক্ষে সেই কষ্টের বর্ণনাও সহ্য করা কঠিন। কৃপাহত্যা রোগগ্রস্ত মানুষকে তার অসহ্য রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়। তাই কৃপাহত্যা এদিক থেকে অনৈতিক হতে পারে না। যদি কোন রোগী এইরকম করুণ অবস্থায় মৃত্যুকে প্রার্থনা করে, যদি সে মনে করে যে এই কষ্ট দীর্ঘায়িত করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়, তাহলে সেই ব্যক্তির মৃত্যুকে সাহায্য করা মোটেই অনৈতিক হতে পারে না।

উপযোগবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কৃপাহত্যাকে সমর্থন করা যায়। যে কাজ সুখের তুলনায় বেশী পরিমাণ দুঃখ দেয়, সেই কাজ অনুচিত বলে বিবেচিত। আর যেকাজ দুঃখের তুলনায় বেশী পরিমাণ সুখ দেয় তা উচিত কর্ম বলে বিবেচিত হয়। কৃপাহত্যায় দুঃখের অবসান হয় একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই উপযোগিতার মানদন্ডে কৃপাহত্যাকে নীতিগত ন্যায়সম্মত বলা যায়। শুধু তাই নয় রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের আরও বেশী কষ্ট ভোগ থেকে নিস্কৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে কৃপাহত্যা দেওয়া হয়, তা দুর্বিসহ রোগীর ক্ষেত্রে কল্যাণজনক। তাই এদিক থেকে কৃপাহত্যা নৈতিক বলে বিবেচিত হয়।

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় কৃপাহত্যাকে অন্যায় বলে গণ্য করা হয় না। কারণ অনারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের কৃপাহত্যা কোন অপরাধ নয় এবং নৈতিক দিক থেকে অন্যায় নয়। নেদারল্যান্ডস্-এ কৃপাহত্যাকে অন্যায় বলে গণ্য করা হয় না। সেখানে প্রতি বছর প্রায় ২,৩০০ মানুষ কৃপাহত্যায় প্রাণ ত্যাগ করছে। যদিও বেশীরভাগ দেশই কৃপাহত্যাকে নৈতিক বলে সমর্থন করে না। তথাপি নেদারল্যান্ডস্ -এ কৃপাহত্যার আইনি স্বীকৃতি রয়েছে।

আমরা একথা অস্বীকার করতে পারি না যে, যাকে কৃপাহত্যা দেওয়া হয় সে একজন মানুষ, যার নিজের জীবনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অন্য ব্যক্তির প্রাণহানির অধিকার অন্তত আমাদের নেই। তাই আমরা কারও জীবন নাশ করতে পারি না। মানুষের দুঃখের প্রতি সহানুভূতি অবশ্যই প্রশংসনীয়, তাই বলে কৃপাহত্যার পরিকল্পনা করা উচিত নয়। কোন ব্যক্তিকে কৃপাহত্যা দিলে সেই ব্যক্তির নৈতিক অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়। কাজেই কৃপাহত্যা মোটেই নৈতিক বলে গণ্য করা যায় না।

অনেকের মতে জীবনের ধর্মই হল জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করা। তাই মানুষ তার স্বভাব ধর্মে দীর্ঘায়ু কামনা করে। প্রতিটি মানুষ সচেতনভাবে দীর্ঘদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়। মানুষের কাছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাগুলিকে পূরণ করার জন্য মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। এমতাবস্থায় যদি কৃপাহত্যা মানুষকে দেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে না। আবার এমন সম্ভবনাও অস্বীকার করা যায় নাযে, কৃপামৃত্যুকামী ব্যক্তিটি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে সে হয়তো অনেক মহৎ কাজ করতে পারত। তাই কৃপাহত্যা কখনই নৈতিক হতে পারে না।

অনারোগ্য এবং দুর্বিসহ রোগ যন্ত্রণার উপশম যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে কৃপাহত্যা চাওয়া হয়। কিন্তু রোগটি যে প্রকৃতই অনারোগ্য এবং যন্ত্রণার উপশম যে সম্ভব নয় তার নিশ্চয়তা কোথায়? এরকম তো হতে পারে যে চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়টি ভ্রান্ত ছিল, রোগটি আসলে অনারোগ্য নয়। আবার এমনও হতে পারে যে, ভুল চিকিৎসার জন্য যন্ত্রণার উপশম হয়নি - সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করা গেলে যন্ত্রণা মুক্ত হত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের

নব আবিষ্কার ও অগ্রগতির ফলে অনেক রোগ নিরাময় আজ সম্ভব হয়েছে যা একদিন দুরারোগ্য ছিল। আজ যে রোগ আমাদের কাছে অনারোগ্য আগামীকাল তার হয়তো নিরাময় পাওয়া সম্ভব। কাজেই এদিক থেকে কৃপাহত্যা মোটেই নৈতিক নয়।

মানুষের মধ্যে যে বাঁচার প্রবণতা থাকে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই বাঁচার ইচ্ছা কখনও কখনও হয়তো দুর্বল হয়ে যায়। আমরা যখন রোগগ্রস্ত হই, যন্ত্রণায় কাতর হই, তখন আমরা সাময়িকভাবে হতাশাগ্রস্ত হই একথা সত্যি। সে সময় হয়তো আমাদের বাঁচার ইচ্ছাটুকু আর থাকে না। কিন্তু সেটা নিতান্তই একেবারেই ক্ষণিকের জন্য হতে পারে। সেই ক্ষণিক সময়টুকু কাটিয়ে উঠে মানুষ আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু কৃপাহত্যা কার্যকর করা হলে মানুষের এই বাঁচার স্বপ্ন থাকে না। কাজেই কৃপাহত্যা অন্যায় ও অনৈতিক।

কৃপাহত্যা আইনসম্মত হলে প্রতারণা ও জালিয়াতি হবার আশঙ্কা থাকে যাকে কখনই নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় না। এমন সম্ভবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে রোগ জীর্ণ অসহায় বৃদ্ধ পিতা মাতার সম্পত্তির লোভে পুত্র কন্যা মরণের ইচ্ছা আদায় করে নিতে পারে। তাছাড়া কৃপাহত্যা রোগীর মনোবল নষ্ট করে দেয়। তবে রোগযন্ত্রণা অবশ্যই মারাত্মক এবং যারা যন্ত্রণাক্লিষ্ট তাদের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য। তাই কৃপাহত্যা নৈতিক দিক থেকে মোটেই কাম্য নয়।

ছোট বড় সকল প্রাণীরই বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার আছে। কারোরই কারো জীবনহানি করার বা নষ্ট করার অধিকার নেই। বিশ্বের কোন ধর্মই কোন মানুষকে জীবিত অবস্থায় হত্যা করিবার অধিকার কাউকেই প্রদান করেননি। মহাত্মা গান্ধীর কথা উদ্ধৃত করে বলা যায় যে,God alone can take life because he alone gives it.' 'ভগবানই শুধু এই জীবন নিতে পারেন, কেননা তিনিই একমাত্র জীবনদাতা।'সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে কৃপাহত্যায় কোন নৈতিকতার স্থান নেই।

পরিশেষে এ কথাই বলা যায় যে, কৃপাহত্যা নৈতিক অথবা অনৈতিক যাই হোক না কেন, আমাদের উচিত সকলেরই সুস্থ ও সবল থাকা, যাতে আমাদের জীবনে কৃপাহত্যার মতো অন্তিম সিদ্ধান্ত নিতে না হয়। মৃত্যু তো জীবনে আসবেই তেব সেই মৃত্যু মানুষের এমন হওয়া উচিত - যা একাধারে স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে থাকে।

সাহায্যকারী গ্রন্থাবলী ঃ

১। তত্ত্বগত নীতিবিদ্যা ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা — ডঃ সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য
২। নীতিশাস্ত্র — দীক্ষিত গুপ্ত
৩। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান — অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মুন্সী, অধ্যাপক ডঃ বেণুলাল ধর, অধ্যাপক রীতেন সরকার।
৪। গর্ভপাত করানো কি উচিৎ ? আপনিই ভেবে দেখুন — গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।
৫। মধুসূদন রচনাবলী — সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা- ৯
৬। ভারতীয় দর্শন — ডঃ সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

আদিবাসী নারীর যৌনতা

নীলেন্দু বিশ্বাস

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ এম, এম, টি কলেজ

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে সাত দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে, আজ আদিবাসী নারীদের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। অরণ্য নির্ভর আদিবাসী সমাজ আধুনিক সভ্যসমাজের লালসার শিকার হয়ে অন্ধকারের গভীর গহনে হারিয়ে যাচ্ছে। পেটের টানে তাদের ভিনরাজ্যে পরিযায়ীর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। কাজ দেবার নাম করে বহু আদিবাসী নারী হারিয়ে যাচ্ছে। যাদের কোন সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। উপরন্তু আদিবাসী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতিকেও নারীদের অবস্থা খুব সুখকর নয় ঝাড়গ্রাম থেকে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে বীরভূম, দুমকা থেকে বর্ধমান, কালনা, কাটোয়াতে এইভাবে বহু আদিবাসী নারী প্রতিনিয়ত যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অথচ ক্ষমতাহীন ও প্রতিরোধহীন আদিবাসী নারীর উপর যৌন হিংসার সমস্যাটি রাজনীতি, গণমাধ্যম ও সমাজবিজ্ঞানের কাছে উপেক্ষিত থেকে গেছে। প্রতিকারের উপায় নেই জেনে নারীর নিঃশব্দে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে যায়। সামাজিক অপবাদের ভয়ে তারা এমনকি পুলিশের কাছেও অভিযোগ জানাতে পারে না। আবার উন্নয়ণের নামে সরকারী তৎপরতা আদিবাসীদের জীবনকে করে তুলেছে আরও দুর্বিসহ। সরকারী উন্নয়ণের জন্য বরাদ্দ অর্থ বা প্রকল্পগুলি আদিবাষী অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছতে পারে না। তাই আদিবাসী নারীকে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হচ্ছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষায়।

আদিবাসী নারীর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশে-ষণে স্বাভাবিকভাবেই অরণ্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা উঠে আসে। অরণ্যনির্ভর অর্থনীতিকে আদিবাসীরা কিভাবে তাদের উন্নয়ণের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে, সেকথা বিশে-ষণের পাশাপাশি দেখতে হবে সরকারী উন্নয়ণমূলক কর্মসূচী তাদের জীবনযাত্রায় কোন পরিবর্তন আনতে পারছে কিনা। বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় উন্নয়ণ কর্মসূচীর সুযোগ আদিবাসীদের উপর আদৌ কোন প্রভাব ফেলছে কিনা বা কী কী সমস্যা এক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে তা পর্যালোচনা করা দরকার। আবার আদিবাসী নারীর সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে তাদের যৌনতাকে যেভাবে আধুনিক সভ্য সমাজে উপস্থাপন করা হচ্ছে তা আসলে আধুনিকতার বিকৃত রূপটিই প্রতিফলিত করছে। হয়তো এই কারণেই আদিবাসী নারী অতিমাত্রায় যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আদিবাসী নারীদের এই বিচিত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা তাদের অস্তিত্বের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে, যা দূর করা না গেলে ভারতের আদিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সামাজিক ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীর স্থান বা মর্যাদা নিয়ে গবেষণা হয়নি এমন নয়, বিবাহ প্রথা, রক্তের সম্পর্ক, শিক্ষা, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আদিবাসীদের নিয়ে যে সমস্ত গবেষণা কর্ম হয়েছে তা থেকে আদিবাসী নারীদের সামাজিক মর্যাদার কথা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু সমাজে আদিবাসী নারীদের মর্যাদা বলতে ঠিক কি বোঝানো হয় তা নিয়ে বিতর্ক অবশ্যই আছে। একদিকে আদিবাসী নারীদের মর্যাদা

বলতে সমাজে তাদের অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে আবার আদিবাসী নারীর সম্মানকেও অস্বীকার করা যায় না। অথচ এতদিন আদিবাসীদের পৃথক এক জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেই যাবতীয় গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়ে এসেছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় আদিবাসী সমাজের যাবতীয় আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত সভ্য সমাজের নিকটহীন ও নীচ হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে। মূলস্রোতের বিপরীত আদিবাসী সমাজের জীবন যাপন পদ্ধতি প্রচলিত সমাজের চোখে এক অন্য মাত্রা পেয়ে এসেছে। তাই আদিবাসী সমাজের নারীদের মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলে অনেক প্রসঙ্গই আলোচিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু যে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আদিবাসী নারীদের প্রতি বেশি আকর্ষিত হয় তা হল আদিবাসীদের যৌনতা এবং ডাইনী প্রথা। এরমধ্যে যৌনতা বলতে আদিবাসী নারীদের যৌন জীবনযাপন পদ্ধতির কথা বোঝানো হয়। আমরা জানি যে আদিবাসী নারী যৌন জীবনের ক্ষেত্রে যেরকম স্বাধীনতা লাভ করে, তা সভ্য সমাজের নিকট কাম্য তো নয়ই বরং ব্যাভিচারের নামান্তর। কিন্তু আদিবাসী নারীদের যৌন জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে যথার্থ চিন্তা ভাবনার অভাবের ফলে এ বিষয়ে সেরকম গবেষণা হয়নি, হলেও তা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে করা হয়েছে। তাই আদিবাসী নারীদের যৌনতা নিয়ে সেরকম চিন্ত া ভাবনা না হওয়ায় সভ্য সমাজের নিকট তা উপেক্ষনীয় হয়ে থেকেছে। আদিবাসী নারীকে তাই দেখা হয়েছে ভিন্ন চোখে, যে চোখ নারীকে হীন এবং যৌনতার নামে ব্যাভিচার বলে প্রতিপন্ন করেছে। কিন্তু আদিবাসী নারী তাদের বস্ত্রবিন্যাসে, বিবাহে, বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক স্থাপনে, বিবাহ বিচ্ছেদে কিংবা সংজননে যেভাবে স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হয়েছে, যা সভ্য সমাজের নিকট মর্যাদা পায়নি। অথচ এ বিষয়ে আমাদের প্রয়োজন আদিবাসী নারীদের যৌন জীবন সম্পর্কে যথার্থ ও সার্বিক সমীক্ষা নির্ভর জ্ঞান।

যৌন জীবন সম্পর্কে আদিবাসীদের ধারণা ঃ মানুষের দেহ ও মনের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দময় যৌনজীবনের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। জীব বিশেষে প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। মানুষ যেহেতু প্রাণীকুলের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞান ও চেতনা সম্পন্ন হওয়ায় সে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু মানব সমাজে যৌনতার সম্পর্ক প্রাণী সমাজের ন্যায় স্বাধীন ও সর্বজনীন নয়। সামাজিক বিধিনিষেধ, নিয়মনীতি ও আইনকানুন তাকে মেনে চলতে হয়। তাই যৌনতার নামে যথেচ্ছাচার বা স্বেচ্ছাচারকে সেখানে ব্যাভিচারের নামান্তর বলে মনে করা হয়। বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে তাই কখনই সুনজরে দেখা হয় না। বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক স্থাপনহীন নারীকেই সভ্যসামজে পবিত্র বলে মনে করা হয়। কিন্তু আদিবাসী সমাজে যৌনতার ধারণা সভ্য সমাজের চেয়ে পৃথক।

আদিবাসী নারীর যৌনতার সম্পর্ক বিশে-ষণের প্রশ্নে যে সমস্ত বিষয়ের উপর দৃষ্টি প্রদর্শন করতে হয় তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'ঘোটুল' বা Dormitory club । 'ঘোটুল' বলতে বোঝায় আদিবাসী সমাজের এমন একটি যৌন সম্পর্ক মূলক প্রতিষ্ঠান,যেখানে আদিবাসী যুবক যুবতীরা বিবাহের পূর্বে একত্রে বসবাস করতে

পারে। বিবাহের পূর্বে যুবক যুবতীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনে এই ঘোটুল-এর আয়োজন করা হয়। জাতি বিশেষে আদিবাসী সমাজে 'ঘোটুল' ভিন্ন নামে পরিচিত। ওরাওঁদের ঘোটুলকে বলা হয় 'ধুমকুরিয়া', মুন্ডাদের ঘোটুলকে বলা হয় 'গিটিওরা'। ঘোটুল-এ কিভাবে আদিবাসী যুবতীদের যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয় সে প্রসঙ্গে দেখা যায়, মুন্ডাদের ক্ষেত্রে গ্রামে একটি টোলা বা বাসস্থান নির্দিষ্ট করা থাকে যেখানে মুন্ডা যুবক যুবতীরা একত্রে মিলিত হয়। এই টোলা বা নির্দিষ্ট করা বাসস্থান কোন বৃদ্ধা বা বিধবা মহিলার গৃহেও হতে পারে। সন্ধ্যার খাবার পর এক একটি টোলায় মুন্ডা যুবক যুবতীরা মিলিত হয়। সেখানে তাদের বিভিন্ন লোককাহিনী শোনান হয় এবং তারপর যুবক যুবতীরা যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। এইভাবে ঘোটুলেই মুন্ডা যুবক যুবতীদের যৌন শিক্ষা হয়। ওরাওঁদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওরাওঁ মেয়েরা সাধারণত ঘোটুলেই রাত্রী যাপন করে। আর সেজন্য যুবতীদের ঘোটুলের উপর কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়। বস্তুত আদিবাসী যুবক যুবতীদের বিবাহের পূর্বে তিন বছর নির্দিষ্ট করা থাকে। এই তিন বছরের মধ্যে ঘোটুলেই তাদের যৌনশিক্ষা সম্পন্ন করতে হয়।

ঘোটুল-এ আদিবাসী যুবক যুবতীদের যৌন শিক্ষা সম্পর্কে ভেরিয়ার এলউইন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রেখে গেছেন। মুরিয়া জাতির মধ্যে ঘোটুল জীবন সম্পর্কে এলউইন বলেছেন, 'The Murias had a simple,innocent and natural sex.In Ghotul this was strengthened by the absence of any sence of guilt and general freedom from external interference .... this belief in sex as something good and normal gave the Murias as light touch .... Sex was great fun; it was the best of Ghotul games, it was the dance of enraptured bodies; it was an ecstatic swinging in the armes of the beloved. It ought not to be too intense; it must not be degrated by possessiveness or defiled by jealousy. It was belief that the best and most successfull sex relations were to be had in the modern Ghotul where partners often changed ....we may also consider how the Ghotul boys and girls were almost completely freedom those furtive and unpleasant vices that so mar our modern civilization. There was unknown, unthinkable. No motiary would ever give her body for money.

যৌন সম্পর্ক স্থাপনে আদিবাসী যুবক যুবতীদের ঘোটুল ব্যতীত আরও কিছু পন্থা প্রচলিত ছিল। কিছু ধর্মীয় উৎসবেও (বাহা ও শোহরাই) অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের রীতি প্রচলিত ছিল। আবার আখরার গান ও নাচগুলিতে রোমান্টিক যৌন আভাষ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে সরকারি শব্দ প্রকাশ করা না হলেও আভাষ ইঙ্গিতের মাধ্যমে যৌন কামনা প্রকাশ করা হয়। তাই দেখা যায় বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ঘটনা আদিবাসী সমাজে

নিষিদ্ধ না হওয়ায় আদিবাসী নারী তার নিজের ইচ্ছা ও পছন্দমতো জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে পারে। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমন পবিত্র সম্পর্ক বজায় থাকে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদিবাসী যুবক যুবতীদের মধ্যে বিবাহ বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত না হলেও তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধা থাকে না। বস্তুত ঘোটুল জীবন আদিবাসী সমাজে এতই জনপ্রিয় যে অল্প বয়স থেকেই উদাহরণ ও ব্যবহারিক শিক্ষার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের যৌন ক্রিয়ার কৌশল শেখানো হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসবের দিনে আনন্দ, নাচ গানের মাধ্যমে প্রণয় ক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে এবং তারপর কোন নির্জন বা গভীর অরণ্যে তার মিলিত হয়। অর্থাৎ বিবাহপূর্ব যৌন সংসর্গকে আদিবাসী সমাজে কুনজরে দেখা হয় না। সাঁওতালদের মধ্যেও দেখা যায় শোহরাই ও সরহুল উৎসবের দিনে যুবক যুবতীরা স্বাধীনভাবেই যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়। এই যৌন সংসর্গের ফলে সাঁওতাল মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে তবেই বিবাহের প্রয়োজন হয়। সংশি-ষ্ট যুবক বিবাহে সম্মতি না দিলে অপর কোন পুরুষের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দেওয়া হয়।

আধুনিক সমাজে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ঘটনাকে বিবাহ পরবর্তী অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও আদিবাসী সমাজে এর ভিন্নতর প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সেখানে বিবাহ বা যুবক-যুবতীদের সাংসারিক জীবনের সোপান স্বরূপ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়না। এটি হল একপ্রকার চুক্তি, ধর্মীয় নিয়ম কানুন সেখানে প্রযোজ্য নয়। বিবাহের বহু পন্থাই আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে। পরস্পরের সম্মতিক্রমে, পালিয়ে গিয়ে, বিনিময়ের মাধ্যমে, বন্দিনী করে, এমনকি ক্রয় করেও বিবাহ করা হয়ে থাকে। এসবের পাশাপাশি পিতামাতার দ্বারা আয়োজিত বিবাহের প্রচলনও আছে। যুবক যুবতী উভয়ের সম্মতিক্রমে পিতা মাতা বিবাহের আয়োজন করে। কিন্তু এক্ষেত্রে কন্যাপণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। হো সমাজে যদিও দেখা যায় যে স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর বয়স অনেক বেশি হয়। হো সমাজে মাঘী পরব উপলক্ষ্যে যুবক যুবতীরা অবাধে যৌন মিলন ঘটায় এবং এক্ষেত্রে অনেক বিবাহের ঘটনাও ঘটে। তবে হো সমাজের একটি বিশেষত্ব আছে, নারী পুরুষের দীর্ঘকালীন প্রণয় সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার কোন বাধ্যবাধকতা প্রথা এখানে নেই। কিন্তু অর্থ উপার্জনের জন্য অন্যত্র যেতে হলে দীর্ঘকালীন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যে নিয়মিত যৌন সংসর্গ ঘটলে তবেই তাদের স্বামী স্ত্রী বলে গণ্য করা হয়।

আদিবাসী নারীদের এই যৌন স্বাধীনতার ধারণাটি যদিও অনাদিবাসী সমাজের চোখে ভিন্নতর অর্থ বহন করে। আধুনিক সভ্য সমাজ আদিবাসী নারীদের গণিকা হিসাবেই গণ্য করে। যেকারণে দেখা যায় কোন আদিবাসী নারী কর্মের জন্য অন্যত্র গমন করলে অনাদিবাসী পুরুষ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। এমনকি কনট্রাক্টর বা কর্মরত শ্রমিকরাও বলপূর্বক আদিবাসী নারীকে ধর্ষণ করে থাকে। এই যৌন সম্পর্ক বা ধর্ষণের ফলে আদিবাসী নারীটি অন্তঃসত্ত্বা বা গর্ভবতী হয়ে পড়লে আদিবাসী সমাজ তাকে মেনে নেয় না এবং সে আদিবাসী সমাজ থেকে বহিস্কৃত হয়। আদিবাসী পুরুষ কোন অনাদিবাসী পুরুষ কর্তৃক ব্যবহৃত নারীকে বিবাহ করতে রাজি হয় না। যদি সেই নারীর নিজস্ব জমি থাকে এবং প্রচুর অর্থ প্রদান করে, তবেই তাকে আদিবাসী সমাজে গ্রহণ করা হয়।

বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ প্রথার প্রচলন আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে। বিবাহ বিচ্ছেদের পশ্চাতে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে। সাধারণ কারণগুলির মধ্যে সাংসারিক অশান্তি, অসুস্থতা,বিশ্বাসঘাতকতা,যৌন সংসর্গে অক্ষমতা, সন্তান ধারণে অক্ষমতা ইত্যাদি। তবে বিবাহ বিচ্ছেদের দ্বারা আদিবাসী সমাজে নারীরা তাদের পূর্বতন মর্যাদা হারায়। সমাজে তাদের নিচু চোখে দেখা হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহ সহজ হলেও নারীর ক্ষেত্রে মোটেই সহজ ছিল না। সাধারণত বিবাহ বিচ্ছিন্না আদিবাসী নারীকে কোন পুরুষ বিবাহ করতে রাজি হয় না। সমাজের চোখে পরিত্যক্তা কোন আদিবাসী নারীকে কোন আদিবাসী পুরুষ বিবাহ করতে রাজি হলে তাকে যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কেননা, বিবাহ বিচ্ছিন্না আদিবাসী নারীকে সমাজে অনৈতিক বিপদ হিসাবে গণ্য করা হয়। তাছাড়া আদিবাসী সমাজে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রচলন থাকায় খুব সহজেই কোন বিবাহ বিচ্ছিন্না নারকিে ডাইনী আখ্যা দিয়ে সমাজ থেকে বহিষ্কার বা হত্যা করা হয়। সেক্ষেত্রে সেই নারীকে বিবাহ করতে রাজি হওয়া পুরুষকেও রেহাই দেওয়া হয় না। আদিবাসী সমাজে এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। যাইহোক হো, সাঁওতালরা এক বিবাহে বিশ্বাসী হলেও ভূতিয়া, নাগারা জাতি বহু বিবাহ করে থাকে।

আদিবাসী নারীর উপর পুরুষের যৌন শোষণ ও নিপীড়ণ ঃ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আদিবাসী নারী সভ্য জগতের নারীদের তুলনায় বেশি ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হলেও নানা ভাবেই নারীর যৌনতার উপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ থেকে আদিবাসী সমাজে নারীদের মর্যাদার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। সাধারণতঃ বেশ কিছু ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীরা পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। রজঃস্বলা, অন্তঃসত্ত্বা ও শিশু জন্মানোর সময় আদিবাসী নারীর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। আবার কৃষিজমিতে লাঙল চালানোর ক্ষেত্রেও নারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা অবশ্য আদিবাসী সমাজ বিশেষে ভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন - মাতৃতান্ত্রিক সমাজে রজঃস্বলা থাকাকালীন নিষেধাজ্ঞা মান্য করা হয় না। আবার সাঁওতাল, ওরাওঁ, খারিয়া মেয়েদের লাঙল চালানোর ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। অন্যদিকে অস্ত্র চালনা, গৃহের ছাউনি তৈরী করার ক্ষেত্রে বাধা থাকলেও যে সব পরিবারে কোন পুরুষ সদস্য নেই, সেখানে মেয়েরাই সব ধরণের কাজ করে। খারিয়া মেয়েদের রজঃস্বলা থাকাকালীন কোন উৎসবে যোগ দিতে দেওয়া হয় না এবং অতিথি সেবন করতেও বাধা দেওয়া হয়।

এই ধরণের নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসাবে দেবনাথন ও গোবিন্দ কেলকার কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তাদের মতে লাঙল চালনা,ছাউনি তৈরীর মত কর্মে পুরুষরা আনুষঙ্গিক হিসাবে নারীকে ব্যবহার করে থাকে। নারী সহযোগিতা না করলে পুরুষের কাজ সম্পন্ন হয় না। কিন্তু এসবের দ্বারা পুরুষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে নারী শেষ পর্যন্ত পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়। আবার উৎসবের দিনে নারীকে উৎসবে অংশগ্রহণ করতে না দেওয়ার মাধ্যমে আসলে বলী দেওয়া পশুর উপর নারীর অধিকারকে অস্বীকার করা হয়। অস্ত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ আরোপ করে অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার

কেবল পুরুষদের সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়ছে। এই ভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সামাজিক সম্পর্কে লিঙ্গের ভূমিকাকে বাখ্যা করে এবং যৌনতার সঙ্গে স্বাধীনতা ও নির্ভরতার সম্পর্কের সত্যতাকে প্রমাণ করে।

নারীর যৌনতাকে আদিবাসী পুরুষ অন্যভাবেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোন আদিবাসী নারীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকলে তা তার স্বামীর নিকট বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় বহন করে। ওরাওঁ সমাজে কোন নারী তার স্বামীকে পরিত্যাগ করে অপর কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন বা বিবাহ করলে সেই নারীর পিতামাতাকে কন্যাপণ পরিশোধ করতে হয়। আবার মাল পাহাড়িয়া আদিবাসী সমাজে স্ত্রী যদি ব্যভিচারের অবিযোগে পরিত্যক্ত হয় তাহলে সেই দ্বিতীয় পুরুষকে কন্যাপণের সকল অর্থ সংশি-ষ্ট নারীর স্বামীর হাতে প্রত্যার্পন করতে হয়। অর্থাৎ আদিবাসী সমাজে নারীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে সে রকম অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না। আর্থিক ক্ষতি পূরণ করে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে। আদিবাসী যৌন জীবনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে আদিবাসী নারী পুরুষের একাধিক বিবাহ। কোন আদিবাসী পুরুষ যৌন জীবনে অতৃপ্তি বোধ করলে অপর কোন নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারে। এক্ষেত্রে বিবাহ হতেও পারে, নাও পারে। প্রথম স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিলেই হয়, সমাজের তাতে কোন আপত্তি থাকে না। হো সমাজে হো পুরুষের দুটি বিবাহ হয়ে থাকে। প্রথম স্ত্রী স্বামীকে কৃষিকাজে সাহায্য করে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী সংসারের দায়িত্ব পালন করে।

সুতরাং অস্বীকার করার উপায় নেই যে আদিবাসী নারীর যৌনতাকে পুরুষ লিঙ্গের বহিরাকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। নিজের দেহ এবং যৌনতার উপর আদিবাসী নারীর অধিকারহীনতাকে পুরুষ শাসনের বৃহত্তর দিকের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। নারীকে দমন করা পুরুষের অন্যতম হাতিয়ারই হল যৌনতা। তাই আদিবাসী সমাজ এবং পুরুষের নিকট যৌনতা ও লিঙ্গের ধারণা আলাদা কিছুই নয়। তাই ক্যাথারিন ম্যাককিনন বলতে পেরেছিলেন, 'Sexuality ..... is a form of power. gender as socially of constructed embodies it. not reverse. Women and are devided by gender. made in to the sexs. as we know them. by social requirements of heterosexually. which institutionalize male sexual dominance and female sexual submission. if this is true. sexuality in the linchpin of gender equality'. [Feminism, Marxism, Method and state : An Agenda Theory - Catherine Mac Kinon.]

এইভাবে আদিবাসী সমাজে দেখানো হয় আদিবাসী নারীর যৌনতার উপর পুরুষের কর্তৃত্ব চরম। এই কর্তৃত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে জাতি বিশেষে কিছু বিশেষ রীতিনীতি প্রচলিত আছে। ওরাওঁদের মধ্যে একটি রীতির চল আছে। গ্রীষ্মকালে ওরাওঁ পুরুষেরা শিকারে গেলে ওরাওঁ মেয়েদের যৌন আকাঙ্খা সংবরণ করতে হয়। পুরুষের অনুপস্থিতিতে গ্রামে অবস্থিত মেয়েরাই পুরুষের মত পোশাক পরে, পুরুষদের মত আচার ব্যবহার বজায় রাখে।

এই রীতির পশ্চাতে একটি কারণ হতে পারে, গ্রামের বাইরে যাতে প্রকাশ না পায় যে আদিবাসী গ্রামে পুরুষেরা নেই। তাই শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে এই পন্থার আশ্রয় নেওয়া হয়। আরেকটি মত হল গ্রামের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক থাকলে পশু শিকারেও সাফল্য আসবে। কিন্তু সাঁওতালদের ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষের অনুপস্থিতিতে অপর কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হলে তা এক অশুভ লক্ষণ রূপে বিবেচিত হয়। মনে করা হয় স্ত্রীর ব্যভিচারের কারণে তাঁর স্বামীকে হিংস্র পশু খেয়ে ফেলেছে। তাই যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণের অর্থই হল পশুকে বশে আনা। নারী নিজের যৌন আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে স্বামীর সৌভাগ্য এবং সাফল্যের পথ পরিষ্কার করে দেবে।

যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা বিবাহের ক্ষেত্রে আদিবাসী নারী স্বাধীনতার অধিকারী হলেও তাকে বহু ক্ষেত্রেই পুরুষের অধীনে থাকতে হয়। লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার আদিবাসী নারীদের জীবনকেও বাধ্য করেছে পুরুষের কর্তৃত্বে থাকতে। আদিবাসী সমাজে নিজস্ব মৌখিক আইন আছে, যা অমান্য করলে নারীকে শাস্তি পেতে হয়। কিন্তু এই আইনের দ্বারা আসলে পুরুষের পক্ষপাতিত্বের সুযোগ করে দেওয়া হয়। নকশাল আন্দোলন, লালগড় আন্দোলনে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের খবর বারে বারেই সংবাদপত্রের শিরোনামে থেকেছে। সমাজ, রাষ্ট্র এবং পুরুষের কাছে তাদের একটাই দাবী - মর্যাদা। বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কর্মসূচীর দ্বারা আমাদের দেশ অগ্রসর হলেও আদিবাসী নারীদের উন্নয়ণের বিষয়টি আদৌ কি কোনদিন সুবিচার পাবে ?

তথ্যসূত্র ঃ

১। সাঁওতাল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস — বুদ্ধেশ্বর টুডু, জ্ঞানপীঠ পাবলিশার্স , কোলকাতা -০৭, ২০১৫।

২। পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত — দেবশ্রী দে, সেতু প্রকাশনী, কোলকাতা-২৬, ২০১৫।

৩। মানভূমের স্বাধীনতা আন্দোলন — দিলীপ কুমার গোস্বামী, পারিজাত প্রকাশনী, বিদ্যাসাগর পল্লী, পুরুলিয়া, ২০১২।

4. The Tribals World of Verrier Elwin : An Autobiography - Verrier Elwin, Oxford University Press, London, 1964.

মনোশৈলী : সাহিত্যালোকের একটি তাত্ত্বিক প্রস্থান

ডঃ শ্যামলচন্দ্র দাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যক্তি রয়েছে স্বতন্ত্র কল্পনাশীল মন। এই মনের স্তরগুলি হল সচেতন (conscious), অবচেতন (Subconscious), নির্জ্ঞান (Unconscious)। নির্জ্ঞানের আবার তিনটি স্তর — অহং (ego), অদস (id) ও অধিশাস্তা(superego)। ফ্রয়েডীয় মনের ধারণা অবশ্য চেতনাপ্রবাহ পর্যন্ত বিস্তৃত। যাইহোক, বিচিত্র ব্যষ্টিমনের নানা দিক সাহিত্যের বাচনের সঙ্গে বিজড়িত। ব্যষ্টিদৃষ্টি (world view)ও। চরিত্র, স্রষ্ঠা পাঠকের ক্ষেত্রে এই মনের স্তরগুলি ভাষায় উঠে আসে সাহিত্যের বাচনের সঙ্গে জড়িত হয়ে। এর একটি ক্ষেত্র এখানে সংকে।সপে বিশে-ষিত হবে।

মনোশৈলী ঃ সংজ্ঞা ও বিবর্তন

পরিভাষাটির সর্জন করেন ১৯৭৭ খ্রীঃ Roger Fowler,তাঁর ‘Linguistics and the Novel’ গ্রন্থে। এর বাংলা পরিভাষা করা যায় ‘মনোশৈলী’। আলোচক ফাওলার এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে - ‘Cumulatively, consistent structural options, agreeing in cutting the presented world to one pattern to(an) other, give rise to an impression of a world-view,what I shall call a ‘mind style’। বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় - নির্বাচনির গঠনমূলক সঙ্গত প্রস্থসমূহ, ছিঁড়ে কেটে এক বা অন্য আদলে উপস্থাপিত জগৎ, একিত্রত করলে উঠে আসে ব্যষ্টি দৃষ্টির এক একটি স্বতন্ত্র অবয়ব, যাকে আমি বলবো মনোশৈলী। এই ইংরেজী পরিভাষাটির সংজ্ঞা ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রাপ্তির চার বছর পর এই মনোশৈলীর ধারণাটি বিশদীকৃত হয় G.N.Leech &M.H.Short দ্বারা, ‘Style inFiction’ গ্রন্থ -এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে। অতঃপর পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব গবেষকদের নানা উদ্যোগে এই তাত্ত্বিক প্রস্থানের সমৃদ্ধি ঘটেই চলেছে নানা দৃষ্টিকোণে। যেমন Louise Nuttal,Elena Semino প্রমুখের গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রসঙ্গত কর্তব্য (আগ্রহী পাঠক, আন্তঃজাল (internet)-এর সৌজন্যে লেখাগুলি পড়ে নিতেও পারেন)।

দৃষ্টিকোণ ও মনোশৈলী ঃ

উভয় ধারণাই ব্যষ্টিদৃষ্টির রকমফের। সেজন্য এই দুই ধারণাকে ফাউলার সমতুল্য হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু তা যথার্থ নয়। দৃষ্টিকোণ হল ধ্যানধারণা,চিন্তাচেতনা (ideological) নির্ভর; যা Uspensky-র মতে, ‘point of view on the ideo-

logical plane' বা ধ্যানধারণা বিকাশের স্তর। এটি মূলত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ইত্যাদি ভিত্তির উপর স্থিত। অন্যদিকে মনোশৈলী প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত, অভিজ্ঞতাজাত ও জ্ঞানগর্ভ (congnitive)বিশদ নিষ্প্রয়োজন।

আলঙ্কারিক ভাষা ও মনোশৈলী ঃ

সাধারণ ভাষীরাও অনেকসময় প্রয়োগ করে থাকে। যেমন - চক্ষু চড়ক গাছ, ভয়ে কাঠ, চাঁদমুখী, অগ্নিশর্মা ইত্যাদি। একালের মুঠোফোনাসক্ত ভাষীরা অনেকসময় ফোনের ভাষায় গভীর অর্থ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে থাকে,যেমন টাওয়ার, ডিলিট ইত্যাদি। সাহিত্যের কিছু কিছু বয়ানের নামও রূপক বা অলঙ্কারে অন্বিত হয়ে প্রদত্ত হয়। যথা - গৃহদাহ, চোখের বালি, বিষবৃক্ষ, রক্তকরবী ইত্যাদি। কথাসাহিত্যের লেখক বা চরিত্ররা এই ভাষা দিয়ে মনের এক একটি ধারণা বা রূপ ব্যক্ত করে থাকে।

প্রয়োগতত্ত্ব ও মনোশৈলী ঃ

ব্যক্তি অনুযায়ী জ্ঞাপনের রকমসকম হয়ে থাকে, হয়ে থাকে চরিত্রানুযায়ী। ব্যক্তিভাষী বা চরিত্রের পার্থক্য হয়ে থাকে মূলত নিভাষা (ideolect), অঙ্গভাষা (body language), অধিধ্বনি (suprasegments), স্পর্শন ইত্যাদির প্রয়োগের দিক থেকেও। আবার একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনের চোখে জগতকে দেখা হলে অন্য চরিত্রের মনোদর্শন হয়ে যায় বিকেন্দ্রীভূত, অপ্রধান। যেমন একক চরিত্রের দেখা ও দেখানো জীবন ও জগৎ রয়েছে 'রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর, গোরা, দেবদাস, মনের মানুষ (লালন ফকির সম্পর্কিত) ইত্যাদি উপন্যাসে কমলাকান্তের দপ্তর ইত্যাদি রচনায়। আবার গুটি কয় মনের দর্শন 'রজনী' (রজনী, শচীন্দ্র, অমরনাথ)'ঘরে বাইরে' (নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ) ইত্যাদি উপন্যাসে 'পঞ্চভূত' (ক্ষিতি, স্রোতস্বিনী, দীপ্তি, ব্যোম, সমীর ও ভূতনাথ) ইত্যাদি রচনায়।

ভাষাংশ ভাষাবিজ্ঞানমূলক (corpus Linguistic) পদ্ধতি ও মনোশৈলী ঃ

পদগুচ্ছ বা অন্বয়কে ভাঙলে পাই শব্দ বা রূপিমের স্তর। এই শব্দ বা রূপিমের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করলে স্রষ্টা বা চরিত্রের মনোশৈলী অনেকখানি স্পষ্টতা পায়। বাংলা সফটওয়ার দিয়ে বর্তমানে একাজ হয়তোবা করা যেতে পারে। যদিও ইংরাজির মতো নয়। অন্তত মাইক্রোসফট্ অফিস ওয়ার্ডের মতো। যাই হোক 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসের 'মৃত্যু' বা মরন সম্পর্কিত শব্দান্তরসমূহ ধরে বিচার করলে লেখক শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কিত মনোশৈলী অনায়াসে বোঝা যায়।

বিকারতত্ব ও মনোশৈলী ঃ

মানসিক বা শারীরিক ভাবে সমস্যাযুক্ত ভাষী বা চরিত্রদের প্রযুক্ত ভাষাগত উপাদান আলাদা হওয়ায় উচিত। সাহিত্যে এই জাতীয় উপাদান ব্যবহার করে বিপরিচিতিকরণ (defamilairization) ঘটানো হয়ে থাকে। যথা - অবশব্দসংক্রামায়ণ (Under

lexicalization) শব্দসংক্রামাধিক্য (over lexicalization), শব্দঘাটতি বা পদগুচ্ছ বিকল্পন ইত্যাদি প্রসঙ্গত স্মর্তব্য। শুধু মানসিক বা পরিবেশীয় নয়, বাক্যন্ত্রের ত্রুটিসহ অন্যান্য কারণও এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'-র 'রেলওয়ে' অংশে প্রাপ্ত জ্ঞানানন্দ বাবাজীর উচ্চারণ এক্ষেত্রে লক্ষণীয় - 'ঠিক বঁলেঁচো দাঁদাঁ, ওরাঁ ভক্তাঁর কাছে উপদেঁশ পাঁঞি নাঁঞি, ওঁঞাদের রাঁমা রঁঞ্জিকার পাঁঠ দেওঞা উঁচিত, দাঁদাঁ শুনেচি বিবিরাঁ নাঁকি রাঁমারঁঞ্জিকা পড়ছেঁ !, দাঁদাঁ অ্যাঁকট্যা সংকীর্ত্তন ইঁক,শুঁধু শুঁধু বসে কাঁল না হরছে এঞ্ন্না, দাঁদাঁ সর্ব্বনাশঞ হলো! সর্ব্বনাশঞ হলো! আমার গেঁজেটি নাই। অবশ্য এই অতিনাসিক্যতা(hyper-nasality) এখানে হাস্যরসের খোরাক হয়ে উঠেছে। অনুরূপ বিকার 'রাণুর তৃতীয় ভাগ'-এর 'বর ও নফর' অংশে লব্ধ গণশা চরিত্রে, 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের গডাঢর চন্দ্র চরিত্রে, 'লম্বকর্ণ' ছোটগল্পের লটবর লল্‌দি ইত্যাদি চরিত্রে।

অন্যান্য ভাষাগত উপাদান ও মনোশৈলী ঃ

কোন এক চরিত্র বা ভাষীর কথা অন্য কোন চরিত্র বা ভাষী সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে নেতি,কূটভাষ, অস্বাভাবিক ভাষা উপাদান ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। যথা - 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ 'কমলাকান্তের জবানবন্দী'। এই অংশে কমলাকান্ত তার বয়স সম্পর্কে বিচারককে জানায় আমার বয়স '৫১ বৎসর, দু মাস, ১৩ দিন, চার ঘন্টা,৫ মিনিট ...' আবার অনেকে অসম্পূর্ণ বাক্য, মূদ্রাদোষ (যথা 'মানে কথা', 'হল গিয়ে' ইত্যাদি পুনরাবৃত্তি), অতি বিরাম বা প্রায় অবিরাম একটানা বাক্ ব্যবহার ইত্যাদি করে থাকে। এ ধরণের ভাষা উপাদান ব্যবহার আসলে এক একটি ভাষী বা চরিত্রের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র মনেরই প্রতিফলক।

সাহিত্যপাঠে মনোশৈলীর উপযোগিতা ঃ

আখ্যান, নাটক, কাহিনীমূলক কবিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই শৈলীর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। পুনরুলি-খিত হলে উপযোগিতার কয়েকটি দিক সংক্ষেপে এভাবে উলে-খ করা যায়।

প্রথমত, চরিত্র, স্রষ্টা এমনকি পাঠকেরও ব্যক্তি মন এবং এর সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক ইত্যাদি সন্ধান করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক ভাষাগত উপাদান যেমন ধ্বনি, রূপিম, পদগুচ্ছ, অন্বয় ইত্যাদির সঙ্গে ব্যষ্টি-দৃষ্টির যে গূঢ় বন্ধন রয়েছে তার অনুসন্ধানও করা যায়।

তৃতীয়ত, আলঙ্কারিক ভাষা ইত্যাদি প্রয়োগের সঙ্গে মনের সাময়িক ও স্থায়ী স্তরগুলির সাযুজ্য সন্ধান করা যেতে পারে।

চতুর্থত, ভাষার বিচ্যুত - বিকৃতি উপাদানের সঙ্গে চরিত্রাদির মনের সম্পর্ক -সূত্র সন্ধান করা সম্ভব।

আলোচ্য তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাসমূহ ঃ

এই তত্ত্বের ত্রুটিবিচ্যুতির নানা দিক অবশ্যই বিদ্যমান। সেগুলি এভাবে সংক্ষেপে

উলে-খ করা যায়।

মনোশৈলীর বদলে ব্যষ্টি দৃষ্টি-ই অধিকতর গ্রহণযোগ্য পরিভাষা কারণ কথাসাহিত্যের প্রায় কল্প জগতের সঙ্গে মানানসইও বটে। যেহেতু ব্যক্তিচরিত্রের জ্ঞান-বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যায়। এই সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ মনোশৈলীতে বিধৃত হয় না। কেবল ব্যক্তিনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাজাত মন - মেজাজটুকুই কেবল ধরা পড়ে।

আরও একটি পারিভাষিক প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উত্থাপন করা যায়, যথা - Palmer এর fictional mental functioning বা কল্পিত মনের নির্বাহন ক্রিয়া। এই ক্রিয়া ধরলে ব্যক্তিচরিত্র বা লেখকের মানসক্রিয়া, যথা - চিন্তাভাবনা, অভিপ্রায়, স্মৃতি, আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখের অনুভূতি, প্রক্ষোভ ইত্যাদি সহজেই বোঝা যায়। এই দিক মনোশৈলীর ধারণায় ততটা স্পষ্টতা পায় না।

উপন্যাস বা গল্প, নাটকের কথা ধরলে স্রষ্টা ও চরিত্রের মনোশৈলী কি ছিঁড়ে কেটে আলাদা করা সম্ভব ? মন মেজাজ ও ভাষাগত নির্বাচনে একাধিক চরিত্র ‘think alike’ হলে মনোশৈলীর স্বাতন্ত্র্য কিভাবে প্রদর্শন সম্ভব ? তখন একটি চরিত্রের মনোশৈলীর সঙ্গে অন্য চরিত্রের মনোশৈলীর বিভাজন করা যাবে কীভাবে যদি একের কথা অন্যে উচ্চারণ করে? একটি আখ্যান অবলম্বনে এক একটি চরিত্রের মনোশৈলীর কোথায় শুরু, কোথায় শেস, কোথায় একীভূত বা স্বাতন্ত্র্য দ্যোতক তা স্পষ্ট করে দেখানো কি সবসময় সম্ভব ? সম্ভবত নয়।

অবশেষের নটেগাছটি ঃ

এই পরিভাষা তত্ত্বটি প্রায় চলি-শ বছর হল সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে লাগু হয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যালোকরা আজও সমৃদ্ধির জন্য ভাবছেন, ভাবীকালে আরও হয়তো ভাববেন। এর ঋদ্ধি - সমৃদ্ধি ভাবীকাল উপহার দেবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা। আবার এও হতে পারে, এই তাত্ত্বিক প্রস্থান থেকে আলাদা কোন সাহিত্য বিচার পদ্ধতিও হয়তো সর্জিত হবে। এইভাবে দেখলে তত্ত্বটির মূল্য সাহিত্যালোকনের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না।

তথ্যঋণ ঃ

লেখককৃত কয়েকটি ভাষাশৈলী বিষয়ক প্রবন্ধ ও গবেষণা নিবন্ধ, কিছু আন্ত ঃজালিক তথ্য, দুএকটি বাংলা ইংরেজি অভিধান ও পরিভাষাকোষ ইত্যাদি এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

লাবণ্যর প্রেমের বন্যা - ভাসছে অমিত সাঁতার কাটছে শোভনলাল

- সোমাশ্রী সরকার

বাংলা সাহিত্যে প্রেম এসেছে বাব বার, নব নব রূপে, নব নব ভাবে। কখনো রাধার বিরহ প্রেম, কখনো চৈতন্য প্রেম, কখনো ওপু দুর্গার প্রকৃতি প্রেম, কখনো বা রোহিনীর পরকীয়া প্রেম হয়ে। রবীন্দ্র সাহিত্যেও প্রেম এসেছে বারবার। নব রূপে, নব ভাবে। কখনো তা বিনোদিনীর প্রেম হয়ে, কখনো নন্দিনীর প্রেম হয়ে, কখনো বিভা রতন সুভার প্রেম হয়ে, আবার কখনো সুচরিতার প্রেম হয়ে। তেমনই রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি ‘শেষের কবিতা’র লাবণ্য। লাবণ্যর প্রেমও হয়ে উঠেছে বাস্তব ও কল্পনার মেলবন্ধনে সীমার মধ্যে অসীম, না পাওয়ার মাঝে অনেকখানি পাওয়া। চিরন্তন এক শাশ্বত প্রেম,যে প্রেমের পরশ মনের অন্দর মহলে।

লাবণ্য লাবণ্যময়ী, সে অনন্যা, আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা। আর তার এই স্বরূপের মধ্যেই তার প্রেমিকা সত্ত্বা বিরাজমান, যে সকালবেলার একফালি রোদ, যে রোদ, চারিদিকে অন্ধকারকে সরিয়ে আলোর রূপ ফুটিয়ে তোলে। লাবণ্য অমিতের মধ্যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়েছে, যে প্রদীপের শিখা হয়ে সে নিজে জ্বলেছে। অমিতের সাথে লাব্যণর প্রথম সাক্ষাৎ হয় শিলং এর নির্জন পাহাড়ে। সেই নির্জনতাই হয়তো তাদের প্রথম প্রেমের ছোঁয়া দিয়ে গেল। এরপর শুরু হল তাদের আলাপের আরম্ভ। শোভনলালকে প্রত্যাখ্যান করে লাবণ্য যখন নতুন করে নিজেকে প্রস্তুত করছে তখনই অমিতের সঙ্গে তার আলাপ তার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। ক্রমশ অন্তরঙ্গতা পেল তাদের নতুন আলাপ। তারা নিজেদের নিজেদের কাছে নতুন পরিচয়ে পরিচিত করল। অমিত হয়ে উঠল লাবণ্যের ‘মিতা’ ও লাবণ্য হয়ে উঠল অমিমতের কাছে ‘বন্যা’ - যাকে শত চেষ্টা করেও আটকে রাখা যায় না। সব কিছু ভাসিয়ে আপন স্বরূপে সে ছুটে চলে। লাব্যণ নতুন প্রেমের পরশ পেল। সে নিজের প্রেমিকা সত্ত্বাকে নিজেই আবিষ্কার করল। অমিতের মধ্যে লাবণ্যই প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়েছিল। তাই অমিতের ভাবনা - “আমাদের সকলের চেয়ে বড় যে পাওনা সে মিলন নয়, সে মুক্তি।” লাবণ্যের মধ্যে প্রেমের পরিপূর্ণতা আসতেই সে প্রেমকে আপন সত্ত্বায় বেধে না রেখে মুক্তি দিতে চেয়েছে। তার প্রেম থাক নিরঞ্জন হয়েই। লাবণ্য প্রেমের আসল স্বরূপ বুঝতে পেরেছে। অমিতকে ত্যাগের মধ্যেই লাবণ্যর প্রেম হয়ে উঠেছে এক চিরন্তন শাশ্বত প্রেম, যেখানে কোন কামনা বাসনা নেই, আছে ত্যাগ, মুক্তি ও চিরন্তন এক দীপ্তি।

‘শেষের কবিতা’য় সাংসারিক প্রেমের বাইরে এক চিরন্তন প্রেমের রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। তাইতো শিলং এ নির্জন পাহাড়ের মধ্যে লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, যা চিরন্তন। লাবণ্যর প্রেমিকা সত্ত্বাকে জাগিয়ে তোলার জন্য দরকার অমিতের প্রেমের স্পর্শ, অমিতের প্রেমের স্পর্শেই লাবণ্যর সেই সত্ত্বা জেগে ওঠে। তাই অমিতের মুখে, “For

God's sake, hold your tongue / and let me love !" শুনে লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে। দুজনে দুজনকে নতুনভাবে চিনতে শুরু করে। লাবণ্যের নতুন পরিচয় হয় 'বন্যা' নামে, আর অমিতের নতুন নাম হয় 'মিতা'। মিতা অর্থাৎ বন্ধু, অমিত লাবণ্যের জীবনের চিরবন্ধু হয়ে ওঠে। লাবণ্য বুঝতে পারে এই প্রেম বিবাহের জন্য নয়। অমিতের যে সহজে কিছু পছন্দ হয় না, এই তার ভয়। সে একথা বুঝেছে যে রুচির তৃষ্ণা মেটাতেই অমিত তার সঙ্গ চায়। "মিতা তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না।" লাবণ্য তার কর্তামাকেও জানিয়েছে বিয়ে করে সে দুঃখ দিতে চায় না, বিয়ে সকলের জন্য নয়। "বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।" বিয়ে যে প্রেমের এক বন্ধন লাবণ্য তা বুঝেছে। তাই সে সেই বন্ধন থেকে প্রেমকে মুক্ত করতে চেয়েছে। বিবাহের বন্ধনে তার প্রেমকে বাঁধতে চায়নি। কিন্তু লাবণ্যও ভালোবাসে, সারা পৃথিবীকে সে শোনাতে চায় - শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। লাবণ্য স্বীকার করে যে - "আমি তো ভেবে পাইনে, আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। বর্ষণমুখর দিনে লাবণ্য আকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করছে অমিতের জন্য। অমিতের সঙ্গে সে পায়ে পা মিলিয়ে পথ চলতে চেয়েছে অমিতের হাত ধরে —

"আমরা যাব যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি,
ডুবি যদি তো ডুবি না কেন
ডুবুক সবই , ডুবুক তরী।"

উভয়ের প্রেমের স্পর্শে উভয়ে পূর্ণতা পেল। অমিতের প্রতি লাবণ্যর প্রেমের অকপট স্বীকারোক্তি

"মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ।"

আবার পরক্ষণেই লাবণ্য অমিতকে বলছে যে "তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে।" লাবণ্য বুঝতে পেরেছে যে অমিত যতই তার অনেক কাছে থাকুক সে আসলে তার থেকে অনেক দূরেই রয়েছে, যে প্রেমকে দূর থেকে দেখা যায়, অনুভব করা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না। শেষ সন্ধ্যায় লাবণ্য তাই বলে উঠেছে —

"তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে। ....
শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।"

প্রেম সে তো ভালোবাসতে চায়, ভালোবাসা পেতে চায়, দিতে চায়। তাই সেই প্রেম যখন পূর্ণতা পায়, তখনই সেই প্রেমকে হারানোর ভয় গ্রাস করে। এটাই তো প্রেমের ধর্ম, প্রেমের পরীক্ষা। লাবণ্যর প্রেমও পূর্ণতা পেয়েছে, লাবণ্যও সেই হারানোর ভয়ে ভীত

হয়েছে। আর লাবণ্যর এই ভীতি সত্য হয়ে উঠেছে কেতকীর আবির্ভাবে। লাবণ্য যখনই শুনলো অমিত কেতকীকে আংটি দিয়েছে তখনই সেই বন্ধন থেকে লাবণ্য অমিতকে মুক্তি দিতে চেয়েছে। হঠাৎ সেই সময়ই শোভনলালের সাথে লাবণ্যর আবার সাক্ষাৎ ঘটে। আজ আর লাবণ্য তার ভালোবাসাকে অস্বীকার করতে পারেনি। তাই শোভনলালকে সে বলেছে, "তুমি আমার সকলের বড়োবন্ধু।" একদিন লাবণ্য শোভনলালকে অপমান করেছিল এবং লাবণ্যের উক্তিতে শোভনলাল যে ব্যথা তার অন্তরে লুকিয়ে রেখেছিল তখনই সেই প্রেম চিরন্তন প্রেমের আকার ধারণ করেছিল। "যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় এক অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উল্টো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বুঝি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসেছিল।"

অমিতের সাথে কেতকীর বিবাহ স্থির হয় এবং লাবণ্য শোভনলালকে তার ভালোবাসায় আপন করে নেয়। অমিত যতিশংকরকে জানিয়ে ছিল লাবণ্যর প্রেম হল দিঘির জল, যে দিঘি কখনো ঘরে আসে না অথচ সেই দিঘির জল ঘড়ায় ভরে ঘরে আসে, তা নিত্য দিনের প্রয়োজন মেটায়। তা পান করেই বেঁচে থাকতে হয়। সেই ঘড়ায় তোলা জল হল কেতকী, যা দিঘির জলেরই সামান্য অংশ বিশেষ। কিন্তু দিঘি সে তো অফুরন্ত, সেখানে মুক্ত বাতাস, খোলা আকাশ, সেই দিঘি যাকে সামান্যে ধরে বেধে রাখা যায় না। লাবণ্য সেই দিঘি, তাই তার প্রেম সামান্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা অনন্ত শাশ্বত। সেই দিঘিতেই সাঁতার দিক অমিতের মন।

আবার শোভনলালের প্রতি লাবণ্যের প্রেম স্বপ্ন নয়, সে প্রেম সত্য বাস্তব, পূজার অর্ঘ্য স্বরূপ। লাবণ্য স্বীকার করেছে —

"যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।"

আবার লাবণ্য অমিতের কাছে একথাও স্বীকার করেছে যে —

"তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।"

লাবণ্য প্রেমকে ত্যাগের মধ্য দিয়ে, গ্রহণের মধ্য দিয়ে চিরন্তনত্ব দান করেছে, উত্তীর্ণ করেছে স্বর্গে, মহিমান্বিত করেছে এক অদ্ভুত মহিমায়। লাবণ্য তার প্রেমকে দৈনন্দিনতার ভিড়ে হারিয়ে ফেলে ভোগের সামগ্রী করে তোলেনি। তাই তার প্রেম হয়ে উঠেছে শাশ্বত। কখনো অমিত তাতে সাঁতার দিয়ে গা ভাসিয়েছে, কখনো শোভনলাল নীরবে সেই প্রেমকে পূজা করেছে। আর লাবণ্য তার প্রেমের বন্যায় ভালোবাসাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। তার প্রেম গমন করেছে ভাবলোকে। বন্যাকে যেমন বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় না, তেমনই লাবণ্যর ভালোবাসাও বাধাহীন। লাবণ্য বার বারই শূন্যকে পরিপূর্ণ করেছে। তাই লাবণ্যর প্রেম হয়ে উঠেছে চিরন্তন, শাশ্বত, অনন্ত, না পাওয়ার মাঝেও অনেকখানি পাওয়া।অমিতের প্রেমের স্পর্শেই লাবণ্যর সেই সত্ত্বা জেগে ওঠে। তাই অমিতের মুখে, "For God's

sake, hold your tongue / and let me love !" শুনে লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে। দুজনে দুজনকে নতুনভাবে চিনতে শুরু করে। লাবণ্যের নতুন পরিচয় হয় 'বন্যা' নামে, আর অমিতের নতুন নাম হয় 'মিতা'। মিতা অর্থাৎ বন্ধু, অমিত লাবণ্যের জীবনের চিরবন্ধু হয়ে ওঠে। লাবণ্য বুঝতে পারে এই প্রেম বিবাহের জন্য নয়। অমিতের যে সহজে কিছু পছন্দ হয় না, এই তার ভয়। সে একথা বুঝেছে যে রুচির তৃষ্ণা মেটাতেই অমিত তার সঙ্গ চায়। "মিতা তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না।" লাবণ্য তার কর্তামাকেও জানিয়েছে বিয়ে করে সে দুঃখ দিতে চায় না, বিয়ে সকলের জন্য নয়। "বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।" বিয়ে যে প্রেমের এক বন্ধন লাবণ্য তা বুঝেছে। তাই সে সেই বন্ধন থেকে প্রেমকে মুক্ত করতে চেয়েছে। বিবাহের বন্ধনে তার প্রেমকে বাঁধতে চায়নি। কিন্তু লাবণ্যও ভালোবাসে, সারা পৃথিবীকে সে শোনাতে চায় - শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। লাবণ্য স্বীকার করে যে - "আমি তো ভেবে পাইনে, আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। বর্ষণমুখর দিনে লাবণ্য আকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করছে অমিতের জন্য। অমিতের সঙ্গে সে পায়ে পা মিলিয়ে পথ চলতে চেয়েছে অমিতের হাত ধরে —

"আমরা যাব যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি,
ডুবি যদি তো ডুবি না কেন
ডুবুক সবই , ডুবুক তরী।"

উভয়ের প্রেমের স্পর্শে উভয়ে পূর্ণতা পেল। অমিতের প্রতি লাবণ্যর প্রেমের অকপট স্বীকারোক্তি

"মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ।"

আবার পরক্ষণেই লাবণ্য অমিতকে বলছে যে "তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে।" লাবণ্য বুঝতে পেরেছে যে অমিত যতই তার অনেক কাছে থাকুক সে আসলে তার থেকে অনেক দূরেই রয়েছে, যে প্রেমকে দূর থেকে দেখা যায়, অনুভব করা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না। শেষ সন্ধ্যায় লাবণ্য তাই বলে উঠেছে —

"তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে। ....
শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।"

প্রেম সে তো ভালোবাসতে চায়, ভালোবাসা পেতে চায়, দিতে চায়। তাই সেই প্রেম যখন পূর্ণতা পায়, তখনই সেই প্রেমকে হারানোর ভয় গ্রাস করে। এটাই তো প্রেমের ধর্ম, প্রেমের পরীক্ষা। লাবণ্যর প্রেমও পূর্ণতা পেয়েছে, লাবণ্যও সেই হারানোর ভয়ে ভীত

হয়েছে। আর লাবণ্যর এই ভীতি সত্য হয়ে উঠেছে কেতকীর আবির্ভাবে। লাবণ্য যখনই শুনলো অমিত কেতকীকে আংটি দিয়েছে তখনই সেই বন্ধন থেকে লাবণ্য অমিতকে মুক্তি দিতে চেয়েছে। হঠাৎ সেই সময়ই শোভনলালের সাথে লাবণ্যর আবার সাক্ষাৎ ঘটে। আজ আর লাবণ্য তার ভালোবাসাকে অস্বীকার করতে পারেনি। তাই শোভনলালকে সে বলেছে, "তুমি আমার সকলের বড়োবন্ধু।" একদিন লাবণ্য শোভনলালকে অপমান করেছিল এবং লাবণ্যের উক্তিতে শোভনলাল যে ব্যথা তার অন্তরে লুকিয়ে রেখেছিল তখনই সেই প্রেম চিরন্তন প্রেমের আকার ধারণ করেছিল। "যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় এক অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উল্টো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বুঝি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসেছিল।"

অমিতের সাথে কেতকীর বিবাহ স্থির হয় এবং লাবণ্য শোভনলালকে তার ভালোবাসায় আপন করে নেয়। অমিত যতিশংকরকে জানিয়ে ছিল লাবণ্যর প্রেম হল দিঘির জল, যে দিঘি কখনো ঘরে আসে না অথচ সেই দিঘির জল ঘড়ায় ভরে ঘরে আসে, তা নিত্য দিনের প্রয়োজন মেটায়। তা পান করেই বেঁচে থাকতে হয়। সেই ঘড়ায় তোলা জল হল কেতকী, যা দিঘির জলেরই সামান্য অংশ বিশেষ। কিন্তু দিঘি সে তো অফুরন্ত, সেখানে মুক্ত বাতাস, খোলা আকাশ, সেই দিঘি যাকে সামান্যে ধরে বেধে রাখা যায় না। লাবণ্য সেই দিঘি, তাই তার প্রেম সামান্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা অনন্ত শাশ্বত। সেই দিঘিতেই সাঁতার দিক অমিতের মন।

আবার শোভনলালের প্রতি লাবণ্যের প্রেম স্বপ্ন নয়, সে প্রেম সত্য বাস্তব, পূজার অর্ঘ্য স্বরূপ। লাবণ্য স্বীকার করেছে —

"যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।"

আবার লাবণ্য অমিতের কাছে একথাও স্বীকার করেছে যে —

"তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।"

লাবণ্য প্রেমকে ত্যাগের মধ্য দিয়ে, গ্রহণের মধ্য দিয়ে চিরন্তনত্ব দান করেছে, উত্তীর্ণ করেছে স্বর্গে, মহিমান্বিত করেছে এক অদ্ভুত মহিমায়। লাবণ্য তার প্রেমকে দৈনন্দিনতার ভিড়ে হারিয়ে ফেলে ভোগের সামগ্রী করে তোলেনি। তাই তার প্রেম হয়ে উঠেছে শাশ্বত। কখনো অমিত তাতে সাঁতার দিয়ে গা ভাসিয়েছে, কখনো শোভনলাল নীরবে সেই প্রেমকে পূজা করেছে। আর লাবণ্য তার প্রেমের বন্যায় ভালোবাসাকে ভাসিয়ে দিয়েছে। তার প্রেম গমন করেছে ভাবলোকে। বন্যাকে যেমন বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় না, তেমনই লাবণ্যর ভালোবাসাও বাধাহীন। লাবণ্য বার বারই শূন্যকে পরিপূর্ণ করেছে। তাই লাবণ্যর প্রেম হয়ে উঠেছে চিরন্তন, শাশ্বত, অনন্ত, না পাওয়ার মাঝেও অনেকখানি পাওয়া। হয়ে উঠেছে চিরন্তন, শাশ্বত, অনন্ত, না পাওয়ার মাঝেও অনেকখানি পাওয়া।

মনুর রাষ্ট্রচিন্তায় রাজধর্মের ভূমিকা

পূর্বালী চট্টোপাধ্যায় এবং সুপ্রীতি দত্ত

অতিথি অধ্যাপিকা, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা

ভূমিকা ঃ আধুনিক যুগে আমরা 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বলতে যা বুঝি, প্রাচীন যুগে সেটা বোঝাতে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' কথাটা ব্যবহৃত হয়নি। 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বলতে যেসব শব্দ প্রাচীনকালে ব্যবহৃত হত সেগুলি হল - রাজশাস্ত্র, রাজধর্ম, দন্ডনীতি, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি ইত্যাদি।

'রাজশাস্ত্র' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে মহাভারতে,'রাজনীতি' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে কালিদাসের রঘুবংশ ও মাঘের শিশুপালবধে, 'রাজধর্ম' কথাটা দন্ডনীতির সাথে একাত্মক হয়ে গেছে মহাভারতে, আবার 'দন্ডনীতি' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং 'রাজধর্ম' শব্দটা বিখ্যাত করে দিয়েছেন স্বয়ং মনু।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা নৃপতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তাই রাজা তার ধর্ম অনুসারে কিভাবে রাজ্য পরিচালনা করবে তার একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

'মনুস্মৃতি' বা 'মনুসংহিতা' ভারতের প্রাচীনতম ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র। সকল স্মৃতি গ্রন্থই বেদের বিধানকে স্মরণ করে রচিত। এই কারণে স্মৃতি নামের সার্থকতা বেদের উপরে ভিত্তি করে বলেই মনুস্মৃতির প্রামাণ্য। পন্ডিতগণ মনুস্মৃতির আনুমানিক কাল নির্ধারণ করেছেন খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক চিত্র মনুস্মৃতিতে ফুটে উঠেছে এর সাথে রাজধর্মের যথার্থতা বিচার করে তা কিভাবে রাজা এবং রাজ্যের প্রতিটি মানুষের হিত সাধন করতে পারে তার একটি সাবলীল বিশে-ষণ পাওয়া যায় মনুর রচনাতে।

'ধর্ম' শব্দটির পরিধি ব্যাপক, এই শব্দটির প্রাচীন অর্থ হল, ধর্ম তাই যা মানুষ ও সমাজকে ধারণ করে বা রক্ষা করে। মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, "বেদোহখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্ । মনুস্মৃতিতে আরো বলা হয়েছে —

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥"

ধর্ম কথাটার আরেক অর্থ হল কর্তব্য। রাজধর্ম কথার অর্থ হল রাজার কর্তব্য। এখানে রাজধর্মকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, যথা - দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক ধর্ম। যে সকল ধর্ম রাজাকে এবং রাজ্যকে ইহজন্মে রক্ষা করে তাকে দৃষ্টার্থক ধর্ম বলে। যেমন - সন্ধি, বিগ্রহ,যান,আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়, এই ছয়টি ধর্মকে ষাড়গুণ্যও বলা হয়। এই ধর্মগুলো প্রয়োগ করে রাজা, তাঁর রাজ্য রক্ষা ও সমৃদ্ধ করে তোলে। এজন্য এই ধর্মগুলোর প্রয়োজন কেবল ইহজগতেই হয় বলে এই ধর্মগুলোকে দৃষ্টার্থক ধর্ম বলে। আবার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সম্পাদন করা প্রভৃতি রাজার যেসব অন্যান্য কর্তব্য আছে সেগুলো হল অদৃষ্টার্থক ধর্ম। এই

ধর্মের ফল হল পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করা। 'রাজধর্ম' শব্দটিতে 'রাজ' বলতে কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় জাতিরূপ অর্থ বুঝাচ্ছেন তা নয়, 'রাজ' শব্দটির অর্থ হল রাজ্যে প্রজাগণের এবং রাজ্যাভিষেকের উপর আধিপত্য প্রভৃতি গুণ যারা আছে, সেই সকল ব্যক্তি হল রাজা। 'রাজা' কথার আরেকটা প্রতিশব্দ হল 'নৃপ'। এই কথাটার প্রয়োগের দ্বারা বোঝা যায় যে, জনপদের আধিপত্য যাঁর কাছে তাঁরই এই রাজধর্মে অধিকার অর্থাৎ তাঁরই পক্ষে এই রাজধর্ম পালনীয়। 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ হল কর্তব্য এবং 'রাজধর্ম' কথার অর্থ হল রাজার পালনীয় কর্তব্য। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে ক্ষত্রিয় নরপতি সমস্ত প্রজাদের প্রতিপালন করেন, এটাই হল রাজার কর্তব্য বা রাজধর্ম।

রাজার সৃষ্টি ও মহিমা ঃ রাজার সৃষ্টি প্রসঙ্গে মনু বলেছেন, সমাজ যদি অরাজক হয় চারিদিক থেকে ভয়ে সকলেই অস্থির হয়ে ওঠে, তখন এই পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা রাজাকে সৃষ্টি করেছেন ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, কুবের, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ইহাদের সকলের সারাংশ নিয়ে। তাই সকল দেবতার শক্তি রাজার মধ্যে বর্তমান। এখন প্রশ্ন হল, রাজা হওয়ার অধিকারী কে? স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হয়ে ক্ষত্রিয়রাই রাজা হওয়ার অধিকারী। মেধাতিথি তার ভাষ্যে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করে আয়ত্ত করেছেন তাঁর পক্ষে বেদের অর্থ জ্ঞান সম্ভব। সেই ব্যক্তিরই ব্রাহ্ম সংস্কার হয়েছে, এখানে 'ব্রাহ্ম সংস্কার' বলতে উপনয়ন সংস্কারকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু 'সংস্কার' বলতে গর্ভাধান প্রভৃতি আটচলি-শটা সংস্কারকে বোঝায়। তবে তিনি এটাও বলেছেন যে, যদি ক্ষত্রিয় রাজা না পাওয়া গেলে অন্য বর্ণের লোক তাঁর ন্যায় রাজ্য পালন করবে। এটাকে শাস্ত্রের অতিদেশ বিধি বলা হয়েছে। কিন্তু শূদ্ররা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।

শাস্ত্র অনুসারে, রাজা যেহেতু সকল দেবগণের সারাংশ দিয়ে সৃষ্টি তাই সকল দেবগণের গুণ রাজার মধ্যে থাকবে এবং তিনি নিজের তেজে অন্যান্য জীবকূলকে অভিভূত করবেন, সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবে। সূর্য যেমন মানুষের চোক ঝলসিয়ে দেয় সেরকম রাজার দিকে কোন লোক নিরীক্ষণ করলে তারই চক্ষু ও মন দগ্ধ হয়, এইজন্য পৃথিবীর কেউই তাঁর দিকে ভাল করে একদৃষ্টিতে দেখতে পারে না। তাই মেধাতিথি তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে, রাজা উপরে বসলে অন্য সকলে তাঁর আসন থেকে নিম্নস্থানে থাকবে।

অগ্নি প্রভৃতি দেবতার সারাংশ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তাঁদের শক্তি রাজার মধ্যে রয়েছে তাই রাজা নিজের অলৌকিক শক্তির প্রভাববশতঃ অগ্নিস্বরূপ, তিনিই বায়ু, তিনিই সূর্য, তিনিই চন্দ্র, তিনিই কুবের, তিনিই বরুণ, তিনিই ইন্দ্র স্বরূপ। মনু এটাও বলেছেন যে রাজা যদি বালক হয়, তাঁকে মানুষ ভেবে অবজ্ঞা করা উচিত না কারণ এই রাজাই হল এক অসাধারণ দেবতা যিনি মানুষ রূপে পৃথিবীতে রয়েছেন। এজন্য রাজা কোন দোষদুষ্ট হলেও তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত না। কোন ব্যক্তি যদি অগ্নির অনেক কাছে বা নিকটবর্তী হলে অগ্নি কেবল তাকেই দগ্ধ করে কিন্তু রাজা এমনি এক অগ্নি যিনি রেগে গেলে মানুষকে সর্বাংশ, গবাদি পশু, স্বর্ণাদি দ্রব্য ও গৃহাদি সমতে দগ্ধ করেন।

রাজার শিক্ষা ঃ প্রজাপতি ব্রহ্মা সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের রক্ষক রূপে রাজাকে সৃষ্টি করেছেন, তাই রাজার উপর বিশাল দায়িত্ব। তাই রাজার চরিত্র গঠনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। রাজ্য রক্ষার কাজে নিযুক্ত রাজা ঠিকমতো রাজধর্ম পরিচালনার জন্যে ত্রি-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে ঋক্‌, সাম, যজুঃ এই তিন বেদের বিষয় আয়ত্ত করবেন, রাজা দন্ডনীতি শিখবেন অর্থশাস্ত্রবিদের কাছে, তার্কিক ও বৈদান্তিক পন্ডিতদের থেকে তর্কবিদ্যা, কৃষক বণিকদের কাছ থেকে কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি ধন অর্জন বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করবেন। যেহেতু রাজাই প্রজাদের বশে রাখে তাই তিনি, তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত রাখার জন্য সব সময় সাবধানতা অবলম্বন করবেন।

এছাড়াও মনু রাজাকে ক্লেশ উৎপাদন করে এইরূপ দশটি কামজ এবং আটটি ক্রোধজ ব্যসন সযত্নে বর্জন করার কথা বলেছেন। ইহাদের পরিণাম খুবই খারাপ তাই এগুলোর বর্জন করবেন রাজা। যে রাজা কামজ ব্যসনে লিপ্ত সেই রাজা অর্থ ও ধর্ম হতে বিচ্যুত হন এবং ক্রোধজ ব্যসনে লিপ্ত রাজা অচিরেই বিনাশপ্রাপ্ত হন বা আত্মবিয়োগ হয়। যে দশটি কামজ ব্যসন রাজার জন্য অনুমোদিত তা হল - মৃগয়া, পাশাখেলা, দিবানিদ্রা, পরের দোষকীর্ত্তন, স্ত্রীসম্ভোগ, মদ্যপান,নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথা পর্যটন। যে আটটি ক্রোধজ ব্যসন পরিহারযোগ্য তা হল - না জেনে অন্যের দোষ কথন অর্থাৎ পৈশুন্য, সজ্জনের বন্ধনাদির দ্বারা নিগ্রহ অর্থাৎ সাহস, ছলে হত্যা অর্থাৎ দ্রোহ, ঈর্ষা, অন্যের গুণ সত্যে দোষাবিষ্কার অর্থাৎ অসূয়া, অর্থদূষণ, বাকপারুষ্য, দন্ডপারুষ্য। এই উভয় প্রকার ব্যসনই লোভজাত। তাই রাজার উচিত সযত্নে লোভকে জয় করা। কামজ ব্যসন বর্গের মধ্যে মদ্যপান, পাশাখেলা, স্ত্রীসম্ভোগ, মৃগয়া যথাক্রমে এই চারটি সর্বাপেক্ষা নিন্দনীয়। আবার ক্রোধজ ব্যসন বর্গের মধ্যে বাকপারুষ্য, দন্ডপারুষ্য, অর্থদূষণ এই তিনটি অত্যন্ত কষ্টকর। এই সাতটি ব্যসন সব রাজার মধ্যেই থাকে, আত্মসংযমী রাজা এইগুলো সম্পর্কে সাবধান হবেন। ব্যসন আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যসনকেই অনিষ্টজনক বলেছেন কারণ ব্যসনহীন লোক স্বর্গ লাভ করে।

রাজার চরিত্রে বিনয় একটি অন্যতম গুণ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সর্বদা সেবা করা রাজার কর্তব্য। তাদের আদেশও রাজা পালন করবেন। যদিও নিজ বুদ্ধি বলে বা রাজনীতি শাস্ত্র অনুসারে শাসন করার কথা বলা হয়েছে তবুও রাজা সর্বদা বিনয় শিক্ষায় রত থাকবেন। কারণ অবিনয়ের জন্যে অনেক রাজা নিজ রাজ্য চ্যুত হয়েছেন। বেন, নহুষ, সুদ, পৈজবন,সুমুখ ও নিমি সকলেই অবিনয় হেতু বিনষ্ট হবার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার বিনয়ের জন্য অনেক রাজা বনবাসী হয়েও রাজ্য লাভ করে। পৃথু ও মনু বিনয় হেতু রাজ্য জয় করেছিলেন, কুবের ধন ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র মুনিও বিনয় হেতু ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন।

রাজার রাজ্য পরিচালনা ঃ রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে অতিব বিচক্ষণতার প্রয়োজন। দুষ্টের বিনাশ এবং শিষ্টের পালনই শাস্ত্র কথন। রাজা নিজের প্রয়োজনে নিজের শক্তি, দেশ,কাল বিবেচনা করে কার্যসিদ্ধির জন্য শত্রুর সাথে মিত্রের ন্যায় আচরণ করেন

আবার যখন কাউকে দন্ড দেওয়ার শক্তি না থাকে তখন রাজা তার অপরাধ সহ্য করেন, আবার উপযুক্ত স্থান ও উপযুক্ত সময়েরও অপেক্ষা করে থাকে, কার্যসিদ্ধির জন্য রাজা নানান রূপ ধারণ করে এবং একই রূপে কখন থাকেন না। এই কারণে রাজাকে বিশ্বাস করা উচিত না তেমনই রাজাকে সুহৃদ বা বন্ধু মনে করাও উচিত না।

রাজা যদি কারোর প্রতি প্রসন্ন হন তাহলে তিনি ধনসম্পত্তি প্রদান করেন আবার তিনি যদি ক্রুদ্ধ হন তাহলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়ে থাকেন। এজন্য ধনসম্পত্তি লাভ করার ইচ্ছা থাকলে রাজার উপাসনা করা কর্তব্য। রাজা যে কেবল ধনসম্পত্তি দেন তা নয়, যে ব্যক্তি রাজার আরাধনা করে রাজা খুশি হলে তার যত শত্রু আছে তাদের সকলকেই ধ্বংস করে দেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মা সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের রক্ষকরূপে রাজাকে সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁর হাতে অনেক দায়িত্ব। প্রত্যেক আশ্রমে মানুষের কাজকর্ম নীতি নিয়ম সঠিক ভাবে সম্পন্ন না হলে রাষ্ট্র পরিপালন সঠিকভাবে হতে পারে না। তাই বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করছে কিনা সেটা দেখাও রাজার কাজ। রাজা প্রজাপালনের জন্যে যে যে কার্য সম্পাদন করবে নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে —

রাজার অধীনস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ ও তাঁদের সাথে করণীয় কর্তব্য ঃ রাজার একার পক্ষে রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব না। রাজা তাই মন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করে রাজ্য শাসন করবেন। মনু বলেছেন, বংশ পরম্পরাগত, বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী, বীর, যুদ্ধে নিপুণ, সৎকুলজাত, সুপরীক্ষিত এমন সাত বা আটজনকে মন্ত্রী নিয়োগ করবেন রাজা। কারণ অল্প মানুষ হলে একজোট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আবার অনেক লোক থাকলে মন্ত্রনা বহিঃপ্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রাজা তাঁদের সাথে সন্ধি ও যুদ্ধ বিষয়ে আলোচনা করবে, রাজদন্ড, কোষ, পুর, দেশবাসীর রক্ষা বিষয়ে প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করবে, পরে নিজে যেটা ঠিক করবে সেই মত কাজ সম্পাদন করবেন।

এছাড়া রাজা আরো কয়েকজন বুদ্ধিমান, স্থির স্বভাব, ধনার্জনের নিপুণ, সুপরীক্ষিত, কর্মসচিব নিযুক্ত করতে পারেন। রাজার সমস্ত কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করতে যে পরিমাণ লোক লাগবে রাজাও সেই পরিমাণ লোককে নিযুক্ত করবেন। তাদের মধ্যে দক্ষ, উচ্চকূলসম্মত, শূচিব্যক্তিকে আয় ব্যয় ব্যাপারে আর ভীরু ব্যক্তিদের অন্তঃপুরে নিযুক্ত করবেন রাজা।

রাজার পক্ষে কে তাঁর শত্রু আর কে তাঁর মিত্র তা জানা সম্ভব না তাই কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দূতের আবশ্যিকতা অপরিহার্য। রাজা এমন লোককেই দূত হিসাবে নিয়োগ করবেন যিনি সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, অপরের আকার ইঙ্গিতের দ্বারা মনের ভাব বুঝতে পারেন, যিনি শূচি, কর্মকুশল, সৎ বংশজাত, রাজার অনুরক্ত, দেশকালজ্ঞ, ভয়শূন্য, বাকপটু, সুন্দর আকারবিশিষ্ট হবেন।

দন্ডে মন্ত্রীর, কোষ আর রাষ্ট্রে রাজার, সন্ধি আর বিগ্রহে দূতের অধিকার থাকবে। দূতই সন্ধিস্থাপন করে থাকে, যাদের সাথে সন্ধি আছে তাদের সাথে বিগ্রহ হয় দূতের কারণেই,

আবার রাজাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হয় এই দূতদের জন্যই।

রাজদন্ড ঃ দন্ড হল রাজশক্তির অমত্য প্রতীক। রাজ্য পরিচালনার জন্যে রাজদন্ডকে মনু একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে মনে করেছেন। দন্ডের উৎপত্তি বিষয়ে বলেছেন, রাজার প্রয়োজন সাধনের জন্যে প্রজাপতি রাজাকে সৃষ্টি করবার আগে দন্ড সৃষ্টি করেছেন। দন্ডই হল সকল জীবের রক্ষক। দন্ডকে বাদ দিয়ে রাজা রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালন করতে পারেন না। সকলে সুপ্ত হলে লোকেরা কেবল দন্ডের ভয়ে স্বেচ্ছাচারিতা করে না। পন্ডিতগণ দন্ডকে ধর্ম বলে জানেন। এইজন্যে রাজার স্বরূপ সম্পাদন করবার জন্যে দন্ড সৃষ্টি করেন। "ধর্ম্মম আত্মজং ব্রহ্মতেজোময়ম্" এই বাক্যের সাহায্যে সব দন্ডের প্রশংসা করা হয়েছে।

দেশ, কাল, শক্তি, বিদ্যা ঠিক মত বিবেচনা করে অন্যায়কারী ব্যক্তি যেমন কাজ করবে তাতে তার কিরূপ দন্ড প্রাপ্য সেরূপ দন্ড প্রদান করবেন রাজা। দন্ডের একমাত্র পুরুষ, নেতা, চালক, শাসনকর্তা হলেন রাজা। মনুর কথায় — "স রাজা পুরুষো দন্ডঃ স নেতা শাসিতাচ"।

দেশ কাল বিবেচনা করে দন্ডকে ঠিকমত প্রয়োগ করলে সব প্রজারাই সন্তুষ্ট হয়, তা না হলে রাজার বিনাশ ঘটে। সমস্ত লোক দন্ড দ্বারা বশীভূত। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস, পক্ষী, সর্প তারাও দন্ডের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে লোকের ভোগের সহায়তা করে।

যে রাজা সত্যবাদী, বিবেচনাপূর্বক কাজ করে অর্থাৎ বুদ্ধিমান এবং যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনিই দন্ডের সঠিক প্রয়োগ করতে পারেন। এই রাজার ত্রিবর্গ বৃদ্ধি পায় এবং যে রাজা অল্পেতেই রেগে যান,নীচ, তিনি দন্ড প্রয়োগ করে নিজেরই ক্ষতিসাধন করেন। অসহায়, মূর্খ, লোভী,শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তি দন্ড প্রয়োগ করতে পারে না। অর্থাৎ দন্ড সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে দন্ডের সঠিক প্রয়োগ করতে পারে না। শাস্ত্র অনুসারে, যিনি লোভী না, সত্যবাদী, অমূর্খ, বুদ্ধিমান, শাস্ত্র নির্দেশ অনুসারে কাজ করে, এই পাঁচপ্রকার গুনযুক্ত তিনিই দন্ড প্রয়োগ করার উপযুক্ত।

রাজারা কার প্রতি কেমন দন্ড প্রয়োগ করবেন সেটার প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, নিজ রাজ্যের মধ্যে মৃদু দন্ড প্রয়োগ করবেন রাজা, অন্য রাজার রাজ্য জয় করে সেই শত্রুদের গুরুতর দন্ড প্রয়োগ করবেন রাজা, আবার স্নেহের বন্ধুদের সাথে সরলভাব অবলম্বন করবেন কিন্তু ব্রাহ্মণের সকল প্রকার অসৎ কর্মের জন্য রাজা যেন দন্ড না দিয়ে তাঁদের প্রতি ক্ষমাযুক্ত হন। এইভাবে ধর্ম, বুদ্ধি অনুযায়ী যদি রাজা শাসন করে তাহলে তাঁর যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর প্রতি মন থেকে ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মান আসবে।

রাজাদূর্গ ঃ রাজার বাসস্থান নির্মাণের উপযুক্ত দেশ সম্পর্কে মনু বলেছেন, জাঙ্গল (যেখানে জল ও ঘাস অল্প এবং প্রচুর আলো বাতাস থাকে),সঞ্চিত শস্যশালী, ধার্মিক লোকবহুল,রোগাদিশূন্য, মনোরম, যেখানে সহজভাবে সুখে বাস করা যায় - এমন স্থানে রাজা বাসস্থান স্থাপন করবে। এখানে মনু কতগুলো দুর্গের কথা বলেছেন -ধনুর্দূর্গ (মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত, জলব্যবস্থাও থাকবে), মহীদূর্গ (ইট নির্মিত দুর্গ), জলদূর্গ (জল বেষ্টিত দুর্গ), বৃক্ষদূর্গ (বড় বড় গাছ দিয়ে বেষ্টিত দুর্গ), নৃ দুর্গ (সৈন্য ও অস্ত্রধারী বহু বীরপুরুষ দ্বারা রক্ষিত দুর্গ)। এই সকল দূর্গগুলোর মধ্যে গিরিদূর্গ শ্রেষ্ঠ কারণ পাহাড়ের উপরে শত্রুরা

সহজে উঠে আক্রমণ করতে পারে না।দূর্গ নির্মাণের আবশ্যিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, দূর্গ নির্মাণ করা প্রয়োজন বলা হয়েছে। যাদের শক্তি অল্প তারা যদি দূর্গে আশ্রয় করে তাঁদের শত্রুরা পরাজিত করতে পারে না। যদি একজন যোদ্ধা দূর্গের প্রাচীরে ধনুর্ব্বান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তখন সে নিম্নে একশো জন যোদ্ধাকে বাধা দিতে পারে, এইরকম একশো জন যোদ্ধা দশ হাজার যোদ্ধাকে আটকাতে পারে। এইসব কারণে অবশ্যই দূর্গ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

সেই সমস্ত দূর্গে বাস করার সময় রাজা ভার্য্যা গ্রহণ করবেন, সেই ভার্য্যা হবেন সেই দূর্গে অবস্থিত সুবর্ণা, সুলক্ষণা, উচ্চবংশজাতা, মনোরমা ও রূপগুণসম্পন্না।

রাজকর ঃ একটি দ্রব্য কত দামে কেনা হচ্ছে, আবার বিক্রি করে কত লাভ হচ্ছে কত সময় লাগবে, তার মধ্যে কতটা পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে, খাওয়া খরচ, বনে বা দুর্গম পথে যাবার সময় অন্য রাজার ভয়, চোরের ভয় ইত্যাদি সমস্ত কিছু বিবেচনা করে বণিকরা রাজাদের কর দেবে।

কৃষকদের থেকে অল্প পরিমাণ কর গ্রহণ করা কর্তব্য। কর কি পরিমাণের হবে সেটার নিয়মবদ্ধ করে দেওয়ার দরকার নেই কারণ যেখানে বণিকের লাভ বেশি সেখানে প্রচলিত পরিমাণের থেকে বেশি পরিমাণের কর গ্রহণ করবে রাজা। পশু ও স্বর্ণাদি বিক্রি করে যে লাভ তার পঞ্চাশ ভাগের একভাগ রাজা গ্রহণ করবে। শস্য উৎপাদনে পরিশ্রমের তারতম্যের ভিত্তিতে ছয় ভাগের একভাগ, আটভাগের একখাগ, বারো ভাগের একভাগ কর নেবেন রাজা। বৃক্ষ, মাংস, মধু, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ওষধি, বৃক্ষয়াদির রস, পুষ্প, মূল, ফল, পাতা, শাক, মাটির ও পাথরের পাত্র এইসব দ্রব্যের বিক্রির লাভের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজা কর হিসাবে নেবে। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের থেকে রাজা কর নেবে না, রাজা তাদের সবরকমভাবে রক্ষা করবেন। ব্রাহ্মণেরা ধর্মানুষ্ঠান করে রাজার আয়ু, সম্পত্তি, রাজ্যও বৃদ্ধি করবেন। সাধারণ লোক কৃষকদের থেকে বছরে একবার কর নেবে রাজা। লৌহকার, সূত্রকার, শিল্পী, শূদ্র এঁদের রাজা প্রতি মাসে একদিন করে কাজ করিয়ে নেবেন।

রাজার ন্যায্য কর নেওয়াটা আবশ্যিক কারণ রাজা কর না নিলে রাজকোষ শূন্য হবে, আবার অধিক কর নিলে প্রজাদের কষ্ট হয়। তাই রাজার উচিত অল্প অল্প করে সারা বছর কর গ্রহণ করা তাহলে নিজের এবং অন্যদের মূলোচ্ছেদ হবে না।

যুদ্ধনীতি ঃ রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল প্রজাপালন করা। সেই সময় ছিল গ্রামকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা। রাষ্ট্রগুলি গঠিত হয় ছোট ছোট গ্রাম নিয়েই। রাষ্ট্রগুলি বিভিন্ন কারণে একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হত। তাই কোন রাজার পক্ষেই নিরুপদ্রপে দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করা সম্ভ হত না। যদি তাঁর সমবল, অধিকবল, হীনবলসম্পন্ন অন্য কোন রাজা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতেন, তবে নিজ রাজ্যের রক্ষাকল্পে রাজার যুদ্ধ করা একান্ত কর্তব্য ছিল। যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম। গীতাতে বলা হয়েছে, স্বধর্মে মৃত্যু শ্রেয়। যুদ্ধ করতে বিমুখ না হওয়া, প্রজাবর্গের পালন করা, ব্রাহ্মণগণের শুশ্রুষা করা এই তিনটি কর্মের ফল সমান। তাই এগুলো রাজাদের শ্রেষ্ঠ কাজ। যে রাজা যুদ্ধ করতে করতে দেহত্যাগ করেন তার স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।

ক্ষত্রিয় রাজা যে যুদ্ধ করবেন তা যেন ধর্মযুদ্ধ হয়। অন্যায়ভাবে কারো প্রাণহানি করা রাজার কর্তব্য নয়। যুদ্ধে কোন যথেচ্ছচারিতার স্থান ছিল না। মনু যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধের কথা বলেছিলেন। এই নিয়ম অনুসারে যুদ্ধ করাই যোদ্ধার কর্তব্য। এই নিয়মগুলি হল গুপ্তি অস্ত্র বা কূট অস্ত্র দ্বারা শত্রুকে হত্যা করা যাবে না,কর্ণতুল্য ফলকযুক্ত অস্ত্রের দ্বারা, বিষাক্ত বাণ এবং আগুনের দ্বারা, উত্তপ্ত ফলকযুক্ত বাণের দ্বারা যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে যোদ্ধা রথে চড়ে যুদ্ধ করছেন তিনি ভূতলস্থিত পদাতিক যোদ্ধাকে অস্ত্রাঘাত করতে পারবেন না, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না এমন ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা যাবে না। আবার যে লোক 'আমি বড় দীন', 'আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' এইরকম উক্তি কারী শত্রু, বর্ণহীন, বিবস্ত্র, নিরস্ত্র, যুদ্ধত্যাগী, কেবলমাত্র যুদ্ধ দেখতে সমাগম এরকম ব্যক্তিদের হত্যা করা উচিত না। আবার যে যোদ্ধার অস্ত্র ভেঙে গেছে, যে লোকের পুত্র বা ভ্রাতা নিহত হওয়ায় কাতর, যার শরীর ক্ষতবিক্ষত, যে যুদ্ধ করতে বিমুখ হয়েছে তাহাদের প্রতিও অস্ত্রাঘাত করা যাবে না।

যদিও যুদ্ধে জয় করা শত্রু পক্ষের সব জিনিস বিজয়ী রাজার প্রাপ্য, তবুও মনু এই বিষয়ে ব্যতিক্রমের কথা বলেছেন। রথ, অশ্ব, হাতী, ছাতা, ধন, ধান, গবাদি পশু, দাসী, গুড়, লবন ইত্যাদি সব জিনিস যুদ্ধে যে যোদ্ধা জয় করবে সেটা তারই হবে, রাজা হচ্ছে স্বামী কাজেই তাঁরই সব গ্রহণ করার কথা, কিন্তু তা হবে না। তবে স্বর্ণ, রৌপ্য, ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদি রাজারই প্রাপ্য হবে। বেদবচন রয়েছে যে, যুদ্ধে জয় করা জিনিসগুলো কিছু অংশ রাজাকে দিতে হবে। আবার সকলের দ্বারা একত্রে জিনিসগুলো সমস্ত যোদ্ধার মধ্যে রাজা ভাগ করে দেবেন।

এগুলোকেই মনু যোদ্ধাদের চিরন্তন ও সনাতন ধর্ম বলেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু হত্যায় রত ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের এই ধর্ম চিরকালই মনে রাখতে বলেছেন। মনু যুদ্ধবিষয়ক এইসব চিন্তাভাবনা মহাভারতে ভীষ্মপর্বেও পাওয়া যায়। আরো বলা হয়েছে যে রাজা সবসময় হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি বল প্রস্তুত রাখবে, সর্বদাই যা গোপন করার মতন বিষয় তা গোপন করবে এবং শত্রু ছিদ্র ধরে তার অভিলাসিত কাজ বুঝে নিয়ে তা নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করবে। রাজার যেন নিজের কোন দোষ ত্রুটি দুর্বলতা প্রতিপক্ষ রাজা যেন জানতে না পারেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ রাজার দোষ ত্রুটি রাজা জেনে নেবার চেষ্টা করবেন।

যুদ্ধযাত্রাকালে রাজাকে কয়েকটি রীতি অনুসরণ করতে হত। যখন রাজা শত্রু রাজ্যের দিকে যাবে তখন এই নিয়ম অনুসরণ করে শত্রুর নগরের দিকে যাবেন। শুভ অগ্রহায়ণ মাসে অথবা ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে রাজা যুদ্ধ যাত্রা করবেন। অন্য সময়ে যখন রাজা বুঝবেন জয় নিশ্চিত ও শত্রুর বিপদ হরেই অভিযান করবেন। যুদ্ধযাত্রা কালে দন্ড, শকট, বরাহ, মকর, সূচী বা গরুড় ব্যূহ অবলম্বন করে অভিযান করবেন। দন্ডের মত দেখতে যে ব্যূহ সেটাই হল 'দন্ডব্যূহ', যা সন্নিবেশে থাকবে এইভাবে - অগ্রভাবেগ থাকবে বলাধ্যক্ষ, মধ্যস্থলে রাজা, পশ্চাদভাগে সেনাপতি, দুই পাশে হাতি, তার পাশে ঘোড়া এবং তাদের পাশে পদাতিক সৈন্য। এইভাবে চারিদিকে সমানভাবে বলবিন্যাস দন্ডের মতন সরল হয়ে

থাকে। এজন্য এটার নাম হল 'দন্ডব্যূহ'। চারিদিক থেকে ভয় উপস্থিত হলে দন্ডব্যূহরচনা করা উচিত। সূচী ব্যূহ হল খুব দীর্ঘ এবং সম্মুখভাগে বীরপুরুষেরা থাকবে। সৈন্য সকল অগ্রপশ্চাদে অতি স্থুল ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকবে। মকর ব্যূহ হল অগ্র ও পশ্চাৎ উভয়ই স্থুল। উভয়দিক থেকে ভয় উপস্থিত হলে মকর ব্যূহ রচনা করা উচিত। এইভাবে বিশেষ বিশেষ নিয়মে প্রয়োজন অনুসারে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যূহ রচনা করে অভিযান করা উচিত। এক এক দল করে সৈন্য স্থাপন করবেন যারা বিশ্বাসী, তারা হবে যুদ্ধে পারদর্শী এবং নির্ভীক। সৈন্যবল যদি কম থাকে তবে দলবদ্ধভাবে যুদ্ধ করবেন। আর যদি বহু সৈন্য থাকে তবে ইচ্ছে মত বিস্তার করে সূচীব্যূহ নির্মাণ করে যুদ্ধ করবে।

ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যর জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে। সমতলভূমিতে রথ ও ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। অল্প জলযুক্ত স্থানে হাতির সাহায্যে এবং গভীর জলপূর্ণ স্থানে নৌকার সাহায্যে, ঝোপঝাড় ও গর্ত বহুল অঞ্চলে ধনুবাণের সাহায্যে, ফাঁকা স্থানে ঢাল তলোয়ার জাতীয় অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। শত্রু যে দুর্গের মধ্যে অবস্থান করে সেই দুর্গকে এমনভাবে ঘিরে রাখতে হবে যাতে সেখান থেকে কেউ বেরোতে না পারে। এবং বাইরে থেকে কেউ যেতে না পারে ভেতরে। বাইরে থেকে নানা উপদ্রব করে খাবার, জল,ঘাস,খড়, ইন্ধন দূষিত করবে। জলাশয়, পরিখা, প্রাচীর প্রভৃতি ধ্বংস করে দেবে। শত্রুপক্ষের বিশিষ্ট লোকজনদের প্রলোভন দেখিয়ে নিজ পক্ষে নিয়ে আসবে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ জেনে নেবে।

যুদ্ধে জয়লাভ করার পর দেবতা ও ধার্মিক ব্রাহ্মণগণের পূজা করা কর্তব্য। রাজা জয়লাভের পর দেশবাসীকে অভয় ঘোষণা করবেন। মনুর মতে বিপক্ষের রাজা যদি যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক হয়ে মিত্রতা করতে চান, প্রচুর অর্থ এবং নিজের রাজ্যের কিছু অংশ দিতে রাজি থাকেন তবে বন্ধুত্ব, অর্থ, ভূমি এই তিন রকমের ফল লাভ হচ্ছে এই বিবেচনা করে বিপক্ষ রাজার সঙ্গে সন্ধি করে স্বদেশে ফিরে আসেন।

একজন বিজিগীষু রাজার উচিত তাঁর মিত্র, শত্রু ও উদাসীন রাজার বৈশিষ্ট্য ভালভাবে জেনে রাখা। মিত্র রাজা যদি হীনবল হন তবুও তিনি কৃতজ্ঞ ও ধার্মিক হলেও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কোন শত্রু রাজা যদি বুদ্ধিমান, সৎ বংশজাত, বীর, কার্যকুশল, দাতা, কৃতজ্ঞ ও ধৈর্য্যশীল হয়ে তবে সে খুব কষ্ট দায়ক হয়। কারণ, এইরকম শত্রুকে উচ্ছেদ করা সহজ নয়। সাধু স্বভাব, বীরত্ব, সদয়, বহুপ্রদত্ত এই গুণ গুলো সবসময়ই উদাসীনের গুণ, উলি-খিত গুণাবলীযুক্ত শত্রু রাজার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেন।

উপসংহার ঃ মনুসংহিতায় শাসনব্যবস্থার সম্বন্ধে মনু যে আলোচনা করেছেন তাতে দেখা যায়, রাষ্ট্রের সাথে রাজার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিন, এরা একে অপরের পরিপূরক। মনু কথিত তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রাণ স্বরূপ ছিল রাজা। সেই সময় রাষ্ট্র ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। প্রত্যেকটা গ্রাম ছিল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যদিও এই গ্রামগুলো সংযুক্ত হয়েই একটা পূর্ণরাজ্য গঠিত হয়। আর এই রাজ্যের উন্নতি রক্ষণাবেক্ষণ রাজ্যের প্রভূত মঙ্গল সম্পাদন করার দায়িত্ব ছিল রাজার। রাজা ছিলেন ধর্মের ধারক ও বাহক, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে

আমরা দেখতে পায় রাজা কীভাবে ধর্মের পথে তার রাজ্যকে পরিচালনা করেছেন। রাজার হস্তে যেমন অসীম ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে সেই ক্ষমতাকে আবার ন্যায়নীতির কঠোর অনুশাসনে আবদ্ধ করা হয়েছে। এখানে রাষ্ট্র তথা জনগণের হিতেই যেন রাজার হিত, রাষ্ট্রের মঙ্গলেই যেন রাজার মঙ্গল এটাই মনুর ধর্মশাস্ত্রের তাৎপর্য। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার যে প্রতিচ্ছবি মনুর লেখাতে ধরা পড়েছে তা সর্বকালের এবং সর্বসময়ের গ্রহণযোগ্য এবং সত্যই প্রশংসাযোগ্য। রাজা, রাষ্ট্র এবং রাজনীতির যে অতি সুক্ষ সম্পর্কের জটাজাল উনি বিশে-ষন করেছেন তা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়। তাই মনু কথিত রাজধর্মের অনুশীলনের মাধ্যমে সত্যিই ধর্মরাজ্য স্থাপিত হয়।

তথ্যসূচী ঃ

১। মনু ২.৬
২। মনু ২.১২
৩। মনু ৭.১৪
৪। মনু ৭.১৭

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

* বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, প্রাক কথন ও মনুসংহিতা পরিচয়, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৯৯৩।
* বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিসার্শ, কলকাতা, ১৯৯৯।
* সপ্ততীর্থ, ভূতনাথ (অনুবাদক), মনুস্মৃতির মেধাতিথি ভাষ্য (বঙ্গানুবাদ)।

সারদা সান্নিধ্যে ভগিনী সরলার প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণায় রূপান্তর ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের একটি চিরস্মরণীয় পদক্ষেপ

দোয়েল দে

গবেষক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ

নারী জাতির উন্নয়ণকল্পে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী সংঘ বা স্ত্রীমঠের প্রতিষ্ঠা করা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আজন্ম লালিত স্বপ্ন। তবে এই স্বপ্নের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৭২ খ্রীঃ ফলহারিনী কালিপুজার রাত্রে নিজের স্ত্রী সারদাদেবীকে ষোড়শী পূজার মাধ্যমে। বস্তুত ঐ রাতেই ভবিষ্যতের স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তরটি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। আর সৌধ নির্মাণের দায়িত্ব ছিল উত্তরসূরীদের, মূলত স্বামী বিবেকানন্দের হাতে। বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখেছিলেন সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে এক নব অভ্যুত্থানের আলোকে নব ব্রহ্মবাদিনী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে পরার্থে নিবেদিত প্রাণ এবং রামকৃষ্ণান্দোলনের যথার্থ প্রসারে সদাসচেষ্ট। বস্তুত স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় ও বক্তৃতায় বহুবার বহুভাবে ফুটে উঠেছে একটি তত্ত্ব - আত্মাতে কোন লিঙ্গ ভেদ নেই। পুরুষ যদি সন্নাসের অধিকারী হয় তবে নারীই বা হবে না কেন। তবে সমকালীন ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে স্ত্রীমঠ অর্থাৎ সম্পূর্ণ নারী পরিচালিত একটি মঠ প্রতিষ্ঠার পেছনে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল, ছিল নানা সামাজিক প্রতিকূলতা। কিন্তু ধীরে ধীরে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক জগতের উদার মনোভাব বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে স্বামীজির আজন্ম লালিত নারী মঠের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে আরম্ভ করে। যাঁকে কেন্দ্র করে স্বামীজি এই নারীমঠের স্বপ্ন দেখতেন সেই শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালেই বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসীগণ স্থির করেন যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনুমোদন ক্রমে শাখা কেন্দ্রগুলির স্ত্রী বিভাগে যেসব উৎসর্গীকৃত মহিলাকর্মীরা আছেন, তাঁদের সংগঠিত করে স্বাধীন স্বতন্ত্র সন্ন্যাসিনী সংঘের প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং মেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালে সারদাদেবীর জন্মশতবর্ষেই বেলুড় মঠ কর্তৃক স্ত্রীমঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং সেদিন যে ব্রতধারিনীদের উপর তাঁরা এই মহান দায় ন্যস্ত করেছিলেন, ভারতীপ্রাণ মাতাজী ছিলেন তাঁদের পুরোভাগে। ১৮৯৪ খ্রীঃ গুপ্তিপাড়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ভারতীপ্রাণার জন্ম হয়। পিতা রাজেন্দ্রনাথ শিশুটির নাম রাখেন পারুল। পারুল থেকে সরলা হয়ে শেষ পর্যন্ত সারদামঠের প্রথম অধ্যক্ষা ভারতীপ্রাণা হয়ে ওঠার জন্য তাঁকে যে দুর্গম, দুস্তর জীবন পথের পথিক হয়ে উঠতে হয়েছিল তা বিস্ময়ের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর এই পথের অন্যতম প্রদর্শক ছিলেন ভগিনী সুধীরা। পারুল নামের মেয়েটিকে সরলায় পরিণত করা ছিল সুধীরার জীবনের অন্যতম একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ - যে পদক্ষেপটি পরবর্তীকালে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

পারুল নিবেদিতা বিদ্যালয়ে প্রথম পড়তে আসেন ১৯০২ সালে। তখন স্কুল ছিল

১৭ নং বোসপাড়া লেনে। ছোট থেকেই পারুলের স্কুলের প্রতি এক অমোঘ টান জন্মে গিয়েছিল। তাঁর নিজের কথায়, "আমরা তখন কিছুই জানতুম না বা বুঝতুম না, তবু সিস্টারদের সঙ্গে ঘোরা, মারকাছে যাওয়া এসব খুব ভাল লাগত।" বড় হবার সাথে সাথে স্কুলের প্রতি টান যেন আরো বাড়তে লাগল। ভগিনী সুধীরার স্কুলে যোগদান পারুলের জীবনে অন্য এক মাত্রা নিয়ে এল। তাঁর কথায়, "স্কুলকে ভালবাসতুম আর সুধীরাদিকে ভালবাসতুম। সুধীরাদি যেন জাদু জানতেন। যে একবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সেই তাঁকে ভাল না বেসে পারে নি। তাঁর ভালবাসার আকর্ষণ ছিল অদ্ভুত। .... তাঁর ত্যাগের আদর্শ, ভালবাসা, উৎসাহ ও দরদ আমাদের জীবনকে পাল্টে দিল।

সমাজের তৎকালীন নিয়মে পারুলের খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হয়ে যায়। কিন্তু সংসার কোনদিনই তাঁকে টানতে পারেনি। তাই বাড়ির লোকজন যখন তাঁকে জোর করে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করল তখন দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত সুধীরাকে সব কিছু খুলে বললেন। অনিবার্যভাবেই ভগিনী সুধীরার কাছ থেকে পেলেন আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন। সুধীরা পারুলকে বেশী জবরদস্তি হলে বাড়ী থেকে পালিয়ে আসার ইঙ্গিত দিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে সরস্বতী পূজার ভাসানের দিন রাত বারোটার সময় বাড়ির সকলের অলক্ষ্যে সতের বছরের পারুল চিরকালের মতো গৃহত্যাগ করে নিবেদিতা স্কুলে এসে পৌঁছালেন। ইতিমধ্যে সুধীরা পুরো বিষয়টি ভগিনী নিবেদিতাকে জানালেও নিবেদিতা পারুলের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেননি। তিনি বলেছিলেন, "সীতা সাবিত্রীর দেশে এ আদর্শ কি ঠিক হবে?" বস্তুত আবহমান কাল ধরে ভারতবর্ষ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর গুণগান করে আসছে এবং নারী জাতির আদর্শ হিসাবে এঁদেরকেই মেনে আসছে। অর্থাৎ নারীর ক্ষেত্রে গার্হস্থ্য ধর্মকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে, সম্মানিত করা হয়েছে তাঁর জননী রূপকে। ফলে ভারতীয় নারীর পরিণতি না হয়ে, তথাকথিত নারীজনোচিত জীবনের পরিবর্তে একক ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র্য জীবনযাপনের আদর্শকে তাই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ নিবেদিতা মেনে নিতে পারেননি। এমনকি সিস্টার ক্রিস্টিনও পারুলের এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেননি। কিন্তু দৃঢ়চেতা সুধীরা সর্বান্তঃকরণে পারুলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই রাতেই সুধীরা পারুলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন হাতিবাগানের কাছে তাঁর পিসতুতো বোনের বাড়ীতে। আর পরিচয়ের গোপনীয়তার কারণে তার নাম বদলে রাখলেন সরলা। শুরু হল পারুলের জীবনের নতুন অধ্যায়। এরপর সুধীরা সরলাকে হরিপালের জেজুড় গ্রামে নিজের পৈর্তৃক বাড়ীতে আত্মগোপন করে থাকতে সাহায্য করেছিলেন।

পারুলের এই গৃহত্যাগের খবর শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে পৌঁছতে তিনিও কিঞ্চিৎ অনুযোগের সুরে বলেছিলেন, "তাই তো সুধীরা, একটি মেয়ের সারা জীবনের দায়িত্ব, কাজটা কি ভাল করলে?" সুধীরা তার উত্তরে বলেছিলেন, "মা ,করে তো ফেলেছি, কি আর করা যায়।" এই ছোট্ট ঘটনাটির মধ্য দিয়েই নব যুগের এক সম্ভবনাময় ইঙ্গিত যেন সারদাদেবী পেলেন। ফলে সরলার উপর সারদাদেবীর এক বিশেষ সহানুভূতি পড়ে গেল। ভগিনী নিবেদিতাও সুধীরার এই কাজে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, "সুধীরা একটা দুঃসাহসিক কাজ করেছে। সুধীরার নিজের দাদা দেবব্রত বসু (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) সরলার ছবি দেখে

ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, "এই মেয়েটি অন্যরকম, ভাল আধার, একে দিয়ে অনেক কাজ হবে।" শ্রীমা সারদাদেবী, ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রমুখের উৎসাহে সরলা সম্পর্কে সুধীরার আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। তিনি সর্বান্ঃকরণে সরলাকে মানুষ করে তুলতে ব্রতী হলেন। 'ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা' থেকে জানা যায় যে, সুধীরাকে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছিল সরলাকে গড়ে তুলতে। কিন্তু কোন প্রতিকূলতাই সুধীরার লক্ষ্য ভ্রষ্ট করতে পারেনি। আর সরলাও যেন একাগ্র চিত্তে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন ভবিষ্যতের বৃহত্তর কর্মকান্ডের কান্ডারী হিসাবে।

সেই সময় সুধীরা পারিবারিক কারণে অন্যত্র চলে গেলেই সারদাদেবী স্বয়ং এগিয়ে এলেন সরলার দায়িত্ব নিতে। সরলাকে তিনি বলেছিলেন, "তুমি আর কতদিন এখানে-সেখানে ঘুরে কাটাবে? আমার কাছে এসে থাকো।" অর্থাৎ সারদাদেবীও যেন সরলাকে নিজের কাছে রেখে যথাযথভাবে সুশিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। সেই সময় কাশীর রাজা মহারাজ সুধীরাকে বলেছিলেন, "এখানে সেবাশ্রমে মেয়েদের সেবা ছেলেরা করে, তুমি একটা মেয়ে দিতে পার না।" মহারাজের এই কথায় সুধীরা সরলাকে ডাফরিন হাসপাতালে রেখে ধাত্রী বিদ্যা শেখাবার কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। সিস্টার ক্রিস্টিনও চেয়েছিলেন যাতে সরলা নিজের পায়ে দাঁড়াবার মতো কোনও অর্থকরী বিদ্যা অর্জন করতে পারে। একই সময় গভর্নর কারমাইকেলের স্ত্রীও লেডী ডাফরিন হাসপাতালে নার্সিং শেখার জন্য তিনজন হিন্দু মেয়েকে চাইছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি সিস্টার ক্রিস্টিনের বন্ধু ছিলেন। তাই অনিবার্যভাবেই সরলার সামনে নার্সিং শিক্ষার একটা অভাবনীয় সুযোগ এসে গেল। কিন্তু সমসাময়িককালে ব্রাহ্মণ কন্যার পক্ষে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা ছিল কল্পনাতীত। ফলে সুধীরা যখন এই খবর উদ্বোধনে এসে সারদাদেবীকে জানালেন,গোলাপ মা খুব রাগ করে বললেন, 'সুধীরা এ কি কান্ড! ব্রাহ্মণের মেয়েকে হাসপাতালের কাজ করতে দিচ্ছে! সে আবার কি গো! যত অনাসৃষ্টি! ওর হাতে আর কে খাবে?' এখানে আমরা সারদাদেবীকে এক ক্রান্তিকারীর ভূমিকায় দেখতে পাই। তিনি নিজে ব্রাহ্মণের বিধবা হয়েও এবং সমসাময়িক দেশাচার এবং লোকাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হওয়া সত্ত্বেও খুব শান্তভাবে বলেছিলেন, "সে কি গোলাপ, শিখে এসে ও আমাদেরই সেবা করবে।" অর্থাৎ সমসাময়িক যাবতীয় বিধি নিষেধ তথা ছুঁৎমার্গের উর্দ্ধে উঠে সারদাদেবী মানবসেবাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিলেন। যে মানবপ্রেম তথা মানবসেবা হল রামকৃষ্ণান্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। ফলে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। সারদাদেবীর এই ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হয়নি। সারদাদেবীর শেষ অসুখের সময় সরলা অক্লান্তভাবে তাঁর সেবা করেছিলেন এবং সারদাদেবীর ছাঁচে নিজের জীবনকে গড়ে তোলার এক দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে সরলার জীবনে সারদাদেবীর এক অসীম প্রভাব ছিল। এই সাথে অনিবার্যভাবেই আর যার প্রভাব ছিল তিনি হলেন ভগিনী সুধীরা। এই প্রভাবের কথা সরলাদেবী বার বার নিজের জীবনের বিভিন্ন সময় স্বীকার করেছিলেন। যখন কাছে থাকতেন তখন তো বটেই, দূরে থেকেও সুধীরা নিয়মিত চিঠির মাধ্যমে সরলাকে অনুপ্রাণিত করতেন। সুধীরার ঐকান্তিক বাসনা ছিল সরলা যেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে নিজের জীবন সার্থক করে

তুলতে পারে। সরলার নার্সিং শিক্ষার সময় তাই সুধীরা লিখলেন, "... আর এই কটা মাস ওখানে আছ তারপর কর্ম্ম জগতে বাহির হইবে। কাজেই আদর্শটা নাড়াচাড়া কের নেবার বিশেষ দরকার। এতদিনে আমার মনে হচ্ছে একজন ঠিক শিখে কাজের উপযুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসছে। আর তো সবাই এখনও শিক্ষার অধীন। .... তুমি নিজেই জান না চারিদিকেকত কাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। যা শিখেছ তা যদি ৪ জনকে শেখাতে পার তোমার শেখা সার্থক হবে।" সুধীরার এই উপদেশ সরলা সারা জীবন মেনে চলেছিলেন। সারদা দেবীর শেষ অসুখের সময় সরলা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিনরাত জেগে সারদাদেবীর সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন। তাই ১৯২০ সালে জুন মাসে সারদাদেবীর মৃত্যু তাঁর কাছে একটা বড় মানসিক আঘাত স্বরূপ ছিল। সারদা দেবীর মৃত্যুর অল্প কয়েকমাস পরে সরলার প্রাণের সুধীরাদিও ইহলোক ত্যাগ করেন (২৪ নভেম্বর, ১৯২০ খ্রীঃ)। পরপর এই দুটি মৃত্যু সরলাদেবীকে নির্বাক করে দিয়েছিল। তাঁর নিজের কথায়, "মস্ত একটা শক্ লেগেছিল।" সেই সময় তাঁর মানসিক আশ্রয়স্থল ছিলেন স্বামী সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ) এবং গোলাপ মা ও যোগীন মা। কিন্তু কালের অনিবার্য নিয়মে ১৯২৪ সালে পর পর যোগীন মা এবং গোলাপ মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯২৭ সালে শরৎ মহারাজও ইহলোক ত্যাগ করেন। মানসিক ভাবে শ্রান্ত সরলা স্বামী সারদানন্দের পূর্ব আদেশানুসারে কাশীযাত্রা করেন। এরপর দীর্ঘ ২৭ বছর তিনি কাশীতেই সাধন ভজনে অন্তরীন হয়ে রইলেন - যেন নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন এক বিরাট কর্মযজ্ঞের নেত্রী হিসাবে।

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে সারদা দেবীর জন্মশতবার্ষিকীর সময় সরলাদেবী কাশী থেকে জয়রামবাটীতে আসেন। সেই সময় স্বামী শঙ্করানন্দ সরলাদেবীকে ডেকে বলেছিলেন, মেয়েদের মঠ হলে তোমাকে যেতে হবে।" সরলাদেবী তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করলে মহারাজ পুনরায় বলেনন, "আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তোমার দ্বারাও হবে। শ্রী শ্রীমার উপর নির্ভর করে থাকবে। তুমি যে রকম শ্রীমার কাছে ছিলে শ্রীমার সেই ট্রেনিংটা তুমি এই মেয়েদের দেবে।" স্বামী শঙ্করানন্দের এই কথা প্রকৃত পক্ষে রামকৃষ্ণান্দোলনের এক বিস্ময়কর দিগন্তের উন্মোচন করল, শুরু হল সরলার জীবনের তৃতীয় পর্ব।

বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত স্ত্রী মঠ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃপক্ষের ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল ১৯৫১ খ্রীঃ থেকেই। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৫১ খ্রীঃ দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের কাছে গঙ্গার তীরে 'সুরধুনী কানন' নামক বাগানবাড়ি সমেত জমি কেনা হয় এবং তা বসবাসের উপযুক্ত করার জন্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কাজও শুরু হয়। ১৯৫২ খ্রীঃ সাধু সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, সারদাদেবীর জন্মশতবার্ষিকী অর্থাৎ ১৯৫৩-৫৪ খ্রীঃ স্ত্রীমঠের প্রতিষ্ঠা কার্যটি সুসম্পন্ন হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে সব ত্যাগব্রতী মহিলারা নানা কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাদের ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা দিয়ে নবগঠিত স্ত্রীমঠের দায়িত্বভার প্রদানের বিষয়টিও স্থির হয়। এরপর, ১৯৫৩ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর সারদাদেবীর জন্ম তিথিতে বেলুড় মঠের তদানিন্তন অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ সাতজন ব্রতধারিনীকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সরলাদেবী। এরপর

১৯৫৪ সালের ৮ই জুলাই বেলুড়মঠ কর্তৃপক্ষের সাথে স্ত্রীমঠ সম্পর্কে সরলাদেবীর নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্পাদিত হয়। ১০ই জুলাই স্বামী শঙ্করানন্দ সরলাদেবীর উপর ব্রহ্মচারিনীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'শ্রীভারতী' নাম দেন এবং গৈরিক বস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেন। অবমেষে ১৯৫৪ সালের ২রা ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরে স্ত্রীমঠের উদ্বোধন হয়, স্বামীজির আজন্ম লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটে। স্ত্রীমঠের নামকরণ হয় 'সারদা মঠ' এবং এর প্রথম অধ্যক্ষা হলেন শ্রীভারতী। ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী সারদাদেবীর জন্মতিথিতে স্বামী শঙ্করানন্দ মঠ ও মিশনের ট্রাস্টি ও প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সামনে শ্রীভারতী ও সাতজন ব্রহ্মচারিনীকে বিরজা হোম পূর্বক সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত করেন। শ্রীভারতীর সন্ন্যাস নাম হল প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা।

১৯৫৯ খ্রীঃ পর্যন্ত শ্রীসারদামঠ বেলুড় মঠের একটি শাখা কেন্দ্র রূপেই পরিগণিত হত। ১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ মঠের সন্ন্যাসিনীদের স্ত্রমিঠের ট্রাস্টি করে তাঁদের উপর স্বাধীন সারদামঠের ভার অর্পণ করেন এবং প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণাই অধ্যক্ষা পদে আসীন হন। একথা অনস্বীকার্য যে সারদামঠের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মসূচী রামকৃষ্ণমঠের সাথে অভিন্ন হলেও উভয়ের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। অর্থাৎ শ্রীসারদামঠ রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরিচালিত একটি সংস্থা রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে স্বামী বিবেকানন্দের বহু কাঙ্খিত স্ত্রীমঠ পরিকল্পনার সার্থক রূপ ঘটে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার নেতৃত্বে। এইভাবে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার জীবনের এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল - সূচনা হল এক নব যুগের।

১৯৬০ সালের মে মাসে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী শ্রীসারদামঠের ট্রাস্টিগণ জনহিতকর কার্য আরম্ভ করেন। এই উদ্দেশ্যে "রামকৃষ্ণ সারদামিশন অ্যাসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তা যথাবিধি নথিভুক্ত করা হয়। এইভাবে নব প্রতিষ্ঠিত "শ্রীসারদামঠ" ও "রামকৃষ্ণ সারদা মিশন" রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সমমর্যাদা লাভ করে। এই সংস্থার প্রথম শাখাকেন্দ্র হল একটি ডিগ্রি কলেজ, যা দমদম অঞ্চলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় শাখা স্থাপিত হয় ১৯৬২ খ্রীঃ আলমবাজারে বারুইপাড়া পল্লীতে। তদানিন্তন সরকারের অর্থানুকূল্যে একটি মাদার ট্রেনিং সেন্টার ও জুনিয়র বেসিক স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য জমি কিনে বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্গত তিনটি প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরিত হয়ে রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অন্তর্গত হয়, ১৯৬১ খ্রীঃ মার্চ মাসে এন্টালী আশ্রম, নভেম্বর মাসে মাতৃভবন এবং ১৯৬৩ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে নিবেদিতা বিদ্যালয়। এছাড়া প্রথম থেকেই সারদামঠ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল কলকাতার বাইরের মহিলা ভক্তগণ যাতে দু-চারদিন মঠে বাস করতে পারেন তার জন্য একটি পৃথক অতিথি ভবন নির্মাণ করা। ১৯৬৪ খ্রীঃ ঐ অতিথি ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। এইভাবেই প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার তত্ত্বাবধানে শ্রীসারদামঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের ক্রমসম্প্রসারণ ঘটে।

উদ্বোধনে সারদাদেবীর সংস্পর্শে থাকার কারণে ভারতীপ্রাণার জীবন এক নতুন ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছিল। যার প্রতিফলন দেখা যেত সারদামঠের প্রত্যেকটি কাজে।

ভারতীপ্রাণার সুস্পষ্ট জীবনাদর্শ, আত্মত্যাগ, কঠোর কর্মজীবন শুধু যে মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসিনী বা ব্রহ্মচারিনীদেরই অনুপ্রাণিত করত, তা নয়,রামকৃষ্ণ সারদা ভাবাদর্শের সকলকেই তা নতুনভাবে পথ দেখাত, তাদের মুগ্ধ করত। সারদাদেবী যেমন সকলকে নিয়ে পরম ভালবাসায় একত্রে থাকতেন। মঠের প্রতিটি অংশের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিত সারদাদেবীর পক্ষপাতহীন অনাবিল স্নেহের কথা। সারদাদেবীর "যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন" - এই কথাগুলির যথার্থ ভারতীপ্রাণার জীবনে প্রতিফলিত হত। যে কোন পরিবেশে, যে কোন প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি অবিচলিত থাকতেন, শান্তভাবে সমস্ত পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতেন এবং তাঁর উদার ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতা দিয়ে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কুসংস্কার গুলিকে অতিক্রম করে একটি সহজ সরল, যুক্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হতেন। এইভাবে সারদাদেবীর মত তিনিও মঠবাসিনীদের সামনে একটি যথার্থ আদর্শনিষ্ঠ জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তোলেন।

তবে শুধু মঠবাসীই নয়, সমস্ত ভক্ত মেয়েদের দুঃখকষ্টকে তিনি উপলব্ধি করতেন এবং নানাভাবে সহানুভূতির সাথে পরামর্শ দিয়ে নতুন পথের সন্ধান দিতেন। তিনি নিজে মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করলেও নারী শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন। তিনি আন্তরিক ভাবে চাইতেন, মেয়েরা যেন লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া তিনি পণপ্রথারও তীব্র বিরোধী ছিলেন। কেউ পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছে শুনলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন। মেয়েদের উপর কোন অত্যাচার বা অবমাননা ঘটলে তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারে না। বহু স্বামী পরিত্যক্তা কিংবা নির্যাতিতা মেয়েদের তিনি অর্থ দিয়ে ও নানাভাবে সাহায্য করতেন। মেয়েদের প্রতি এত সহানুভূতিশীল হলেও তিনি কোনরকম মিথ্যা কথা বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কোন মতেই বরদাস্ত করতেন না। এভাবে দেখা যাচ্ছে, সারদাদেবীর অন্তরঙ্গতা ও শিক্ষা সর্বতোভাবে ভারতীপ্রাণাকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিল, যে শিক্ষার প্রতিফলন তাঁর সমস্ত জীবনেই দেখা যায়। তাই স্বামী মাধবানন্দ মঠবাসিনীদের কাছে ভারতীপ্রাণা মাতাজী সম্পর্কে যথার্থই বলেছিলেন, "মা ঠাকরুণের অন্ত রঙ্গ সেবিকা! একি কম কথা! তোমরা কখনই তাঁকে সামান্য মনে করবে না। তাঁর কাছ থেকে সব জেনে শিখে নেব।" বস্তুত সারদাদেবীর আন্তরিক সাহচর্যে ভারতীপ্রাণার জীবনও সারদাদেবীরই মত অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কারী, নীতিনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যা ১৯৫৪ খ্রীঃ থেকে ১৯৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘ আঠারো বছর শ্রীসারদামঠকে আবৃত করে রেখেছিল, রক্ষা করেছিল এই নবাঙ্কুরকে প্রাথমিক ঝড় ঝাপটার হাত থেকে আর এইভাবেই ভারতীপ্রাণার জীবনটি নিঃস্বার্থ স্নেহের দৃষ্টান্ত হিসাবে নিবেদিতা ক্রিস্টিন সুধীরা বৃত্তের সম্পূর্ণতা সাধন করল।

১৯১১ সালে সরস্বতী পূজার ভাসানের দিন গৃহত্যাগের মধ্য দিয়ে যে জীবনের নতুন সূচনা হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী তার পরিসমাপ্তি ঘটে। শেষ হয় রামকৃষ্ণান্দোলনের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার ৩১ শে জানুয়ারী ১৯৭৩ সালের রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, "সেই কবে এ জীবনে এসেছিলেন বাগবাজারের সরলা নামে একটি সরলা বালিকা। .... উদ্বোধনে শ্রী শ্রী সারদা মায়ের কাছে রইলেন তাঁর শিষ্যা হয়ে, সেবিকা হয়ে।

জীবন তার সূচনাতেই এক মহাপূর্ণতার দিকে লক্ষ্যবদ্ধ হয়েছিল। .....
বারাণসী বৃন্দাবনে একলা কাটিয়েছেন ভিক্ষাঝুলি নিয়ে মাধুকরী করে। .....

৭৮ বছর আগে এক উল্টোরথের দিন, সেদিন ছিল ২১ জুলাই। আবির্ভূতা হন এই মহাসাধিকা। দীক্ষা দিয়ে, সন্ন্যাস দিয়ে, স্নেহ, বাণী উপদেশ ধারায় শতশত নরনারীকে অভিসিঞ্চিত করে প্রয়াত হলেন ১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারী।

'ভারতীপ্রাণার মৃত্যুতে প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা মাতাজী যথার্থই লিখেছিলেন - "আমরা স্থূল জগতে শ্রী শ্রী মায়ের জীবন যাপন দেখার সৌভাগ্য লাভ করিনি, কিন্তু তাঁর এই কন্যাটির জীবন আমাদের সম্মুখে আঠারো বছর ধরে জাজ্জ্বল্যমান ছিল।"

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। নির্ভয়প্রাণা প্রব্রাজিকা (সম্পা) 'ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা', শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর,কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃঃ ২৫।
২। তদেব পৃঃ ২৪
৩। তদেব পৃঃ ২৬
৪। 'অনন্যা সুধীরা', পৃঃ ৬৯
৫। তদেব
৬। তদেব
৭। 'ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা'পৃঃ ২৭ ও 'ভগিনী সুধীরা' - শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী, পৃঃ ১৮৫।
৮। 'ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা', পৃঃ ৩৯
৯। তদেব পৃঃ ৪০
১০। তদেব পৃঃ ৪০
১১। তদেব
১২। 'অনন্যা সুধীরা', পৃঃ ৭৬
১৩। 'ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা', পৃঃ ৫২
১৪। তদেব পৃঃ ৬৫
১৫। তদেব
১৬। তদেব পৃঃ ৭৭
১৭। বেদান্তপ্রাণা প্রব্রাজিকা (সম্পাদিত), 'প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা', শ্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৩

পাড়া গাঁ-র খেলা ঃ বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

সোমনাথ দাস

পাড়া গাঁয়ে শিশুদের খেলার ভূবন এক অজানা আনন্দ উত্তেজনায় ভরপুর। তাদের খেলায় মাটি আছে, রঙ নেই। খেলনা আছে, উপকরণ নেই। উপকরণহীন খেলার ভূবনে শিশুরা অভিভূত হয় অজানা আনন্দে। অতি সামান্য খেলাই শিশুর মনোজগতকে পৌঁছে দেয় রূপকথার সোনার পরীর দেশে। আনন্দের সীমাহীন জগতে শুধু পথচলা। এ পথ চলার আনন্দ চিরকালের। 'পথের পাঁচালি'র অপু-দুর্গার নাটাফল, রড়ার বিচি কুড়ানো, বাঁশের ধনুক ও পাটকাঠির তীর দিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা, দেশলাই এর খাপ দিয়ে তাস বানিয়ে চারা খেলা মনে করিয়ে দেয় আমাদের ছেলেবেলার দিনগুলি। যেখানে ছিল আনন্দ, আর বন্ধন মুক্তির আকাঙ্খা।

অতীত বাংলার পাড়াগাঁয়ে এমন অনেক খেলা প্রচলিত ছিল তা আজও বাংলার কোন পাড়াগাঁয়ে গেলে দেখা যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যা'র গানগুলিতে 'দাবা' খেলাটির উলে-খ পাওয়া যায়।

পাহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মাড়িউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ ।।
মতিএঁ ঠাকুরক পরীনিবিত্তা।
অবশ করিআ ভববল জিতা ।।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে শিশু শ্রীমন্তের শৈশব বর্ণনায় লোকক্রীড়ার নিদর্শন পাওয়া যায়।

নগর্য়া বালক সঙ্গে   সদাই খেড়ে কড়া ভাঙ্গে
খেলে সদা টিকা কৌড় ভেটা
....
তেপাআ বাঘচালি   খেলে সাধু সাতা ধুলি
সামরু সবই তিনাতা
কোনোকোনি নেত্রবন্ধ   খেলায় সদাই দ্বন্দ্ব
না জানি দিবসে থাকে কোথা।

শিশু শ্রীমন্তের খেলায় সাতাচারি, মাছ মাছ, ময়নাগুড়ি, ডুবাবাজি, ঝালি প্রভৃতি খেলারও পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকক্রীড়াগুলিতে সমগ্র লোকজীবনের খন্ড বিক্ষিপ্ত পরিচিতি নিহিত রয়েছে। পাড়া গাঁ-র উপকরণহীন খেলাগুলি তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরে। সামাজিক কর্ম ও চিন্তাধারার নানা ঘাত প্রতিঘাত প্রত্যক্ষ করা যায় খেলাগুলির মধ্যে। গ্রাম্য খেলাগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে ঐতিহাসিক তথ্যের অবিন্যস্ত ও অগ্রথিত

কাঁচামাল —

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি
ডুলি গেল সেই কমলা পুরী। ....

ডুম অর্থাৎ ডোম দৈন্যদল। উদ্ধৃত খেলার ছড়াটি বিগত দিনের জনসেনাবাহিনীর জাকজমকটিকেই তুলে ধরেছে।

অন্য একটি খেলার ছড়ায় পাওয়া যায় সাহেববাবুদের সঙ্গে ইংরেজ ও পোর্তুগিজদের মিলের আভাস —

উপেনটি বাইস্কোপ
নাইনটেন টাইস্কোপ
টুলটানা বিবিয়ানা
সাহেববাবুর বৈঠকখানা
বাবু বলেছেন যেতে
পান সুপারি খেতে।

পাড়া গাঁয়ের খেলাগুলি আভিজাত্যহীন, মুকুটহীন রাজার মতো। গ্রামীণ সরলতা এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পল-ীমায়ের সন্তানদের এই উপকরণহীন খেলাগুলিই জুটিয়ে দিচ্ছে আনন্দের খোরাক। শিশু মনের বিকাশে এই খেলাগুলির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিশুর খেলার ভান্ডারে গচ্ছিত যে খেলাগুলি আজও পাড়াগাঁয়ে চোখ রাখলেই দেখা যায়, সেগুলি হল — কাবাডি, গোল-ছুট, ডাংগুলি, পিন্টু বা পিটু, কুমিরডাঙা, লুকোচুরি, গাদী, ডেগোল (চারা খেলা), কিতকিত, বৌ বসন্তী ইত্যাদি। এই খেলাগুলির উদ্ভব কবে, কীভাবে তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। প্রবাদ বাক্যের মতোই এ খেলাগুলির উদ্ভব পল-ীবাংলার মানস ভূমিতে। কোন সুদূর অতীত থেকে এর ধারা আজও বহমান।

পাড়া গাঁ-র ছেলেদের একটি জনপ্রিয় খেলা গোল-ামারি বা গোল-ছুট। এই খেলায় আছে ছুটোছুটি করার আনন্দ আর মুক্তির অনাবিল আকাঙ্খা। দুটি দলে ভাগ করে এই খেলা হয়। প্রতি দলে কতজন থাকবে তার নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। ছেলে ও মেয়ে উভয়েই এই খেলার অংশীদার হয়। প্রতিটি দলে একজন রাজা বা প্রধান সেনাপতি থাকে। একটি গোলাকার দাগ কেটে তার মধ্যে রাজা বা সেনাপতিকে বসানো হয়। গোলাকার অংশটি থেকে কিছুটা দূরে - সাধারণ ৩০-৫০ মিটার দূরে একটি আয়তাকার ক্ষেত্র অঙ্কন করে দলের রাজাকে ঘিরে থাকে, যাতে রাজা ফাঁকা পেয়ে আয়তাকার ঘরে পৌঁছে না যায়। বসে থাকা রাজার দলের লোকেরা এক একজন করে দম নিয়ে মুখে 'চু-উ-উ-উ' আওয়াজ করতে করতে রাজাকে ঘিরে থাকা বিরুদ্ধ দলের সদস্যদের তাড়িয়ে দেয় বা ছুঁয়ে দিয়ে মাঠের বাইরে বের করে দেয়। বিরুদ্ধ দলের রাজা আয়তাকার ঘরে অবস্থান করে। তাকেও

ঘর থেকে তাড়াতে হয়। এই সুযোগে রাজা আয়তাকার ঘরে চলে আসলে গেম ওভার। অনেক সময় অনেকের দম ফুরিয়ে যায়। তাকে যদি প্রতিপক্ষ দলের ছেলেরা ছুঁয়ে ফেলে, তবে সে খেলার বাইরে চলে যায়। দম ফুরানোর আগেই সে যদি রাজাকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে বা আয়তাকার ঘরে পৌঁছে যায় তবে সে খেলায় থেকে যায়। এই খেলার উপাদান সামান্যই — খোলা মাঠ, মুক্ত আকাশ আর অসীম আনন্দ।

ডাংগুলি এক অদ্ভুত ধরণের পাড়া গেঁয়ে খেলা। খেলার উপকরণ বলতে কঞ্চি দিয়ে তৈরী একটি অংশ বা লাঠি এবং দুই দিক ছুঁচলো পাঁচ ইঞ্চি মাপের একটি গুলি।এটি দেখতে অনেকটা মাকুর মতো। এই খেলাটিও দুটি দলের মধ্যে হয়ে থাকে। একটি ছোটো লম্বাটে গর্ত করে তার মধ্যে মাকুর মতো দন্ডটিকে রাখা হয়। ডাং-টির সাহায্যে দন্ডটি যতদূর যায় ততদূর ফেলা হয়। বিরুদ্ধ দল গর্ত থেকে কিছুটা দূরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। অনেকটা আধুনিক ক্রিকেট খেলার ফিল্ডিং এর মতো। ডাং দিয়ে দন্ডটি ছোঁড়ার সময় যদি শূন্যে ধরে ফেলা যায় তবে সে আউট বলে গণ্য হয়। দন্ড বা গুলিটি যেখানে গিয়ে পড়ল সেখান থেকে দন্ডটিকে আবার ডাং দিয়ে ছুঁচলো অংশে আঘাত করে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় জোরে আঘাত করা হয়। যতদূর দন্ডটি গিয়ে পড়বে সেখান থেকে ডাং দিয়ে গর্তটি পর্যন্ত মাপা হয়। ডাং-এর আয়তনে যতবার মাপা হল সেই দলের তত পয়েন্ট। এইভাবে দলের প্রতিটি সদস্য আউট না হওয়া পর্যন্ত অন্যদল ডাংগুলি ব্যবহার বা খেলার সুযোগ পাবে না। খেলাটি অনেকটা আধুনিক ক্রিকেট খেলার মত। অনেকের মতে, ডাংগুলি খেলা থেকেই নাকি আধুনিক ক্রিকেটের জন্ম।

শিশুদের খেলার ভূবনে আরেকটি জনপ্রিয় খেলা পিন্টু বা পিটু। খেলার উপকরণ ছড়িয়ে আছে গ্রামের পথে-ঘাটে-হাটে-মাঠে। পুরানো টালিভাঙা গোলাকার বা চৌকো করে ভেঙে নিলেই হল। কোথাও সাত বা কোথাও নয়টি টালিভাঙা পরপর সাজিয়ে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা থাকে। তা থেকে প্রয়োজন মতো কিছুটা দূরে একটা রেখা অঙ্কন করা হয়। রেখার ওপার থেকে ছোট বল দিয়ে সাজানো চারাগুলিকে আঘাত করে ভেঙে দেওয়া হয়। দলের প্রতি সদস্য তিনবার করে সুযোগ পাবে। পড়ে থাকা চারাগুলি পরপর আবার সাজিয়ে নিলেই পয়েন্ট নিজেদের পকেটে। চারাগুলি সাজানোর আগে বিরুদ্ধ দল অন্য দলের কোন সদস্যের গায়ে বলটি লাগিয়ে দেয় তবে খেলার দখল তাদের হাতে চলে যায়।

কোন কোন খেলায় নেই কোন উপকরণের বালাই। খেলার কোন উপকরণ না পেয়েই শিশুরা নিজেরাই খেলা তৈরি করে নেয়। এমন একটি খেলা কুমিরডাঙা। যে কোন জায়গায় এটি খেলা হয়। কয়েকজন মিলে এটা খেলা হয়। শিশুরা নিজেদের মধ্যে একজনকে কুমির হিসাবে বেছে নেয়। কুমির জলে আর বাকিরা ডাঙায় অবস্থান করে। ডাঙা থেকে কেউ জলে নামলেই (কৃত্রিম জলাশয়) কুমির তাকে ধরার চেষ্টা করে। 'ও কুমির তোমার জলে নেমেছি' বলে শিশুরা আবার ডাঙায় উঠে পড়ে। সাধারণ একটা মনগড়া খেলা অথচ এর মধ্যে আছে কত আনন্দ, আছে কত প্রাণোজ্জ্বল উন্মাদনা। শিশুমনের সরলতা অতি সামান্যের মধ্যেই খুঁজে পাই পরম আনন্দ।

শিশুর লুকানোর আনন্দ চিরকালের। মা শিশুর লুকোচুরি শিশু মনকে করে

তোরে বিস্ময়াপন্ন। এই খেলায় নেই কোনো বাহ্যিক উপকরণ। খোলা মাঠ, বাগান, জঙ্গল,বাড়ি যে কোন স্থানই হৈ খেলার মঞ্চ। এই খেলার সদস্য সংখ্যার কোন সীমারেখা নেই। খুঁজে বের করার পর যে আনন্দ, রহস্য, উন্মাদনা রয়েছে তার প্রথম হাতে খড়ি লুকোচুরি খেলার মধ্যেই। এই খেলায় একজনকে চোর হিসাবে বেচে নেওয়া হয়। সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে যে যার মতো লুকিয়ে পড়ে। চোরের কাজ হল লুকানো সকলকে খুঁজে বের করা। সকলকে খুঁজে বের করতে পারলে সে চোর থেকে মুক্ত হয়। যাকে প্রথম খুঁজে বের করল সে চোর হিসাবে বিবেচিত হয়। এভাবে খেলা চলতে থাকে।

পাড়া গাঁয়ের আর এক মজাদার খেলা গাদী। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এই খেলাটি হয়। মাঠের মধ্যে লম্বালম্বিভাবে পরপর ৬,৭,৮,৯টি কোট কাটা হয়। একটি দল কোটের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় পরপর দাঁড়িয়ে যায়। প্রতিপক্ষ দলের ছেলেরা নির্দিষ্ট একটি ঘরে প্রথমে প্রবেশ করে। ঘরটিকে দুদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়। দলের সদস্যরা ঘর থেকে বেরোনোর চেষ্টা করে। দলের যে কোন একজন সদস্য প্রতিপক্ষ দলের কোন সদস্যের স্পর্শ না পেয়ে সব ঘরগুলি স্পর্শ করে যদি পুনরায় স্টার্টিং পয়েন্ট - এ ফিরে আসতে পারে তবে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। এই খেলার নেই কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তবু গাদী খেলার জনপ্রিয়তা বাংলার যে কোন গাঁয়ে গেলে বুঝতে পারা যায়।

কোন খেলার উপকরণ আবার টালির টুকরো আর গাছের পাতা বা ফেলে দেওয়া দেশলাই বা সিগারেটের খোল। পাড়া গাঁ-র ছেলেরা তা দিয়েই বানিয়ে নেয় টাকা বা তাস। টালির তৈরী ছোট চারা দিয়ে খোলা মাঠে, ডোবা বা পুকুর পাড়ে ঢালু সমতল জায়গায় খেলা হয়। ছোটো একটি বর্গাকার ঘর মাটিতে অঙ্কন করা হয়। তাতে পা রেখে একজন চারটি মাপ মতো জায়গায় ছুঁড়ে ফেলে এবং পরিমাণ মতো নকল টাকা বা তাস মুঠিবদ্ধ করে ধরা হয়। অন্যজন একইভাবে বর্গাকার ঘরটিতে পা রেখে পূর্বের চারাটিকে খাওয়ার চেষ্টা করে। যদি উপযুক্ত মাপ মতো চারাটিকে খেয়ে ফেলতে পারে তবে মুষ্টিবদ্ধ তাস বা টাকাগুলি তার। আর যদি না পারে তবে মুষ্ঠিতে যতগুলি তাস আছে ততগুলি গুনে দিতে হয়। তাছাড়া চারাটিকে না খেয়েও ঘরে ফিরে আসার সুযোগ আছে। ঘন্টার পর ঘন্টা এবাবেই সময় কাটিয়ে দেয় তারা।

পাড়া গাঁয়ে একটি খেলার নাম কিতকিত। এই খেলাটি মেয়ে মহলে বেশি জনপ্রিয়। পাশাপাশি দু'দিক মিলিয়ে মাপ মতো ছয়টি ঘর মাটিতে দাগ কেটে অঙ্কন করা হয়। একটি গোল ছোট আকারের মাটির হাঁড়ি ভাঙা দিয়ে তৈরি চারা এই খেলার উপকরণ। প্রত্যেকটি ঘরে চারাটি ফেলে দিয়ে 'চু কিতকিত' বুলিতে এক দমে এক পায়ে লাফিয়ে ছয়টা ঘর পার করতে হয়।

এগুলি ছাড়াও কানামাছি, দাড়িয়াবান্ধা, ছিবুড়ি, সীতাচুরি, লাল লাঠি, গুলি খেলা, সোনাপুতি, রুমালচুরি, বাঘছাগল, চিনিবিস্কুট, রান্নাবাটি, গাচ্ছা রে গাচ্ছা, বৌ বসন্তী কত কী খেলার ভান্ডার লুকানো রয়েছে পল্লীর আনাচে কানাচে।

আজকের গতিমান যুগে আধুনিক সভ্যতার হাতছানিতে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে পল্লীর খেলাগুলি। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস, ভলিবল ইত্যাদি স্বীকৃত খেলাগুলির দৌলতে পল্লীর

খেলাগুলি চর্চার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। কম্পিউটার ইন্টারনেটের যুগে ভিডিও গেমের মাধ্যমে উপভোগ করা যায় খেলার আনন্দ। শিক্ষার প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে আমরা ভুলতে বসেছি পাড়াগেঁয়ে খেলাগুলি। আধুনিক যুগ যান্ত্রিকতার যুগ, কৃত্রিমতার যুগ। অথচ প্রাচীনকালে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত। কিন্তু এখন জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যন্ত্রের আধিপত্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে বসে গেম খেলে কিন্তু মাঠে খেলাধূলা করে ন া। ফলে শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে তাদের মানসিক গঠন সুচারু হয় না। খেলার মাঠে পারস্পরিক সহযোগিতা, উদার মনোভাব, নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণাবলী জাগ্রত হওয়ার অবকাশ পায়। শিশুর মানসিক বিকাশে পাড়া গাঁ-র খেলাগুলির গুরুত্ব যান্ত্রিক তার যুগেও অপরিসীম ও প্রাসঙ্গিক।

এ সত্য গোপন কেন ঃ সূর্য ঘোরে পৃথিবী নয়

রাজ্জাক মন্ডল

শ্রদ্ধাশীল গুরুজন ও প্রিয় ভাইবোনেরা। জটিল এক সমস্যার উপর হাত বাড়িয়েছি। এ সমস্যা শুধু আমার নয়, সমগ্র বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের গুরুতর সমস্যা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে সমস্যা চলে আসছে এবং যে সমস্যা সমাধানের জন্য বহু বৈজ্ঞানিক চিন্ত াবিদ আত্মনিয়োগ করেছেন, সে সমস্যার সমাধান আমার মতো একজন অতি নগন্য ব্যক্তির করা দুরুহ। তবুও একটু না লিখে থাকতে পারছি না, কেননা ছোটবেলা থেকেই আমার অভ্যাস সত্যের পথে চলা এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরা।

'The sun rises in the east and sets in the west' —শুধু তাই নয়, এটাকে Universal Truth বা চিরসত্য বলে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোথাও কোন পুস্তকে লেখা নেই - 'The earth rises in the east sets in the west . 'সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে'— প্রাচীনকাল থেকে মানব জাতি এই বিশ্বাসে অবিচল ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিও সূর্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে যে মতবাদ দিয়েছেন সেটা ভ্রমাত্মক। সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে শুধুমাত্র পৃথিবীতে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের নানাবিধ তথ্য। যেগুলোর উপর ভর করেই আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে চলেছে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ - কোরআন, হাদিম, বাইবেল, বেদ, জেন্দ-আবেস্তা এবং পাশাপাশি- বিজ্ঞানও পরিষ্কারভাবে সাক্ষ্য দেয় যে 'পৃথিবী স্থির, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে।'

কোরআনের প্রমাণ ঃ ১) "নিশ্চয় আল-াহ আকাশ সমূহ ও পৃথিবীকে এমনভাবে ধারণ করেছেন যেন ওরা স্ব স্ব স্থান হতে নড়াচড়া করতে না পারে।" [Para - 22, SURA - FATER]

২) "এবং আমি এই জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি যেন উহা (পৃথিবী) তৎসহ আন্দলিত না হয়। [Para - 17, SURA - AMBIA]

৩) "চন্দ্র ও সূর্য গননায় নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে" অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র এমনভাবে ঘুরছে যার ফলে দিবা রাত্রি হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনকে লক্ষ করে দিন, মাস ও বছরের গননা করা হচ্ছে। [Para - 27, SURA - RAHMAIN]

হদিসের প্রমাণ ঃ "হজরত মহম্মদ (সাঃ) বলেছেন "যখন আল-াহতায়ালা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন তখন তাহা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অতপর আল-াহ পাহার পর্বত সৃষ্টি করিলেন এবং উহার উপর শলাকা স্বরূপ মারিলেন, তখন পৃথিবী স্থির হইল।
[মেশকাদ ও হাদিসে রসুল]

বাইবেলের প্রমাণ ঃ ১) "সূর্য ওঠে আবার অস্ত যায়; এবং সত্বর স্বস্থানে যায় যেখানে গিয়া ওঠে" [বাইবেলে যবুর উপদেশক ১/৫]
২) "যখন তিনি উর্দ্ধস্ত আকাশকে দৃঢ়রূপে নির্মান করিলের; যখন জলাধার প্রবাহরাশি প্রবল হইল; যখন তিনি সমুদ্রের সীমা স্থির করিলেন যেন জল তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন না করে,যখন তিনি পৃথিবীর মূল নিরূপন করিলেন।"
[বাইবেল যবুর হিতোপদেশ পরিচ্ছেদ ৮/২৯]

বেদের প্রমাণ ঃ ১) "সবিতা নানা মন্ত্রের দ্বারা (পর্বতমালার দ্বারা) পৃথিবীকে সুস্থ রেখেছেন তিনি বিনা খুঁটিতে আকাশকে দৃঢ় রূপে ধারন করেছেন। [ঋগবেদ। দশম মন্ডল ১৪৯/১]
২) "আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল ও সমস্ত পর্বতও নিশ্চল [ঋগবেদ। দশম মন্ডল ৮৯/৪]
৩) "হে আকাশে পরিভ্রমণকারী সূর্য ও চন্দ্র!" [ঋগবেদ। দশম মন্ডল ১৭৩/৪]

জেন্দ-আবেস্তা ঃ ১) "তিনি চন্দ্র, সূর্যকে পূর্ব হইতে পশ্চিমে ভ্রমণকারী করিয়াছেন এবং পৃথিবীকে জলপরি বিস্তৃত করিয়াছেন।"
২) যখন পৃথিবী কম্প জ্বরে কাতর হইয়াছিল তিনি তাহার প্রাণকে পর্বত রূপে কীলক প্রোথিত করিয়াছিলেন। তখনই পৃথিবী স্থির হইল।

বিজ্ঞানের প্রমাণ ঃ প্রথম প্রমাণ - "বিশ্বের প্রতিটি পদার্থই একে অপরকে সজোরে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষনী শক্তি নির্ভর করে প্রত্যক্ষভাবে তাদের ভরের শক্তি গুনফল এবং পরোক্ষভাবে দূরত্বের বর্গের উপর।" [নিউটন]

যদি একটার ভর অপরটির চাইতে বেশী হয় তবে যার ভর বেশী সে অন্যটাকে কাছে টানবে। দূরত্ব বেশী হলে এই আকর্ষনীয় শক্তি কমে যায় ফলে কাছে টানতে পারে না, তবে তার শক্তিতে ছোটটাকে বা হালকাটাকে তার চর্তুদিকে ঘুরায়। কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের সমন্বয়ে পৃথিবী গঠিত, তাই এটি অত্যন্ত ভারী। অন্যদিকে সূর্য একটি অগ্নিপিন্ড। আমরা জানি আগুনের কোন ওজন নেই। তাই সূর্যের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে যতগুন বড় হোক না কেন তার ওজন পৃথিবীর ওজনের থেকে অনেক কম। অতএব সূর্য পৃথিবীকে ঘোরাতে পারে না। এটা অসম্ভব।

দ্বিতীয় প্রমাণ - প্রথিবী যদি ঘুরত তাহলে নিশ্চয়ই নক্ষত্র ও হেডলির ধুমকেতুগুলি দৃষ্টি বর্হিভূত হতো। দু এক যুগ অথবা দু' এক শতাব্দীতেও দৃষ্টি বর্হিভূত হতো। কিন্তু পূর্বপুরুষদের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর জনম লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এগুলোর কোন স্থান পরিবর্তন হয়নি। তাই দৃঢ়কন্ঠেই বলা যায় যে 'পৃথিবী স্থির।'

তৃতীয় প্রমাণ- পৃথিবীতে তিনভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। এই জলবেষ্টিত পৃথিবী আপন

বক্ষের উপর ঘন্টায় ১ হাজার মাইল বেগে ঘুরলে স্থলভাগের কোন অস্তিত্বই থাকত না। এছাড়া পৃথিবী যদি পশ্চিম হতে পূর্বে ঘুরত তাহলে সামুদ্রিক স্রোতকে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে দেখা যেত না। শুধুমাত্র পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হত। কিন্তু তা হয় না, তাই নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, পৃথিবী স্থির।'

চতুর্থ প্রমাণ - বৈজ্ঞানিকদের মতে, পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল। ২৪ ঘন্টায় আপন বক্ষের উপর ঘুরে আসে। তাহলে পৃথিবীর গতিবেগ ঘন্টায় ১ হাজার মাইলেরও বেশী। ধরলাম এই প্রচন্ড গতিতে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরছে।, তাহলে তার পারিপার্শ্বিক বায়ুমন্ডলও একই দিকে ঘুরতে থাকবে। কিন্তু আমরা তো বছরের বিভিন্ন সময়ে বায়ুমন্ডলকে বিভিন্ন দিকে ঘুরতে দেখি। এমনকি পূর্ব হতে পশ্চিমেও মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহলে খেয়াল করুন ১ হাজার মাইলেরও বেশী গতি সম্পন্ন বায়ুমন্ডলকে অতিক্রম করে মৃদুমন্দ বায়ু উল্টোদিকে প্রবাহিত হয় ? কখনও না। তাই পৃথিবী স্থির না হলে এমন বায়ু প্রবাহ অসম্ভব।

পঞ্চম প্রমাণ - সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসতে পৃথিবীর প্রায় ৬০ কোটি মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। সময় লাগে ৩৬৫ দিন। তাহলে পৃথিবীর বাষিক গতি ঘন্টায় ৬৮৫০০ মাইল একই ভাবে ঘন্টায় ২২৮৫ মাইল গতিতে চন্দ্র পৃথিবীর চর্তুদিকে ঘোরে। চন্দ্র মাত্র ২২৮৫ মাইল গতিবেগ নিয়ে ৬৮৫০০ মাইল গতিবেগ বিশিষ্ট পৃথিবীর চর্তুদিকে কিভাবে ঘুরবে ...? তাই বলবো পৃথিবী স্থির বলেই চন্দ্রের ঘুর্ণন সম্ভব হচ্ছে।

ষষ্ঠ প্রমাণ - ধরলাম পৃথিবী ঘুরছে সত্য কিন্তু শূন্যকে নিয়ে নিশ্চয়ই ঘুরছে না। তাহলে মনেকরি দমদম থেকে একটি এরোপে-ন ১০/১৫ মাইল সোজা উপরে উঠে ১ ঘন্টা গতি নিয়ন্ত্রন করে রাখল। এই এক ঘন্টায় পৃথিবী তো ১০০০ মাইল পূর্ব দিকে সরে যাবে। ১ ঘন্টা পর এরোপে-নটিকে সোজা সুজি নামালে দমদমের উপর না পড়ে তো দিলি-তে পড়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। তাই এটা পরিস্কার যে, 'পৃথিবীর ঘুরছে না।'

সপ্তম প্রমাণ - বিংশ শতাব্দীতে একথা বললে সবাই বিশ্বাস করে যে, রকেটের সাহায্যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা হয়েছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ ছেড়ে যে গতিতে রকেটকে উর্দ্ধাকাশে উঠতে হয়েছিল তার গতিবেগ ছিল প্রতি সেকেন্ডে ৭ মাইল। অর্থাৎ ২৫ হাজার মাইল প্রায়। পৃথিবীর চর্তুদিকে রকেটকে যে গতিবেগ নিয়ে চলতে হয়েছে তা ছিল ঘন্টায় ১৬০০০ মাইল (এপ্রক্স) এবার প্রশ্ন হল যে রকেট ঘন্টায় ১৬০০০ মাইল গতিবেগ নিয়ে চক্রাকারে ঘোরে তা কি করে ৭০০০০ মাইল বেগ বিশিষ্ট পৃথিবীর চর্তুদিকে ঘুরবে। যদি রকেটটা বেশী গতিবেগ সম্পন্ন পৃথিবীর গতিপথের সামনে পড়ে তবে সংঘাত অবিনার্য আর যদি পিছনে পড়ে তবে পৃথিবীকে আর জন্ম জন্মান্তরেও ধরতে পারবে না।

এছাড়া টলেমি ছিলেন আলেকজান্ডারের একজন সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি। তিনি ঐ

যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, 'পৃথিবী স্থির'। জার্মান বৈজ্ঞানীক, ধর্মযাজক, সৈনিক ও গণক নিকোলাস কোপারনিকাস প্রমাণ করেছেন 'পৃথিবী স্থির'। সমস্ত সৌরজগৎ তাকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে। তিনজন মার্কিন বৈজ্ঞানীক মুলার, স্মুট এবং গ্রেনস্টোন বলেছেন, 'ব্রহ্মান্ড স্থির; এ সত্য উদঘাটিত হয়েছে U-2 বিমান হতে পর্যবেক্ষণ দ্বারা। এছাড়া একাদশ শতাব্দীর এক খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলবেরণী প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবই পৃথিবীর সেবক। সবাই এই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

বৈজ্ঞানীকেরা কোন যুগেই বসে নেই। সর্বযুগেই এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। তবে যখন কোন মতবাদ প্রচলিত হয়ে যায় তখন সেটিকে উল্টানো অত্যন্ত কঠিন। একটা ভুলকে যদি ভুল বলেও জানে তবু পারিপার্শ্বিক চাপে সে ভুলকে সত্য বলেই মানে। বৈজ্ঞানীক আইনস্টাইন তাই বলেছেন, "আঠারো বছর পর্যন্ত মানুষ যা কিছু শেখে, মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত সেটাকেই অনুসরণ করে।" গ্যালিলিও এর পরের বৈজ্ঞানীক নিউটন পৃথিবী ঘোরে একথা মেনে নিতে পারেননি। ১৯৫২ সালে মাইকেল সন্স ও মর্লি একই মত প্রকাশ করেন। পৃথিবী ঘূর্ণনের ব্যাপারে আইনস্টাইনকে জিজ্ঞাসা করে যা পাওয়া যায় তা এই দাঁড়ায় — "পৃথিবী ঘোরে বস্তুত এর কোন প্রমাণই নেই।" উপিরেউক্ত আলোচনার শেষে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সূর্য ঘোরে, পৃথিবী স্থির।

আধুনিক ভারতে নারীশিক্ষা ঃ বর্তমান সময়ের নীরিখে

গীতা (সিনহা) চক্রবর্তী
হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

"Education one man, you educate one person, but educate a woman and you educate a whole civilisation" - Mahatma Gandhi.

সূচনা ঃ সূচনায় বলা যায় নারী থেকে জাতির জন্ম। নারী তাঁর শিক্ষা দীক্ষা, আত্মবিশ্বাস, মানসিকতা, স্বনির্ভরতা, নারী ক্ষমতায়ন, দূরদৃষ্তিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যত উন্নত হবে, সেই জাতিও তত উন্নত হবে। তাই নিশ্চিতভাবেই বিশ্বের প্রতিটি দেশে নারী শিক্ষা, নারী প্রগতি ও নারী শক্তি একান্তভাবেই কাম্য এবং আমাদের দেশ ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়।

"নারী শিক্ষা" শব্দটি দুটি শব্দের সংমিশ্রণ, যথা — 'নারী' এবং 'শিক্ষা', সুতরাং নারী শিক্ষায় এই দুটি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। অর্থাৎ একদিকে নারীজাতির শক্তি, সম্মান, সুরক্ষা, মর্যাদা, ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি প্রদান, অন্যদিকে শিক্ষার আলোয় নারীর সার্বিক ও সর্বাঙ্গিন বিকাশের পথ সুদৃঢ় করা। বর্তমানে শিক্ষিত মহিলা যে জাতীয় সম্পদ এটি সর্বস্তরে স্বীকৃত।

ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার প্রেক্ষাপট ঃ অতীতে এমন একটা যুগ ছিল যখন নারীরা তাদের জীবনের সার্থকতা গৃহস্থালীর কাজে এবং সন্তান প্রতিপালনের দ্বারা অর্জন করতো। অর্থাৎ নারী জাতির সার্থকতা চরিতার্থ হত যোগ্য পত্নী ও মাতা রূপে, তবে সেই যোগ্যতা বিচার করা হত গার্হস্থ্য দক্ষতার মাপকাঠিতে। নারী সমাজের অধিকার সীমায়িত থাকত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম নীতি, আচার অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারের বেড়াজালে।

পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনেতারা উপলব্ধি করেন, যে কোন সভ্যতার বিজয় রথের দুটি প্রধান সমান্তরাল চাকার একটি নারী ও অপরটি পুরুষ। তাই ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশের ১৪,১৫ এবং ১৬ নং ধারায় সবার জন্য সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও ২১, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৫১ ধারাগুলি নারী ও শিক্ষা সংক্রান্ত স্বার্থকে সুরক্ষিত করেছে। আইনের দৃষ্টিতে জাতি লিঙ্গ বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিকই সমান। এখন নারীরা নিজ অধিকার, নিজ সম্মান - মর্যাদা, সুরক্ষার দাবিতে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে।

ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার বর্তমান চিত্র ঃ ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যার ৪৮.৭২% নারী। যেহেতু ভারতের মানবসম্পদের অর্ধভাগ নারী। সুতরাং ভারতের অগ্রগতির অর্ধাংশ নারী সমাজের ওপর নির্ভরশীল। তাই ভারতের মত উন্নয়ণশীল দেশকে বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে সম্পূর্ণ মানবসম্পদকে ব্যবহার করে জাতির উন্নতি ঘটাতে হবে। আর তার জন্য নারীশিক্ষা অপরিহার্য।

বর্তমান কালের বিচারে দেখতে পাই, ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী সাক্ষরতার হার ক্রমবর্ধমান। ২০১১ সেন্সাস রিপোর্ট থেকে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরলে দেখব এই

তথ্যের বাস্তবতা।

Literacy Rate in the India : 1951 - 2011

Census year	Person(%)	Male	Female	m/f gap in literacy rate
1951	16.7	24.9	7.3	17.6
1961	24.0	34.4	13.0	21.4
1971	29.5	39.5	18.7	20.8
1981	36.2	46.9	24.8	22.1
1991	52.2	63.9	39.2	24.7
2001	65.38	76.0	54.0	22.0
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

Source Census of India, GOI (2011)

২০১১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার ৭৪.০৪%। নারীশিক্ষার হার ৬৫.৪৬% এবং পুরুষ শিক্ষার হার ৮২.১৪%। এই রিপোর্ট থেকে স্পষ্ট যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নারী পুরুষ উভয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে উন্নতি করেছে। অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১ সালে যেখানে মোট সাক্ষরতার হার ১৬.৭% ছিল, সেখানে ২০১১ সালে মোট সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৭.৭%। ১৯৫১ সালের তুলনায় ২০১১ সালে পুরষ শিক্ষার হার প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যথা - ২৪.৯% (১৯৫১ সালে) এবং ৮২.১৪% (২০১১ সালে)। এইদিক থেকে আশ্চর্যভাবে, নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৫১ সালের তুলনায় ২০১১ সালে প্রায় নয়গুণ অর্থাৎ ৭.৩% (১৯৫১ সালে) এবং ৬৫.৪৬% (২০১১ সালে)। সুতরাং এই বিষয়টি সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পুরুষদের তুলনায় নারী শিক্ষার বৃদ্ধির হার দ্রুততর। কিন্তু এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে নারীরা পশ্চাৎপদ। ৩৫% নারী আজও শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে। ভারতবর্ষে গ্রামাঞ্চলে এখনও নারীশিক্ষার অগ্রগতির হার ধীর গতি সম্পন্ন।

ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার সমস্যা ঃ ভারতবর্ষে নারীশিক্ষার পশ্চাৎপদ হওয়ার কারণ বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা, যা আজও বর্তমান, সেগুলি হল ঃ

১) অভিভাবকদের শিক্ষা ও সচেতনার অভাব। গ্রামাঞ্চলে এখনও ৭০% কন্যাসন্তানকে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে গৃহকর্মে নিযুক্ত করা হয়।

২) অতীতের বিভিন্ন প্রথা - কুসংস্কার ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারলেও আজও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে (মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড প্রভৃতি) বাল্যবিবাহ প্রথা নারী সাক্ষরতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

৩) পুরুষদের ওপর নারীদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা তাদের দুর্বলতার আরো একটা কারণ। তাই শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বি করে তোলার জন্য নারীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন।

৪) আঞ্চলিক দূরত্ব বিচার করে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা সর্বত্র সম্ভব হয়নি। বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয়ের অভাব কন্যাসন্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলেছে।

৫) বিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের জন্য পরিকাঠামোগত নানা অসুবিধা, পৃথক শৌচালয়ের অভাব প্রভৃতি মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। যার ফলে প্রাথমিক স্তরের পরে মেয়েদের স্কুলছুটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬) উচ্চ শিক্ষার জন্য মেয়েদের কলেজ সর্বত্র নেই।

৭) পরিবারের আর্থিক অনটন নারীশিক্ষার বিকাশে বাধা প্রদান করছে।

৮) সামাজিক রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কার নারীশিক্ষার পথে বাধা।

৯) সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বৈষম্যমূলক মনোভাব নারীশিক্ষার অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়।

উপসংহার ঃ বর্তমানে মানুষ এটুকু বুঝেছে অন্তত পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে চালনা করতে হলে পরিবারের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার দেখাশুনা করতে হলে গৃহবধূকেও শিক্ষিত হতে হবে। তাই নারীশিক্ষাকে অনুপ্রাণিত করতে বর্তমানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে ছাত্রছাত্রীর সমানুপাতে আসনের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। যেমন অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা মেয়েদের পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা, পৃথক শৌচালয় স্থাপন, বিভিন্ন প্রকার ভাতা প্রভৃতি। এছাড়াও পারিবারিক শিক্ষা ও অভিভাবকের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাচীনকাল থেকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রক্ষাকর্তারা বুঝেছিলেন যে, নারীরা শিক্ষিত হলে নারী তার অধিকার, সম্মান অর্জন করে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বেড়াজাল ভেঙে যাবে। এই মনোভাবকে ব্যর্থ করতে হলে মেয়েদের নিজেদেরই অনেক বেশি সাবলম্বী তথা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ ও শক্ত সমর্থ হয়ে উঠতে হবে। শিক্ষিত নারী সমাজে সন্ত্রাসবাদ, কুসংস্কার দূর করে একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ উন্নত সমাজের বাতাবরণ তৈরি করতে পারে। তাই মালালা ইউসুফজাই এর ভাষায় বলা যায় —Extremists have shown what frightens them most : a girl with a book."

গ্রন্থসূচী ঃ

1. Aggarwal, J.C (2004).Development and planning of modern education Delhi, Vikas publishing house pvt. ltd.

2. Gupta, N.L (2000) Woman education : Thrpugh the ages : New Delhi : Concept publishing company.

3. Kumar, J & Sangeeta (2013) "Status of women education in India".

4. মুখোপাধ্যায়, রঞ্জুগোপাল : শিক্ষার অধিকার অধিকারের শিক্ষা।

5. P. Mukherjee, R.Dev & G. Upadhyaya (2016), "Women's education in India - post predicaments and Future Possibilities."

Reports :

1. Census od India (2011) : Office of registrer General, India.

ফরাসী বিপ-বে বাঙালী বিপ-বী

মুকুল সাহা

সপ্তদশ শতাব্দী। গোরার দল এসে গেছে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। পর্তুগীজ ঘাঁটি গড়েছে ব্যান্ডেলে। অবশ্য ওরা এসেছে অনেক আগেই। হুগলীতে ইংরেজ, চুঁচড়োয় ডাচ,রিষড়েয় গ্রীক, ভদ্রেশ্বরে জার্মান-অস্ট্রিয় আর চন্দননগরে ফরাসী। পলাশী যুদ্ধের বছর পঞ্চাশ আগেই খলিসানি, বোড়ো ও গোন্দলপাড়া এই তিনটি গ্রাম নিয়ে ফরাসীরা গড়ে তোলে শহর চন্দননগর। মাত্র পঞ্চাশ বছরেই নাম ছড়িয়ে পড়লো পূবের অন্যতম সেরা শহর বলে। গোরার দল এসেছিল বাণিজ্য করে বড়লোক হবে বলে। তবে অন্যান্য ব্যবসার আড়ালে তাদের আসল ব্যবসাটা ছিল দাস ব্যবসা, খাস ব্যবসা। জমি কিনতে হয়ে না, কারখানা গড়তে হয় না, লেবর পুষতে হয়না। এক্কেবারে তৈরী মাল — finished product। ধরো হাতে পায়ে বেড়ি বাঁধো আর জাহাজের খোলে ভরো। মাস দুয়েকে পৌঁছে যাবে পশ্চিমের শহর বন্দরে। খরচ বলতে এই ট্রান্সপোর্ট কষ্টটুকুই। Plucking field - থেকে মার্কেট অবধি। তা ওটুকু খরচ তো লাগবেই। এক্কেবারে finished product-এর কারবার, কোন খুঁত নেই। ডিজাইনড্ ডিফেক্টও হয় না। ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টও হয়না। এক্কেবারে গাট্টা গোট্টা ছেলে ছোকরা। অল্পবয়সী ডরকা ছুকরীও পাওয়া যায়।দাম একটু বেশী, তা টাকা ষাটেক হবে। এ ব্যবসা এদেশে আগেও ছিল। মনুসংহিতায় তো দশ রকম ক্রীতদাসের বর্ণনা আছে। মেগাস্থিনিস বলছেন ছিল না। আবার পরবর্তীকালে ইবনবতুতা বলছেন ছিল। আমার মনে হয় ছিল ছিল। সবরকম শোষণের ব্যবস্থা হাঁট করে খোলা ছিল, আর এটা ছিল না। নাই যদি থাকবে তবে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে চন্দ্রপালরা কোত্থেকে এল। মরিশাসে শিওসাগর রাইরা বা কোত্থেকে এল। দাস ব্যবসা আগে থেকেই ছিল, গোরার দল আসায় আড়ে-বহরে একটু বেড়ে গেল, এই যা। এ ব্যাপারে পর্তুগীজরা Pioneer হলেও অন্যেরাও কিছু কম ছিল না। ওরা দেশীয় দালাল ছড়িয়ে দিত, আশে পাশের গ্রামে। তারা ভুলিয়ে ভালিয়ে নারী পুরুষ ধরে নিয়ে আসত সাহেবদের কুঠিতে। ওখান থেকেই জাহাজের খোলে পণ্য হয়ে চলে যেত পশ্চিমের বন্দরে বন্দরে।

সালটা ১৭৭০। বাংলায় মন্বন্তরের বছর। মাত্র বছর দশেকের এক দুবলা পাতলা শ্যামলা ছেলে ফরাসডাঙার সাহেব কুঠিতে এসেছিল কিছু উচ্ছিষ্ট খাবারের লোভে। খাবার পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মায়ের কোলে আর ফেরত যেতে পারেনি। হাতে পায়ে বেড়ি পড়ে ঢুকতে যাবে খোলের ভেতর, পারেনা। দাঁড়িয়ে থাকে ডেকের ধারে। দু'চোখ ভরা জল নিয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকে। অস্ফূটে 'মা' বলে একবার ডেকেও ফেলে মাঁশয়ে মোঁদের লোকদের নজর এড়ায় না। ঠেলে দেয় জাহাজের খোলে। জলে জলে ভেসে ভেসে একদিন পৌঁছে যায় প্যারি নগরে। খালি গা, খালি পা, দীর্ঘ জাহাজ যাত্রায় ক্লান্ত দাসকে একদিন হাজির করানো হয় রাজা পঞ্চদশ লুই-এর দরবারে। অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত, যাত্রাপথের ক্লান্তি ছেলেটি দাঁড়াতেই পারছিল না ভাল করে। প্রাচ্য দেশীয় ছোট্ট ছেলেটা দেখে রাজার বোধহয়

একটু করুণা হয়। রাজা তার বিশ্রাম আর একটু ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। দুদিনেই ছেলেটি বল ফিরে পায়, দাঁড়াতে পারে। ছোট খাটো এটা ওটা করে দিতে পারে। রাজা খুশী হন।

একদিন সন্ধ্যেয় রাজা তাকে কাছে ডাকেন।অনেকগুলো পাখী নানা গড়নের, নানা রঙের, কয়েকটি অদ্ভূত দর্শন কুকর, মহামূল্য গওনা বস্ত্র আর তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজা চলেন অন্দরমহলে মাদাম দি বেরীর ঘরে। বেরী রাজার রক্ষিতা। একে একে সবকিছু দান করে দেন বেরীকে। তার দিকে তাকিয়ে বেরী বলেন, 'একে এনেছো কেন?" রাজা বলেন, একেও তোমাকেই দিলাম। প্রাচ্য দেশীয় ভালো ছেলে, তোমার সেবা করবে। বেরী খুশি। ছেলেটি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যায় বেরীর। ছেলেটির কাছে যেয়ে দাঁড়ান। থুতনী ধরে প্রাচ্যের সেই শ্যামলা ছেলের কালো চোখের দিকে চোখ বিঁধিয়ে তাকান মাদাম। কি দেখলেন তিনিই জানেন, তবে মনে হল তিনি ডুব দিলেন সেই চোখে। ভালো লেগে যায় বেরীর। তাকে তিনি একটু একটু করে লেখাপড়া শেখাতে থাকেন। চালাক চতুর ছেলেটি এগোতে থাকে একটু একটু করে। গণিত, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস সবই সে পড়তে থাকে তার মালকিনের রেখে দেওয়া পন্ডিতদের কাছে। লেখাপড়া কেমন হচ্ছে মালকিন খোঁজ রাখতেন সেদিকেও। দিনে একবার নিঝুম দুপুরে তাকে একবার দেখা করতে হত মালকিনের সাথে। বেরী তার সাথে কথা বলতেন অনেক বিষয়ে। গ্রহ, তারা, নক্ষত্র - সৃষ্টি তত্ত্ব, ধর্ম, ইতিহাস নানা বিষয়ে। প্রশ্ন করতেন অনেক অনেক। ছেলেটির যথাযথ উত্তরে বেরী বুঝলেন ছেলেটি শুধু জ্ঞানেই বাড়েনি,দেহেও বেড়েছে। হঠাৎ করে লম্বা হয়ে গেছে। নাকের নীচে, গালে নরম কালো দাঁড়ি গোঁফ। প্রাচ্য দেশীয় চোখজোড়া আরও টলটলে। ঝকঝকে গভীর হয়েছে। যে কেউ ডুব দিতে চাইবে - বেরীও। ছেলেটির কাছে যায় বেরী। গালে, বুকে, পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। কিন্তু সব বাঁধন আলগা, সদ্য যৌবনে পা দেওয়া প্রাচ্য দেশীয় যুবকের স্পর্শে পাশ্চাত্য নারীর বাঁধের প্রাচীর ভেঙে খান খান। আবেগে জড়িয়ে ধরে। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেন ছেলেটির নাক, মুখ বুক। প্রথম যৌবনেই নারী স্পর্শে হঠাৎ বড় হয়ে যায় বঙ্গজ দাস। ভাবে কাছে না এলেই হোত। কাছে এলেই কামিনী গন্ধ ছাড়ে। বুকের ভেতর কাটা মোরগের ছটফটানি। চকিতেই মহাজাগরণ, দুটি মস্তিষ্কে তখন যুদ্ধের আয়োজন। বেরী নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নেন। ভাট ফুলের গন্ধ মাখা বঙ্গজ যুবককে যৌবনের গভীর আবেগে আবার জড়িয়ে ধরে বেরী যুবকের নাম দেন, লুই বেনেডিকট্ জামর।

আবার এক সন্ধ্যায় মাদাম বেরী জামরের হাতে তুলে দেন এক মহাগ্রন্থ কালজয়ী দার্শনিক Jean Jaques Roussean-র "Institution politiques." বেরী যেমন তাকে নারীত্বের স্পর্শ দিয়ে যৌবন ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, তেমনি নিজের অজান্তে ই দীক্ষিত করলেন বিপ-ব মন্ত্রে। বিদ্যুৎ খেলে গেল বঙ্গজ দাসের মস্তিষ্কের কোষে কোষে। চির বিপ-বী বাঙালী অন্তরে ঝড় উঠলো বিপ-বের।

যতই তিনি রাজার বাড়ি পালিত হন, রাজবাড়ির খানাখান, রাজার প্রেমিকার প্রেমিক হন, তার আসল পরিচয় তিনি একজন দাস, ক্রীতদাস। তার শত্রু অভিজাত তন্ত্র। অভিজাত তন্ত্র ধ্বংসেই দাসত্ব মুক্তির পথ।

এসে গেল ১৭৮৯। দামামা বাজলো ফরাসি বিপ-বের। জামর তখন মাত্র উনিশ। এই বয়সেই বিপ-ব বুকে আসে, আসে প্রেমও। পরিচয় হল ইংরেজ বিপ-বী গ্রিভের সাথে। তার মাধ্যমেই যোগাযোগ হল ফরাসী বিপ-বের নেতাদের সাথে। জামর নির্বাচিত হলেন ভার্সাই বিপ-বী সংগঠনের সচিব হিসাবে। দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপ-বী কর্মকান্ডে। ভলতেয়ার, রুশো, মন্টেস্কুর বিপ-বী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সমগ্র জনগণ অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক হন। ১৪ই জুলাই ভেঙে পড়ে বাস্তিল। সাম্য - মৈত্রী- স্বাধীনতার জয় হয়।

কিন্তু বিপ-ব তরঙ্গ থিতু হলে, গ্রেপ্তার হন জামর। তার বিরুদ্ধে বিপ-বীদের অভিযোগ সে বেড়ে উঠেছে রাজগৃহে, রাজপ্রাসাদে, ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছে তার আর সর্বোপরি তার গায়ে রয়েছে ব্যভিচারের কটূগন্ধ। ১৭৯৩ এর ৬ই ডিসেম্বর বিচার কক্ষে বিচার সভায় জবানবন্দিতে তিনি বলেন, ধর্মাবতার, আমি লুই বেনেডিকট্ জামর। ভারতের বাংলা আমার জন্মভূমি। বাংলা আমার মাতৃভাষা। কিন্তু সে সব অতীত। স্বেচ্ছায় নয় হাতে পায়ে শৃঙ্খল পড়িয়ে দাস হিসাবে আমাকে আনা হয়েছে। রাজা পঞ্চদশ লুই এর রক্ষিতা মাদামবেরী আমার মালকিন, তিনি আমাকে যৌবন ধর্মে দীক্ষিত করেন, সাথে সাথে বিপ-ব ধর্মেও। তিনি আমাকে জানতে শেখান - আমি কে, কি আমার পরিচয়, কি আমার ধর্ম, কি আমার কর্তব্য। আমি দাস ছিলাম, দাস আছি। আমার ধর্ম দাস ধর্ম অর্থাৎ অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে লড়াই করা। সে লড়াই আমি নিষ্ঠার সাথেই করেছি। আমার উদ্দেশ্য অভিজাততন্ত্রের উচ্ছেদ। সে উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে। আর ব্যভিচার, একে আমি ব্যভিচার বলে মানি না। দুটি পূর্ণ বয়স্ক নারী পুরুষ যখন প্রেমের আর্তিতে দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত হয়, তখন কোন যুক্তিতেই অন্যায় বা পাপ বলা যায় না। পুরুষতান্ত্রিক ভাবনায় তৈরী দেশের আইন নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে। তাই, আইন অনুমোদিত সম্পর্কের বাইরে অন্য সম্পর্কের উপর ব্যভিচারের ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। আজ আমি যেমন দাস, পুরুষতন্ত্রের অধীন নারীও তেমনি দাস। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বিপ-বে দাস মুক্তি পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু নারী মুক্তির কথা বিপ-ব ভুলে গেছে। আগামী দিনে সে সংগ্রাম জারি থাকবে। বিচারক দেশের আইন মোতাবেক বিচার করেন। ব্যভিচারের দায় থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়না। শাস্তি কারাবাস। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে প্যারি শহরের এক স্যাঁতসেতে অন্ধকার ঘরে শেষ হয় বিপ-বী জীবন তাঁর শিয়রে নিয়ে দুই মহাবিপ-বীর ছবি। একখানি মারাট, অন্যখানি রবসপিয়ের।ছেলেটির কাছে যায় বেরী। গালে, বুকে, পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। কিন্তু সব বাঁধন আলগা, সদ্য যৌবনে পা দেওয়া প্রাচ্য দেশীয় যুবকের স্পর্শে পাশ্চাত্য নারীর বাঁধের প্রাচীর ভেঙে খান খান। আবেগে জড়িয়ে ধরে. চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেন ছেলেটির নাক, মুখ বুক। প্রথম যৌবনেই নারী স্পর্শে হঠাৎ বড় হয়ে যায় বঙ্গজ দাস। ভাবে কাছে না এলেই হোত। কাছে এলেই কামিনী গন্ধ ছাড়ে। বুকের ভেতর কাটা মোরগের ছটফটানি। চকিতেই মহাজাগরণ, দুটি মস্তিষ্কে তখন যুদ্ধের আয়োজন। বেরী নিজেই দায়িত্ব নিয়ে নেন। ভাট ফুলের গন্ধ মাখা বঙ্গজ যুবককে যৌবনের গভীর আবেগে আবার জড়িয়ে ধরে বেরী যুবকের নাম দেন, লুই বেনেডিকট্ জামর।

আবার এক সন্ধ্যায় মাদাম বেরী জামরের হাতে তুলে দেন এক মহাগ্রন্থ কালজয়ী

দার্শনিক Jean Jaques Roussean-র “Institution politiques.” বেরী যেমন তাকে নারীত্বের স্পর্শ দিয়ে যৌবন ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, তেমনি নিজের অজান্তেই দীক্ষিত করলেন বিপ-ব মন্ত্রে। বিদ্যুৎ খেলে গেল বঙ্গজ দাসের মস্তিষ্কের কোষে কোষে। চির বিপ-বী বাঙালী অন্তরে ঝড় উঠলো বিপ-বের।

যতই তিনি রাজার বাড়ি পালিত হন, রাজবাড়ির খানাখান, রাজার প্রেমিকার প্রেমিক হন, তার আসল পরিচয় তিনি একজন দাস, ক্রীতদাস। তার শত্রু অভিজাত তন্ত্র। অভিজাত তন্ত্র ধ্বংসেই দাসত্ব মুক্তির পথ।

এসে গেল ১৭৮৯। দামামা বাজলো ফরাসি বিপ-বের। জামর তখন মাত্র উনিশ। এই বয়সেই বিপ-ব বুকে আসে, আসে প্রেমও। পরিচয় হল ইংরেজ বিপ-বী গ্রিভের সাথে। তার মাধ্যমেই যোগাযোগ হল ফরাসী বিপ-বের নেতাদের সাথে। জামর নির্বাচিত হলেন ভার্সাই বিপ-বী সংগঠনের সচিব হিসাবে। দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপ-বী কর্মকান্ডে। ভলতেয়ার, রুশো, মন্টেস্কুর বিপ-বী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সমগ্র জনগণ অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক হন। ১৪ই জুলাই ভেঙে পড়ে বাস্তিল। সাম্য - মৈত্রী- স্বাধীনতার জয় হয়।

কিন্তু বিপ-ব তরঙ্গ থিতু হলে, গ্রেপ্তার হন জামর। তার বিরুদ্ধে বিপ-বীদের অভিযোগ সে বেড়ে উঠেছে রাজগৃহে, রাজপ্রাসাদে, ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছে তার আর সর্বোপরি তার গায়ে রয়েছে ব্যভিচারের কটূগন্ধ। ১৭৯৩ এর ৬ই ডিসেম্বর বিচার কক্ষে বিচার সভায় জবানবন্দিতে তিনি বলেন, ধর্মাবতার, আমি লুই বেনেডিকট্ জামর। ভারতের বাংলা আমার জন্মভূমি। বাংলা আমার মাতৃভাষা। কিন্তু সে সব অতীত। স্বেচ্ছায় নয় হাতে পায়ে শৃঙ্খল পড়িয়ে দাস হিসাবে আমাকে আনা হয়েছে। রাজা পঞ্চদশ লুই এর রক্ষিতা মাদামবেরী আমার মালকিন, তিনি আমাকে যৌবন ধর্মে দীক্ষিত করেন, সাথে সাথে বিপ-ব ধর্মেও। তিনি আমাকে জানতে শেখান - আমি কে, কি আমার পরিচয়, কি আমার ধর্ম, কি আমার কর্তব্য। আমি দাস ছিলাম, দাস আছি। আমার ধর্ম দাস ধর্ম অর্থাৎ অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে লড়াই করা। সে লড়াই আমি নিষ্ঠার সাথেই করেছি। আমার উদ্দেশ্য অভিজাততন্ত্রের উচ্ছেদ। সে উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে। আর ব্যভিচার, একে আমি ব্যভিচার বলে মানি না। দুটি পূর্ণ বয়স্ক নারী পুরুষ যখন প্রেমের আর্তিতে দৈহিক মিলনে প্রবৃত্ত হয়, তখন কোন যুক্তিতেই অন্যায় বা পাপ বলা যায় না। পুরুষতান্ত্রিক ভাবনায় তৈরী দেশের আইন নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে। তাই, আইন অনুমোদিত সম্পর্কের বাইরে অন্য সম্পর্কের উপর ব্যভিচারের ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। আজ আমি যেমন দাস, পুরুষতন্ত্রের অধীন নারীও তেমনি দাস। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বিপ-বে দাস মুক্তি পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু নারী মুক্তির কথা বিপ-ব ভুলে গেছে। আগামী দিনে সে সংগ্রাম জারি থাকবে। বিচারক দেশের আইন মোতাবেক বিচার করেন। ব্যভিচারের দায় থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়না। শাস্তি কারাবাস। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে প্যারি শহরের এক স্যাঁতসেতে অন্ধকার ঘরে শেষ হয় বিপ-বী জীবন তাঁর শিয়রে নিয়ে দুই মহাবিপ-বীর ছবি। একখানি মারাট, অন্যখানি রবসপিয়ের।

ধর্ম ও ভক্তি ঈশ্বরলাভের পরমমার্গ

সন্তু কুমার পান

হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

প্রবন্ধসার ঃ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে সেটি হল ধর্ম ও ভক্তি ঈশ্বরলাভের পরমমার্গ। মনুষ্যগণের মুক্তির জন্য ভারতীয় প্রাচীন মুনি ঋষিরা বহু উপায় বলেছেন। আর সেই সব উপায়গুলি অধিকারীভেদে উপদিষ্ট রয়েছে। তাই ভগবান লাভের পথ একটাই এটি কেউ বলতে পারে না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন - "যত মত তত পথ ইতি।" যদিও ঈশ্বরলাভের পথ অনেক বিদ্যমান আছে, কিন্তু সহজভাবে বর্তমানকালে ঈশ্বরলাভের পথ অনেক বিদ্যমান আছে, কিন্তু সহজভাবে বর্তমানকালে ঈশ্বরলাভের উপায় রূপে ধর্ম ও ভক্তির বর্ণনা পায়। ধর্ম ও ভক্তি এই দুটি পথ একে অপরের পরিপূরক। যেমন ধর্ম করতে গেলে ভক্তির প্রয়োজন ঠিক ভক্তি ছাড়া ধর্ম পালন হয় না। আর এই প্রবন্ধে ধর্ম ও ভক্তিকেই সংক্ষেপে আলোচনা করব। ধর্মবিষয়টি মনুস্মৃতি থেকে আর ভক্তি বিষয়টি ভাগবৎপুরাণ থেকে নিয়ে আলোচনা করব। মনু ঈশ্বরলাভের উপায় রূপে দশটি ধর্মের লক্ষণ বলেছেন। আর ভাগবৎপুরাণে নববিধ ভক্তির উলে-খ পাওয়া যায় ঈশ্বরলাভের জন্য। প্রবন্ধে প্রধানত এই দুটি বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হবে। আর ধর্ম ও ভক্তি ঈশ্বরলাভের উপায় এটি দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য গীতাদি গ্রন্থ থেকে প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। আর উপসংহারে ধর্ম ও ভক্তির বর্তমানে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলা হয়েছে। এবং মানুষ কিভাবে এই দুটি চাকা দিয়ে নিজের গন্তব্যস্থলে অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ করবে তা বলা হয়েছে এবং শেষে যদিও ধর্ম ও ভক্তি দুটি পথের মাধ্যমে ভগবান লাভ হয় তবু এ ধর্ম অপেক্ষা যে ভক্তি গরিয়সী ঈশ্বরলাভে তা উলে-খ করা হয়েছে।

প্রমুখশব্দসমূহ ঃ (ধর্ম, ভক্তি, ঈশ্বর, ধৃতি, ক্ষমা, শৌচ, অস্তেয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দম, ধী, বিদ্যা, আত্মনিবেদন, দাস্য, সখ্য, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অক্রোধ, সত্য ইত্যাদি)

ভূমিকা ঃ এই মোহ অন্ধকাররূপ জগৎ সংসারে যে সকল মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত সুখপ্রাপ্তি হয় না। তাই সকল মানুষ ঈশ্বরপ্রাপ্তির দ্বারা দুঃখসাগরকে পার করে ভগবানপ্রাপ্তিরূপ সুখের অধিকারী হয়। এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন - "যে ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এসবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।" আর সৎস্বরূপ ঈশ্বরের প্রাপ্তি প্রধানত দুটি মার্গের দ্বারা হয়। একটি ধর্মমাগ অপরটি ভক্তিমার্গ। এখন এই প্রধানমার্গদুটির বিষয়ে আলোচনা করব।

মানবজীবনের পরমপ্রাপ্তি বা লক্ষ্য হল ভগবৎপ্রাপ্তি। এপ্রসঙ্গে ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন - "ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।" এই মহৎ উদ্দেশ্যকেই সফল করার জন্য ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ সকল অধিকারীভেদে বহু উপায় বলেছেন। যেমন গৌতমমুনি পদার্থজ্ঞান থেকে মুক্তি বলেছেন। মীমাংসকগণ বলেন যজ্ঞ করে স্বর্গলাভ হয়। পতঞ্জলি মতে, যোগের দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। এই প্রসঙ্গে পতঞ্জলিসূত্র হল - "যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।"চার্বাকরা বলেন শরীর ত্যাগ হলে মুক্তি হয়। বেদান্তিগণ জ্ঞান থেকে মুক্তি হয় বলেন। এইরকম অনেক উপায় বলা আছে। আর নিজস্বধর্ম অনুসারে কর্মানুষ্ঠান করে অধিকারী নিষ্কামভাবনার দ্বারা ভগবানের প্রীতির জন্য সর্বদা তৎপর থাকে। আর উত্তম অধিকারী এইসকল কর্ম করে ভগবান লাভ করে জীবনের পরম উদ্দেশ্য প্রাপ্ত করে। তাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। আর এই ভগবানপ্রাপ্তির জন্য অনেক উপায় বিদ্যমান থাকলেও ধর্ম ও ভক্তি সর্বপ্রমুখ দুটি মার্গ। ধর্মবিচারকালে ভগবান মনু মনুস্মৃতিতে যে ধর্মলক্ষণটি বলেছেন সেটি পরিশীলন করব। ভগবান মনু ধর্মের দশটি লক্ষণ বলেছেন,যার দ্বারা ভগবান প্রাপ্তি হয়। সেই লক্ষণটি হল যে- "ধৃতিঃ ক্ষমাদমোস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম"।।১ ইতি।।

ধৃতি ঃ-

এই লক্ষণের দ্বারা যে ধর্মের কথা বলা হল সেই ধর্মের আচরণ করে মানুষগণ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে ভগবান লাভ করতে পারে। বিপদ উপস্থিত হলে অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতে মনকে স্থিরলূপে ধারণ করা হল ধৃতি। এই ধৃতি ছাড়া ধর্মে গতির অভাববশৎ ভগবান লাভ হয় না।

ক্ষমা ঃ-

কোনো ব্যক্তি অপরের অপরাধ সহ্য করে তাকে দন্ডদান না করে ক্ষমাশীল গুণযুক্ত হয়। আর এইরকম ক্ষমাভাবের দ্বারা ভগবানের দেখা পায়।

দম ঃ-

কুৎসিতকর্ম থেকে মনের নিবারণ হল দম। আর মনের নিগ্রহ ছাড়া ভগবানলাভ অসম্ভব। গীতাতে ভগবান বলেছেন যে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনের বশীকরণ হয় -

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে"।।২ ইতি।।

এইরকম অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা নিগৃহীত মন ভগবান লাভের উপায়। পতঞ্জলিও যোগসূত্রে বলেছেন - "অভ্যাসবৈরাগাভ্যাম তন্নিরোধঃ"।৩ ইতি ।।

অস্তেয়ম ঃ-

মন বাক্ কায় কর্ম এই সকলের দ্বারা চৌরকর্ম থেকে নিবৃত্তিকে অস্তেয় বলে।

শৌচম্ ঃ-

শৌচকর্ম দুই প্রকার। এক বাহ্য শৌচকর্ম অপরটি অন্তঃ শৌচকর্ম। উচিৎ ব্যবহারের দ্বারা আচার আচরণের, মাটি জল দ্বারা শরীরের যে শুদ্ধি তা হল বাহ্যশৌচ। আর রাগবাসনাপরিত্যাগপূর্বক নিজের অন্তঃকরণ শুদ্ধিকে অন্তঃশৌচকর্ম বলে।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ঃ-

রূপাদি বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলির নিবৃত্তি হল ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। যার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হয়েছে সেই ব্যক্তিকে ধর্মাত্মা বা জিতেন্দ্রিয় বলে। এই গুণবিশিষ্ট মানুষ ভগবান লাভ করে।

ধী ঃ-

সতসঙ্গ ও আত্মচিন্তনের দ্বারা যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাকে ধী বলে।

বিদ্যা ঃ-

বিদ্যা বলতে যার দ্বারা আত্মা লাভ হয় অর্থাৎ আত্মবিদ্যা। বিদ্যা সর্ব অবিদ্যাকে দূর করে অধিকারীকে ঈশ্বরলাভ করতে সাহায্য করে।

সত্যম্ ঃ-

মন বাক্ কর্মের দ্বারা শাস্ত্র প্রতিপাদিত সত্যের আচরণ করতে হবে। সত্যের আচরণই ভগবান প্রাপ্তির উপায়। মুন্ডকোপনিষদে আছে যে -

"সত্যমেব জয়তে সত্যেন পন্থা ......।
..... বিতথে দেবয়ানঃ।।" ৪ ইতি।।

অক্রোধ ঃ-

এটি ধর্মলক্ষণে অন্তিম লক্ষণ। কারো দ্বারা প্রতিকূলাচরণ করা হলেও যদি মনে ক্রোধের বিকার ন উৎপন্ন হয়। তাকে অক্রোধ বলা হয়।

এই সকল ধার্মিকগুণের দ্বারা ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারে মনুষ্য। গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন যে ধর্ম দুই প্রকার প্রবৃত্তিমার্গ নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গের দ্বারা সংসারে প্রবৃত্ত হয়। নিবৃত্তিমার্গের দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

আর যদি মানুষগণ এইসকল ধার্মিক উপায়ের দ্বারা ভগবান লাভ না করতে পারে তাহলে ভগবানের দ্বারা যে অপর মার্গটি বলা আছে সেটি পালন করবে। তাই ভগবান ভাগবতে নববিধ ভক্তির কথা বলেছেন। সেগুলি হল -

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ।।" ৫ ইতি ।।

ভক্তিমার্গের সার রহস্য এই শে-াকে অন্তরনিহিত আছে। এই নববিধ ভক্তির দ্বারা ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়া যায়।

শ্রবণম্ ঃ-

ভগবানের রূপ নাম চরিত্র জীবন শ্রবণ ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ হলে তাকে শ্রবণ বলে।

কীর্তনম্ ঃ-

"কীর্তনং মুনিভিঃ প্রোক্তং হরের্লীলাপ্রগায়নম্" - এই উক্তির দ্বারা বুঝতে পারি কীর্তনের গুরুত্ব। এখানে নাম রূপ গুণ লীলা এই চারটি প্রকার কীর্তনের কথা বলা আছে। "কলৌ তদ্ধিকীর্তনাৎ"।৬ - ভাগবতে কীর্তনের মহত্ব জানতে পারা যায়। বিষ্ণুপুরাণেও কীর্তনের মহত্ব দেখতে পায় - "কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্"। ৭ ইতি ।

স্মরণম্ ঃ-

যে ঈশ্বরকে স্মরণ করে অন্তিমকালে শরীর ত্যাগ করে সে ঈশ্বরকে লাভ করে এটি ভাগবতে বলা আছে। গীতাতে ভগবান বলেছেন -

"অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্তা করেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।" ৮ ইতি ।।
"যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।" ৯ ইতি ।।

পাদসেবনম্ ঃ-

ভগবানের চরণযুগলের সেবা করায় হল পাদসেবা। ভগবানের বিগ্রহের স্পর্শ মন্দিরের পরিক্রমা প্রয়াদিতীর্থযাত্রা ভক্তের করে থাকে। এর দ্বারাও পাপরাশির বিনাশ হয়।

অর্চনম্ ঃ-

ভগবানের পূজা অর্চনা ভক্তের অবশ্যই করা প্রয়োজন। বিবিধ উপাচারের মাধ্যমে অর্চনা করা হয়। এই অর্চনার দ্বারা ভগবানের প্রতি ভক্তের শ্রদ্ধার ভাবই প্রধান বিষয়। গীতাতে ভগবান বলেছেন -

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃৎ মশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ।" ১০ ইতি ।।

বন্দনম্ ঃ-

অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি যুক্ত নমস্কারকে বন্দনা বলা হয়। বন্দনার চরম ফল হল নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করা। গীতাতে ভগবান বলেছেন —

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।" ১১ ইতি ।।

দাস্যম্ ঃ-

দাসভাবরূপে উপাসনা করাকে দাস্যম্ বলা হয় সামান্যত। ভাগবৎ পুরাণে দাস্যভাব সম্পর্কে বলেছেন যে নিজের মধ্যে দাসত্বভাবনার দ্বারা সেইরূপ আচরণ করা। নিজের কৃতকর্মকে প্রভুর উপর অর্পণ করা হল দাসের বৈশিষ্ট্য। হনুমান মাধব অঙ্গদ প্রভৃতি এই দাস্য শ্রেণীতে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সখ্যম্ ঃ-

সখ্যভাব হল মধুর ভাব। ভগবান জীবের দোষগুলিকে না দেখে সখ্যভাবের দ্বারা মঙ্গল সাধন করেন। বিষ্ণু সহস্রনামস্তোত্রে বলা আছে যে - "অবিজ্ঞতা সহস্রাংশুর্বিধাতা কৃতলক্ষণঃ"।১২ ইতি। বিভীষণ সুদাম অর্জুন প্রভৃতি সখ্যভাবের উদাহরণ।

আত্মনিবেদনম্ ঃ-

দেহাদিসমূহের শুদ্ধি পর্যন্ত নিজেকে সর্বতভাবে ভগবানের কাছে অর্পণ হল আত্মনিবেদন। গীতাতে ভগবান বলেছেন —

"ময্যেব মন আধতস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

নিবসিষ্যমি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংসশয়ঃ।" ১৩ ইতি।।

উপসংহার ঃ-

জীবের ভগবান লাভের সর্ব উৎকৃষ্ট উপায় রূপ ধর্ম ও ভক্তির কথা সংক্ষেপে বলা হল। এই দুটি মার্গ নিজের ঈশ্বরলাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর বেদপুরাণাদিশাস্ত্রের দ্বারা এই দুটি কর্তব্যরূপে বিহিত হয়েছে। এই দুটি মার্গ আধ্যাত্মিক জীবন রথের চাকা বলা যেতে পারে। তাই এই দুটি মার্গকে অবলম্বন করে আমাদের শরীররূপ রথকে নিজের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি পরিপুষ্টা তার কারণ হল ভারতীয় সংস্কৃতি ধর্মাধারিতা ভক্তি আধারিতা। তাই সকলে মানুষকে নিজের উন্নতির জন্য এই দুটি মার্গকে আশ্রয় করতেই হবে। ধর্ম ও ভক্তিকে আধার করে জীবন আছে বলেই জীবনের এত মহত্ব লক্ষ্য করি আমরা। সম্প্রদায়ে আমরা দেখতেও পাই যে -

"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"

যদিও ধর্মের দ্বারা ভক্তি , ভক্তির দ্বারা ধর্ম এইরকম পরস্পর বিনিময় দেখা যায়। তবুও আধুনিক যুগে ধর্মের অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। এই কারও দ্বারা কল্পিত নয় বা নির্ণয় নয়। কিন্তু আমাদের অনুভবই এখানে প্রমাণ। ঔম তত্ সৎ।

অন্ত্যটিকা ঃ-

১) মনুস্মৃতি - ৭.১২
২) ভগবদ্গীতা - ৬.৩৫
৩) পতঞ্জলিযোগসূত্রম - ১
৪) মুন্ডকোতপনিষত - ৩.১
৫) ভাগবতপুরাণম্ - ৭.৫.২৬
৬) ভাগবতপুরাণম্ - ১২.৩.৫
৭) বিষ্ণুপুরাণম্ - ৩.২.১২
৮) শ্রীমদ্ভগবতগীতা - ৮.৫

৯) শ্রীমদ্ভগবতগীতা - ৮.৬
১০) শ্রীমদ্ভগবতগীতা - ৯.২৬
১১) শ্রীমদ্ভগবতগীতা - ১২.২
১২) ভাগবতপুরাণম্ - ৩.১৩.২৭
১৩) শ্রীমদ্ভগবতগীতা - ১২.৮

উপযুক্তগ্রন্থসূচী ঃ-

১) শ্রীম, (১৩০৮), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতম্ (প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, তৃতীয়ভাগ), কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, আভা প্রেস।
২) রাজগোপাল চট্টোপাধ্যায়, (মার্চ ২০০৫), শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ উৎস ও উদ্ভব, কলিকাতা - ৭০০০৫৯, পশ্চিমবঙ্গ, জয়শ্রী প্রেস।
৩) স্বামী গীতানন্দ, (১৯৯৮) ভাগবতকথা, কলিকাতা - ৭০০০০৩, পশ্চিমবঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়।
৪) মনু (১৩৯৭), মনুসংহিতা, পঞ্চানন তর্করত্ন,কলিকাতা - ৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।
৫) সদানন্দযোগীন্দ, (২০১২), বেদান্তসার, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ, চৌখম্বা বিদ্যাভবন।
৬) শ্রীমদ্ভাগবতম্ (২০৬৭), গোরখপুর,দিলী, গীতা প্রেস।
৭) শ্রীমদ্ভাগবতম্ (২০৬৭), গোরখপুর,দিলী, গীতা প্রেস।

স্বাধীনতা - উত্তর বাংলা সাহিত্যে বারাঙ্গনা বৃত্তি

ডঃ সুমনা রায়

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নারীর জীবিকা প্রসঙ্গে বারাঙ্গনা বৃত্তি সম্পর্কে আমরা জানি। প্রাচীন ভারতে এই বৃত্তি নিন্দনীয় তো ছিলই না বরং তারা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। রামায়ণ মহাভারতের পিঙ্গলা, মৃচ্ছকটিকা নাটকের বসন্তসেনা, বৌদ্ধযুগে উজ্জয়িনীর দেবদত্তা, বৈশালীর অম্বাপালীর কথা এখানে উলে-খ করা চলে। কৌটিল্যের (৪০০ খ্রীঃ) অর্থশাস্ত্রে নারীর এই জীবিকা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা আছে। বাৎসায়ন তাঁর 'কামশাস্ত্র' গ্রন্থে বেস্যাবৃত্তির নানা রীতিনীতির উলে-খ করেছেন। চৌষট্টি কলায় সুশিক্ষিতা নারীরা সমাজে বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিল। কিন্তু এই গণিকা বৃত্তি ধারিনীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষ বয়সে অনুশোচনা করেছে - অনুতপ্ত হয়েছে।

মধ্যযুগে এই বৃত্তির পরিবর্তিত রূপ দেখা যায়। সমাজে বারাঙ্গনারা আর সম্মানের অধিকারী থাকলো না - চৌষট্টি কলায় নিপূণা না হলেও, অর্থোপার্জনের জন্যে তারা এই বৃত্তিকে গ্রহণ করতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যকারদের কলমে গণিকাদের এই উপজীবিকা তাদের পারিপার্শ্বিকতা খুবই সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। বর্তমানে এই ব্যবসা নানাভাবেই সমাজের নানাস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন রমনীর অকাল বৈধব্য, পুরুষের প্রলোভনের ফলেই নারীদের গণিকা হতে হয়েছে। বিশ শতকে উদগ্র বাসনা, দেহ সর্বস্বতা - মূল্যবোধহীনতা ও আদর্শচ্যুতির ফলে নূতন ধরণের গণিকাতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে (১)। নগর বেশ্যাদের মত মাঠবেশ্যাদের সৃষ্টি হয়েছে। "মাঠ বেশ্যা" হল ''সামাজিক বেশ্যা"। এইসব নারীদের মাঠে পাওয়া যায়। মধ্যবিত্তের সকল মূল্যবোধের বাইরে ঘর ভাঙা বা ঘর পালানো বা ঘর খ্যাদানো কিংবা তালাকী অথবা তালাক কল্প নারীদের এটা উন্মুক্ত বেশ্যালয়। এরা প্রফেশনাল হয়ে মাসির ছাউনীতে চালান হওয়ার আগে এখানে থাকে। নারীর পণ্যে জীবনধারণই নয় - প্রভুত সম্পদ উপার্জনও আজকের গণিকাদের লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে গণিকাদের সুস্থভাবে বাঁচার দুর্বার আকাঙ্খা তাদের প্রেমময়ী রূপ ইত্যাদিতে প্রায় সব লেখকদের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। নারীর মূল্য, নারীত্ব, সতীত্ব ইত্যাদি নানা ব্যথাও তাঁরা দিতে লাগলেন এবং এর সূচনা দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পেই। রবীন্দ্রনাথের চোখে হেমশশী ওরফে পতিতা মোক্ষদা "স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার মতো" উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। চৌদ্দ বছরের বিধবার অন্তরাকাশে দূরদিগন্ত থেকে যে যৌবন সমীরণ উচ্ছসিত হয়েছিল তাকে বাধা দেবার উপায় তার ছিল না। বৈধব্যের বেষ্টনে - তৃপ্তিহীন আকাঙ্খাকে নিবৃত্ত করার উপায় যে অত্যন্ত কঠিন তা সেদিনের সমাজশাস্ত্রীরা বোঝেননি। মুসলমান মৌলবাদীরাও বুঝতে চাননি বেগম রোকেয়ার 'সত্য ঘটনা অবলম্বনে' রচিত "বলিগর্ত" গল্পে যা বলেছেন। খাঁ বাহাদুর হিন্দুয়ানী প্রথাকে ঘৃণার চোখে দেখে কিন্তু নিজের তের বছরের ভগিনীর বিয়ের প্রস্তাবে এই বলে আপত্তি তোলে,

"আমরা যখন হিন্দুর দেশে আছি, তখন তাহাদের আচার নিয়মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য। কোন সম্ভ্রান্ত বংশীদের বিধবা বিবাহ হয় না।"

আবার শতকের শেষভাগে এবং উনবিংশ শআব্দীর প্রথমদিকে ইংরেজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ফলে শহরাঞ্চলে নারীর দেহজীবিকার ব্যাপক প্রসার ঘটে - এ নিয়ে অনেক নকশা, নাটক, গল্প, উপন্যাস লেখা হতে থাকে (২)। এইসব নারীদের মধ্যে নিষিদ্ধপল-ীর বাসিন্দা হলেও অনেকেই কিন্তু শিক্ষিতা ছিল। নাটকাদিতে অভিনয় করে তারা খ্যাতি অর্জন করেছে। তখন তাদের সেটাই জীবিকা হয়ে উঠল - গোলাপ সুন্দরী, এলোকেশী, জগত্তারিনী, শ্যামা এদের মধ্যে উলে-খযোগ্য। গোলাপসুন্দরী অভিনয় জীবনে সুকুমারী দত্ত নামে পরিচিতা এবং অভিনেতা গোষ্ঠবিহারীর স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেন। অবশ্য এর জন্য গোষ্ঠবিহারীকে সমাজচ্যুত হতে হয়। এই সকল বারবনিতাদের মধ্যে অনেকেই আত্মজীবনী লিখে নিজের মনোবেদনা, সুখ দুঃখের কাহিনী বলেছে, যেমন বিনোদিনীর - "আমার কথা" তে দেখি সমাজের নিষ্ঠুরতায় রূপোজীবিনীরা নারী জীবনের সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। মানুদা দেবীর "শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত" পতিতাদের পক্ষ নিয়ে অনেক লেখা সুলেখা হয়েছিল বটে তবে অনেক পতিতার জীবনে যে ক্ষণে প্রবঞ্চক প্রেম এসেছিল, সেই প্রেমিকের স্মৃতি নিয়েই তারা বাঁচতে চেয়েছে। কেউ ভালবেসে ধন্য হতে চেয়েছে - কিন্তু সার্থক জীবন পেয়েছে (সুবোধ ঘোষের 'পরশুরামের কুঠার', 'বারবধূ' গল্প দুটি এখানে স্মরণীয়) অতি অল্প জনই।

দু-একজন ছাড়া অধিকাংশেরই পরিণতি যে করুণ তা বিমল মিত্রের 'বেনারসী', জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'চিরকালিনী'-র যুঁই, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'জামাই'-র বকুল শরীরকে পণ্য করে অনেকেই দুঃসাহসীর মতো জীবন ধারণ করতে চেয়েছে। 'গণদেবতার' দুর্গার মত বাংলা সাহিত্যে গণিকা চরিত্রে দেখা যায়, অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতায় তারা এই পথে নেমেছে। অপহৃতা মেয়েদের সমাজ ফিরিয়ে নেয়নি - বেঁচে থাকার তাগিদে তার কাছে আর কোন বৃত্তি ছিল না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মহানগর' - এর চপলা, প্রবোধকুমার সান্যালের 'কল্লান্ত '-এর শোভনা, ছোড়দি ও তার মেয়ে, জগদীশ গুপ্ত-র 'লঘুগুরু'-র টুকী, বিমল করের 'আঙুরলতা'-র আঙুরলতা এরকম অনেক উদাহরণ - সমাজের বাধায় জীবন সুন্দর ভাবে সার্থক করে তুলতে পারেনি বটে, তবু এরা হারেনি। সমরেশ বসুর সুধারানী (তেরো নম্বরের সুধারানী), চন্দ্রাবলী চারুবালা (মুক্তো বেনীর উজানে) -র মধ্যে দেখা দিল এক নতুন আত্মবোধ, খুঁজে নিতে চাইল নিজেদের পরিচয়। "শেষযাত্রা"-র (প্রফুল- রায়) কৃষ্ণভামিনী ও তার সাথিরা সমাজকে উপেক্ষা করেতে পেরেছে। দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদেরকে।

শরৎচন্দ্রের হাতেই আমরা গণিকা চরিত্রের বিস্তৃত পরিচয় পাই। 'দেবদাসের' চন্দ্রমুখী, "আধারে আলো"র বিজলি যে রকম আত্মিক শক্তি ও মহত্বের পরিচয় দিয়েছে তা দুর্লভ। রূপোজীবিনীরা এভাবেই সাহিত্যে এল। কলে-াল কালের লেখকেরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে নিরুপায় নারীদের বেদনা তুলে ধরতে লাগল - ধীরে ধীরে পরিবর্তন এল এই গণিকা চরিত্রে। বনফুলের 'আলোর পিপাসা'-র সুষমা সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করেছে। আবার কোন কোন গণিকা জীবনের ইতিহাস মুছে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, সদর্পে বলেছে "আমি কোন দাসীর মেয়ে নই। .... আমি মানুষ আমি মেয়ে" (নিশিপদ্ম মুক্তোমালা)। এ এক আত্ম অন্বেষণ।

গণিকাদের বঞ্চনা ও যন্ত্রণার ছবি বাংলা সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বঙ্কিম সাহিত্যে কুলটা চরিত্র থাকলেও ঠিক বারাঙ্গনা বলতে যা বোঝায় সে জাতীয় চরিত্র পাওয়া যায় না। অথচ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা হুতোমের নকশায় তা সুবিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গভীরভাবে সহানুভূতির সাথে বিচার করে গণিকাদের নিয়ে শরৎচন্দ্র সার্থক উপন্যাস রচনা করেন। চন্দ্রমুখী থেকে তার যাত্রা শুরু (দেবদাস ১৯১৫) "আঁধারে আলো"(১৯১৬), বিজলী কিংবা শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী এরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিল শোষিতা, অবস্থার শিকার তবুও এদের ব্যক্তিত্ব, আত্মিক শক্তি আমাদেরকে বিস্মিত করে। স্রষ্ঠার আনুকূল্যে এরা মহিমাময় চরিত্র রূপে চিত্রিত হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই পেশাটি নানাভাবে এবং নানা রূপে ছড়িয়ে পড়েছে।

কোলকাতা শিল্প নগরী হবার পর থেকেই নারীদের নিয়ে যে একটা ব্যবসা গড়ে ওঠে কলে-ালের লেখকেরা তা দেখিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের (পাঁক), জগদীশ গুপ্ত, শৈলজা নন্দ প্রমুখ প্রত্যেকেই দেখালেন নারীরা কিভাবে শোষিত হয়, অর্থনৈতিক অনটনে নিরুপায় হয়ে দেহকে তুলে দেয় কেনাবেচার জগতে। এ নিয়ে অনেক ছোট গল্প লেখা হয়েছে (সুবোধ ঘোষ - বারবধূ, মানশুল্কা, প্রেমেন্দ্র মিত্রর - বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, মহানগর, জগদীশ গুপ্ত - লঘুগুরু, বিমল মিত্রের 'বেনারসী', প্রবোধ কুমার সান্যালের 'অঙ্গার', নরেন্দ্র মিত্রের 'জামাই', বিমল করের 'লবঙ্গলতা') এইসব দেহ ব্যবসায়িনীদের মধ্যে কেউ কেউ সংসার পেতে সুস্থ জীবন যাপন করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এখানেও সেই অসহায়তা। কিন্তু সাতের দশক থেকে গণিকা বৃত্তিধারিনীরা নিজেদের অন্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল - প্রতিবাদ জানাবার ভাষা অর্জন করল চরিত্রের এই বিবর্তন সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', 'কবি' ড়োং র্নিশপদ্ম' উপন্যাসে।

গণিকা কন্যা মুক্তোমালা শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করে প্রথমে নার্স পরে নৃত্যগীত শিল্পী হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই স্বাধীনতা অর্জনের পথটি তারাশঙ্কর প্রথম দেখালেন 'কবি' উপন্যাসে। কবি-র বসন যখন ভাগ্যের বিড়ম্বনায় 'কপালের নেকন'বলে ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু মুক্তোমালা সদম্ভে বলেছে - 'কারো পরিচয় কাজ নেই আমি মানুষ আমি মেয়ে।' এই আত্মবোধের স্বরূপ আরো অনেক লেখকের গল্পে প্রকাশ পেল। বিমল করের আঙুরলতাও বলেছিল 'আঙুর মরবে না আর কাঁদবে না।'এই আত্ম প্রতিষ্ঠা দেখা গেল সমরেশ মজুমদারের গল্পেও — "তেরো নম্বরের সুধারাণী" সোনাগাছির গণিকা — আন্ত র্জাতিক গণিকা সম্মেলনে যোগ দিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীতে উন্নীত হল।

মিসেস গাঙ্গুলী জেনুইন ফুল গেরস্ত - স্বামী কর্পোরেশনের ক্লার্ক - মদের নেশা আছে। মাইনের টাকায় চালাতে পারে না বলে সেও দেহ ব্যবসা করে। তবে একটু ভিন্নভাবে। তার মতে, "পেটে একটু বিদ্যে না থাকলে এসব লাইনে নাম করা যায় না।" খদ্দেরদের দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেওয়া, আদর আপ্যায়ণ করে দু'দন্ডে শান্তি দেওয়া - রাত দশটার মধ্যে হোটেল কিংবা অন্যত্র থেকে এরা ফিরে আসে। জেনে শুনে স্বামী এভাবেই বউকে ব্যবসায় নামায়। মুকুন্দের কাব্যে যে জায়া জীবের কথা আমরা জেনেছি, এও সেই জায়া জীব কথা।

সতীত্ব, নারীত্ব, মূল্যবোধ এসব তচনচ হয়ে গেছে। 'জনঅরণ্যের' (১৯৭৩) নটবর বলেছে টাকা দিয়ে মায়ের কাছ থেকে মেয়ে, ভাইয়ের কাছ থেকে বোনকে, স্বামীর কাছ থেকে বউকে, বাপের কাছ থেকে বেটীকে কতবার নিয়েছি — টাকার অ্যামাউন্ট ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে গার্জেনদের একটুও উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি (৩)। মিসেস বিশ্বাস এমনই এক নারী, যে নিজের দু মেয়েকে - রুমা ও ঝুমাকে দেহ ব্যবসায় লাগিয়েছে। জনঅরণ্যে আরেক মেয়েকে দেখি যে সকালে স্কুলে পড়ায়। নির্দিষ্ট একটা সাজানো ফ্ল্যাট বাড়ি, অন্য সময় কাস্টমারদের সঙ্গে থাকে। মেয়েটি লীলা সামতানি - সিন্ধি।

গৃহস্থ ঘরে অনেক মেয়েই এই বিপথে নেমেছে — কেউ অনটনে নিরুপায় হয়ে, কেউ আরো বড়লোক এবং আরো ভোগ সুখের আশায়। দাদার চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে না পেরে কনা নাম ভারিয়ে শিউলি হয়ে এই ব্যবসায় এসেছে। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কাজ পাওয়ার জন্যে মালিক বা প্রভুদের খুশি করার জন্য এভাবে মেয়েদের পাঠাতে হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্থ পর্যন্ত বারাঙ্গনা চরিত্রে নিরুপায় ভাবটাই ফুটে উঠেছে। তারা অত্যাচারিতা আর্থিক কারণেই তারা দেহকে পণ্য করেছে। তবু কিছু কিছু চরিত্র কোথাও মাথা নীচু করেনি — সমাজে এরা স্বচ্ছন্দেই বিচরণ করেছে — "গণদেবতার" দুর্গা। ভালবেসে সুস্থভাবে বাঁচার আশায় অনেকে ঘৃণ্য জীবিকা ছেড়ে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যিকগণ গণিকার চরিত্র আঁকতে গিয়ে দেখালেন সমাজ জীবনে অব্যবস্থার এবং অবস্থার শিকার হয়েই তারা এই বৃত্তিতে এসেছে। এঁরা আরো দেখালেন এইসব গণিকাদের হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য মহৎ। প্রেমিকের কল্যাণের জন্য এরা সততই আত্মত্যাগে উন্মুখ। নিজেকে বিপন্ন করে অন্যের বিশেষ করে প্রেমিকের কল্যাণ এরা চাইত। গণিকাদের এই মহত্বের দিকটা অনেকটাই যেন 'মডেল' বা আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শরৎচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ (বিচারক গল্প) এই রূপটিই তুলে ধরেছেন। "আঁধারে আলো"র বিজলী কিংবা দেবদাসের চন্দ্রমুখী এমনকি শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীর আত্মত্যাগ আমাদের বিস্মিত করে। সেই সঙ্গে প্রশ্ন জাগে প্রেমিকের নিষ্ঠুর অপমান সহ্য করেও কোন আত্মিক শক্তিতে এরা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। গণিকা জীবনের কদর্যময় দিকটি এদের রচনায় কি উপেক্ষিত হয়নি? "কলে-ালের" লেখকরা গণিকা জীবনের কদর্যময় দিকটি উন্মোচন করে দেখালেন, কেউ কেউ দেখালেন এই ঘৃণিত বৃত্তি থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা কিন্তু সামাজিক কঠোরতায় তার করুণ পরিণতি ঘটেছে। এই নিরুপায় অবস্থা, অত্যাচার অবিচার থেকে রেহাই পেতে সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ' এবং বিমল মিত্রের 'বেনারসী' উলে-খযোগ্য গ্রন্থ। সত্তর আশির দশক থেকে গণিকারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকে - বারাঙ্গনা, গণিকা, বেশ্যা ইত্যাদি শব্দগুলি তাদের যেভাবে চিহ্নিত করত তা থেকে 'যৌনকর্মী' আখ্যা নিয়ে তারা আত্মপ্রকাশ করল। (তের নম্বরের সুধারাণী - সমরেশ বসু)। সমরেশ বসুর সুধারাণী সোনাগাছির তের নম্বর ঘর থেকে গণিকাদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা দেখাল। জ্যোতির্ময়ী দেবী 'মর্ত্যের অপ্সরা'(১৯৮৭) তে গণিকাদের গভীর জীবনদর্শন পায়। সুবোধ বসুর নটী (১৯৩৭) আশালতার মনিকা বাইজীতে রূপান্তর উলে-খযোগ্য। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চতপা' -তে কাঞ্চন দেহ ব্যবসা থেকে মুক্তি পেতে চায়। প্রফুল- রায়ের "শেষযাত্রা" (১৯৯৫) তে গণিকাদের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের ছবি

দেখা যায়। এখানে আমরা নারীর ভাগ্য জয় করার শক্তি দেখতে পাই। মনোজ বসু 'নিশিকুটুম্ব' (১৯৬৩) তে রূপবতী ও রাধারানী দায়ে পড়ে হীনবৃত্তিতে নেমে এসেছে। এছাড়াও 'কালীঘাট বস্তির পতিতা সুধামুখীর গণিকা বৃত্তি' তে সবকিছু জেনে বুঝে এই বৃত্তি গ্রহণ যথেষ্ট সাহসের পরিচয়।

গণিকা চরিত্রেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন এল ('কবি' উপন্যাসের বসন,'বারবধূ'-র লতা) তারা আত্মপ্রতিষ্ঠা চাইল। নির্বিচারে সব অত্যাচার মাথায় পেতে নিতে তারা রাজী নয়। গণদেবতার দুর্গাতে তারাশঙ্কর এটাই দেখালেন। কিন্তু বলিষ্ঠভাবে 'নিশিপদ্ম' উপন্যাসে তারাশঙ্কর দেখালেন নারীর আপন ভাগ্য জয় করে নেবার অধিকার কিভাবে প্রতিষ্ঠা করে কিভাবে সম্মানজনক উপার্জনের পথ, বাঁচার পথ বেছে নিতে হয়।

বর্দ্ধমানের কাঞ্চনমালা দেহ ব্যবসায়িনী থেকে হয়েছিল কীর্ত্তন গায়িকা। প্রথম জীবনে সে দেখেছে বিয়ে সাদী, অন্নপ্রাশনে ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়ীতে উৎসব অনুষ্ঠানে তার মা খেমটা নাচত — কীর্ত্তন গাইত। সেটাই ছিল তাদের জীবিকা। ঢপ কীর্ত্তনও হত রাসে, দোলে , ঝুলনে। তখন নাচগান ছিল নিম্নশ্রেণীর নারীদের। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এই নাচ গানের চেহারাটা পাল্টে যায়। ভদ্র ঘরের মেয়েরা নাচগান শিখতে লাগল। সিনেমা থিয়েটারে অভিনয় করতে লাগল। কাঞ্চনমালার কন্যা জানত না তার মা এক সময় দেহ ব্যবসায়িনী ছিল। কাঞ্চনমালাও দুঃখ করে মেয়ে মুক্তোমালার কাছে বলেছে, 'মা আমার ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে'— বিয়ের একবছর যেতে না যেতেই বিধবা হয়েছিল। তারপর কপালে লেখন আর পাড়াগাঁয়ের সমাজ ..... কলঙ্কের দাগ পড়ল — বাধ্য হয়ে কলকাতায় এল — হল কসবী খানকী"(৪)। মেয়েদের গণিকাবৃত্তিতে আসতে বাধ্য হবার এটাও ছিল একটা বড় কারণ। কাঞ্চনমালা শেষ পর্যন্ত মহৎ আশ্রয় পেয়ে ঘৃণ্য জীবন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে। মুক্তমালাকে ভালভাবে মানুষ করেছে, নৃত্য কলায় খ্যাতি লাভ করেছে। পিতার কোনও পদবী গ্রহণ না করে মায়ের উপাধি দাসীকে বর্জন করে দাস করে নিয়েছে। কিন্তু মুক্তমালার সংগ্রামের ইতিহাস শুরু হয়েছে মায়ের মৃত্যুর পর। প্রথমে নার্সিং কোর্স - এ মোট চার বছর ট্রেনিং নিয়ে হাসপাতালে চাকরী নিয়েছিলেন। যুদ্ধের জন্য তখন নার্সের অনেক চাহিদাও ছিল। মুক্তমালা ভেবেছিল এই নতুন জগতে তার জন্ম ইতিহাস কেউ জানবে না। পরে ঘটনাচক্রে নৃত্যপটিয়সী হয়ে খ্যাতিলাভ করেছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার আগে সে মাকে স্পষ্ট ভাষায় যে কথাগুলি বলেছিল তাতে তার বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

মুক্ত ঃ তোমার ঐ ধর্মকে আমি ঘেন্না করি। ... আমার পরিচয় কি বলতে পারো মা? কাঞ্চন কীর্তনওয়ালীর মেয়ে — এক বোস বাবু উকিলের এক ; বল মা বল, তুমি তার কে — কি ?

কাঞ্চন ঃ আমি তাঁর দাসী। তিনি প্রভু। আমি ভালবেসে তার চরণে বিকিয়েছিলাম — আমি তার দাসী —

মুক্ত ঃ আমি সে পরিচয় আমার পরিচয় থেকে মুছে দেব। আমি দাসীর মেয়ে নই। নিজে কারুর দাসী হব না। তোমার প্রভুর মেয়ের পরিচয়েও আমার কাজ নেই। 'আমি মানুষ। আমি মেয়ে' (পৃ: দ্রঃ তারাশঙ্কর রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, পৃঃ ৩৭৮)। জন্ম পরিচয়ের এই অপমানের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে নার্সিং এর বৃত্তি নিয়েছিল। মুক্তমালাই বোধ হয় প্রথম নারী যে আত্ম অন্বেষণ করে বলতে পেরেছে। 'আমি মানুষ আমি মেয়ে।'

'কবি' উপন্যাসের বসনের মুখ দিয়ে তারাশঙ্কর এমন দৃপ্ত ভাষা উচ্চারণ করতে পারেননি। সেখানে বসন ভগবানের অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে - 'কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামী পুত্র ঘর সংসার দিয়েছে?' তাকে মাথা নত করতে হয়েছে নিজের ভাগ্যের কাছে। 'কবিয়াল, এই আমাদের কপালের নেকন।' মুক্তমালা হার মানেনি। বাঁচবার, প্রতিষ্ঠা স্থাপন করার দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে বলেছে, 'প্রতিষ্ঠা নিয়ে আছি — সম্পদ নিয়ে আছি — আর আছি ছেলের জন্য।'

কলেন্সলের কালে পতিতা চরিত্র নিয়ে খুব বেশী মাত্রাতেই গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে আর তখন থেকে এই জাতীয় চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরেই গণিকারা সমাজে শোষিত হয়ে এসেছে। সামাজিক উৎপীড়ন তো ছিলই। নারীদের এর থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসের চেষ্টা চলছিল শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখীর দেবদাসের সঙ্গে ঘর করার প্রস্তাব দেবার সাহস ছিল না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া' (১৯৩০) উপন্যাসের নির্মলা পুরুত ডেকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চেয়েছে। জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬ - ১৯৫০) -র 'লঘগুরু' (১৯৩১) উপন্যাসে দেখিয়েছেন মেয়েদের কি কারণে গৃহ বঞ্চিতা হয়ে তাকে পতিতা হতে হয়। বিপত্নীক পরিতোষের স্ত্রী টুকী যখন জানল, সে পরিতোষের রক্ষিতা এবং তাকে দিয়ে সে দেহ ব্যবসা করার জন্যে লম্পট কামুক অচিন্ত্য বাবুকে এনেছে। সে তখন অচিন্ত্যবাবুকে ঘৃণায় বিদ্বেষে বলে, 'এ কাজ যদি করতে হয়, তবে আপনাকে দেব দেহ, আপনি আমাকে দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে?' তারও আগে এর চেয়েও বলিষ্ঠভাবে বেশ্যা চরিত্রকে তুলে ধরেছেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২ - ১৯৬৪) 'শুভা' (১৩২৭ সন) উপন্যাসে জীবনকে সার্থক করবার জন্য শুভা বলেছে, 'বেশ্যা বৃত্তিতে এত ভয়ের কথা কী? অন্য উপায়ে যদি জীবিকা অর্জন না হয় তবে শরীর বেচিয়া খাইলে এমন কি অপরাধ। ঘরে থাকিলেও শরীর বেচিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে বাহিরেও না হয় তাহাই হইবে, কিন্তু স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই, জীবনটাকে সার্থক করিবার একটা অবসর চাই।' 'লুপ্তশিখা'র (নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত) মালতীকেও নরকের কীট হতে হয়েছিল। শরীর বিক্রয়কে যে ঘৃণা করত সেই মালতীকে হতে হল লুপ্ত শিখা। অবশ্য এ কাজও খুব সহজ হয়নি। কারণ সমাজ যে পুরুষ শাসিত। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০ - ১৯৬৪) চাষার মেয়ে (১৯২৪) উপন্যাসে দেখিয়েছেন সৌরভকে বেশ্যা বৃত্তি নিতে হয়েছে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত স্বামীকে বাঁচানোর জন্য (৫)। দারিদ্রই তাকে এই অন্ধকার জগতে ঠেলে দিয়েছে। এইসব চরিত্রের মধ্যে বারাঙ্গনা নারী মুক্তির ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে। বাস্তব জীবনের স্থূল দিকগুলো এখানে বাদ পরেছিল। একটা প্রেমাবেগ ও আদর্শ সেখানে মুখ্য। গণিকাদের নিয়ে সম্পূর্ণ বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন ১৯৩৭ এ লেখা সুবোধ বসু তাঁর 'নটী' উপন্যাসে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের লুপ্ত শিখাতেও বাস্তবানুগ ছবি পাওয়া যায়। তবে এই শ্রেণীর সাহিত্যে সম্পূর্ণ নির্মোহভাবে বাস্তব নতুন চিত্র তুলে ধরেছেন রমেশচন্দ্র সেন (১৮৯৪ - ১৯৬২) 'কাজল' (?) উপন্যাসে। প্রেমিকের প্রতারণার পরও কাজল সব হারাতে চায় নি। শরীরী ব্যবসাও তার কাম্য ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞতায় সে দেখল 'হৈমবতী অবলা আশ্রমে'-র কুৎসিত ক্রিয়া কলাপ। দুঃস্থ মহিলাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সেখানে যৌনতাকে উপভোগ করে। কাজল পতিতা বৃত্তি নিতে বাধ্য হলেও - সর্বভোগ্যা জনপদ বধূ হতে চায়নি, চেয়েছিল

একজন সদাশয় ব্যক্তির আশ্রয় থেকে জীবন ধারণ করতে। রথীনের মতো মানুষের আশ্রয় এই আকাঙ্খা পূরণ হ'ল বটে কিন্তু রথীনের মৃত্যু তাকে আবার আশ্রয়চ্যুত করল। এবার আর কোন গত্যান্ত না থাকায় প্রকাশ্যে যৌন ব্যবসায় নামতে বাধ্য হয়। তার ভাবনা কন্যা সীমার জন্য — তাকে অন্ধকারে কিছুতেই ডুবতে দেবে না এই তার পণ। রমেশচন্দ্র উপন্যাসে খুব নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন সমাজের উচু তলার লোকেরা - পুলিশ অফিসার - আশ্রমকর্তা লোকেরা বেশ্যাকে ব্যবহার করে সকলেই। অর্থনৈতিকভাবে অসহায়া কাজল জীবনে আর্থিক সাফল্য হয়ত পেয়েছে কিন্তু অনেক মূল্যে। নবলব্ধ আত্মবোধ নিয়ে গণিকাদের বৃত্তি, ওদের পরিচয়, ওরা নিজেরাই খুঁজে নিয়েছে আজ। বিমল করের আঙুরলতা সদর্পে বলে, 'না আঙুর মরবে না' — এমন কথা আগে কেউ বলেনি। 'মুক্ত বেনীর উজানে' (১৯৮০) সমরেশ বসু দেখিয়েছেন গণিকাদের সহমর্মিতা। তারা আজ এই কর্মে এক সূত্রে বাঁধা। চারুবালা স্পষ্ট করে বলে, 'ওসব ভদ্দর মইলে টইলে বোলনি বাবা, আমরা যা আমরা তাই।' এই আত্ম পরিচয়ে রয়েছে আকুণ্ঠ প্রকাশ। কোন সমবেদনার প্রত্যাশী তারা নন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে গণিকারা যৌনকর্মী সংগঠন তৈরী করেছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তারা যোগ দেয়। সমরেশ মজুমদার 'তেরো নম্বরের সুধারানী' গল্পের নায়িকা সুধারানী দেহ ব্যবসার পলী সোনাগাছি থেকে প্যারিসে গেছে — গণিকাদের প্রতিনিধি হয়ে। এই প্রতিমূর্তি, তাদের আত্মচিন্তা দেখে মনে হয় গণিকা বৃত্তি আজকের সমাজে এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। আজ গণিকা বৃত্তির প্রসার বেড়েই চলেছে নানা রূপে। অর্থ উপার্জনই এখন অনেক ক্ষেত্রেই মুখ্য হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ 'পতিতা' কবিতায় নারীর যে নারীত্বের কথা বলেছেন তাও যেন অবলুপ্তির পথে -

নাহিক করম, লজ্জা শরম,
জীবনে জনমে সতীর প্রথা -
তা বলে নারীর নারীত্ব টুকু
ভুলে যাওয়া সেকি কথার কথা ?

রাজনর্তকী অম্বাপালীর মতো আজকের নারীদের কোন বুদ্ধ - শরণ না পেলে (যেমন পেয়েছিলেন বিনোদিনী রামকৃষ্ণের আশ্রয়স্থল) হয়তো কোন দিন মুক্তি আসবে না। কলগার্ল, মাঠবেশ্যা, নগরবেশ্যা দেখে আজকাল কোন সহানুভূতি আসবে কিনা ভাবতে হবে।

এই আত্ম অন্বেষণ আধুনিক গণিকাদের চরিত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বর্তমানে এই কলঙ্কময় জীবনে যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক চাপের ফলে হচ্ছে এটা বলা চলে না। নারীর শুচিতা, সতীত্ব ইত্যাদি আদর্শ আজ মূল্যহীন। উচ্চাশাও বিত্তশালিনী হওয়ার লোভে এক শ্রেণীর নারী তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। নারীর শোষণের পাশাপাশি নারীর স্বেচ্ছায় উচাছৃঙ্খল জীবন যাপনের প্রণালী বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে যেভাবে নিজেদেরকে স্বল্প বসনে সম্ভোগের বস্তু বলে তুলে ধরেছে, তারও যে ছবি তার মূলে আছে অর্থ, সম্পদ, খ্যাতির লোভ। সমরেশ বসু একটি গল্পে যথার্থই বলেছেন, 'দেহ ব্যবসার অতি আধুনিক চিত্রের কথা আলাদা। নগরকেন্দ্রিক সেসব সুপার ব্যবসা ব্যবস্থার সঙ্গে কোটি কোটি মানুষের কোন পরিচয়ই নেই (৬)।"

নৌকার গঠন কৌশল : প্রসঙ্গ পদ্মানদী

সুব্রত কর্মকার

গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা ঃ সুপ্রাচীনকাল থেকেই মানুষের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত বা পণ্য পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম স্থুল নৌকা। স্থলপথ যখন বিস্তৃত ছিল না তখন থেকেই জঙ্গল বেষ্টিত শ্বাপদ সঙ্কুল স্থলভূমি অপেক্ষা মানুষ জলপথকেই চলাচলের একমাত্র সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করে। নদ নদী বেষ্টিত বাংলায় নদী আমাদের কাছে মায়ের মতো। ক্ষুদ্র শিশুর মাতৃবক্ষে যেমন ভয় থাকে না। তেমনি এখানকার লোকজনও নির্ভয়ে নদী পাড়ি দেয়। নিত্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম, হাটবাজার থেকে পণ্যের সম্ভার নিয়ে দূর দেশে বাণিজ্যে যায়। মনসামঙ্গল ও চন্ডীমঙ্গল কাব্য তার সাক্ষ্য বহন করে।

মানুষের প্রয়োজনের নিরিখেই নৌকার আকার আয়তন তৈরি হয়। গৃহস্থ বাড়ির কাজকর্ম ও মাছ ধরার নৌকা একরকমের আর ভাববহনকারী নৌকা অন্যরকমের। আবার নৌ বাইচ প্রতিযোগিতার নৌকার গঠন অন্যধরণের। শৌখিন ধনী শ্রেণীর ব্যবহৃত নৌকা বা বাণিজ্য নৌকার গঠন আলাদা হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে পদ্মানদীতে দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত মাছ ধরা জেলে নৌকা ও পণ্য পরিবাহী বাণিজ্য নৌকা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পদ্মানদীতে ব্যবহৃত নৌকা ঃ

পদ্মানদী সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষা চালিয়ে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে পদ্মা তীরবর্তী নৌকাকে আমরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। মাছ ধরার জেলে নৌকা আর ব্যবসার কাজে যুক্ত ভারী মালবাহী নৌকা। জেলে নৌকাগুলিকে স্থানীয় ভাষায় কুশা (কোষা) বলে। সেগুলি সাধারণত ১৬ হাত লম্বা হয়ে থাকে। চওড়া ৪হাত, গভীরতা ২৪ - ২৫ ইঞ্চি হয়। এই মাছ ধরার জেলে নৌকা যন্ত্রবিহীন। জেলেরাই তা চালনা করে। মালবাহী নৌকায় ইঞ্জিনের ব্যবহার দেখা যায়। ভারবহন ক্ষমতা অনুযায়ী নৌকার দৈর্ঘ্য প্রস্থের তারতম্য হয় ও সে অনুযায়ী যন্ত্র বসানো হয়।

নৌকা তৈরীর যন্ত্রপাতি ও তার ব্যবহার ঃ

পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চলের নৌকা সাধারণত দেশীয় প্রযুক্তিতেই তৈরি হয়। নৌকা তৈরি করতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় সেগুলি হল -

হাতুড়ি — পেরেক ও জলুই লাগাতে ব্যবহার হয়।
বাটাল — কাঠ সাইজ করে কাটার জন্য।
গ্রিসকাপ — এর দ্বারা কাঠ পরিষ্কার ও মসৃণ করা হয়।
আরি — কাঠ কাটার যন্ত্র।
বাইশ — কাঠ চাছার জন্য।

বাঘা — কাঠ বাঁকানো যন্ত্র। এর দ্বারা শক্ত করে ধরে কাঠ বাঁকানো হয়।
ট্যাঙা — জলুই মারা হয়।
শিল — বাটাল ধারালো করার যন্ত্র।
তুরপিন — কাঠ ফুটো করার যন্ত্র।
মাপার ফিতা — বিভিন্ন অংশ পরিমাপে ব্যবহৃত হয়।

নৌকার প্রধান প্রধান অংশ ঃ

নৌকার প্রধান প্রধান অংশগুলি হল -
দাঁড়া, গলুই, গুড়া, ছত্রি , দারগা, বাঁক, পাছা ও বড়াশ। এছাড়া থাকে বৈঠা, হাল, পাল, কাছে, গুণ, গেরাপি বা নঙ্গর।

দাঁড়া — নৌকার মেরুদন্ড। নৌকাকে দৃঢ়ভাবে শক্ত করে ধরে থাকে।
গলুই — নৌকার দুপ্রান্তে সংকীর্ণ জায়গা।
গুড়া — নৌকার এক ডালা থেকে অপর ডালা পর্যন্ত বিস্তৃত কাষ্ঠ খন্ড। নৌকার উপরের অংশে লাগানো থাকে, নৌকাকে মজবুত ও শক্তিশালী করে তোলে।
ছত্রি — নৌকার উপরের ছাউনি।
দারগা — নৌকার পার্শ্বস্থ বড়াশের মুখে আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত দীর্ঘ কাষ্ঠখন্ড।
বাঁক — নৌকার গঠনে ব্যবহৃত কাষ্ঠখন্ড যার দ্বারা তলার কাঠ মজবুত করা হয়। নৌকার তলদেশের তক্তা এর সাথে পেরেক দিয়ে জোড়া হয়।
পাছা — নৌকার পশ্চাৎভাগ।
বড়াশ — নৌকা দৃঢ় করে তৈরীর জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠখন্ড, যা বড় চারকোণা মাথামোটা পেরেক দিয়ে আটা হয়।
বৈঠা — নৌ চালন দন্ড। কাঠের তৈরি পাতলা দাঁড়, না বেঁধে হাতে তুলে নৌকা বাইতে সাহায্য করে।
হাল — এক বিশেষ নৌদন্ড। নৌকার দিক পরিবর্তনে ও সঠিক পথে চলতে নৌকাকে সাহায্য করে।
পাল — কাপড়ের তৈরী পর্দা বিশেষ। মাস্তুলে লাগানো থাকে এতে বাতাস লেগে নৌকার গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়।
কাছি — রশি বা দড়ি। নৌকার তক্তা বাঁকাবার জন্য ব্যবহৃত দড়ি বিশেষ। বাঁশের শক্ত খুঁটিতে কাছি দিয়ে বেঁধে নৌকার তক্তা বাঁকানো হয়।
গুণ — স্রোতের বিপরীতে যাওয়ার সময় নৌকার মাস্তুলে দড়ি বেঁধে নদীর ধার দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। একে গুণ বলে। সাধারণত মাছ ধরার সময় গুণ টানা হয়।
গেরাপি — নৌকাকে নঙ্গর করতে সাহায্য করে, ঝড় বৃষ্টিতে নৌকা স্থির থাকে - হারিয়ে যায় না।

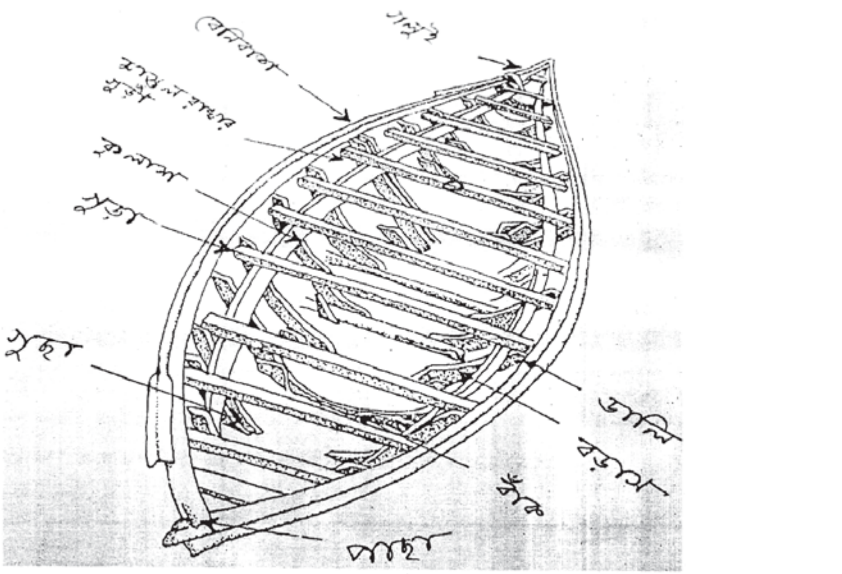

নৌকার উপাদান ঃ

নৌকা তৈরী করতে বিভিন্ন উপাদান দরকার হয়। সেগুলি হল - কাঠ, পেরেক, জলুই, ফুলখড়ি, ধুপ, আলকাতরা, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, বাঁশ, দড়ি ইত্যাদি। প্রধানত শাল অথবা সেগুন কাঠ নৌকা তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। তবে আর্থিক সমস্যার কারণে কাঁঠাল, শিশু, শিমূল, বাবলা প্রভৃতি সস্তা কাঠও মানুষ ব্যবহার করে। এই নৌকাগুলো বেশিদিন টেকসই হয় না। অল্পদিনেই নষ্ট হয়ে যায়। তবে শাল ও সেগুন কাঠ নির্মিত নৌকা বহুদিন টিকে থাকে। কাঠকে পরিমাপ মতো কেটে গুছা, গুড়া, বাঁক, দাঁড়া বানানো হয়। গলুইয়ের সঙ্গে তক্তা দৃঢ়ভাবে আটকে রাখতে বা নৌকার অন্য অংশে কাঠ জুড়ে দিতে পেরেক ব্যবহার করা হয়। জলুই হল দুমুখো সরু ও পাতলা ফলার মত বিশেষ ধরণের পেরেক, যা দুটি তক্তাকে মুখোমুখি জুড়তে সাহায্য করে। ফুলখড়ি-ধুপ-আলকাতরার মিশ্রণ নৌকাকে নিশ্চিদ্র করতে সাহায্য করে। নৌকার বড়ো ছিদ্র বন্ধ করতে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো প্রয়োজন হয়। বাঁশ ও দড়ি নৌকার কাঠামো তৈরীতে সাহায্য করে।

গঠন কৌশল ঃ

ভারবাহী নৌকার গঠন :

একটি নৌকার প্রধান প্রধান অংশ হল - দাঁড়া, গলুই, বাঁক, গুছা, চাপ বা মাথার কাঠ। সমস্ত নৌকায় দাঁড়ার ব্যবহার দেখা যায় না। ভারী মালবাহী দূরগামী ডিঙি নৌকাতেই কেবল দাঁড়ার ব্যবহার দেখা যায়। জেলে নৌকা বা কোষাতে দাঁড়ার ব্যবহার থাকে না। দাঁড়া যুক্ত নৌকায় প্রথমে দাঁড়া তৈরী করা হয়। এটি নৌকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নৌকাকে মজবুত ও শক্তিশালী করতে এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। লম্বা, সরু, দৃঢ় একটি কাঠকে দাঁড়া হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সামনে থেকে পিছনে নৌকার তলদেশের কেন্দ্র

বরাবর দাঁড়ার অবস্থান। এটিই নৌকার মেরুদন্ড। দাঁড়ার পর গলুই নির্মাণের কাজ শুরু হয়। নৌকার সামনে ও পিছনে দুদিকেই গলুই থাকে। গলুই নৌকার কাঠামোটিকে শক্ত করে ধরে রাখে। গলুই লাগানোর পর পরিপূর্ণ নৌকার কাঠামো তৈরীর জন্য সামনের গলুই থেকে পিছনের গলুই পর্যন্ত গলুইয়ের দুপাশে তক্তা লাগানো হয়। এই তক্তা লাগানোর জন্য প্রয়োজন মতো তক্তাকে পুড়িয়ে বাঁকা করতে হয়। তক্তাকে পুড়ানো মানে সরাসরি অগ্নিসংযোগে জ্বালিয়ে দেওয়া নয়; পোড়ানো মানে উত্তপ্ত করা। যাতে তক্তাকে নৌকার গঠন অনুসারে প্রয়োজন মতো বাঁকিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এর বিশেষ পদ্ধতি আছে। যে তক্তাকে পোড়ানো হবে তাতে পুরু করে কাঁচা গোবরের প্রলেপ দিতে হবে। তারপর খড় বা কাঠের আগুন জ্বালিয়ে সেগুলি সেঁকে নিয়ে প্রয়োজন অনুসারে বাঁকাতে হবে। তক্তাকে বাঁকানোর জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে বাঁশের খুঁটি পুতে তাতে আটকে রাখা হয়। সব তক্তাকে অবশ্য একসঙ্গে বাঁকা করা হয় না। মিস্ত্রি তার প্রয়োজন অনুসারে এই কাজটি করে থাকে।

গলুইয়ের দুপাশে নৌকার সামনে থেকে পিছনে তক্তা লাগানো হলে নৌকার ফ্রেম তৈরী হয়। এবার দাঁড়া থেকে ক্রমান্বয়ে উভয় দিকে দুখানা করে গুছা লাগাতে হয়। গুছার পর বাঁক লাগানোর কাজ চলে। এই বাঁক নৌকার তলদেশকে মজবুত করে। এরপর বেনিবাতা লাগাতে হয়। যা নৌকার কাঠকে দৃঢ় করতে সাহায্য করে। ফলে নৌকা সহজেই নদীর উত্তাল ঢেউকে প্রতিহত করতে পারে। এরপর গুড়া লাগানো হয়। নৌকায় কতগুলি গুছা, বাঁক বা গুড়া হবে তা তার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। দৈর্ঘ্য বেশি হলে নির্দিষ্ট নিয়মে এগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে; আর দৈর্ঘ্য কম হলে এর সংখ্যা কম হবে। গুড়া লাগানোর পর লাগানো হয় কুলাশ বাতা। যা নৌকার উপরিতলের মাচাকে দৃঢ়ভাবে থাকতে সাহায্য করে। নৌকার সামনের দিকে লাগানো হয় মাস্তুল। সাধারণত সোজা বাঁশ বা কাঠ দিয়ে এই মাস্তুল নির্মিত হয়। মাস্তুল দন্ডটিকে সোজাভাবে দাঁড় করানোর জন্য নৌকার সামনের অংশের একটি প্রশস্ত গুড়া ও তলার অংশের একটি প্রশস্ত বাঁকে ঐ দন্ডের আয়তন মতো গোলাকার গর্ত করা থাকে।

ফলে মাস্তুল দন্ডটি দৃঢ় ও সোজাভাবে দাঁড়াতে পারে। এতে পাল যুক্ত করে নৌকা বায়ুর সাহায্যে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। মাঝিদের শ্রম লাঘব হয়, বিশ্রামের অবসর মেলে। এরপর নৌকা উল্টো করে তলদেশ নির্মিত হয়। কাঠের তক্তাকে পাশাপাশি সাজিয়ে তলদেশ গঠন করা হয়। তক্তা জোড়া হয় জলুই দ্বারা। তলদেশ নির্মাণের পর নৌকাকে নিশ্ছিদ্র করার জন্য কাঠের জোড়ার মুখে এক ধরণের প্রলেপ লাগানো হয়। এই প্রলেপ তৈরী হয় ধূপ-ফুলখড়ি ও আলকাতরা মিশ্রণে। এই মিশ্রণ কাঠের মাঝে জোড়ার মুখ বন্ধ করে। তবে একটু বেশি ফাঁকা থাকলে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো গুঁজে দিয়ে ধূপ-ফুলখড়ি ও আলকাতরার মিশ্রণ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ফাঁকা অংশ বন্ধ হয়। কোনভাবেই জল আর প্রবেশ করতে পারে না। সমগ্র নৌকাকে মজবুত ও টেকসই করার জন্য আলকাতরা মাখানো হয়। আলকাতরা শুকিয়ে গেলেই নৌকা ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠে। নৌকা ব্যবহারের জন্য হাল ও বৈঠা যুক্ত করা হয়। সমগ্র নৌকায় হাল একটাই থাকে, বৈঠার সংখ্যা নৌকার আকার আয়তনের ওপর নির্ভর করে।

৫২ হাত নৌকা নির্মাণের প্রধান প্রধান উপাদান ঃ

গুছা	গুড়া	বাঁক	দাঁড়া	জলুই	পেরেক	ফুলখড়ি	ধূপ	আল কাতরা
১০৪ টা	২৬ টা	৪২ টা	১ টা	৩০ কেজি	আড়াই ইঞ্চি ৩০ কেজি, ৪ ইঞ্চি ৪ কেজি,সাইড ওয়াসার ৬ কেজি,মোটা চাদরের টিন ১০৪ হাত	২০ কেজি	৪ কেজি	৭ টিন

৫২ হাত নৌকা নির্মাণের বিবরণ ঃ

নৌকার পরিমাপ	ব্যবহৃত কাঠ	ব্যবহারের ধরণ	দাম	টেকসই	মিস্ত্রি	রোজ	নির্মাণ সময়
লম্বা ৫২ হাত/৭৮ ফুট। চওড়া ৬হাত, গভীরতা ৩৪ ইঞ্চি, নীচের তল ৫ হাত	শাল, সেগুন	ব্যবসার কাজে ব্যবহার হয়। ২২/২৫ টন জিনিস যায়।	১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা	৫০/৫৫ বছর	৫২/৫৪ জন	৪০০ টাকা খাবার ও পান বিড়ি সহ। দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ।	২৫/২৬ দিন

কোষার (জেলে নৌকা) গঠন ঃ

প্রথমে তক্তাকে নৌকার আকার অনুসারে জলুই - এর সাহায্যে জোড়া দেওয়া হয়। এতে নৌকার দুই পাশের কাঠামো তৈরী হয়। তারপর বাঁশ বেঁধে নির্দিষ্ট আয়তন মতো দুপাশের তক্তাকে তুলে ধরে গলুই লাগানো হয়। সামনের ও পিছনের গলুই একই ক্রমে লাগানো হয়। এরপর লাগানো হয় গুছা। নৌকার তক্তাকে দৃঢ় করার জন্য নীচের দিকে বাতা মারা হয়। এতে নৌকা সহজেই নদীর ঢেউকে সহ্য করতে পারে। এরপর বাঁক ও বেনিবাতা লাগানো হয়। তারপর গুড়া লাগানো হয়। নৌকার ওপরের অংশে থাকে গুড়া, নৌকার দুই ডালার মাঝে অবস্থান করে নৌকার কাঠামোকে শক্ত করে। নৌকার সামনের দিকের একটি প্রশস্ত গুড়া ও একটি প্রশস্ত বাঁকে মাস্তুল রাখার জায়গা রাখা হয়। মাস্তুল সোজা বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরী হয়। এর সাহায্যে পাল খাটিয়ে নৌকাকে বিনাশ্রমে দ্রুত গতিতে চালানো যায়।

তারপর নৌকাকে উল্টো করে তলদেশের কাজ শুরু হয়। আয়তন অনুসারে তক্তাগুলিকে জলুই দ্বারা জুড়ে নৌকার কাঠামোর সাথে পেরেক দিয়ে আটকানো হয়। তলদেশ নির্মাণের পর নৌকাকে নিশ্ছিদ্র করার কাজ চলে। সামান্য ছিদ্রের মুখ ধুপ - ফুলখড়ি - আলকাতরার আঠালো মিশ্রণ দিয়ে বন্ধ করা হয়। বড়ো ছিদ্র বা জোড়ার মুখে কাপড়ের টুকরো গুঁজে দিয়ে ঐ প্রলেপ লাগানো হয়। তারপর সমগ্র নৌকায় আলকাতরা মাখিয়ে শুকোতে দেওয়া হয়। ফলে নৌকা মজবুত ও টেকসই হয়। এরপর হাল ও বৈঠা লাগিয়ে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। গঠনের দিকে একটি কোষা নৌকার উচ্চতা যথাক্রমে - পিছনে ৩৮ ইঞ্চি, মাঝে ৩৩ ইঞ্চি ও সামনে ৩২ ইঞ্চি হয়।

১৬ হাত নৌকা নির্মাণের প্রধান প্রধান উপাদান ঃ

গুছা	গুড়া	বাঁক	দাঁড়া	জলুই	পেরেক	ফুলখড়ি	ধূপ	আল কাতরা
২৪ টা	১১ টা	৯ টা	সাধারণত প্রয়োজন হয় না	১৬ কেজি	দুই ও আড়াই ইঞ্চি ১ কেজি, অন্যান্য মিলে মোট ১২ কেজি	৩ কেজি	১ কেজি	২ টিন

১৬ হাত নৌকা নির্মাণের বিবরণ ঃ

নৌকার পরিমাপ	ব্যবহৃত কাঠ	ব্যবহারের ধরণ	দাম	টেকসই	মিস্ত্রি	রোজ	নির্মাণ সময়
লম্বা ১৬ হাত/২৪-২৫ ফুট। চওড়া ৪ হাত, গভীরতা ২৪-২৫ ইঞ্চি	শাল, সেগুন	মাছ ধরা ও ফসল আনার কাজে ব্যবহার হয়। ২০ মণ জিনিস আনা যায়।	৪০ হাজার টাকা	৫০/৫৫ বছর	৪২ জন	৪০০ টাকা খাবার ও পান বিড়ি সহ। দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ।	২০/২২ দিন

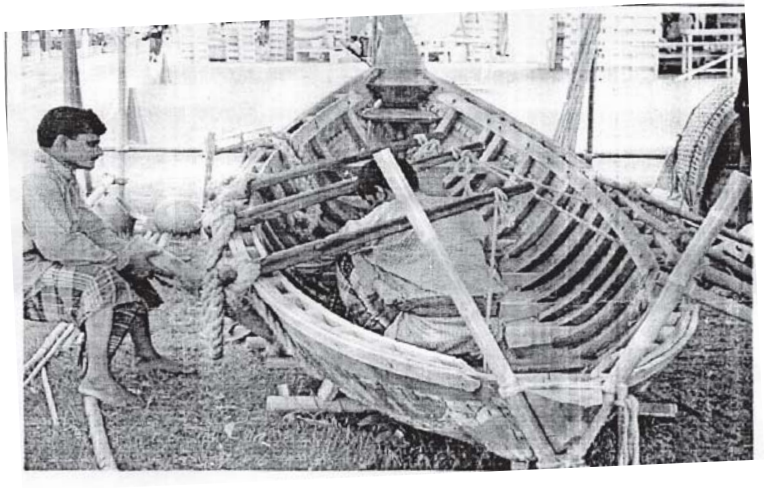

উপসংহার ঃ

বর্তমান প্রবন্ধে পদ্মানদীতে ব্যবহৃত দু ধরণের নৌকার বিবরণ ও গঠন কৌশল আলোচনা করা হল। কোন নৌকার গঠন মূলত নির্ভর করে তার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ক্ষেত্র ও মানুষের ব্যবহার কার্যের উপর। নদীপথ ও সমুদ্রপথে ব্যবহৃত নৌকা একরকম হয় না। বাণিজ্যতরী ও রণতরী ব্যবহারের সুবিধা অনুযায়ী গঠন করা হয়। আবার নৌকা যখন বিলাস ও আনন্দ প্রতিযোগিতার মাধ্যম হয় তখন তার গঠনশৈলী আলাদা। অর্থাৎ একটি

নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল, মানুষের কাজ ও তার ব্যবহারের ধরণের উপর নৌকার গঠন কৌশল অনেকখানি নির্ভর করে। তবে বর্তমান প্রবন্ধে নৌকার গঠন কৌশল নিয়ে যা আলোচনা করা হল তা প্রায় সমস্ত নৌকার গঠন কৌশল সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। Hornell James, The Origins and Ethonological Significance of Indian Boat Designs. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VIII, no. 3.

২। H.H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I & II, calcutta 1981.

তথ্যদাতা ঃ

১। প্রফুল- কুমার হালদার, দয়ারামপুর, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৫১ বছর, জাতি নমশূদ্র, হিন্দু।

২। সুবল চন্দ্র বালা, সূর্যনগর কলোনী, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৪০ বছর, জাতি নমশূদ্র, হিন্দু।

৩। সুনীল হালদার, দাসের চক ডোমকল, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৬০ বছর, জাতি নমশূদ্র, হিন্দু।

৪। সমর শর্মা, দয়ারামপুর, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৫৬ বছর, জাতি সূত্রধর, হিন্দু।

৫। আক্রাম মন্ডল,দয়ারামপুর, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, বয়স ৫৫ বছর, জাতি মুসলিম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

এই প্রবন্ধ রচনায় বহু মানুষের দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। তাদের মধ্যে যাদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় তারা হলেন - হরেরাম হালদার, সমর হালদার, অমিয় হালদার, ভূপেন মন্ডল, মহীদুল শাহ (দয়ারামপুর, মুর্শিদাবাদ) ও পরেশ বিশ্বাস (দেবীপুর, মুর্শিদাবাদ)।

* লেখক পরিচিত : সুব্রত সরকার, গবেষক,লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কলোনী বিশ্ববিদ্যালয়।

Tsunami - A Killer Wave
সুনামী - একটি মারণ তরঙ্গ

সোমা মাইতি

হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সোপান পর্বতশীর্ষে উন্নীত হলেও প্রকৃতির খেলাতে একেবারে পাদদেশে অবস্থিত। তাই প্রাচীন যুগ হতে আজ পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতির দুর্যোগকে ঈশ্বরের অভিশাপ স্বরূপ বলে মেনে নিয়ে প্রকৃতির নিদারুণ রোষের কাছে আত্মসমর্পণ করে আছে। সেই প্রাচীন ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরালেই তার বীভৎস রূপ দেখা যায়। যেমন সিন্ধু নদীর তীরে অবস্থিত হরপ্পা - মহেঞ্জোদাড়ের থেকে মেসোপটেমিয়া, মেহেরগড় প্রায় সমস্ত সভ্যতাগুলির অবনতির পেছনে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের করাল গ্রাস। এ প্রসঙ্গে উলে-খ করা যায়, মহেঞ্জোদাড়ো এলাকায় জনবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার পর অনেকেই বলেছেন যে, দূর অতীতে এই নগরের কাছে ভয়াবহ ভূমিকম্পের উৎসস্থান ছিল। এবং এর ফলেই এই নগরী ধ্বংস হয়েছিল। আবার অনেক বিশেষজ্ঞ এই নগরীর পতনের কারণ হিসাবে বারংবার বন্যাকেই দায়ী করেছেন। যাইহোক মনুষ্য জীবন প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সভ্যতার আলোকে পৌছালেও প্রকৃতি নির্ভরতাকে না পেরেছে পুরোপুরি নির্মূল করতে, না পেরেছে প্রকৃতির অপার বৈচিত্র্যময় গভীরতাকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে। তাই মাঝে মাঝেই ভয়ঙ্কর বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ও সুনামীর যত মারণ তরঙ্গ মানবজীবনকে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত করে দিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাক এর মধ্যে বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, সুনামী ইত্যাদি ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এতই আকস্মিক ও দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী যে, সবকিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বুঝতে চেয়েছে কেন হয় এইসব দুর্যোগ, দুর্বিপাক। আবার দুর্যোগের মধ্যে বন্যা, খরা, ভূমিধ্বংস ইত্যাদি আংশিক সার্বিক ক্রিয়াকলাপের ফলে কিছুটা ঘটিত হলেও ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত কিন্তু সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক ও আকস্মিক , যার ধ্বংসাত্মক পরিণতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অল্প জায়গা জুড়ে লক্ষ্যনীয়। কিন্তু কেন হয় এই ভূমিকম্প, সুমামী ? দেশে দেশে পৌরাণিক গল্পগাঁথা থেকে শুরু করে লোককথায় এর সৃষ্টির নানা রহস্য লুকিয়ে আছে। হিন্দু পুরাণুসারে পাওয়া যায় ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত শেষনাগ পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করে রয়েছে, সে যখন মাথা নাড়ায় তখনই হয় ভূমিকম্প। এছাড়া জাপানের পৌরাণিক বিশ্বাস হল, এক বিশাল মাকড়সার পিঠে রয়েছে আমাদের পৃথিবী। তার নড়াচড়ার ফলে ভূমিকম্প সাধিত হয়। এ তো গেল পৌরাণিক কাব্য কিন্তু বৈজ্ঞানীক রহস্য কী ?

গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, "ভূগর্ভে গ্যাসের চাপ বেড়ে গেলে হয় ভূমিকম্প। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পেরেছি

অ্যারিষ্টটলের ভাবনা সত্য নয় তাহলে সত্যটা কি? ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ভূবিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন ভূগর্ভে বৃহদায়তন শিল্প খন্ডের আপেক্ষিক স্থান চ্যুতির ফলে যে প্রচুর সঞ্চিত শক্তি হঠাৎ করে মুক্ত হয়ে যায় তার ফলে ভূত্বক কেঁপে ওঠে এবং ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এবং এই ভূমিকম্পই জন্ম দেয় সুনামী নামক এক মারণতর জোর বা পোতাশ্রয় ধ্বংসকারী এক জনস্রোতের। যার অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল প্রশান্ত মহাসাগরের উপকুলবর্তী শহর জাপান।

এবারও জাপান, ফের এক তীব্র বিধ্বংসজনিত ভূমিকম্পে সৃষ্টি সুনামীর ভয়ঙ্কর করাল গ্রাসে পর্যবসিত হল উদিত সূর্যের দেশ জাপান উত্তর ও পূর্ব। মাত্র ২ ঘন্টার মধ্যে উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রবল আঘাত হেনে তীব্র গতিতে জলের ঢেউয়ে ভাসমান কাগজের নৌকার মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল উপকুলের জাহাজ, বোট, লঞ্চ থেকে শুরু করে বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট, বিমানবন্দর, রেলবন্দর, তৈল শোধনাগার সমস্ত কিছু। নিমেষের মধ্যে খরস্রোতা জল ইচ্ছেমত ছাপিয়ে সব নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেল। আসলে কি রহস্য ছিল এই ভয়ঙ্কর সুনামীর সৃষ্টির পেছনে?

Geological Survey of India-র অবসর প্রাপ্ত ভূকম্প বিশেষজ্ঞ জ্ঞান রাজন করালের মতে প্রশান্ত মহাসাগরের যে অংশে এদিন সুনামী সংঘটিত হয়েছিল সেখানে সমুদ্রের নীচে পাশাপাশি ছিল দুটি পাত এবং জাপান খাত নামে একটি খাতে ওই প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত এবং ইউরেশিয় পাতের অবস্থান। প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাতটি প্রতিবছর 50-60mm করে ঢুকে যাচ্ছিল ইউরেশিয় পাতের তলায়। আর দুটি পাতের ঘর্ষণে উৎপন্ন হয়েছিল যে, শক্তি সঞ্চিত এদিন Elasrticity অতিক্রম করে 1 সেঃ মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাতটি ইউরেশিয়ান পাতের তলায় অন্তত 10-15 মিঃ ঢুকে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ ভয়ঙ্কর মাত্রায় সৃষ্টি হয়েছির ভূমিকম্প যার ফলশ্রুতি সুনামী।

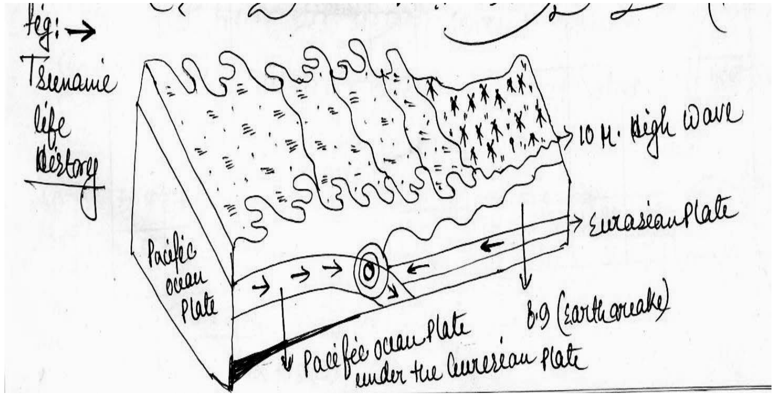

টোকিও থেকে 373 Km. দূরে সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর সেন্ডাইয়ে সমুদ্রের 17 মাইল গভীরে যখন সৃষ্টি হয় সুনামী নামক মারণতরঙ্গের বিভীষিকা তখন ভারতীয় সময় ছিল সকাল সওয়া এগারোটা ও স্থানীয় সময় দুপুর ২.৪৫ মিনিট, ২০১১ সাল। আশ্চর্যের বিষয় এটিই যে এই ঘটনায় ২০ কোঃ টন ট্রাইনাইট্রেট লুইন একসঙ্গে ফাটলে যে শক্তি নির্গত হয় তার সমান শক্তি তৈরি হয়েছিল সম্রদ্রের নিচে। ভূবিজ্ঞানীদের মতে এদিন সেখানে ভূকম্প হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে। ওই অংশে রয়েছে সারি সারি আগ্নেয়গিরি, পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘অগ্নিবলয়’ এবং এই অগ্নিবলয়গুলোতেই মাঝে মাঝে ভূমিকম্প লেগেই থাকে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্রের সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে গত ৫০ বছরে ওই অগ্নিবলয়ে ২১টি বড় ধরণের ভূমিকম্প হয়েছে যার প্রতিটিই সুনামীর জন্ম দিয়েছে।

আসলে কি এই সুনামী? উপযুক্ত সমুদ্রোপকূলে বা তলদেশে ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জলশুরের আন্দোলনের কারণে যে বিরাট সমুদ্র তরঙ্গ বিপুল শক্তি নিয়ে উপকূলভাবে বলি বিশালাকার

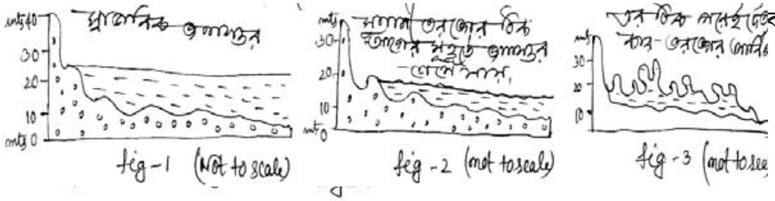

জাপানে প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্ট এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল এদিন 8.9। সুনামীর ঢেউয়ের উচ্চতা ছিল 13 feet. কোথাও আবার 33 feet , সমুদ্রের জল 10মি. উঁচু হয়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল সমুদ্রতটে।

ক্ষয়ক্ষতির কথা বলতে গেলে বড় বড় লঞ্চ, বোটগুলোকে বেগবান বানের জলে ভাসমান কাগজের নৌকার মত ভাসিয়ে নিয়ে যায় এই সুনামীর জলস্রোত। অনেক জায়গায় স্রোতের টানে বনবন করে ঘুরতে থাকে জাহাজ, গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে জলযানগুলি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। গাড়িগুলি জলস্রোতে ওলটপালট খায় খেলনা গাড়ির মত। তটভূমি থেকে 10 Km. দূরে বাসভূমিতে ঢুকে পড়ে লাভাস্রোতের মত তীব্রগতিতে জল।

বাড়িঘর, দেশলাই বাক্সের মত ভাসতে থাকে জলে। খরস্রোতা জল ইচ্ছেমত দাপিয়ে বেড়ায় শহরের পথে, বিমান বন্দরে। যে জমিতে জল পৌঁছতে পারেনি সেখানেও ভূমিকম্প আর সুনামি জনিত ফাটলে অনেক রাস্তা ও বাড়ির চেহারা হয় বলিরেখাময় বৃদ্ধের ত্বকের মত। তৈল শোধনাগারে আগুন লেগে তা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বিমানবন্দর, রেরবন্দর সব বন্ধ। একইসঙ্গে 40 লক্ষ বাড়ি বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে।

জাপানের এই সুনামীর প্রভাব শুধুমাত্র পথে ঘাটে বাড়িতেই আবদ্ধ ছিল না। বিশ্বঅর্থনীতিকেও ব্যাপকভাবে টলিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি জাপানের এদিনের বিপর্যয়ে ঠিক কতটা বিপর্যস্ত হয়েছিল তার একটি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সুনামীর এই দিনে ৬টি কারখানা বন্ধ করে দিয়েছিল sony, ৩টি কারখানা বন্ধ করার কথা জানিয়েছিল। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গাড়ি নির্মাতা TOYOTA, HONDA MOTOR & NISAN একই পথে হেঁটেছে। কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল FUJI HEAVY INDUSTRIES সহ বেশ কিছু সংস্থা। বন্ধ ছিল J.X,NIPPON OIL AND ENERJY-র তিনটি তৈলশোধনাগার। আগুন ধরে গিয়েছিল Cosmo Oil Company-র চিবা শোধনাগারে। সুইডেনের গাড়ি বহুজাতিক ভলভো, সুইস সংস্থা, নেসলে, সিটবেল্ট বা এয়ার ব্যাগ নির্মাণে বৃহত্তম সংস্থা অটোলিভ ও রিটেল বহুজাতিক টেসেকা।

বিশ্ব অর্থনীতি ছাড়াও এই সুনামীর রোষ পড়েছিল শেয়ার বাজারের ওপরও। এদিন ভূমিকম্পের সময় থরথর করে কাঁপছিল জাপানের শেয়ার বাজার ‘নিক্কেই’। দিনের শেষে যা পড়েছিল 1.7%। এই বিপর্যয়ের রেশ এদিন ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারেও। লিবিয়া ও সৌদি আরবে তেলের দাম নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছে শেয়ার বাজার।

টোকিও থেকে মিয়াগি শহরের থেকে জাপানের উঃ পূঃ শহরগুলি সুনামীর প্রবল স্রোতে ভেসে গেলেও সিগনিপিবাস, তাইওয়ান, গুয়ান, হাওয়াই, পাপুয়া, নিউগিনি,চিলি, এলসালভাদোর সহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় বলয় সংলগ্ন দ্বীপরাষ্ট্রগুলিকে “ভূকম্প ও সুনামী প্রবণ বিপজ্জনক অঞ্চল” বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

যদিও সুনামী প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট একটি বিধ্বংসী অস্থির ও অনিশ্চিত প্রকৃতির মারণ তরঙ্গ যার কোনো পূর্বাভাস দেওয়া অসম্ভব বললেই চলে, তবুও ১৯৪৬ সালে “আন্ত র্জাতিক সুনামী হুশিয়ারী ব্যবস্থা” চালু হবার পর থেকে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা আগের থেকে কমেছে। এছাড়া জাপানের নিকটবর্তী আগ্নেয়গিরিগুলোর চারপাশে লাগানো হয়েছে অসংখ্য সেন্সর। যে সেন্সরগুলো আগাম পূর্বাভাস দেবে অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের। ফলে সেন্সরগুলি থেকে বার্তা তরঙ্গাকারে সেকেন্ডের মধ্যে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে ও মানুষজন নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করণে। সেন্সর ছাড়া কিছু বেলুনের আবিষ্কার করা হয়েছে যার মধ্যে মানুষ জলের মধ্যে ভেসে থাকতে পারবে দীর্ঘক্ষণ, ফলে ভাসমান মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে অসংখ্য মানুষ। জাপানের এই সুনামী ভবিষ্যতের ভৌগোলিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হতে পারে। কারণ ভূবিজ্ঞানীদের একাংশের দাবি যে, জাপানের সমুদ্রের নিচের ভূস্তরে দুটি পাতের অবস্থান শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় তার ওপর নির্ভর করবে সমুদ্রের নিচে ফাটলের

আকার। ওই ফাটল ক্রমশ বাড়তে থাকলো। তা স্থায়ী ভূপরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন একদিকে অভিশাপ স্বরূপ তেমনি আশীর্বাদও বটে, কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ভূগাঠনিক পরিবর্তন ঘটলে আমরা মূল্যবান সম্পদও আবিষ্কার করতে পারি। ধ্বংসের মধ্যেই সুপ্ত থাকে সৃষ্টির বীজমন্ত্র তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয় জানত ধ্বংসের মধ্য দিয়েই জেগে উঠুক নবীনের উন্মেষ, যা মনুষ্যজনজাতিকে অগ্রগতির পথে ত্বরান্বিত করবে। মানুষ একদিন সত্যসত্যই প্রকৃতির খেয়ালীপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণাধীনে আবদ্ধ রাখবে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে সেইদিন, সেদিন মানুষ প্রকৃতই জয় করবে প্রকৃতিকে।

তথ্যসূত্র ঃ

১) Ananda Bajar Patrika
২) ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগ’ — শারদা মন্ডল
৩) ভূমিকম্পবিদ্যা — এস.আর. বসু ও আর. মাইতি
৪) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস - সুনীল চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় দর্শনে বৌদ্ধ জৈন এবং গান্ধিজীর অহিংসা তত্ত্ব

তুফান আলি সেখ

অতিথি অধ্যাপক, দর্শন বিভঅগ, হরিণঘাটা মহাবিদ্যালয়

অহিংসার পীঠস্থান হল ভারতবর্ষ। দুঃখ ও হিংসা জর্জরিত পৃথিবীতে ‘অহিংসা’ হল ভারতবর্ষের মূল মন্ত্র। ভারতীয় উপনিষদ, মনুসংহিতা, স্মৃতি ইত্যাদিতে সেই অতি প্রাচীনকাল থেকে ধ্বনিত হয়ে আসছে অহিংসার বাণী। খ্রীঃপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ‘অহিংস’ ধ্বনির প্রতিধ্বনি প্রতিফলিত হয় বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক, নীতি দার্শনিক গৌতমবুদ্ধ জাগতিক মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে গভীরভাবে বিচলিত হন এবং এই জাগতিক দুঃখ কষ্ট জর্জরিত জীবের মুক্তির উপায় অনুসন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করেন, যার অন্যতম ফসল হল অষ্টাঙ্গিক মার্গ। জীবের মুক্তির উপায় বা পথ হিসাবে বুদ্ধ যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলেছেন তার অন্যতম একটি অংশ হল শীল বা সদাগর। বৌদ্ধদর্শনে এই শীলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল ‘প্রাণাতিপতি বিরতি’ বা ‘অহিংসা’। বৌদ্ধ মতে, জীবের অ্যাত্মিক দুঃখ নিবৃত্তি বা নির্বাণ লাভের ক্ষেত্রে এই অহিংসা পালন অত্যন্ত জরুরী। বৌদ্ধমতে, যে কোন প্রাণী হত্যা করা যে অকর্তব্য তাই নয়, প্রাণী হত্যায় প্ররোচনা বা সহযোগিতা ও অনুমোদন যোগ্য নয়। অহিংসক সূত্রে বুদ্ধদেব কায়িক বাচিক এবং মানসিক এই ত্রিবিধ হিংসা থেকে বিরতির কথা বলেছেন। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে বৌদ্ধ দর্শনে হিংসা অনুমোদিত হয়েছে। আবার জৈনদর্শনে মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে অহিংসাকে পরম ব্রত বলে গণ্য করা হয়েছে। জৈন তীর্থঙ্করদের মতে, ত্রিরত্নের অন্তর্গত সম্যক চরিত্র লাভের ক্ষেত্রে অহিংসা ব্রত কঠোরভাবে পালন করতে হবে। জৈনমতে, কায়িক, বাচিক এবং মানসিকভাবে কোন জীবের ক্ষতি না করা, ক্ষতির চিন্তা না করা এবং ক্ষতির কথা না বলা-ই অহিংসা। তবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ‘অহিংস’ নীতিকে গ্রহণ করলেও তিনি বলেছেন, জৈন দার্শনিক দের মতো কঠোরভাবে অহিংস নীতি পালন করা বাস্তব জীবনে সম্ভব নয়। তাই তিনি ব্যবহারিক জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে অহিংসা নীতির পরিবর্তে ‘হিংসা’-কে উচিত কর্ম বলেছেন।

মূল শব্দ ঃ **(Key Words)**

ত্রিগুপ্তি, ত্রিরত্ন, অহিংসা, শ্রমণ, সর্বোদয়, রামরাজ্য।

ভূমিকা ঃ (Introduction)

প্রাচীন ভারতের দর্শনের এক অন্যতম মূল মন্ত্র হল অহিংসা। ভারতীয় উপনিষদ মনুসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থে ‘অহিংসা’র বাণী ধ্বনিত হয়েছে। এই ‘অহিংসা’ মন্ত্রই ভারতবর্ষকে গোটা বিশ্বে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করে। খ্রীঃপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনে জাগতিক মানুষের পারমার্থিক মুক্তি বা মোক্ষলাভের পথ বা উপায় হিসাবে এই ‘অহিংস’ নীতি

অনুশীলনের উপর জোর দেওয়া হয়। এর পরবর্তী সময়ে গান্ধিজী এই অহিংসা নীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং এই অহিংস নীতির দ্বারা তিনি ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষকে আঞ্চলিকতার গন্ডি মুক্ত করে জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন। তাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে ‘জাতির জনক’ আখ্যায় ভূষিত করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি হলেন ‘মহাত্মা’। আর এই ‘জাতির জনক’ মহাত্মা গান্ধি ভারতকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করতে অস্ত্র হিসাবে ধারণ করেছিলেন প্রাচীন ভারতের মূলমন্ত্র ‘অহিংস’ নীতিকে। গান্ধিজী উদ্ভাবিত এই ‘অহিংস’ অস্ত্র ছিল গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অভিনব। গান্ধিজীর স্ব-উদ্ভাবিত এই ‘অহিংস’ নীতি এবং আদর্শ তাঁকে বিশ্বের দরবারে এনে হাজির করে।

উদ্দেশ্য ঃ (Objectives)

১. বৌদ্ধমতে অহিংসা ধারণার ব্যাখ্যা প্রদান।

২. জৈনমতে অহিংসা ধারণার ব্যাখ্যা প্রদান।

৩. গান্ধিজীর অহিংসা তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান।

৪. অহিংসা ধারণাটির বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা।

বৌদ্ধমতে অহিংসার ধারণা ঃ

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম একটি সম্প্রদায় হল বৌদ্ধ সম্প্রদায়। নাস্তিক এই দর্শন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ জাগতিক মানুষের দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা দেখে গভীরভাবে বিচলিত হন। তাই তিনি তাত্ত্বিক আলোচনা অপেক্ষা জাগতিক মানুষের দুঃখ দুর্দশা মুক্তির উপায় নির্ণয়ে ব্রতী হন।

বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন যে জাগতিক মানুষের দুঃখ দুর্দশার মূল কারণ হল অবিদ্যা। আর এই অবিদ্যা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব। তিনি অবিদ্যা থেকে জীবের মুক্তি লাভের উপায় হিসাবে আটটি পথ বা মার্গের উলে-খ করেন। এগুলি একত্রে অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের আটটি মার্গ হল — সম্যক দর্শন, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তর্গত সম্যক বাক্, সম্যক কর্ম এবং সম্যক আজীবকে বলা হয় শীল। বৌদ্ধ দর্শনে ‘শীল’ শব্দের অর্থ হল সদাচার। শীল হয় বিরতি স্বরূপ। অর্থাৎ সমস্ত শীল কোন না কোন পাপ কর্ম থেকে বিরতি থাকার কথার বলা হয়েছে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গে তিনটি শীলের উলে-খ থাকলেও বুদ্ধদেব মঠবাসী শ্রমণদের জন্য দশ প্রকার এবং গৃহস্থদের জন্য নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকার শীল পালনের নির্দেশ দিয়েছেন যা পঞ্চশীল নামে পরিচিত। এই পঞ্চশীল হল —

১. প্রাণাতিপাত বিরতি

২. অদত্তাদান বিরতি

৩. ব্রহ্মচর্য বিরতি

৪. মুষাবাদ বিরতি

এবং ৫. মদ্যামাদকার্থ বিরতি

বৌদ্ধ দর্শনে উলি-খিত বিভিন্ন শীলের মধ্যে অন্যতম প্রধান অঙ্গ হল - প্রাণাতিপাত বিরতি, যার অপর নাম হল 'অহিংসা'। বৌদ্ধমতে যেকোন প্রাণী হত্যা শুধু অকর্তব্য তাই নয়, প্রাণী হত্যায় প্ররোচনা বা সহযোগিতাও অনুমোদন যোগ্য নয়। তাছাড়া যে কোন প্রাণীকে আঘাত করা বা প্রাণীর ক্লেশের কারণ হতে পারে এমন কোন কাজও হিংসা। আর এই সকল কর্ম থেকে বিরতি থাকাই হল অহিংসা। অহিংসক সূত্তে বুদ্ধদেব বলেছেন, যে ব্যক্তি কায়িক, বাচিক এবং মানসিক এই ত্রিবিধ হিংসা থেকে বিরতি থাকেন তিনিই প্রকৃত অহিংসা ব্যক্তি। বৌদ্ধমতে, অহিংসা শুধুমাত্র ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর পালনীয় নয়; অহিংসা গৃহস্থেরও পালনীয়।

হিংসা মানুষের জীবনকে কলুষিত করে। যদি কোন শ্রমন ভুলবশত হিংসা করে থাকেন, তবে সেক্ষেত্রে তাকে ধর্মবিধি অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। বৌদ্ধমতে, পশুপাখি এমনকি অতি ক্ষুদ্র বৃক্ষ, গুল্ম বিনাশ বা প্রাণবান বস্তুকে আঘাত বা নিহত করলে তার প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। অহিংসার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শনে বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে - সকল প্রাণীর কাছে তার নিজ আত্মা সর্বাধিক প্রিয়। প্রতিটি প্রাণীর নিজ আত্মা যেহেতু প্রিয়তম সেহেতু কোন ব্যক্তির পক্ষে কখনই অপরকে হিংসা করা উচিৎ নয়। সকলের আত্মাই সমান। একটি প্রাণীর যেমন মৃত্যুভয় আছে, অন্যান্য সকল প্রাণীরও তেমনি মৃত্যুভয় আছে। সুতরাং কোন প্রাণীর পক্ষেই অন্যকে আঘাত করা বা অন্যের প্রাণনাশ করা উচিৎ নয়।

গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত সর্বাত্মক অহিংসা নীতির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, অহিংসবাদী হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধদেব কোন কোন ক্ষেত্রে মাছ, মাংস ভক্ষণকে অনুমোদন করেছিলেন। এমনকি তিনি স্বয়ং মাংস ভোজন করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন।

উক্ত আপত্তির নিরসনে বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি যদি বিশেষভাবে কারোর জন্য মাংস প্রস্তুত করে তাহলে ঐ মাংস ভোজন করা অনুচিত। একজন ব্যক্তি মাছ বা মাংস ভোজন করতে পারে যদি তা ঐ ব্যক্তির জন্যই বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে - এ কথা ঐ ব্যক্তি যদি না জানেন অথবা কারোর কাছে না শোনেন অথবা এমন কোন আশঙ্কার কারণ না থাকে। এছাড়া গৌতম বুদ্ধ বলেছেন - কোন বিশেষ রোগ থেকে পরিত্রানের জন্য যদি কোন ব্যক্তি মাংস ভোজন করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের স্বার্থে প্রাণীবধ করা অনুচিত নয়। কোন অসুস্থ ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের জন্য যদি 'আম - মাংস' অর্থাৎ কাঁচা মাংস ভোজন করে তাহলে সেই ভোজনকে মাংস ভোজন অর্থাৎ হিংসা বলা হয় না।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর প্রথম ধর্মপ্রচার বা ধর্ম উপদেশের মৃগদাব বা অভয়ারণ্য দিয়েছিলেন। যাতে কোন প্রাণীবধ না হয়। এর থেকে বৌদ্ধ দর্শনে অহিংসার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। অহিংসা সম্পর্কে বুদ্ধ অতি কঠোর মনোভাব পোষন করেছিলেন, যার ফলে মানসিক হিংসাকেও তিনি পরিত্যজ্য রূপে গণ্য করেছিলেন। তবুও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রমের স্বীকার করে তিনি ব্যবহারিক জীবন ও উদার মনোভাবের পরিচয় দেন।

জৈনমতে অহিংসার ধারণা ঃ

ভারতীয় নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম হল জৈন দর্শন। তবে, নাস্তিক সম্প্রদায় হলেও জৈন দর্শনে মোক্ষ লাভকেই জীবের পরম পুরুষার্থ রূপে গণ্য করা হয়েছে। আর এই মোক্ষলাভের উপায় হল নৈতিক উপায়। সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক চরিত্র — এই তিনটি নীতিকে জৈন দর্শনে বলা হয়েছে 'ত্রিরত্ন বা রত্নত্রয়'। আর এই 'ত্রিরত্ন'কে জৈন দর্শনে বলা হয় মোক্ষমার্গ বা মোক্ষলাভের উপায়। যে সব কর্ম আত্মার বন্ধনের কারণ হয় সেইসব কর্ম পরিত্যাগ এবং শ্রদ্ধাবান ও জ্ঞানবান পুরুষের পক্ষে মোক্ষলাভের সহায়ক কর্মের অনুশীলনকে বলা হয় সম্যগ্ চরিত্র। আর এই সম্যক চরিত্রের বিবর্তনে অহিংসা হল প্রধান ধর্ম। জৈন নীতিশাস্ত্রে সম্যগ্ চরিত্র লাভের জন্য পাঁচটি ব্রতের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্রত পাঁচটি হল — অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং পরিগ্রহ। এগুলিকে একত্রে বলা হয় পঞ্চব্রত। এই পঞ্চব্রতকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয় — অনুব্রত এবং মহাব্রত। মঠবাসী সন্ন্যাসীদের কঠোরভাবে ঐ পাঁচটি ব্রত পালন করতে হয় বলে তখন একে বলা হয় পঞ্চমহাব্রত এবং সাধারণ গৃহস্থের ক্ষেত্রে এই ব্রত পালনকে বলা হয় অনুব্রত।

জৈন নীতি দর্শনে সম্যগ্ চরিত্রের বিবর্তনে অহিংসাই প্রধানতম ব্রত। কারণ, অন্য চারটি ব্রত পরোক্ষভাবে অহিংসা ব্রতকেই অনুসরণ করে। জৈন মতে, কায়িক বা দৈহিকভাবে বাচিক বা বচনের(কথার) দ্বারা এবং মানসিকভাবে কোন জীবের ক্ষতি না করা, ক্ষতির চিন্ত া না করা এবং ক্ষতির কথা না বলঅই হল অহিংসা। এই তিন প্রকার হিংসাকে একত্রে বলা হয় 'ত্রিগুপ্তি'। অপরকে হিংসা করা,হিংসায় প্ররোচিত করা, অপরের হিংসাত্মক কর্মকে সমর্থন করা — এ সবই হিংসার অন্তর্গত। জৈন দর্শনে যে পঞ্চব্রতের কথা বলা হয়েছে অহিংসা ব্যতীত অপর চারটি ব্রত অহিংসা ব্রত-র অন্তর্গত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় - পঞ্চব্রতের দ্বিতীয় ব্রত সত্য প্রকারান্তরে অহিংসা ব্রত। কেননা, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলা সেই ব্যক্তির মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হয়। একজন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসত্য কথা বলে তা বাচনিক হিংসা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আবার, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই বাকি তিনটি ব্রতও অহিংসা ব্রতের অন্তর্গত। এই কারণে জৈন দর্শনে অহিংসাকেই প্রধান ব্রত বলা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উলে-খ্য, অহিংসার মূর্ত প্রতীক গৌতম বুদ্ধ কয়েকটি ক্ষেত্রে মাংস ভোজনকে অহিংসা বলে অনুমোদন করেছেন। যেমন - কোন অসুস্থ ব্যক্তি কোন রোগ থেকে আরোগ্যের জন্য যদি মাংস ভোজন করে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের স্বার্থে প্রাণী বধ অনুচিত নয়। কিন্তু, জৈন দার্শনিকগণ এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। জৈন মতে, জীবহত্যা মাত্রই হিংসার অন্তর্গত। অসতর্কভাবে জীব হত্যাও হিংসা। বাতাসে ভাসমান অতি সুক্ষ্ম জীবাণু শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার ফলে নিহত হলে সেটাও হিংসা। অর্থাৎ জৈন দর্শনে 'অহিংসা' ব্রত খুবই কঠোরভাবে পালন করা হয়। জৈনমতে, মঠবাসী সন্ন্যাসী বা শ্রমণদের আচরণ সম্পূর্ণভাবে অহিংস হতে হবে। এই কারণে জৈন ভিক্ষুকে পাঁচটি মহাব্রত পালন ছাড়াও পাঁচটি সমিতি বা অনুনীতি পালন করতে হয়। এগুলি হল —

১. ঈর্ষা সমিতি — অর্থাৎ একজন সন্ন্যাসী দিনের বেলায় আলোকিত পথে হাঁটবেন যাতে চলার সময় কোন প্রাণীর আঘাত না লাগে অথবা কোন প্রাণীর যেন জীবননাশ না হয়।

২. ভাষা সমিতি — সন্ন্যাসী পরনিন্দা, আত্মপ্রশংসা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকবেন।
৩. এষনা সমিতি — খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন সন্ন্যাসী সজেঃচতন থাকবেন যে ঐ খাদ্য শুধু তার জন্যই প্রস্তুত না করা হয় এবং তিনি সমস্ত দোষমুক্ত খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন।
৪. আদান সমিতি — একজন জৈন ভিক্ষু প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ যথাস্থানে স্থাপন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন যাতে কোনভাবে অপর কোন জীবের ক্ষতি না হয়।
১. পরিথাপানিকা বা উৎসর্গ সমিতি — সন্ন্যাসী অপ্রয়োজনীয় বস্তু যেমন - কফ, মল, মূত্র ত্যাগ ইত্যাদি জীবশূন্য স্থানে করবেন যাতে এর দ্বারা অপর কোন জীবের প্রাণনাশ না ঘটে।

উক্ত পাঁচটি সমিতি একজন সন্ন্যাসীকে অহিংসা ব্রত পালনে সাহায্য করে। উক্ত পাঁচটি সমিতির অনুশীলন অতি কঠোর। তবে গৃহীর পক্ষে সকল প্রকার হিংসা বর্জন করা সম্ভব হয় না বলে জৈন নীতিশাস্ত্রে গৃহীকে পঞ্চ অনুব্রত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পঞ্চ অনুব্রত পালন গৃহীকে সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে। এই প্রাক্ প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন হলে গৃহী গৃহত্যাগ করে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নেয়। জৈন দর্শনে, গৃহ নির্মাণ, পাক, ভ্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়াকালীন হিংসা আকস্মিক হিংসা; যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সৈনিকদের হিংসা; আত্মরক্ষামূলক হিংসা এবং ইচ্ছাকৃত হিংসা - এই চতুর্বিধ হিংসার মধ্যে ইচ্ছাকৃত হিংসা গৃহীর সম্পূর্ণ রূপে বর্জনীয় এবং অপর তিনটে ক্ষেত্রে যাতে জীবন হানি না হয় সেক্ষেত্রে গৃহীকে যথাসম্ভব যত্ন ও সতর্কবান হতে হবে।

গান্ধিজীর অহিংসা ধারণা -

১৮৬৯ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে এক বৈষ্ণব পরিবারে গান্ধিজীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা করমচাঁদ গান্ধি বা কাবা গান্ধি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী কর্মপ্রবণ মানুষ এবং তাঁর মা পুতলীবাঈ ছিলেন অত্যন্ত সাধ্বী ধর্মপরায়না রমনী। তিনি নিত্য, নৈমিত্তিক পূজা অর্চনা করতেন। গান্ধিজী যে পারিবারিক পরিচারিকার কাছে বড়ো হয়েছেন তিনিও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ব্যক্তি। সুতরাং পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রে গান্ধিজী ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি অহিংসা ও আত্মসংযমী গুণের অধিকারী হন। পরবর্তী সময়ে তিনি বেদ, পুরাণ, মনুসংহিতা, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনের অহিংস নীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হর এবং ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই অহিংস নীতির প্রয়োগ ঘটান। তবে গান্ধিজী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "এ প্রসঙ্গে আমার জগৎকে কোন নতুন কিছু শিক্ষা দেওয়ার নেই। সত্য ও অহিংসা পাহাড়ের মতই প্রাচীন।"

'অহিংসা' শব্দটির সাধারণ অর্থ হল - হিংসা না করা অথবা হিংসা থেকে বিরত থাকা। আরও ব্যাপক অর্থে 'অহিংসা' বলতে বোঝায় যে কোন প্রকার জীবকে আঘাত করা থেকে বিরত থাকা। হিংসার অর্থ হল ক্রোধবশতঃ বা স্বার্থপরতা বশত কোন জীবকে হত্যা করা। আবার হিংসা হল এমন কিছু যা যন্ত্রণার উদ্রেক ঘটায়। আর এই সকল কিছু থেকে

বিরত থাকাই হল অহিংসা। মূলত গান্ধিজী জৈন দর্শনে যে কঠোর অহিংসা ব্রত পালনের কথা বলা হয়েছে তা থেকে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। জৈন দর্শনে অহিংসা ব্রত কঠোরভাবে পালনীয় ধর্ম। এই মতে, কায়মপে বাজ্যে অর্থাৎ কায়িক , মানসিক এবং বাচিকভাবে কোন অনিষ্ট না করা এমনকি অনিষ্টের চিন্তা না করাই হল অহিংসা। অপরকে হিংসা করা, অন্যকে হিংসায় প্ররোচিত করা, অপরের হিংসাত্মক কর্মকে সমর্থন করা - এ সবই হিংসার অন্তর্গত। কেবল অপরের ক্ষতি না করাটাই অহিংসা নয়, সর্বজীবে প্রেম বিতরণ এবং হিতকর কর্ম অনুষ্ঠানও অহিংসার অন্তর্গত। তবে গান্ধিজী বলেছেন যে, বাস্তব জীবনে জৈনদের মতো কঠোরভাবে অহিংসা ব্রত পালন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, ব্যবহারিক জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন - খাদ্যগ্রহণ, জলপান করা, হাঁটা চলার ক্ষেত্রে, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্যের দেহকে আঘাত না করে নিজ দেহকে রক্ষা করা অসম্ভব। তাই ক্ষেত্র বিশেষে অহিংসা ব্রতী গান্ধিজী জীবহত্যাকেও উচিৎ কর্ম বলেছেন। যেমন - অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত জীব যদি অসহ্য ব্যথা বেদনায় জর্জরিত হয়, যন্ত্রণা উপশমের কোন সম্ভাবনা না থাকে সেই ক্ষেত্রে অহিংসা ব্রতীর উচিত কাজ হবে তার প্রাণনাশ করা। গান্ধিজী তাঁর আশ্রমে এমনই একটি অনারোগ্য ব্যাধি জনিত গো শাবকের মৃত্যুকে বিষ প্রয়োগে ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং তাঁর মতে এই কাজ হল অহিংস।

প্রাচীন ভারতের যে অহিংসা আদর্শের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে গান্ধিজীর অহিংস ধারণার মূল পার্থক্য হল - প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে অহিংসা নীতিকে জীবের মোক্ষ বা মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে গৃহীত হয়েছে অর্থাৎ এখানে অহিংসাকে ব্যক্তি মানুষের মোক্ষ বা মুক্তিলাভের মার্গ হিসাবে উলে-খ করা হয়েছে। কিন্তু গান্ধিজী 'অহিংসা' নীতিকে ব্যক্তি মানুষের মোক্ষ বা মুক্তিলাভের উপায় গৃহীত হয়নি। গান্ধিজী সমাজস্থ সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য নিজে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন এবং অপর সকল ব্যক্তিকে উক্ত অহিংস নীতি পালনে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এক কথায় বলা যায়, গান্ধিজী দুঃখ, দারিদ্র্যমুক্ত জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে সর্বোদয় সমাজ বা রাম রাজ্যের কথা বলেছেন সেই সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল মন্ত্রই হল অহিংসা নীতি।

গান্ধিজীর মতে, অহিংসা বলতে কোন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বোঝায় না, অহিংসা হল এক সক্রিয় শক্তি। অহিংসা কোন কাপুরুষ, ভীতু, চরিত্রহীন ব্যক্তির সশস্ত্র পথ নয়; এই অহিংসার পথ হল নির্ভীক, চরিত্রবানের নিরস্ত্র পথ। গান্ধিজী বলেছেন, হিংসার দ্বারা কোন সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়, হিংসা দ্বারা শীঘ্র শত্রুকে দমন করা গেলেও তা সাময়িক পরিণামে শত্রুতা বাড়ে। সমাজ বিরোধীকে কারাদন্ড দিলে অথবা খুনী ব্যক্তিকে ফাঁসি দিলে সমাজ বিরোধিতা বা খুনের ঘটনা হ্রাস পায় না, বরং বৃদ্ধি পায়। দমন পীড়নের দ্বারা দুষ্টের দমন সকল দেশেই ব্যর্থ হয়েছে ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। গান্ধিজী এই সমস্যার অবসান ঘটানোর জন্য তাঁর বৈপ-বিক অহিংস পথের নির্দেশ দিয়েছে আর এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সত্যনিষ্ঠা এবং প্রয়োজনে আত্মদান। গান্ধিজীর এই অহিংস ধারণাটি শাস্তি সম্পর্কিত সংশোধনাত্মক মতবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। শাস্তি সম্পর্কিত সংশোধনাত্মক মতবাদে বলা হয়েছে — অপরাধীকে তার অপরাধমূলক কর্ম থেকে বিরত হওয়ার বা সংশোধনের

সুযোগ দেওয়া উচিত। এই মতে বলা হয়, শাস্তি একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। শাস্তি সম্পর্কিত এই সংশোধনাত্মক মতবাদ নৃতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক ধারণার উপর গঠিত।

গান্ধিজীর মতে, অহিংসার দুটি দিক আছে। একটি হল আক্রমণাত্মক উগ্রপথ এবং অপরটি হল শোধনাত্মক সৌম্য পথ। ব্রিটিশ শাসনের অবসান কল্পে গান্ধিজী অহিংসার উগ্র পথটিকে অবলম্বন করেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অথবা আইন অমান্য আন্দোলনে আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রয়োজনীয় হওয়ায় গান্ধিজী এক্ষেত্রে অহিংসার উগ্র পথটিকে অবলম্বন করেন। যদিও অসহযোগ আন্দোলনে হিংসার প্রকাশ ঘটলে গান্ধিজী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সংস্কার সাধনের জন্য গান্ধিজী সৌম্য সংশোধনাত্মক অহিংস নীতি গ্রহণ করেন। গান্ধিজীর মতে, সমাজ সংস্কারের প্রথম ও প্রধান ধাপ হল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। কেননা, দীর্ঘকাল ধরে অস্পৃশ্যতার অন্ধ কুসংস্কার ভারতীয় সামাজিক পরিবেশকে দূষিত ও কলুষিত করেছে, মূল শূদ্র শক্তিকে অবহেলা করে সামাজিক শক্তিকে দুর্বল করেছে। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র অথবা দর্শনে কোথাও অস্পৃশ্যতার উলে-খ নেই, অস্পৃশ্যতা কিছু সুবিধাভোগী কপট মানুষের সৃষ্টি। গান্ধিজী এই সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণের জন্য অহিংস নীতিকেই গ্রহণ করেছেন।

প্রাচীন ভারতের অহিংসা ও গান্ধিজীর অহিংসা ধারণার ত্রুটি -

প্রাচীন ভারতের অহিংসা বিশেষত বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের অহিংসা ধারণা এবং গান্ধিজীর অহিংসা ধারণা সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত নয়। এই ত্রুটিগুলিকে নিম্নোক্তভাবে উলে-খ করা হল —

প্রথমত ঃ প্রাচীন ভারতের বিশেষত বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে যে অহিংসা নীতির কথা বলা হয়েছে তা প্রধানত ব্যক্তি মানুষের পারমার্থিক মুক্তি বা মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে অহিংস নীতির উপেক্ষা করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রাচীন ভারতে যে অহিংস নীতির কথা বলা হয়েছে তা ব্যক্তি মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তি বা মোক্ষলাভের উপায় হিসাবে। কিন্তু পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মানবজাতির মুক্তি লাভের পথ এখানে নির্দেশিত হয়নি।

তৃতীয়ত ঃ গান্ধিজী যে সর্বাত্মক অহিংস নীতির কথা বলেছেন তা ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে বোধগম্য ও গ্রহণ যোগ্য হলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয়বাদী ব্যক্তির কাছে এই অহিংস নীতির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

চতুর্থত ঃ গান্ধিজী বর্ণিত অহিংসা ধারণাটির কোন মৌলিকত্ব নেই অর্থাৎ অহিংসা ধারণাটির

তিনিই প্রথম উদ্ভাবক- এমন দাবি করা যায় না। কেননা প্রাচীন ভারতে উপনিষদ, পুরাণ, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অহিংসা, প্রেম, ভক্তির কথা উলে-খ আছে। গান্ধিজী স্বয়ং বলেছেন - ভারতবর্ষে সত্য এবং অহিংসা পর্বতের মতোই প্রাচীন।

পঞ্চমত ঃ অহিংসার দ্বারা কোন ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র সংশোধন সম্ভব হতে পারে কিন্তু কোন বৃহৎ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। গান্ধি সহযোগী বিনোবাভাবে ভূ-দান যজ্ঞ প্রসঙ্গে বলেছেন — অহিংস পথে কোন বিশেষ ভূম্যধিকারার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে তার কিছু জমি ভূমিহীনদের দান করতে সম্মত করানো যায় কিন্তু সকল ভূম্যধিকারার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

ষষ্ঠত ঃ বর্তমানে আধুনিক পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধের মতো বিপর্যয়ের সম্মুখে অহিংস পথে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, অহিংস পথে শত্রুপক্ষের সকলের হৃদয়ে পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। নিরস্ত্রভাবে অহিংস পথে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হলে মৃত্যু অনিবার্য এবং এই মৃত্যুবরণ মূর্খের কাজ, এতে কোন গৌরব নেই।

অহিংসা ধারণাটির বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ঃ

বর্তমান যুগ হল হিংসার যুগ। ভারতবর্ষ তথা গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ সন্ত্রাসবাদীদের হিংসায় আতঙ্কিত। শুধু সন্ত্রাসবাদ কেন, বর্তমান ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি,শিক্ষা সংস্কৃতি এককথায় সকল ক্ষেত্রেই আজ হিংসার ছবি স্পষ্ট। বলা হয় যে, ভারতবর্ষ হল অহিংসা মন্ত্রের জন্মভূমি। এই অহিংসা মন্ত্রই ভারতবর্ষকে গোটা বিশ্বের কাছে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছিল। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষ আজ হিংসার শিকার। ভারতবর্ষের অতীত অহিংসার গৌরব আজ ভূলুন্ঠিত।

বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি হিংসার চরম মাত্রা অতিক্রম করেছে। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের রীতি নীতি, আচার অনুষ্ঠান এমনকি অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। এমনকি তারা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই সকল ঘটনায় ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিংসার ছবি স্পষ্ট।

বর্তমান ভারতবর্ষে রাজনৈতিক হিংসা এক ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীবৃন্দ ক্ষমতার লোভে একে অপরের চরম ক্ষতি সাধনে লিপ্ত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে প্রাণনাশের ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। ফলে একথা নিঃসন্দেহে বলঅ যায় যে, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র আজ হিংসার শিকার। তাছাড়া বিভিন্ন আর্থিক কেলেঙ্কারী, ঘুষকান্ড অর্থনৈতিক হিংসার দৃষ্টান্ত।

শিক্ষা সংস্কৃতিও হিংসার দ্বারা কলুষিত হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘর্ষ শিক্ষক শিক্ষিকা নিগ্রহ আজ যেন নিত্যদিনের ঘটনা। বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলনে হামলা, সাংবাদিক হত্যা, গণমাধ্যমের উপর আক্রমণ, বাক্ তথা ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হিংসা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সুতরাং একথা বলা যায় যে, ভারতবর্ষ আজ যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে,

সেখানে অহিংসা আদর্শ খুবই জরুরী। কেননা, বর্তমানে যে হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তা হিংসার দ্বারা নির্মূল করা সম্ভব নয়। একমাত্র অহিংসাই হিংসাকে জয় করতে পারে। একথা চিরসত্য। তাই প্রাচীন ভারতের বিশেষত বৌদ্ধ, জৈন এবং গান্ধি নির্দেশিত অহিংসার আদর্শ বর্তমান ভারতবর্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

উপসংহার ঃ

'জাতির জনক' মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ১৯৪৮ সালে ৩০ শে জানুয়ারী নতুন দিলীতে বিড়লা হাউসে তাঁর প্রাত্যহিক প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পথে ৫টা ১০ মিনিটে নাথুরাম বিনায়ক গডসের গুলিতে প্রাণ হারান এবং তাঁর শেষ উচ্চারিত শব্দটি ছিল 'হে রাম'। অর্থাৎ করুণাময় ভগবানের কাছে এই হতভাগ্য আততায়ীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে গান্ধিজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এবং জীবনের শেষ ক্ষণেও তিনি তাঁর অহিংস আদর্শের নীতি থেকে বিচ্যুত হননি।

তাই বর্তমান ভারতবর্ষ যে মানুষটির চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করে 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানে নেমেছে, আমার মনে হয় সেই মহান মানুষটি জীবনের শেষ লগ্নে উচ্চারিত 'অহিংসা' নীতিটিকে বর্তমানে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলে ভারতবর্ষ যেমন তার পূর্ব মর্যাদার আসীন হতে পারবে, অনুরূপভাবে এই মহান মানুষটিকে চরমতম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন জানানো হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার মন্ডল (২০১৬) ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
২. ভট্টাচার্য, ডঃ সমেরন্দ্র (২০১৩) সমাজ দর্শন ও রাষ্ট্র দর্শন, কলকাতা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।
৩. নন্দী, নবকুমার (২০১২) সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনের ভূমিকা, কলকাতা, নবভারতী প্রকাশনী।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়,ডঃ নিখিলেশ (২০১২) বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, সদেশ।
৫. ভট্টাচার্য, সুজিত কুমার (২০১১) মহাত্মা গান্ধী, কলকাতা, প্রগতিশীল প্রকাশক।
৬. বাগচী, দীপক কুমার (২০০৭), ভারতীয় নীতিবিদ্যা, কলকাতা,প্রগতিশীল প্রকাশক।
৭. গুপ্ত দীক্ষিত (২০০৭), নীতিশাস্ত্র, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
৮. মুখোপাধ্যায়, জীবন (২০০৫), আধুনিক ভারত, কলকাতা, ছায়া প্রকাশনী।

স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পরে ভগিনী নিবেদিতা

ভাস্বতী চক্রবর্ত্তী

সহকারী অধ্যা পিকা (রাষ্টবিজ্ঞান বিভাগ) ডঃ বি.আর. আম্বেদকর কলেজ, বেতাই, নদীয়া

ভগিনী নিবেদিতার আরাধ্য স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক মহাপ্রয়াণে তিনি মর্মাহত। কিন্তু কখনোই বিচলিত হয়ে আশাহত হননি। কিম্বা শোকে মুহ্যমান হয়ে অভীষ্ট কর্মপন্থা থেকে দূরে সরে থাকেননি। ভগিনী নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন স্বামীজি তাঁর স্থূলদেহ ত্যাগ করেছেন ঠিকই কিন্তু কে বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন তাঁকে। তাই শোকাহত হয়ে সে দায়িত্ব থেকে সরে থাকার অর্থ গুরুর প্রতি চরম অন্যায় করা। ভগিনী নিবেদিতার দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর অপরাধের সামিল। এছাড়াও শোকস্তব্ধ ভগিনী নিবেদিতার কাছে গুরুর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ এতটাই অপ্রত্যাশিত ও অসহনীয় ছিল যে, তিনি সর্বদাই এক বিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখতে চেয়েছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে মিসেস লেগেটকে এক পত্রে লিখেছিলেন যে —

"আমাদের প্রিয় আচার্যদেব চিরদিনের জন্য চলে গেছেন। জীবনের সান্ধ্য বন্দনা সমাপ্ত, পৃথিবীর নীরবতা, মুক্তির সম্ভবন। শেষ। তাঁর সেবা করবার জন্য আমার হৃদয় অধীর পরিণামে যাই হোক যদি এর জন্য বহুদিন অপেক্ষা করতে হয় তাতেও আনন্দ। তাঁর কাজ করবার জন্য যেন শক্তি, বিশ্বাস ও জ্ঞান লাভ করি, এটাই প্রার্থনা। আর কোন আশীর্বাদের আকাঙ্খা নাই। আর কিছু চাই না। আমাদের প্রিয়জন মরেননি; তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন। আমি শোক করতেও পারি না, আমি কেবল কাজ করে যেতে চাই।"

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে, স্বামীজি ঠিক কোন বিষয়কে যেভাবে দেখে, বুঝে বা চিন্তার দ্বারা গ্রহণ করতেন। মানস দুহিতা ভগিনী নিবেদিতাও সেই বিষয়কে ঠিক একইভাবে হৃদয়ঙ্গমের দ্বারা মনের পরম প্রশান্তি লাভের চেষ্টা করতেন। ভগিনী নিবেদিতার ভারতবর্ষের সমস্ত ভালো মন্দের সাথে নিজেকে এক করে নেওয়ার মধ্যেও ছিল সেই স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণাই। কিন্তু ক্রমেই ভারতে অবস্থান কালে তো বটেই এমনকি স্বামীজির অনুপস্থিতিতে একাকী ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে তাঁর নিকট দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হতে থাকে ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনের ভয়ঙ্কর রূপ। আর এই দুটিই যে পরস্পর সম্পর্কিত সে ব্যাপারেও তিনি নিশ্চিন্ত হন। এক কঠিন আত্মবিশে-ষণের মধ্য দিয়ে ক্রমশই ভগিনী নিবেদিতার অবচেতন চিত্তে ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের ভয়াবহ স্বরূপ সম্পর্কে ঘটতে থাকে এক বৈপ-বীক রূপান্তর। আর এইভাবেই স্বামীজির জীবদ্দশাতেই ১৯০২ এর প্রথমদিকে ক্রমেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় ভারতবর্ষে ভগিনী নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও। ভারতবর্ষও হয়ে ওঠে তাঁর কাছে একমাত্র উপাস্য দেবতা। আর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে যদিও স্বামী বিবেকানন্দ নিরপেক্ষ এক সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তাধারা গড়ে উঠলেও স্বামীজির

প্রতি তাঁর অকপট শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল অপরিবর্তনীয়ই।

৪ঠা জুলাই ১৯০২, স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক অন্তর্ধানে ভগিনী নিবেদিতার জীবনে সমুপস্থিত বিরাট ধর্মসংকট। একদিকে বিরামহীন সংগ্রামের হাতছানি। সমগ্র দেশ যেন তাঁকে ডাকছে। আর সেই আহ্বান উপেক্ষার সাধ্য কোথায় তার আর অন্যদিকে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক নির্ধারিত রামকৃষ্ণ মিশনের রাজনীতি নিরপেক্ষ কর্মপদ্ধতি। যেখানে বলা হয়েছে — " The aims and ideals of the mission being purely spiritual and humanitarian, it shall have no connection with politics." অর্থাৎ এখানে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে মিশনের কার্যপদ্ধতি আবর্তিত হবে সর্বতোভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে। মূলতঃ স্বামী বিবেকানন্দের সাথে দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ। স্বামীজির বক্তৃতা সমূহ, কিম্বা বিদেশী শাসনের করাল ভয়ঙ্কর রূপ অনুধাবন পূর্বক ভগিনী নিবেদিতার চিন্তা রাজ্যের প্রবল আলোড়নের হেতু তাঁর মনে হয়েছিল এখন থেকে নিছক ধর্মপ্রচার কিম্বা গুটিকয়েক শিশু কন্যা কিম্বা মহিলার মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেবার পরিবর্তে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ আদর্শ ও বাণী নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রচার পূর্বক ভারতবর্ষের সর্বত্র জাতীয় চেতনা জাগ্রত করে যদি ভারতবাসীকে পরাধীনতার কারাপাশ থেকে মুক্ত কাঙ্খিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই হোক তাঁর পরমধর্ম। আর এইভাবেই ধীরে ধীরে 'ধর্ম' ও ভারতের 'জাতীয়তা'র অর্থ একাকার হয়ে যায় ভগিনী নিবেদিতার কাছে।

কিন্তু কে বলে দেবে ভগিনী নিবেদিতার নির্ধারিত এই পত কতটা সত্য, কতটা নির্ভুল। কে মুক্তি দেবে তাঁকে মনের মধ্যে নিরন্তর ঘটে যাওয়া এই সংশয়, এই দ্বন্দ্ব থেকে। আজ যে তাঁর গুরু প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী স্থূলদেহ ত্যাগ করে লীন হয়েছেন পরমব্রহ্মে। কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার স্থির বিশ্বাস আজও তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ ঠিক একইভাবে তাঁর পাশে বিরাজমান। আসলে নিবেদিতা যে সবসময় গুরুর অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারেন। আর এই অনুভূতির জোরেই যে পথ ভগিনী নিবেদিতা নিজে নির্ধারণ করেছিলেন, 'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা' - সেই পথেই থাকলেন স্থির ও নিশ্চল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ ভগিনী নিবেদিতার দীর্ঘদিনের সাথিরা বিষয়টি ভেবে দেখার প্রস্তাব দিলেও তিনি অত্যন্ত সহজভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'আর কিছু আমার দ্বারা হবে না, ভারতমাতার সাধনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, দেশের ভাবনা আর আমি এক হয়ে গেছি, এ পথ ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে মরা আমার পক্ষে অনেক বেশী সহজ। এরপর স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহযোগিতায় ও তাঁর কাজকর্মের সাথে জড়িয়ে মঠকে কোনভাবে বিব্রত না করার যে শপথ একসময় ভগিনী নিবেদিতা তাঁর পরমগুরু স্বামী বিবেকানন্দের কাছে করেছিলেন তার প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান জানিয়ে প্রাণাধিক প্রিয় গুরু স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ সংঘ হতেত নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার মনস্থ করে স্বামী ব্রহ্মানন্দের পত্রের উত্তরে জানালেন —

১৭, বোসপাড়া লেন,
বাগবাজার
কলিকাতা, ১৮ই জুলাই, ১৯০২

প্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ,

আজ সন্ধ্যায় আপনার যে চিঠি পেলাম, তাঁর প্রাপ্তি স্বীকার করছি, আপনি সংঘের ও আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করুন। ব্যাপারটি বেদনাদায়ক, তথাপি আমার পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য যে কোন ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাতে আমার সম্মতি আছে।

যাই হোক, বিশ্বাস আছে, আপনি এবং সংঘের অন্যান্য সদস্যগণ প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আমার গুরুর ভস্মাবশেষের বেদীমূলে আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ভুলবেন না।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে যথাসম্ভব সহজভাবে আমার নূতন পরিস্থিতির বিষয় জানিয়ে দেব।

কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততাসহ
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা

পরের দিন ১৯শে জুলাই, ১৯০২ শনিবার অমৃতবাজার পত্রিকায় 'সিস্টার নিবেদিতা'- এই শিরোনামে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হল, "অনুরোধ করা হয়েছে, আমরা যেন সর্বসাধারণকে জানাই যে স্বামী বিবেকানন্দের শোক - বাসরান্তে বেলুড় মঠ পক্ষ ও নিবেদিতা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অতঃপর সিস্টার নিবেদিতার কোন কাজেই মঠ কর্তৃপক্ষের সম্মতির অপেক্ষা থাকবে না। তাঁর কাজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে গণ্য হবে।"

ভগিনী নিবেদিতার এই পত্র হতেই অনুমেয় যে, স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক মহাপ্রয়াণে শোকস্তব্ধ ভগ্নহৃদয়া ভগিনী নিবেদিতাকে আরো কতই না নির্মম সত্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তথাপি একথা বলতেই হয় যে, স্বামী বিবেকানন্দের মানস দুহিতা ভগিনী নিবেদিতা আর আগের মতো আবেগপ্রবণ নয়। বরং অনেক বেশী বাস্তবধর্মী।

পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে, নিয়ম নীতির বেড়াজালে যদিও ভগিনী নিবেদিতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়েছিল। তথাপিও রামকৃষ্ণ মিশন ও মিশন ভ্রাতাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ঐকান্তিকতা, আত্মিক যোগাযোগ এসব কিছুরই কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দও কিন্তু এব্যাপারে প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, ভগিনী নিবেদিতার মতো দৃঢ়চেতা, স্বাধীনতাকামী একজনকে জোরপূর্বক কোন একটি নির্দিষ্ট ঘাতে প্রবাহিত করা সম্ভব নয়। আর এই সম্ভবনার কথা অনেক পূর্বেই অনুমান করতে পেরে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্য ও ঘনিষ্ঠ মহলে প্রায়ই বলতেন যে, একদিন নিবেদিতা নিশ্চিত হিন্দুদের মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করবেন এবং তিনি ভগিনী নিবেদিতার কাছে এই প্রত্যাশাই করেন। আর এরই সূত্র ধরে স্বামীজি একবার এও বলেছিলেন যে, " ও যদি মঠের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না-ও রাখে, তোমরা ওকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দিও।"

এসবের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আসলে ভগিনী নিবেদিতার সামর্থ্যের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে যেকোন বিধি নিষেধের বাইরে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভারতমাতার কাছে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার সবরকম সহযোগিতাই করতে চেয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও গুরুর আস্থার প্রতি সুবিচার করে স্বার্থ শূন্যভাবে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন ভারতমাতার চরণে। গুরুকে স্মরণ করে তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে শেষবেলায় লিখেছিলেন, ‘আমি জানি, তাঁর নামে যে কাজ করছি তা তুমিও প্রশ্রয় ছায়ায় লালন করবে, করবে মঙ্গল কামনা .....’

সূত্র ঃ

১। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, ভগিনী নিবেদিতা, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা, ২০০৫।

২। স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ, ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবছরের শ্রদ্ধাঞ্জলী, জগদ্দল বিবেকানন্দ এডুকেশন সোসাইটি ফর চিল্ড্রেন, জগদ্দল, ২০১৫।

৩। নারায়ণী দেবী (অনুবাদিকা), ভারতকন্যা নিবেদিতা, সোমলতা, কোলকাতা, ১৯৫৫।

৪। এমিথিউসের পথে, সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিক, নিবেদিতা সংখ্যা, মার্চ - মে, ২০১২।

৫। Sudeshna Basak, Glimpses of the posst, Essays on sister Niveditaa and her contemporaries, K.P. Bagchi and Company, Kolkata, 2004.

প্রথম প্রহর ঃ রমাপদ ও তিমুদা

রানু বি(্বাস

সহ অধ্যাপিকা, দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ, কৃষ(নেগর।

একজন সাধারণ - ব্যক্তি(মানুষ সুসাহিত্যিক হয়ে ওঠেন তিনটি মহৎ গুণে - আত্মমর্যাদা, মানবিকতা ও বিবেকবোধ। রমাপদ চৌধুরী সেইরকম এক সাহিত্যিক যিনি পাঠককে শুধু তৃপ্ত করেন না, তিত্ত(ও করেন —

‘লেখার সময় আমরা শুধু ভাবি কী লিখতে চাই। আমি এমন অনেক লেখা লিখেছি, সচেতন হয়েও লিখেছি যা পাঠকদের তৃপ্ত করবে না। তিত্ত(করবে।’ (রমাপদ চৌধুরী - আলাপ আমার সময়)

ক্লাসিকপন্থী এই লেখকের জন্ম ২৮ ডিসেম্বর ১৯২২, বাবা স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন চৌধুরী ছিলেন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের অ্যাকাউন্টেন্ট। পরে চীফ্ অ্যাকাউন্টস্ অফিসার। তারাপ্রসন্ন বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র, প্রথমে সিমলার অধ্যাপকের চাকরী না করে বিজ্ঞানের মাধ্যমে কৃষিকার্যে উন্নতিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। পরে নাগপুর জয়েন করেন ‘অডিট’ পরী(ার মাধ্যমে। বিবাহ উত্তরকালে তারাপ্রসন্ন ও পুত্র রমাপদ থাকতেই (্বশুরমশাইয়ের বাড়িতে। রমাপদের এই মাতামহ ছিলেন খড়গপুরের বি.এন. রেলওয়ে হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান হেডমাষ্টার। রমাপদ এই মানুষের সান্নিধ্য বেশী পেয়েছিলেন। অন্যদিকে বাবা রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের চাকরির সুবাদে লাইব্রেরির ছাড়পত্র পান — বাবার কাছ থেকেই পান পড়ার নেশা, জানার আগ্রহ। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত লাইব্রেরির বই পড়া এবং প্-াটফর্মে ইতস্তত বেড়ানোই হয়ে ওঠে তাঁর প্রথম উপন্যাসের বিষয় সমগ্র - ‘প্রথম প্রহর’।

‘প্রথম প্রহর’ শু(হয় আকস্মিক দর্শনে - “ ‘তিমু দা’ না ? চিনতে পারছো ? বাব্বা, কতদিন পর দেখা। তুমি তো আমাকে ভুলেই গেছ, আর ভুলবেই বা না কেন ? এখন তো আমাদের সেই ‘তিমু দা’ নও, কত বড় লেখক হয়েছো। তোমাদের অধিকাংশ বই আমি পড়েছি আর আমার স্বামীও তোমার লেখার দা(নে ভত্ত(। কিন্তু যত বড় লেখকই হও, আমি কিন্তু রমাপদ চৌধুরীকে চিনি না, চিনি আমাদের ‘তিমু দা’ কে।”

‘প্রথম প্রহর’ উপন্যাসে কিশোর নায়ক ‘তিমু’ — রমাপদ চৌধুরীর ছেলেবেলা। উপন্যাসে তিমুর বয়সকাল ৭ থেকে ১৬ বছর উত্তীর্ণ কাল দেখানো হয়েছে। তিমুর ছেলেবেলায় খড়গপুর এখনকার মতো উন্নত শহর নয় - সবে নাগপুর থেকে আদ্রা হয়ে শালবনি পর্যন্ত রেল এসেছে। নাগপুরে ‘বেঙ্গল নাগপুর বেসরকারী রেল কোম্পানি’র হেডঅফিস। সেখান থেকে তারা ছত্রিশগড়ের শ্রমিক পাঠাতো শালবনী পর্যন্ত, তারপর

সেই শ্রমিকেরা দল বেঁধে হেঁটে আসত মেদিনীপুরের কাঁসাই নদীর পুল পর্যন্ত, তখনও পুলে রেলের লাইন পাতা হয়নি। ১৮৭৯ সালে তিমুর দাদু রেলের দোভাষীর কাজ পায়। তিনি শ্রমিকদের ছত্রিশগড়ের ভাষা ইংরাজিতে রূপান্তরিত করে সাহেবদের বোঝাতেন, শহরের পূর্বপ্রান্তে একটা সাদা মন্দিরের চূড়া দেখা যেত, নাম ইদাঁ। তিমু আব্দার করে ঐ মন্দিরে যাবার জন্য। মেদিনীপুরে আরেক মন্দির খড়েগ(রে মন্দির - মতান্তরে জানা যায়, 'খড়গ' নামের এক আদিবাসী গোষ্ঠী থেকেই খড়গপুর। ঐ মন্দিরেই তিমু আবিষ্কার করে মেয়েলি কণ্ঠস্বর। সেখান থেকে তৈরী হয় আর এক গল্প।

'প্রথম প্রহর' উপন্যাসটি যেমন তিমুর জীবনী তেমনি বৃহত্তম রেলষ্টেশনের পাঁচালীও বটে। সেই পাঁচালী লিখতে গিয়ে তিমুর ছেলেবেলা হয়ে পরে রমাপদের ছেলেবেলা —

"জোড়া জোড়া অসংখ্য রেললাইন পাশাপাশি পুবে পশ্চিমে ছুটে গেছে, রাতের আলোয় ওভারব্রিজের মাথা দেখলে মনে হত অসংখ্য ছুরির ফলা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে শহরটাকে দু টুকরো করে দিয়েছে।" (দেশ, ১৩৮২, পৃঃ - ১৫৫)

উপন্যাসেও তিমু আত্মকথনে মনে করেছে কোলাঘাটে রূপনারায়ণ নদের ওপর সেতু হবার আগে প্যাসেঞ্জাররা নদের ওপার থেকে নৌকা করে এপারে এসে আবার ট্রেনে চাপলো। এই কোলাঘাটের উপর সাতদিন ধরে উৎসব চলত। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন প্রথম ট্রেন যখন খড়গপুর ষ্টেশনে থামল, তখন মেয়ে - বৌয়েরা তেল সিঁদুর ট্রেনের গায়ে মাখিয়ে ছড়া বলত —

"তেল তেল তেল
তোমার পায়ে দিই তেল
তোমার কুঠি কতদূর
ব্যাথার পায়ে তেল সিঁদুর
এসো রেল বসো রেল
মুখে জল বাতাসা
চালে ডালে রেখো তুমি
আমার বাছারে ....
....
রেল রেল রেল
আমার ভাতারে দিও মুড়ি তেল।"

এরই সঙ্গে তিমু জানতে পারে ১৮৯৫ সালে রেলকারখানা চালু হবার পর ১৯ হাজার শ্রমিক ৫২টা শপে রেলের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ও প্যাসেঞ্জার কোচের র(নাবে(নের কাজে নিযুক্ত(হয়েছিলেন — এটা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা।

রেলের কারখানা নির্মানের কাজ যখন পুরোদমে চলছে (১৮৮৯ সাল), তখন

খবর আসে বছর পাঁচেকের মধ্যে কাজ শেষ করে কারখানা চালু করতে হবে — নাগপুর হেডঅফিসের নিয়ম। কিন্তু গন্ডোগোল লাগল শ্রমিক নিয়ে — কারণ তখনকার জমিদারেরা চাষবাসকে বেশি গু(ত্ব দিত। তাই বাঙালী শ্রমিক না পেয়ে সাহেবরা ওড়িষা, অন্ধের, তেলেগু শ্রমিক নিয়োগ করেন, রমাপদ আত্মজীবনীতে বলেছেন তাদের কথা — "......... একদিকে হাজার হাজার পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, গুজরাতি, বাঙালী, আর দুরে দুরে অন্ধ্রবাসী বা ছত্রিশগড়ীদের, বিহারী, মুসলমানদের শ্রমিকপল্লী" (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২)। সে যেন ভারতবর্ষেরই এক (দ্র সংস্করন। বনজঙ্গল কেটে, শক্ত(পাথুরে জমিকে যথা সম্ভব সমতল করে রেলের উপনগরী গড়ে তোলার এক অদ্ভূত প্রয়াস দেখা যায় উপন্যাসে।

এই বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে মিশে ছোট্ট তিমুর মনের মধ্যে জন্ম নেয় এক অদ্ভুত সংস্কৃতির। তিমুর এখন কৈশোরকাল - জানবার আগ্রহ প্রচুর - কৌতুহল তাকে সবসময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। রমাপদ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন —

"খড়গপুর রেল উপনিবেশের বেলায় অন্তত আমার ছেলেবেলা সেরকম কোনো মৌলিক সামাজিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল না। ফলে তৈরী হয়েছিল এক মিশ্র সংস্কৃতি, থানা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কালচার না ফিউডাল কালচার..................... সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের, বিভিন্ন কালচারের মানুষের অ্যাকুমিউলেশন ঘটেছিল রেল কারখানাকে কেন্দ্র করে। ফলে 'সেন্স অফ বিলঙ্গিঙ' বলতে যা বোঝায় সেরকম কোনো আত্মিক সংযোগ ছিল না কারোর মধ্যেই আর এখান থেকেই আমার নিঃসঙ্গতার সূত্রপাত ঘটেছিল।"

এই বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ধরা পরে রানা মাষ্টারমশাই, অঞ্জুদি - নিমাইদা, কাকাবাবু - কাকিমা, আবিদ হোসেন - ফুলজানবিবি, মীরা, আন্নামাসী, রামাই পন্ডিত, পরী, আলো বৌ, অঞ্জলিদি, নিমাইদাদা, অবণীদা, প্রথম প্রেমের স্পর্শ পান্না, কুয়োর জলে স্নান করতে করতে সদাশিব জ্যাঠার মন্ত্রপাঠ........। উপন্যাসের সূচনায় তুলসিদাস একটি চৌপাই গায় সদাশিব জ্যাঠা গায় —

পহেলা প্রহরমে সবকোই জাগে
দোসরা প্রহরমে ভোগী
তিসরা প্রহরমে তস্কর জাগে
চৌঠা প্রহরমে যোগী।।"

নানা সময়ে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে এই গানটি ঘুরে ফিরে এসেছে। যদিও উপন্যাসটির নাম প্রথম প্রহর। অর্থাৎ উপন্যাস শু(তে সব চরিত্রকে জীবন্ত রাখে। পরের প্রহরে (দোসরা) গল্প এগোয় ঝিঁ ঝিঁ পোকার ট্র্যাজিটিতে, অঞ্জলিদি ও নিমাইদার প্রণয়োপ্যাখ্যান থেকে স্বদেশী আন্দোলনে। তিসরা প্রহর ও চৌঠা প্রহর ভবিষ্যতের কালগর্ভে বিলীন হয়।

তিমুর ছেলেবেলায় স্কুলভর্তির পাশাপাশি কৈশোরে যুগসন্ধি(ণও এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন — দুপুরে খাওয়ার পর মা ঘুমালে দেখে তিমু

মায়ের পাশ থেকে উঠে চুপি চুপি বাইরে যেতে গিয়ে কাকিমার ঘরের সামনে আসতেই দেখলো কাকাবাবু কাকিমাকে চুমু খেয়ে আদর করছেন। একই রকম নিমাইদা অঞ্জলি দিদিকে বুকে জড়িয়ে আদর করে। তিমুর প্র(— 'চুমুতো বড়োরা ছোটাদের খায়, তাহলে ?' কাকিমা ও অঞ্জলি দিদিকে তিমু জানায়, সে বড় হলে বুঝবে। তিমু বড় হয় শুধু প্রেম বোঝে তা নয়, বিরহ আবিষ্কার করে। নিমাইদার সাথে অঞ্জলিদির বিবাহ হয়নি। অঞ্জলি দিদি (শুরবাড়ী চলে গেলে নিমাইদাদা বড় অন্যমনস্ক হয়ে পরে, তিমুদের আগেরমতো ত্রি(কেটও শেখাতেন না। একই রকম আবিদ হোসেন ছিল তিমুর কাছে সবচেয়ে বড় ঘৃণ্য ব্যক্তি(, অথচ ফুলজান বিবির ব্যর্থ প্রেমে সেই মানুষই সমস্ত সম্পত্তি দান করে ফকির হয়ে চলে যায়। কুলী যোগানের আড়কাঠি অবণীদা যার নাম কামিন, মেয়েদের সঙ্গে জড়িয়ে কুৎসা ওঠে — সেই ব্যক্তি(ই বন্ধুর প্রেমিকাকে কুমারী মাতৃত্বের কলঙ্ক থেকে মুক্ত(করে। নিমাইদাও উপন্যাসের শেষে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেয়। ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যান এ শহরের প্রাণপু(ষ নি(র দাদু আর সদাশিব জ্যাঠাও নি(দ্দেশ হয়ে যায়।

'প্রথম প্রহর' উপন্যাসের মূল বিষয় ছিল প্রবীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের পটভূমি হিসেবে রমাপদ বেছে নিয়েছিলেন তাঁর আবাল্য পরিচিত রেল শহরকে আর ব্যক্তি(জীবনের অভিজ্ঞতার প্রে(তে ধরতে চেয়েছিলেন আধুনিক শিল্পোদ্যোগের ফলে বদলে যাওয়া সামাজিক পরিস্থিতির যথার্থ স্বরূপকে। উপন্যাসটি শুধুমাত্র আত্মজৈবনিক পরিকাঠামোয় নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা তথা শিল্পোদ্যোগের পরিণতিও এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়েছে আর এখানেই 'প্রথম প্রহর' অনন্য হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থঋন ঃ—

১) প্রথম প্রহর — রমাপদ চৌধুরী - দেশ পাবলিকেশন

২) রমাপদ চৌধুরী কথাশিল্প — শম্পা চৌধুরী - এবং মুশায়েরা

পত্রিকা ঃ—

রমাপদ চৌধুরী সংখ্যা - উজাগর - উত্তম পুরকাইত - একাদশ বর্ষ

রবীন্দ্র শি(াভাবনা ব্যক্তি(সত্তা ও জাতিসত্তার সমন্বয়

সুব্রত হালদার

গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বি(বিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া

মানবতাবাদী ও বি(প্রেমের অন্যতম প্রবক্ত(া রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক পরিবেশটি ছিল ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক। এই সময়ে একদিকে আমাদের দেশবাসী ইংরেজ শাসনব্যবস্থার বি(দ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, অন্যদিকে তাদের প্রচলিত ইংরেজি শি(ায় শি(ত হয়ে একদল মধ্যবিত্ত মানুষেরা বিস্তৃত সমুদ্রের ওপারের বি(ভূমির সঙ্গে নিজভূমির মেলবন্ধন ঘটাতে সচেষ্ট। আর ইংরেজরা সেই সময় নিজ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শি(া ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। তখনই বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ নব্যশি(ায় শি(ত হয়ে ইংরেজ শাসকের অধীনে কর্মরত হয়ে পড়েন। অন্য একদল পল্লীবাংলার মানুষ যারা সর্বদা কৃষিনির্ভর, তারা ত্র(মশ সমাজে তলিয়ে যাচ্ছিল। ইংরেজদের আগমনে বাংলার কৃষিনির্ভর পল্লীসমাজের মূল ভিত্তি হারিয়ে ফেলে। তার ফলে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সনাতন পরিকাঠামো ভাঙতে শু(করে। আমাদের সমাজ কাঠামো চিরকালীন প্রবল শক্তি(শালী ছিল। বিদেশী শক্তি(র প্রভাবে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রবল শক্তি(র কাছে অন্যকিছুকে মাথা নত করতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় সমাজ-সচেতনতা সবথেকে বেশীমাত্রায় আলোড়িত হয়েছিল। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ভিন্নতর চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যধারায়। তার মধ্যে বেশী আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। তিনি আজীবন রাষ্ট্র অপে(া সমাজকে (মতার শীর্ষবিন্দু বলে মনে করেছেন। সমাজ সম্পর্কে তাঁর এই ধারনা একান্ত নিজস্বতা। তাই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> *"এতকাল ধর্মকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মর(ার উপায় বলিয়া জানিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে। এই জন্য সমাজের স্বাধীনতা যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্ম র(ার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।"*[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রতি তী(নজর রেখেছিলেন। ১৯০৫ সালে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের বিভাজিত করার জন্য ইংরেজ

শাসক বঙ্গভঙ্গের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার বিরোধী শক্তি(হিসাবে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয় ঐক্য সাধনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ধর্মকেন্দ্রিক বিভাজনের প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি রাখীবন্ধন অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। এছাড়াও তিনি নানারকম অনুষ্ঠানের দ্বারা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। তবুও স্বদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মধ্যবিত্ত সমাজ বড়ই উদাসীন ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজ এবং পল্লীবাসী শ্রমজীবি সমাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য চোখে পড়ে। নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা গায়ের রক্ত(জল করে জীবিকা নির্বাহ করত। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অনেকে চাকুরি, ওকালতি ও শি(কতা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। ফলে ইংরেজি শি(া ও সংস্কৃতির প্রতি তাদের আরও বেশীমাত্রায় আগ্রহ জন্ম নিয়েছিল। তাই ইংরেজি শি(ার কল্যাণেই শহরে মধ্যবিত্ত সমাজের পরিধি ত্র(মশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এই মধ্যবিত্ত সমাজের একটা অংশ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বহু স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করে যুবশক্তি(কে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য উজ্জীবিত করেছিলেন। তবে আন্দোলন যখন হিংসার পথ আশ্রয় করে তখন তিনি রাজনীতির পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনি কোন বিকল্প রাজনীতির পথে হাঁটলেন না। শুধুমাত্র বিকল্প পথ হিসাবে সমাজসেবাকে গ্রহণ করলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছিলেন—

> *"১৯০৫ সালে স্বদেশি আন্দোলন শু(হলে তখনকার দেশনেতারা কলকাতা এবং বড় বড় শহরেই এই আন্দোলন নিয়ে মেতে রইলেন। কিন্তু তখন বাংলাদেশের গ্রামবাসীদের কথাই বাবার বেশি করে মনে হতে লাগল। তিনি অনুভব করলেন, কেবল আন্দোলন করলেই হবে না, ভিত থেকে শু(করার সময় হয়েছে।"*[২]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামের সেবার মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি পল্লীগ্রামের মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। তার জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাদের উৎসাহিত করেছিলেন। আধুনিক প্রযুক্তি(সম্মতভাবে চাষবাস করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় চাষিরা তাদের জীবনপথকে চালিত করতে শিখল। তার ফলস্বরূপ পল্লীগ্রামের মানুষ সমাজব্যবস্থায় একটি স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করে জীবনযাপন করতে লাগল। স্বদেশভূমিতে মানুষ শুধুমাত্র জন্মগ্রহণ করলেই পূর্ণতা পায় না। তবে এই মানুষের মঙ্গল কর্মের দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। তাই স্বদেশের মাটি ও মানুষের একাত্মতা, সকলপ্রকার ভী(তা, দীনতা, হীনতা, হীনমন্যতা থেকে মুক্ত(করার কল্যাণ চেতনামূলক ভাবনাকে তিনি সকলের ভাবনার বিষয় করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেন শাসন (মতা পেলেই দেশ নিজের হয়ে ওঠে না। দেশ তখনই আমাদের নিজের হয় যখন আমরা নিজের মধ্যে দেশকে এবং

দেশের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারি। এই উপলব্ধিই প্রকৃত মুক্তি(র পথ। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ নিজের মধ্যে বাস করে, স্বদেশের মধ্যে নয়। আর এই আত্মকেন্দ্রিকতা যদি সর্বজনীন হয়ে ওঠে তবে নেমে আসবে দুর্গতির পথ।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় গ্রাম্য সমাজব্যবস্থাকেই শা(্বত ভারতের মূল ভিত্তি বলে চিহ্নি(ত করেছেন। তিনি সমাজের আত্মকেন্দ্রিক মানুষদের থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা অবস্থানে বিরাজমান ছিলেন। তিনি কখনো ব্যক্তি(স্বার্থের কথা ভাবতেন না। সর্বদা সমাজের মঙ্গলচিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সমকালে বাংলার বহু জমিদার তাঁদের ছেলে-

মেয়েদের উচ্চশি(ার জন্য ডাক্ত(ারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর উদ্দেশ্যে বিদেশে পাঠাতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে(ত্রেও এক ব্যতিত্র(মী ব্যক্তি(ত্ব। তিনি তাঁর ছেলে রথীন্দ্রনাথকে ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬ সালে আমেরিকায় পাঠালেন কৃষিবিজ্ঞানে শি(ালাভের জন্য। আমাদের কি মনে হয় না যে, সমাজের মঙ্গলচিন্তার (ে ত্রে এটাও বড় প্রমাণ? তাঁর এই কাজে ব্যক্তি(স্বার্থ ছিল না, ছিল শুধু সমাজকল্যাণ ভাবনা। সমাজ ছাড়া যেমন রাষ্ট্রকে কল্পনা করা যায় না, তেমনি আত্মিক ঐ(্বর্য না থাকলে রাষ্ট্রও টিকতে পারে না। গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে একমাত্র আত্মিক শক্তি(লাভ করা যায়। তার ফলে সমাজের কল্যাণ আসে। ব্যক্তি(, ব্যক্তি(সমষ্টি নিয়ে সমাজ এবং রাষ্ট্র, এই তিনের সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি(কে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, সেবামূলক কাজে আগ্রহী হতে হবে এবং চরিত্রবান মানুষ হয়ে উঠতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনায় তাঁর যে আগ্রহ তা ভারতের চিরায়ত ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আনুগত্যের প্রমাণ। এটাই ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সচেতন চিন্তা-ভাবনার ফসল। তখন ভারতের মূল সমস্যা ছিল ঔপনিবেশিক শাসনে গ্রামীণ জীবনের অব(য় ও বিপর্যয়। এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে গ্রামীণ অর্থনীতির স্বনির্ভরতায়, তার সংস্কৃতি পুন(জ্জীবনে, আত্মশক্তি(র চর্চার মাধ্যমে, স্বদেশী সমাজ নির্মাণের দ্বারা। মুক্তি(লাভের এটাই প্রকৃত পথ। আর এতেই ভারতবর্ষের প্রকৃত মুক্তি(। তাই ভারত নামক ভূখণ্ডের ঐতিহ্যকে স্মরণ করে, তিনি আমাদের মনে রেখাপাত করতে চেয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> *"হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শক জাতীয় জাঠ ও রাজপুত, মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গী, নায়ার সকল আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও*

সুবিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য র(া করিয়াছে, একত্রে বাস করিতেছে, কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই—উচ্চ-নীচ, সবর্ণ, অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্য পথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।''[৩]

তাই ভারতবর্ষীয় সমাজ একসময় প্রবল শক্তি(শালী ছিল। তখন রাজা শুধুমাত্র শাসক ছিলেন না, তাকে সমাজর(ণ ও চালনার দায়িত্বও নিতে হয়েছিল। সমাজধর্মের আদর্শকে তাঁরা চিরস্থায়ী করে রেখেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা। সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁরা আত্মত্যাগ করে গিয়েছেন।

সমাজের মানুষকে শি(য়, স্বাস্থ্যে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ কলকাতা পরিত্যাগ করে বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি আদর্শ মানুষ তৈরির একটি অনুকূল পরিবেশ প্রস্তুত করেছিলেন। আর পল্লীসমাজের কাঠামোকে শক্ত(করার কাজকেই তিনি একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের নানামুখী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষকে পূর্ণমানুষ হিসাবে তৈরী করতে চেয়েছেন। এই দুটি বিদ্যালয়ে বেশীমাত্রায় গু(ত্ব দেওয়া হয়েছিল জ্ঞানের বিকাশ এবং কর্মপ্রচেষ্টার। ফলে ছাত্রছাত্রীরা প্রকৃতভাবে চরিত্রবান বা আদর্শগত হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। তাই তাদের মনে সহানুভূতিশীলের জন্ম নিল, সকল প্রকার কুসংস্কারের অন্ধকার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আলোর সন্ধান করতে শিখল। রবীন্দ্রনাথ আশাবাদী ছিলেন যে, বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা প্রকৃত মানুষ হতে পারলেই তারা একদিন সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠনমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে ব্যক্তি(সত্তার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা সেই ব্যক্তি(সত্তাকে হারিয়ে আত্মকেন্দ্রিকতার পথকে অবলম্বন করেছি। তাই মানুষ কৃষিজমি পরিত্যাগ করে দূর দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছে। কেবলমাত্র নিজ ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য। আজ অর্থই যেখানে শেষ কথা। তাই মানুষ তার পিছু হাটতে শু(করেছে। তার ফলে মানুষ তার শা(ত সত্যকে অস্বীকার করতে চলেছে। এটা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে আমাদের দেশের পরিকাঠামো ভাঙতে শু(করবে। তাই তিনি মনে করেন, এই ব্যক্তি(সত্তার বিকাশের মধ্যদিয়ে জাতীয়

স্তরে মঙ্গল সাধন হবে এবং ত্র(মশ তা ছাপিয়ে গিয়ে বি(কল্যাণ ভাবনার স্তরে উপনীত হবে। এইভাবে রবীন্দ্রশি(া ভাবনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি(সত্তা ও জাতিসত্তার সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল একদিন। এই সম্ভাবনার কথা আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। আবার আমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে মানবধর্মের কথা ভুলে মানুষের রক্ত(নিয়ে খেলা করছি। একদল মানুষের (মতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাদের শাসন-শোষণ ও (মতার জন্য সমাজের অন্যদলের মানুষেরা তলিয়ে যাচ্ছে। যা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভূমিকম্পের কম্পমান ভূখণ্ডের মত কাপিয়ে তুলছে। যেকোন সময় তা ভেঙে পড়তে পারে। তাই রবীন্দ্র শি(াভাবনাকে পুনরায় আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কোণে কোণে পৌঁছে দিতে হবে শি(াভাবনাকে স্বার্থক করতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি আমরাই। ঠিক যেন সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে বলেছিলেন—

''আমরা নিজেরা অ(ম, আমাদের সাধ্য সংকীর্ণ, তবু সেই স্বল্প (মতা নিয়েই এই কখানি গ্রামের মধ্যে আমরা একটা আদর্শকে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছি। বহু বৎসর অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমরা গ্রামবাসীদের অনুকূল করেছি। ((ত্র এখন প্রস্তুত, আমাদের সামনে যে বড়ো আদর্শ, বড়ো উদ্দেশ্য আছে, তার কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই(এই মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরূক রাখতে পারি।''[৪]

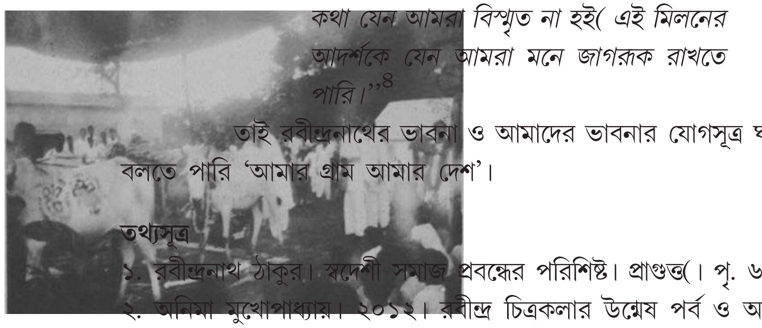

তাই রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও আমাদের ভাবনার যোগসূত্র ঘটিয়ে একই সুরে বলতে পারি 'আমার গ্রাম আমার দেশ'।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট। প্রাগুক্ত(। পৃ. ৬০।
২. অনিমা মুখোপাধ্যায়। ২০১২। রবীন্দ্র চিত্রকলার উন্মেষ পর্ব ও অন্যান্য প্রবন্ধ। পৃ. ৮৮।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবর্ষীয় সমাজ। পৃ. ৪১।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৪১৫। পল্লীপ্রকৃতি (রবীন্দ্ররচনাবলী চর্তুদশ খণ্ড)। পৃ. ৩৮৪।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

অনিমা মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র চিত্রকলার উন্মেষ পর্ব ও অন্যান্য প্রবন্ধ। প্রকাশকাল ২০১২। এন.ই. পাবলিশার্স। কলকাতা-৭০০০০৯।
তবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রনাথের শি(া চিন্তা পরিকল্পনা ও প্রয়োগ'। ৯ মে, ১৯৯৫। সাহিত্য প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘জীবনস্মৃতি’। পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র, ১৪১৭। বিশ্বভারতী। কলকাতা-৭০০০১৭।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘সভ্যতার সংকট’। পুনর্মুদ্রণ পৌষ, ১৪১৫। বিশ্বভারতী। কলকাতা-৭০০০১৭।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘শিক্ষা’। পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র, ১৪১৭। বিশ্বভারতী। কলকাতা-৭০০০১৭।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘রবীন্দ্ররচনাবলী’ (চর্তুদশ খণ্ড)। পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪১৫। বিশ্বভারতী। কলকাতা-৭০০০১৭।
সুশীল মণ্ডল। ‘রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা ও পল্লীপুনর্গঠন’। ডিসেম্বর, ২০১০। এন. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০০৯।

রঙ্গমঞ্চের সাড়া জাগানো নাটক ‘‘স্বর্গ হতে বড়’’

বিদিশা মাহাতো

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় একজন মহান নাট্যব্যক্তিত্বের আবির্ভাবকাল। এই মহান ব্যক্তিত্ব হলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। যিনি একদিকে নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক, নট ও নাট্যউপদেষ্টা রূপে পরিচিত। এই মহান নাট্যব্যক্তিত্বের জন্মকাল ১৯১০ সালের ২৭শে জানুয়ারী। অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার অন্তর্গত ‘দুলালী’ গ্রামে জন্ম মহেন্দ্র গুপ্তর। পিতা দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত এবং মাতা বিমলা সুন্দরীদেবী। ফরিদপুর টাউন থিয়েটারের সেন্টেনারী উপলক্ষে নাট্যকার দ্বারা রচিত ও ফরিদপুর টাউন থিয়েটারে পঠিত লেখক স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে - লেখকের পিতা ফরিদপুরে ওকালতি করতেন এবং তিনি নিজে একজন সুলেখক ও সুঅভিনেতা ছিলেন।

মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে লেখকের পিতা পরলোক গমন করেন। তবে অতি শিশু বয়সেই তিনি তাঁর পিতাকে ‘সাজাহান’ নাটকে ‘সাজাহান’ চরিত্রে, ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে ‘সেলুকাস’ চরিত্রে এবং ‘পরপারে’ নাটকে ‘দয়াল’ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছেন। লেখক ফরিদপুরের ঈশান ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন। এই ইনস্টিটিউশনের হেডমাষ্টারমশাই কিরণচন্দ্র ঘোষও ভীষণ নাট্যানুরাগী ছিলেন। বলাবাহুল্য, পিতা দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত এবং কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহেই মহেন্দ্র গুপ্ত নাট্য জগতের প্রতি আকৃষ্ট হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত, ঠিক সেই সময়ই তাঁকে দিয়ে গিরীশচন্দ্র ঘোষের ‘বুদ্ধদেব’ নাটকে বুদ্ধদেবের চরিত্রে অভিনয় করান কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। এরপর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘ষোড়শী’ নাটকে জীবানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ফরিদপুর কলেজে ছাত্রাবস্থায় রচনা করেন ‘উত্তরা’ নাটক, যেটি তাঁর রচিত প্রথম নাটক। এরপর এম. এ. পড়তে কলকাতায় এলেন। কলকাতায় এসে তাঁর প্রথম রচনা ‘গয়াতীর্থ’ নাটকটি। এই ‘গয়াতীর্থ’ নাটকটি তাঁর প্রথম মঞ্চস্থ নাটক যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯৩৬ সালে। এই সময় তিনি এম. এ. পাশ করেন এবং একটি চাকরি নিয়ে দিল্লী চলে যান। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্বপ্ন হল নাট্য এবং মঞ্চ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন। এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়ণের চেষ্টায় দিল্লীতে চাকরী ছেড়ে চলে এলেন কলকাতাতে। কারণ, নাট্য জগতের প্রতি আকর্ষণকে তিনি অবহেলা করতে পারেন নি। এই সময়ে বহু নাটক তিনি রচনা করেছিলেন যেগুলি সাফল্যের সাথে অভিনীতও হয়েছিলো। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পনেরো বছর ষ্টার রঙ্গমঞ্চের গৌরবের মূলে ছিলো তাঁর অক্লান্ত সাধনা এবং তাঁর রচিত দেশপ্রেমমূলক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে উদ্ভাসিত তাঁর অসাধারণ অভিনয় শৈলী।

ষ্টার থিয়েটারের এই সময়কালটা ছিল মহেন্দ্র গুপ্তর যুগ। তাঁর রচিত ও অভিনীত ‘রাজনর্তকী’ নাটকের পর দীর্ঘকাল ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। কারণ ১৯৫২ সালের পর ষ্টারের তদানীন্তন সত্ত্বাধিকারী শ্রীসলিলকুমার মিত্রের সাথে মহেন্দ্র গুপ্তর

মতবিরোধ ঘটায়, তিনি ষ্টার ত্যাগ করেন। তখন তিনি কখনো 'রঙমহল', কখনো 'মিনার্ভা' আবার কখনো 'বি(েরূপা' তে অভিনয় করতে থাকেন। নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি গড়ে তোলেন নিজস্ব নাট্যসংস্থা 'সপ্তপর্ণা'। কলকাতার বিভিন্ন পেশাদারী ও অপেশাদারী মঞ্চ ভাড়া নিয়ে পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেশ কয়েক বছর এই দলটি অভিনয় ক'রে বেশ কয়েকটি নাটক। তিনি বেশ কিছুদিন যুক্ত(ছিলেন যাত্রা দলের সঙ্গে। ফলত গ্রাম বাংলার আপামর জনগনের মন জয় করে তিনি পরিণত হয়েছিলেন প্রবাদ পু(ষে।

ষ্টার ছেড়ে দেবার ২২ বছর পরে ষ্টার থিয়েটারের তদানীন্তন কর্ণধার শ্রীরঞ্জিতমল কাংকারিয়া, প্রখ্যাত নাট্য সাংবাদিক কালীশ মুখোপাধ্যায় মহেন্দ্র গুপ্তকে পূর্ণ মর্যাদায় ষ্টার থিয়েটারে ফিরিয়ে আনলেন এবং ষ্টার থিয়েটারের প্রধান নাট্য উপদেষ্টা রূপে যোগদান করতে অনুরোধ করলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি আবার ফিরে আসলেন এবং 'কৃষ(কান্তের উইল', 'সম্রাট' ও 'সমাধান' নাটকের উপদেষ্টারূপে ও মূখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে গ্রহণ করলেন দর্শকের বিপুল অভিনন্দন। অবশেষে যে রঙ্গমঞ্চে একদিন তিনি ত(ণ নাট্যকার রূপে পদার্পণ করেছিলেন সেই ষ্টার রঙ্গমঞ্চ থেকে তিনি শেষ বিদায় নিয়েছিলেন ১৯৮৪ সালের ১৯শে নভেম্বর।

কোন্ প্রে(াপটে নাট্যকার মহেন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব সে সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের খানিকটা পিছিয়ে যেতে হয়। পরিবারের হাল ধরার জন্য তিনি বাধ্য হয়েই কেরানির কাজ নিয়ে দিল্লী চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে সশরীরে উপস্থিত থাকলেও মন তাঁর পড়েছিল কলকাতাতে। তাই যখন তিনি শুনলেন তাঁর নাটক 'গয়াতীর্থ' মিনার্ভা থিয়েটারে সফল ভাবে অভিনীত হচ্ছে, তখন তিনি নিজেকে সামলাতে না পেরে চলে আসেন কলকাতাতে। তাঁর রচিত 'চত্র(ধারী', 'সোনার বাংলা' ইত্যাদি নাটক ভীষণ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত। তাঁর রচিত গানগুলিও জনসমাজে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এই সময় তাঁর বিবাহ হয় সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্তর কন্যা লিলিদেবীর সঙ্গে। তবে যাঁর সহায়তায় এই নবীন নাট্যকার কলকাতার নাট্যসমাজে পরিচিতি পেয়েছিলেন তিনি হলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। এই নবীন নাট্যকারের সাহসিকতায় নির্মলেন্দু বাবু অভিভূত। ফলত মহম্মদ-বিন-তুঘলককে নিয়ে লেখা মহেন্দ্র গুপ্তর নতুন নাটক 'অভিযান' এ মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন স্বয়ং নির্মলেন্দু লাহিড়ী। মহেন্দ্র গুপ্ত অনেক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, জীবনীমূলক ফ্যান্টাসি ধরনের নাটকও রচনা করেছিলেন। সেগুলি হল 'কমলেকামিনী', 'শকুন্তলা', 'মহারাজ নন্দকুমার', 'টিপু সুলতান', 'শতবর্ষ আগে', 'হায়দার আলী', 'রানী দুর্গাবতী'। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনারও নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি যেমন - 'মৃণালিনী', 'দেবী চৌধুরানী', 'দুর্গেশ নন্দিনী', 'রাজসিংহ', 'নৌকাডুবি', 'পৃথ্বীরাজ', 'কালিন্দী', 'সূর্যমহল' ইত্যাদি। এছাড়াও সামাজিক ও জীবনীমূলক নাটকের মধ্যে পড়ছে 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'স্বর্গ হতে বড়', 'শেষ রাত্রি', 'কালপু(ষ', 'মাইকেল' এবং 'ল(হীরা'।

তাঁর সামাজিক নাটক 'স্বর্গ হতে বড়' একটি সাড়া জাগানো নাটক তখনকার সময়ে। সেই সময়কাল সম্পর্কে শ্যামল ঘোষের বক্ত(ব্য হল -

> ''কলকাতায় দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধের আঁচ তখন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। কালোবাজারীদের হাত ধরে আমাদের দেশের জীবনমঞ্চে গুঁড়ি মেরে ঢুকছে চোরাকারবার, ফাটকাবাজি, বেকারী ও পতিতাবৃত্তি। গ্রামের অর্থনীতি ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। উপায়বিহীন হয়ে ফরিদপুর থেকে মা ও অবিবাহিত ভাইবোনদের কলকাতায় নিয়ে এলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। বাঁচাটাই তখন একমাত্র প্র(া, তখন কে নাটক দেখে, বিনোদনের জন্য পয়সা ঢেলে ? সংকটের বছরগুলিতেও কিন্তু নাট্যকার পরিচালক মহেন্দ্র গুপ্ত তাঁর প্রিয় থিয়েটারকে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন, রাতের পর রাত জেগে লিখেছেন এবং কিছুদিন বাদে বাদেই মঞ্চস্থ করেছেন একটির পর একটি নতুন নাটক''[১]

সেই সময় যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের পতন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি পেরিয়ে ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে ছেঁড়া নিশান উড়িয়ে অষ্টাবত্র(স্বাধীনতা এসে পৌঁছল। এই পরিবর্তনের হাওয়া মহেন্দ্র গুপ্তের জীবনে যে প্রভাব ফেলেছিল সে সম্পর্কে শ্যামল ঘোষের অভিমতটি হল -

> ''দেশের এইসব পরিবর্তনের হাওয়ার মধ্যে ভিন্নতর এক বদল এল মহেন্দ্র গুপ্তর জীবনে। প্রধান নট হিসেবে তাঁর নিয়মিত মঞ্চাবতরণ। এমনিতেই তেমন খ্যাতিমান শিল্পী কোনোকালেই ছিল না ষ্টার থিয়েটারে। শুধু বলিষ্ঠ নাটক আর দ(পরিচালনার গুণে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠত। নির্দেশকের মনে তাই খেদ ছিল দুর্বল অভিনয়ের জন্য। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতেই হল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত তাঁর 'স্বর্গ হতে বড়' নাটকে অমরেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন মহেন্দ্র এবং প্রথম আবির্ভাবেই রসিক দর্শকের মন কেড়ে নিলেন। ভাবীকালের এক শক্তি(মান নটের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে তাঁরাও বাংলার নাট্যকলার সুঠাম ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন।''[২]

এই হল 'স্বর্গ হতে বড়' বা অন্যান্য সামাজিক নাটকগুলি রচনার পূর্ব পে(াপট। সেই সময় তাঁর রচিত নাটকগুলি বাংলার মঞ্চকে মাতিয়ে তুলেছিল। কারণ এই সমস্ত নাটকগুলি জনমানসকে নিশ্চিতভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল। বলা বাহুল্য যে, স্বাধীনতা পর্বে 'স্বর্গ হতে বড়' নাটকে তাঁর পদার্পণ, রঙ্গমঞ্চে আশীর্বাদস্বরূপ। শ্যামল ঘোষের বক্ত(ব্য অনুযায়ী কারণগুলি হল -

> 'মহেন্দ্র গুপ্তর বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ পদ্ধতির নিজস্বতা ও মার্জিত প্রকাশ শি(িত দর্শকদের কাছে বিপুল আবেদন সৃষ্টি করত। দ্বিতীয়ত, নাটকের অন্তর্গত সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, বা উর্দু উচ্চারণে তাঁর শি(িত দ(তা ছিল তর্কাতীত। তৃতীয়ত, তাঁর স্বরগ্রামের বিস্তারে একই সঙ্গে অনেকগুলি মাত্রার সন্ধান পাওয়া যেত।''[৩]

এছাড়াও অপরূপ কান্তি এবং অসাধারণ ব্যক্তি(ত্বে পরিপূর্ণ ছিলেন মানুষটি। দেশ পত্রিকার বিনোদন সংখ্যাতে তাঁর কৃতিত্বের অন্য একটি দিকও প্রস্ফুটিত হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল যে -

> ''মহেন্দ্র গুপ্ত অন্য একটি দিক থেকেও স্বীকৃতি পায়। সেটা যুদ্ধকালীন সামাজিক অবস্থার মধ্যে রঙ্গমঞ্চের দরজা খোলা রাখার এক দুঃসাহসিক প্রয়াস। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৪৩ এর গোড়ায় যখন 'রানী দুর্গাবতী'র অভিনয় চলছে তখন ষ্টার সংলগ্ন হাতিবাগান বাজারে জাপানী বোমা বর্ষণ করে। অর্থাৎ, যুদ্ধের প্রত্য(আঁচ থিয়েটার পাড়ায়। এই প্রয়াসে তাঁকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি লেখেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ছবি বি(াস প্রমুখ জ্ঞানীগুণী বুদ্ধিজীবি ও শিল্পীরা।''[৪]

আমার আলোচ্য 'স্বর্গ হতে বড়' নাটকটির সার্থকতা সম্পর্কে জানা যায় যে নাটকখানি কালজয়ী নাটকে রূপান্তরিত হয়েছিল। যে দেশাত্মবোধ জাগরণের জন্য তিনি এই নাটক রচনা করেছিলেন তা যথার্থই দেশের ত(ণ ত(ণীকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ককারী হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। নাটকটিতে প্রথম অঙ্কে দেখানো হয়েছে দুটি পরিবারকে। একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত(ব্যক্তি(বর্গ হলেন মানসী, তাঁর দাদা বিনায়ক এবং তাঁদের জমিদারী দেখাশোনার নায়েব গোকুল। এঁদের জমিদারী চন্দনপুরে। তাই, এই চন্দনপুর এস্টেটের ত(ণ জমিদার হলেন বিনায়ক ও

তাঁর দেওয়ান হলেন গোকুল। আর একটি পরিবারে আছেন অমিতাদেবী ও তাঁর দাদা রাজবন্দী অমরেশ ও তাঁর পত্নী কল্যাণী যিনি মৃত। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান মানসী-বিনায়কদের কলকাতার বাড়ীর ড্রয়িং (ম। যেখানে Beer এর সাথে Soda সহযোগে নাচ গানের পার্টি চলছে কারণ ত(ণ জমিদার বিনায়কের বোন মানসীর জন্মদিন। যদিও বিনায়ক এই ব্যাপারে নিরাসক্ত(। পাঁচ বছর London এ ICS পরী(ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পর কলকাতায় ফিরে এসেও সে পাক্কা ভট্টাচার্য্যর মত গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করে। সাহেবীয়ানার বহিঃপ্রকাশ তো দূরের কথা মানসীর দাদা যেন বালীগঞ্জ Society র below par। এই উক্তি(র প্রবক্ত(া স্বয়ং তাঁর বোন মানসী। আসলে বিনায়ক খুব ভালো করেই বোঝেন মেয়েরা Potato Chips এর মতো আর ছেলেরা Salted বাদামের মতো। মানসীর জন্মদিনে নিমন্ত্রিত অমিতাদেবী আলাপরত বিনায়কবাবুকে এর মানে জিজ্ঞেস করলে তাঁর স্পষ্টোক্তি(-

> ''বিনায়ক।। তা নয় তো কি ? ওদের কাছে মেয়েদের দাম তত(ণ, - যত(ণ Potato chips এর মত মেয়েরা থাকে মুচমুচে(- আর ছেলেদেরে কদরও তত(ণ - যত(ণ Salted বাদামের মত Bank Balance এর পু(Coating! জানেন তো, - The World is a stage! আর Stage এর auditorium এ বিকোচ্ছে ঐ সব সভ্যতার oil paper মোড়া potato chips আর বাদামগুলো, চার আনা প্যাকেট দরে''।[৫]

নাট্যকার তৎকালীন যুগমনস্কতাকে তুলে ধরার জন্য Potato chips আর Salted বাদামের যে উদাহরণ বিনায়ক চরিত্রের মুখ দিয়ে প্রকাশ করিয়েছিলেন, বলা বাহুল্য তা এ যুগেও যথার্থভাবে প্রযোজ্য। সভ্যতার এই স্থূল (চি মনস্কতাকে তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যেখানে মানুষের দাম নেই। লোক দেখানো আতম্ভরীতারই দাম আছে। বিনায়কবাবুর এটাই স্পষ্ট ইঙ্গিত। সমাজটা যখন অনুকরণের জেরে বিভোর, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, সেই সময়ও কিছু মানুষ সমাজে থাকেন যারা মানুষের কথা ভাবেন। তবে শুধু ভাবনাতেই আটকে থাকলেও তো চলবে না, কিছু করতে হবে দেশের নিরীহ মানুষগুলির জন্য। রাজবন্দী অমরেশের এমনটাই নির্দেশ বিনায়কবাবুর প্রতি। কে এই অমরেশবাবু ? অমরেশবাবু হলেন অমিতাদেবীর দাদা। যিনি রাজবন্দী। পুরো নাম অমরেশ চৌধুরী। তিন বছরের জন্য কারাদন্ড হয়েছে তাঁর। কারণ দেশকে ভালোবেসেছিলেন। দেশের মানুষকে নিজের আত্মানুজ মনে করেছিলেন। এই অপরাধেই তাঁর জেল। তিন বছরের জন্য মাদুরায় তে অন্তরীন রাখা হয়েছিল তাঁকে। ছমাস আগে মুক্তি(পেয়েছেন তিনি, কিন্তু কেউ তাঁর খবর জানে না। কেউ বলে কঠিন রোগে আত্র(ান্ত হয়েছেন, কেউ বলে থাইসিস হয়েছে, তো কেউ বলে, তিনি পাগল হয়ে গেছেন। কেউই তাঁর সঠিক খবর জানে না। অমিতা জানতে পেরেছে অমরেশের সঙ্গীদের কাছ থেকে যে, সবাই যখন তাঁকে দেশে ফেরার কথা বললেন তখন পাগলের মত অট্টহাসি

হেসে দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে তিনি বলতে থাকেন, নেতাজীর সেই বাণী - 'চলো দূরে বহুদূরে পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে' এবং বলতে বলতে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। কেউ মনে করেন তিনি ডুবে গেছেন আবার কেউ বলেন তিনি সাঁতরে পালিয়ে গেছেন। কিন্তু বিনায়কের প্র্ন যে কীভাবে অমরেশবাবু রাজবন্দী হলেন ? উত্তরে অমিতা জানায় -

''অমিতা।। বৌদি একদিন বলছিলেন, দাদার
গুপ্ত সমিতিতে একটি নূতন
মেয়ে ঢুকেছিল অনেকে সন্দেহ
করে তারই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে
দাদা ধরা পড়েন।''[৬]

এই কথা বিনায়কের মনে সন্দেহ জাগায় যে সেই নূতন মেয়েটি হয়তো তাঁর বোন মানসী। কারণ অমিতার সাথে কথোপকথনে বিনায়ক অবগত হয় যে মানসী ওরফে মানু অমিতার বৌদির বন্ধু। দাদা অমরেশ বন্দী হওয়ার আগে অমিতা এই পরিবারে থাকত না। তখন এই পরিবারের সাথে মানু মেলামেশা করত। সেইজন্য রাজবন্দী স্মৃতিবিহীন অমরেশের স্মৃতিশক্তি(ফিরিয়ে আনার জন্য বিনায়ক তাঁর বোন মানসীকেই এনে তাঁর সামনে উপস্থিত করে। বলা বাহূল্য যে মানসী অমরেশকে দেখে আঁতকে ওঠে এবং অমরেশ তাঁকে চিনতেও পারে। কিন্তু কেন মানসী এই কাজ করেছিল ? অমরেশ তো তার কোনো (তি করেনি তাহলে এর কারণ কী ? এর কারণ সম্পর্কে আমরা নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে জানতে পারি যে, আসলে মানসী কলেজে প্রথম ভর্ত্তি হয়েই শুনেছিল অমরেশ চৌধুরীর নাম। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল অমরেশ চৌধুরীর কাছ থেকে দেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করবে। কিন্তু অমরেশ মানসীকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল এবং উপহাস করে বলেছিল যে -

''মানসী।। আমার দেশ সেবার কল্পনা
সাবানের ফেনার মত (ণস্থায়ী।
আমি দেশের ডাকে সাড়া দিতে
আসিনি, - আমি এসেছি
সবচেয়ে সস্তাদামে নাম
কিনতে।''[৭]

এই উপহাস মানু ওরফে মানসীর কাছে অসহনীয় হয়েছিল ফলে অপমানে আত্মগ-ানিতে তাঁর মন ভরে উঠেছিল। ফলে অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিন চারদিন ওদের আখড়ায় গিয়ে যা দেখেছে, যা শুনেছে সেই সব তথ্য তাঁর বান্ধবী সুমিত্রার কাছে অকপটে ব্যক্ত(করেছে। কারণ সুমিত্রার দাদা গোয়েন্দা বিভাগে বড় কর্মচারী। বলা বাহুল্য এর পরেই অমরেশ চৌধুরীর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেড়োয়। তার এক সপ্তাহ বাদেই খবর পাওয়া যায় যে অমরেশ চৌধুরী গ্রেপ্তার। তারপর সে অমরেশবাবুর বাড়ি গেলে জানতে পারে তিন দিন হয়েছে অমরেশবাবুর স্ত্রী কল্যাণীদেবীও মারা গেছেন। সেই থেকেই মানুর সাথে অমিতার

বন্ধুত্ব। কিন্তু মানসীর স্পষ্ট বক্ত(ব্য যে এই ঘটনার জন্য সে মোটেই দায়ী নয়। এইখানে নাট্যকার বিনায়ক চরিত্রকে দিয়ে একটা বহুমূল্য বক্ত(ব্য পেশ করেছেন, মানসীদের মতো মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে। সেটি হল -

''বিনায়ক।। অন্যায় করা এক কথা, - আর
অন্যায় করে ভাল মানুষটি
সেজে বাহবা নেবার চেষ্টা
তার চেয়েও বড় অপরাধ।''[৮]

তাই তো অসুস্থ অমরেশ যখন ফের মানসীকে দেশমাতার শেকল ভাঙ্গার ব্রত গ্রহণ করতে বলে তখন সে এই ব্রত গ্রহণ করতে অমান্য করে এবং বলে যে -

''দেশ তো শুধু মাটি দিয়ে গড়া নয়, দেশ হল
দেশের মানুষকে নিয়ে। শুধু কলকাতা শহরের
মানুষ নয়, ল(ল(নিরন্ন গৃহহারা নর নারীকে
নিয়ে তোমাদের এই দেশ। তাদের আমি চিনি
না, তাদের সুখ দুঃখের কোন খবর আমি রাখি
না - কেন রাখব ? আমি ধনীর কন্যা, - ফার্ষ্ট
এম্পায়ারে নাচের আসর জমাই, মোটরের
ষ্টিয়ারিং ধরে বিংশ শতকের ধার করা সভ্যতার
জয়রথ চালাই। আমি কেন করব দেশ সেবা ?
কেন ওই নিরন্ন ভিখারীদের জন্য ভোগ-বিলাস
ত্যাগ করব ? কেন ওদের জন্য জেলে পচে মরতে
যাব ?''[৯]

আসলে মানসীদের মত মানুষদের নিত্য নতুন বন্ধু জোটানোও যেমন hobby ঠিক তেমনি দেশ সেবাও hobby। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে নাম বেরোবে সেই আশাতেই তারা দেশ সেবা করতে আসে। দেশ সেবার নামে ঠগবাজি। কিন্তু বিনায়ককে এই ব্রত গ্রহণ করতে বলা হলে, বিনায়ক জানায় যে, তার কাছে পরাধীন জাতির প(দেশের জন্যে দুঃখ বরণ করা ছাড়া অন্য কিছু বরণ করা স্বীকার্য নয়। কিন্তু ব্রত গ্রহণ করা এক কথা আর সেই ব্রতকে আত্মাহূতির ভেতর দিয়ে মূর্ত্ত করে তোলা, দুটোতে অনেক প্রভেদ আছে। এই জায়গায় লেখক একটা মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। যেখানে অমরেশ দেখছে যে রাস্তায় মানুষরূপী ভিখারীরা একটু ফ্যানের জন্য হাহাকার করছে। অমরেশ আ(প করে বলছেন -

''অমরেশ।। ভিখারী! কিন্তু জাত ভিখারী
নয়, - ওরাই ছিল একদিন মা

লক্ষ্মী কোলের নিধি - বাংলার
কৃষাণ-কৃষাণী। গোলাভরা
ছিল ধান, পুকুর ভরা ছিল
মাছ, গোয়ালে ছিল দুগ্ধবতী
গাভী। আজ ওরা সব
হারিয়েছে । শহরের
Collapsible gate
ওয়ালা পাষাণপুরীর দ্বারে
মাথা খুঁড়ে বলছে - 'আমরা
তোমাদের এতকাল ধরে চাল
দিয়েছি, মাছ দিয়েছি, দুধ
দিয়েছি, পরিবর্তে তোমরা
আমাদের খাবার দাও - একটু
ভাতের ফ্যান, ভাত নয়, একটু
ফ্যান দাও। ফ্যান দাও।''১০

অমরেশের চোখ দিয়ে নাট্যকার দেখিয়েছেন, বিংশ শতকের মানুষের কুপরিণতি। সমাজের এক স্তর ফুলে ফেঁপে উঠেছে, আর এক স্তর সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈ্বের' এই মন্ত্র সুসভ্য মানুষের দল ভুলতে বসেছিল। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ আর পশুর মিছিল। অমরেশ নাটকের এই মর্মান্তিক দৃশ্যের বক্ত(া। তিনি বলছেন যে -

''অমরেশ।। রাস্তার ডাস্টবিনের দিকে
তাকিয়ে দেখ্ - বিংশ শতাব্দীর
সুসভ্য পৃথিবীতে একি কেউ
কখনো কল্পনাও করেছে যে
মানুষে, কুকুরে ডাষ্টবিনের
উচ্ছিষ্ট পচা ভাত নিয়ে
মারামারি করেন ? ঐ দেখ
সোনার বাংলার জীবন্ত ছবি
দেখ। 'ময় ভুঁখা হুঁ' বলে সারি
সারি জীবন্ত কঙ্কালের মিছিল!
ঐ ফুটপাথে, ঐ ডাষ্টবিনে দেখ,
অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার বসেছে, ঐ
যে ফ্যানটুকুও না পেয়ে
কঙ্কালদেহ নারী রাস্তার ধারে
মরে পড়ে আছে, আর তারই

বুকে শুয়ে শিশুটি স্তন বৃন্ত
কামড়ে শেষ চেষ্টা করে দেখছে
একটু দুধ, একটু রক্ত(, এক
ফোঁটা জলও পড়ে কিনা তার
শুকনো গলাকে ভিজিয়ে
নিতে।''১১

সমাজের এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে কিছু বিত্তবান মানুষের শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি বেশী অনুরাগ দেখা যায় এবং তারা বিত্তবান হওয়ায় অর্থের অপচয় করতে দ্বিধা করে না, শুধু মানুষ হয়ে মানুষকে এই অর্থ দিয়ে সামান্য সাহায্য করতে বুক ফেটে যায়। এই রকমই একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার যেখানে মানসী ও তার বন্ধুবর্গ মানসীদের Southern Avenue তে সংস্কৃতি ভবন নির্মাণ করতে চায় যা কিনা 'ভাবী বাংলার মূর্ত্তিমান আশা আকাঙ(ার প্রতীক'। তাই এই ভবনের নামও এমন হওয়া দরকার যাতে মানসীর মহানতা প্রকাশ পায় অথচ সেটা বোঝাও যাতে না যায়। তাই 'মানসী মন্দির' নাম পাল্টে হল 'মানমন্দির'। যাতে করে 'সাপও মরল না আবার লাঠিও ভাঙল না'। এই সময় প্রবেশ হচ্ছে আর একটি চরিত্রের, যিনি চন্দনপুর জমিদারীর দেওয়ান গোকুলকাকা। হঠাৎ তিনি কলকাতায় এসেছেন মানসী ও বিনায়কের কাছে। কারণ দেবতার পূজার ভোগে বেণু ওরফে বিনায়ক ভাগ বসাতে চায়। আসলে রাস উৎসব উপলে(চন্দনপুর রাজবাড়ীতে প্রতি বছর এগারো হাজার থেকে পনের হাজার টাকা খরচ হয় কিন্তু এবার এই উৎসবে বেণু তিনশো টাকার বেশি খরচ হতে দেবে না। কারণ বিনায়ক মন্দিরের ভগবানকে সেবা করার বদলে রাস্তার সর্বহারা নিরন্ন, অসহায় মানুষের সেবা করাটাকেই উচিত মনে করেছে। তাই যেমন বলা তেমন কাজ। বিনায়ক তাদের ক্লাবঘরে রাস্তার অসহায় মানুষদের ডেকে এনেছেন আশ্রয় দেবার জন্য। কিন্তু মানসীকে জিজ্ঞাসা না করে বিনায়ক এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলায় মানসী অত্যন্ত (ূদ্ধ হয়ে যায়। বিনায়ক তাকে বোঝায় যে -

''বিনায়ক।। টাকা দিয়ে নাম কেনা যায় বোন্
প্রাণ কেনা যায় না। আজ মুমূর্ষু
বাংলার বড় প্রয়োজন, ওই
এক কালের সুস্থ সবল কৃষাণ
কৃষাণীর পলাতক প্রাণগুলিকে।
আর এই প্রাণগুলিকে ফিরে
ফিরে পেতে হ'লে শুধু টাকার
স্পর্শ নয় দিদি, দরদী প্রাণের
স্পর্শ চাই। ওরা ফুটপাথে। আর
আমরা তেতলার হল ঘরে
থেকে প্রাণের সঙ্গে প্রাণ

মেশানো চলে না। হয় ওদেরও
ডেকে আনতে হবে এই
তেতলায়, নইলে আমাদের
যেতে হবে ঐ ফুটপাথে।"[১২]

দেড় হাজারের বেশী শরণার্থীকে সে আশ্রয় দিয়েছে ঐ Southern Avenue তে। কিন্তু মানসী এই Southern Avenue ক্লাবকে দান করবে সংস্কৃতি ভবন নির্মাণের জন্য। যার ফলে বিনায়ক আর মানসীর সংঘাত বেধে যায় এবং বিনায়ককে এক চরম সত্যের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। কী সেই সত্য ? সত্যটা আসলে যে রায়বংশের জমিদারীর ভাগে বিনায়ক অসহায় মানুষদের আশ্রয় দিতে চায়, সেই রায়বংশের বিনায়ক কেউ নয়, শুধুমাত্র অন্নদাস ছাড়া। স্বর্গীয় শ্রীবিলাস রায়ের ঔরসজাত পুত্র বিনায়ক নয়। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা মরবার সময় তার একমাসের শিশুকে রায়মশাইকে দিয়ে যায়। সেই থেকেই রায়মশাইয়ের সন্তান বলেই পরিচিত হয় বিনায়ক তবে বিনায়ককে সবার কাছে তাঁর নিজের সন্তান হিসেবে পরিচয় দেবার সাত বছর পর অপ্রত্যাশিত ভাবে রায় মশাইয়ের ঘরে একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। বলা বাহুল্য সেই হল মানসী। বিনায়ক যখন গোকুলের কাছ থেকে অবগত হয় যে শ্রীবিলাস রায়ের প্রপিতামহের উইল অনুযায়ী রায়বংশে কোন সন্তান না জন্মালে এই বিষয় সম্পত্তি রাধামাধবের দেবত্র হয়ে যাবে। ফলতঃ তখন এই জমিদারীর ওপর বিনায়কের আর কোন অধিকার থাকে না। এই ঘটনা সম্বন্ধে অবগত হয়ে বিনায়ক বলে যে -

"বিনায়ক।। ওঃ তাই রাধামাধবকে ফাঁকি
দেবার জন্য তিনি আমায় পুত্র
বলে পরিচয় দিয়েছিলেন!
রাধামাধবকে তিনি ফাঁকি
দিয়েছেন, রাধামাধব সেই
ফাঁকি সহ্য করলেন(আর সেই
রাধামাধবের রাস উৎসবে
বাজী পোড়ান আর বাঈজী নাচ
বন্ধ করতে চেয়েছি কিনা,
রাধামাধব আমার সে অপরাধ
(মা করলেন না। রায়বংশের
গৃহদেবতা, তাই আজ আমায়
ঘর ছাড়া করলেন।"[১৩]

বিনায়ক সেই মূহূর্তেই বাড়ী ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে মহাত্মা গান্ধীর ছবি বুকে নিয়ে আর বলে যে -

"বিনায়ক।। আমার চলার পথের দিশারী,

মহাদুঃখ, মহাত্যাগের দিব্য
মূর্ত্তি, সঙ্গে নিলুম - এই আমার
মহাসম্পদ।"[১৪]

এরপর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের স্থান কলকাতায় অমরেশের গৃহ, যেখানে অমরেশ নিত্যানন্দকে অমিতার ওভার কোর্ট থেকে দলিলটা লুকিয়ে রাখার কথা বলছে কারণ, কলকাতার বাড়ী, ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা দুর্গতের আশ্রয়দান ও প্রতিপালনের জন্য হিন্দু মহাসভাকে দান করে দেয় অমিতাকে না জানিয়ে। কারণ সেদিন বিনায়ক ওই একদল অনাথকে নিয়ে অমিতাদের বাড়ীতেই উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু অমিতা শুধু কষ্ট পেয়েছে এই কথা ভেবে যে, দাদা তাঁর সর্বস্ব দান করে দিয়েছেন এমনকি মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও। কিন্তু তাও অমিতা খুশি যে তাঁর দাদা দেশসেবার ব্রত পালন করেছে, দুর্গতদের আশ্রয় দিয়েছে। অমরেশ তাঁর বোনের হাতে এই চল্লিশ কোটী হৃদয়ের আশা-আকাঙ(ার প্রতীক ঐ ত্রিবর্ণ পতাকার ভার তুলে দিতে চায় এবং বিনায়ক ও মানসী উভয়েই এই দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়।

নাট্যকার একদিকে দেখাচ্ছেন কিছু মানুষ ভোগের মন্ত্রে বি(াসী আর এক দিকে দেখাচ্ছেন কিছু মানুষ ত্যাগের মন্ত্রে বি(াসী। এই ভোগের মন্ত্রে বি(াসী মানুষ ধীরে ধীরে রক্ত(পিপাসু পশুতে পরিণত হয়। পশুরা নিজেদের মাংস নিজেরা ভ(ণ করে না কিন্তু মানুষ এমনই নিম্ন প্রজাতির জীব যে সে পশুর মাংস তো ভ(ণ করেই এমনকি মানুষকেও মারতে দ্বিধা করে না। এমনই একটি চরিত্র হল মণিশঙ্কর যে মানসীর স্বামী। তাঁর কুনজর পড়েছে বাগ্‌দীদের একটি মেয়ের ওপর। আসলে মণিশঙ্করের চরিত্র প্রথমেই বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে, সে নারীকে একটা ভোগের বস্তু মনে করে। তাই ইলোরার প্রতিও তাঁর আকর্ষণ বড়ই দৃষ্টিকটু। যা দেখে মানসীও ঈর্ষান্বিত। ইলোরাও কিন্তু পরপু(ষে আসক্ত(। যেমন নাটকের প্রথমে দেখা যাচ্ছে ইলোরা বিনায়কের প্রতিও একটু বেশী কৌতূহলপ্রবণ তেমনি অমিতাদেবীর প্রতি ঈর্ষান্বিতও। নারীদের সবচেয়ে দুর্বল স্থান তাদের স্বামী। তাই অন্যের প্রতি স্বামীর দুর্বলতা স্ত্রীর কাছে অসহনীয় বটে। মানবিক চেতনার এই কোমল অংশটিকেও নাট্যকার চূড়ান্ত সংলাপে ফুটিয়ে তুলেছেন পল্লবের উক্তি(তে। সে বলছে যে -

"পল্লব।। শীত পড়লে মানুষের হাড় ফাটে
না, দেহের সবচেয়ে কমনীয়
অংশ ঠোঁট আর গাল ফাটে।
তেমনি জগতে সবচেয়ে
কোমলমতী জীব নারীও,
ঈর্ষারূপী শীতের স্পর্শে ফাটা
ঠোঁটের মত ((হয়ে যায়। একটু
মিষ্টি কথার, একটু সোহাগ
যত্নের Cold cream

মাখালেই দেখবেন, সব ((তা
কেটে গিয়ে একেবারে নবীন
কোমল মূর্ত্তি ধারণ করেছে।’’[১৫]

মণিশঙ্করকে বাগ্‌দী মেয়ের প্রতি আসক্ত(হতে দেখে পল্লব তাঁকে সাবধান করে দেয় যে, বাগ্‌দীরা তৈরী হয়েছে বি্বকর্মার কামারশালে খাঁটি লোহা আর ইস্পাত গলিয়ে। ওদের কালো কালো শক্ত(হাতগুলো ভোলা যায় না। পরবর্তীতেই মণিশঙ্করের উক্তি(-

‘‘মণিশঙ্কর।। এবং তুমিও ভুলো না পল্লব,
যে আজকের ধনতান্ত্রিক
রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে
Atomic বোমা। এই
Atomic বোমার যুগে
তোমায় লোহার
শাবলওয়ালারা কি করতে
পারে - সে আমিও দেখে
নেব।’’[১৬]

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার প্রতীক হল মণিশঙ্কর, যে কুসুমদিঘি পরগণা কিনতে চায়। একথা দেওয়ান গোকুলকে জানালে গোকুল নিষেধ করেন এই অভিশপ্ত পরগণা কিনতে। কারণ যে এই পরগণা কেনে সে নাকি সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। উত্তরে মনিশঙ্কর জানায় কুসুমদিঘিতে মাণিক আছে। আর এই মাণিককে দেখার চোখ গোকুলের নেই। গোকুল মণিশঙ্করের কুমতলব সম্পর্কে অবগত হয় এবং জানায় যে, মণিশঙ্করকে একাজ সে কিছুতেই করতে দেবে না। মণিশঙ্কর অত্যন্ত কঠোর ভাবে এবং কঠিন শব্দে গোকুলকে অপমান করে এবং দেওয়ানের চাকরী ছেড়ে চলে যেতে বলে। সেই কথানুযায়ী গোকুল মানসীর হাতে চাবি তুলে দিয়ে চলে যেতে গেলে মানসী তাঁকে সন্দেহ করে যে দাদার শোকেই হয়তো গোকুলকাকা আজ ছুটি নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তাই যদি হত তাহলে অনেক দিন আগেই গোকুলকাকা চলে যেত। কারণ - শ্রীবিলাস রায়ের পালিত পুত্র বিনায়ক হলেও গোকুলকাকার তো সে পালিত পুত্র নয়। বিনায়ক আসলে গোকুলকাকারই সন্তান। গোকুলকাকার উক্তি(-

‘‘গোকুল।। তোমার বাবা স্বর্গের দেবতা
ছিলেন মা। আমি তোমাদের
বিষয় র(ণাবে(ণ করি(
বেণু আমার সন্তান, একথা
জানলে যদি কখনো ভুল
ত্র(মেও তোমার মনে হয়,
আমি তোমার স্বার্থের চেয়ে

বেণুর স্বার্থকে বড় করে
দেখছি(তোমার মনে পাছে
আমার ওপর সন্দেহ জন্মে,
অশ্রদ্ধা জন্মে, তাই- তাই
রায় মশাই তোমায় সেদিন
লুকিয়ে ছিলেন যে, ঐ বেণু
আর কেউ নয় আমারি
সন্তান।’’[১৭]

কত বড় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত লেখক এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মানসীর মনে সন্দেহ জাগে যে কী এমন কারণ হতে পারে যার জন্য গোকুলকাকা তাঁকে ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, যে কিনা মানসীর জন্য নিজের ছেলের অভাবও সহ্য করেছে তবু চলে যায়নি। অবশেষে গোকুলকাকা মানসীকে ছেড়ে না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নেয়। এই অঙ্কেও নাট্যকার একদিকে ত্যাগ ও ভোগের প্রতীক হিসাবে গোকুলকাকা ও মণিশঙ্করকে দাঁড় করিয়েছেন। গোকুলকাকার এই আত্মত্যাগের ঘটনা এক বিরল দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

এরপর তৃতীয় দৃশ্যের স্থান কাজল গাঁ, যেখানে অবশেষে বিনায়ক ও অমিতা এসেছে এবং তাঁরা তাদের সর্বস্ব ছেড়ে এই গ্রামের পথেই অভিযান করেছে। এই দৃশ্যে লেখক, মানুষের মনে যে কুসংস্কার দানা বেঁধে রয়েছে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। বিনায়ক দেবনাথের কাছে জল কোথায় পাবে জিজ্ঞেস করলে সে জানায় ঘোষবাবুদের পুকুরে। কিন্তু সেটা একটু দূরে। কাছাকাছি যে পুকুর সেটা বাগ্‌দীদের পুকুর। কিন্তু বাগ্‌দীদের পুকুরে ভদ্দর লোকেরা জল খেলে ব্রহ্মার ছেলে মুচুকুন্দ রাজা এসে অভিশাপ দিয়ে যাবে। - এই সব কিছু বাগ্‌দীরা বি্বাস করে। এদের মধ্যে এই কুসংস্কার প্রবেশের জন্য দায়ী কারা ? আমরা নিজেরাই। অমিতার বক্ত(ব্য এই (ত্রে -

‘‘অমিতা।। দোষ আমাদের, ওদের ওই
পাথরের মত শক্ত(দেহের মধ্যে
কাঁচামাটীর মত নরম মন। সেই
মনকে আমরা যে ভাবে গড়ি
সেইভাবে ওরা গড়ে ওঠে।
ওদের আমরা হাত ধরে টেনে
তুলবো - ওদের আমরা মানুষের
অধিকার দেব। এই আমাদের কর্ম্ম
- এই আমাদের ব্রত।’’[১৮]

অবশেষে বিনায়ক ও অমিতা প্র(াদ বাগ্‌দীর কাছে আশ্রয় লাভ করে। চতুর্থ দৃশ্যে দেখা যায় যে, তারা বাগ্‌দীদের শি(ার কাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত(করেছে। অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য,

তারা একই সাথে খাওয়া দাওয়া করছে আর জমীদারের অত্যাচারের বি(দ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য সাহসও জোগান দিচ্ছে। গোকুলের মুখ থেকেই মানসী জানতে পারে যে, মনিশঙ্কর প্র(াদকে ধরে নিয়ে এসেছে কারণ মণিশঙ্করের পাইক বরকন্দাজরা প্র(াদের মেয়েকে ধরতে পারে নি। প্র(াদ এসে যাওয়ায় তাঁর মেয়ে পালিয়ে যায়। প্র(াদ তাঁর মেয়েকে ধরার কারণ জানতে চাইলে মণিশঙ্করের নির্লজ্জ উত্তর 'আমি তাকে চাই'। কারণ, ভোগ করার জন্য। প্র(াদ বিয়ে করার জন্য তাঁর মেয়েকে দিতে রাজী কিন্তু ভোগের জন্য নয়। ইতিমধ্যেই অমরেশ চন্দনপুরে চলে আসে মানসীর চিঠি পেয়ে। কারণ মানসী তাঁর দাদা বিনায়ককে তাঁর বিপন্ন অবস্থার কথা জানিয়ে চিঠি লেখে। কিন্তু চিঠিটি পায় অমরেশ এবং অমরেশ জানতে পারে যে, মানসী সন্তান সম্ভবা। যাই হোক, মানসীর আশঙ্কা তাঁর সন্তান যদি এই বিষাত্ত(আবহাওয়ায় বাস করে সেও তার পিতার মতই পশুতে পরিণত হবে। তাই এই বিষত(কে সে দারিদ্রের মধ্যেই রাখতে চায়। অমরেশের কথায় - বিষের সঙ্গে অমৃত মিশেছে যেমন সোনার সঙ্গে মিশে থাকে খাদ। দুঃখের আগুনে সেই খাদকে পুড়িয়ে নিলে পাওয়া যাবে কাঁচা সোনা। এই কাঁচা সোনা পাওয়ার জন্য মানসী অমরেশের হাত ধরে বেড়িয়ে যায়। যাতে তাঁর দাদা যে ব্রত গ্রহণ করেছে অন্যায় অত্যাচারকে লুপ্ত করবার জন্য, সেই ব্রত পালনে সে যাতে দ্বিধান্বিত না হয়। পাছে মণিশঙ্কর যে মানসীর স্বামী একথা জানলে বিনায়ক-অমিতার ব্রত ভঙ্গ হবে। এখানে নাট্যকার মণিশঙ্করের অত্যাচারের রূপটিকেও দা(ণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যা মানুষের মনকে অবিচলিত থাকতে দেবে না। মণিশঙ্করের এই অত্যাচারের প্রতিবাদও করেছে গোকুলকাকা বজ্রনিনাদের মত, যা মণিশঙ্করের পাইক বরকন্দাজরাও অমান্য করতে পারেনি। ফলে মণিশঙ্কর তাঁর সংকীর্ণ নিম্ন (চির পরিচয়টি দিয়ে ফেলে মানসীকে ত্যাগ করার কথা উচ্চারণ করে। এই কথার প্রতিবাদে গোকুলকাকা বলে ওঠেন -

> ''গোকুল।।   হতভাগ্য, তাও বুঝলে না ?
> লক্ষ্মীকে যে ত্যাগ করতে
> চায়, সে দুর্ভাগার মুখের কথা
> শোনবার আগে, মা লক্ষ্মী
> আপনা হতেই তাকে ত্যাগ
> করে চলে যায়।''[১৯]

এর পরের পর্ব কাজল গাঁ যেখানে বিনায়ক-অমিতা বাগ্‌দী স্ত্রী-পু(ষদের ওষুধ বিতরণ করছেন। কারণ, তারা অনেক পিছিয়ে। তাদের, কাঁপুনী দিয়ে জ্বর আসলে তারা মনে করে যে বোধ হয় তাদের ভূতে ধরেছে। আবার কেউ দুঃখ দূর করার জন্য শরীরে কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মদ খায়। এই সব নানা কুসংস্কারের ও কুঅভ্যাসের হাত থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য বিনায়ক-অমিতা প্রাণপণ পরিশ্রম করে চলেছে। এরই মধ্যে বাগ্‌দীদের নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে নতুন স্কুল বাড়ীতে। আসলে ওটা স্কুল বাড়ী নয় ওটা মন্দির-'মান মন্দির'। যে মান মন্দিরকে মানসী গড়তে চেয়েছিল কলা-সংস্কৃতির ভবন রূপে সেই মানমন্দির আজ মানুষ গড়ার ভবনে পরিণত হয়েছে যা সম্পর্কে মানসী অজ্ঞাত। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দের কাছ থেকে

বিনায়ক জানতে পারে যে - কুসুমদিঘি পরগণাকে জব্দ করতে না পেরে সাহেব কুঠীতে যে ডাকাতি হয়েছে, সেই ডাকাতির মামলায় জড়িত করার মতলব আঁটছে জমীদার মহাপ্রভু অর্থাৎ মণিশঙ্কর। মণিশঙ্কর বিনায়ককে শেখরডিহি পরগণার ম্যানেজারের পদে চাকরি দেওয়ার লোভ দেখায় কিন্তু বিনায়ক তাতে রাজী না হয়ে জানায় যে - এ কাজ তাঁর নয়। মণিশঙ্করকে বিনায়ক সাবধান করে দেয় এবং অনুরোধ করে যে মণিশঙ্কর যাতে বাগ্‌দীদের ওপর অত্যাচার না করে। কিন্তু এর জবাবে মণিশঙ্কর বিনায়ককে চাবুক মারলে তার মুখ কেটে রত্ত(ঝড়তে থাকে। প্র(াদ বিনায়কের (ত সহ্য করতে না পেরে সবাইকে ডেকে নিয়ে বিদ্রোহ করতে চলে যায়। এরপরই দেখা যায় যে ভিজাগাপট্টমে গোকুলকাকা মানসীর কাছে এসেছেন এ কথা জানাতে যে মানসীর স্বামী মণিশঙ্কর মারা গেছে। বাগ্‌দীদের হাতে তাঁর অপমৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বিনায়ক প্র(াদ বাগ্‌দীকে বাঁচানোর জন্য নিজের ঘাড়ে সব দোষ নিয়ে জেল খাটছে। যদিও বিনায়কের এই অবস্থার কথা গোকুলকাকা মানসীকে বলতে চায়নি। তবে এই কথা শোনার পর, মানসীও তার শেষ কর্তব্যটুকু করতে ভোলে না। মানসী তাঁর সন্তান মন্টুকে নিয়ে চলে আসে চন্দনপুরে। এখানে এসে গোপনে সে তাঁর দাদাকে সাজামুক্ত(করে। ঘটনাত্র(মে বিনায়কও জানতে পারেন যে, তাঁর সাজা লাঘবকারী ব্যত্তি(টি হলেন তাঁর বোন মানসী এবং মণিশঙ্করই মানসীর স্বামী। আবার গোকুলকাকার চিঠি থেকে বিনায়ক জানতে পারে যে গোকুলকাকাই তাঁর বাবা। সেই সঙ্গে অমিতাও জানতে পারে যে তাঁর দাদা অমরেশ মানসীর কাছে সযত্নেই আছেন। যদিও তাঁর আশঙ্কাজনক অবস্থা কিন্তু এই অবস্থায় অমিতা যদি একদিনের জন্যও তার দাদাকে দেখতে যায় তাহলে অমিতার ব্রত ভঙ্গ হবে এবং অমরেশও তাতে অসন্তুষ্ট হবেন। মানসী চন্দনপুর এস্টেট মানমন্দিরের জন্য দান করে দেয় এবং তাঁর সন্তান মন্টুকেও এই ধূলি মাখা মানুষদের কাছে রেখে বিনায়ক ও অমিতার ওপর ভার অর্পণ করে চলে যায়। এই পর্বেও তাহলে অমিতা ও বিনায়কের কাছে তিনটে চরম সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। নাট্যকার এই নাটকের তিনটি অঙ্কেই সত্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। এই পর্বে মানসীর স্বীকারোত্তি(-

> ''মানসী।।   সত্যিই ভাই, তোমরা অসম্ভবকে
> সম্ভব করেছ। আমি কখনো
> কল্পনাও করতে পারিনি যে,
> ছন্নছাড়া দীন-দুখীদের অভাবের
> সংসারগুলিকে এমন ছন্দবদ্ধ
> কাব্যের মত সাজিয়ে গুছিয়ে
> তোলা যায়। আসবার সময়
> গোটা পল্লীটা ঘুরে দেখে এলাম।
> মনে হল যেন, এখানকার
> মাটীতে দাঁড়িয়ে জীবন্ত প্রাণের
> স্পন্দন অনুভব কর্চ্ছি।''[২০]

এ থেকে বোঝা যায় যে, মানসীর মানবিকতা বোধ জাগ্রত হয়েছে। তাই, উইল অনুযায়ী চন্দনপুর এস্টেটের উত্তরাধিকারীর অর্বতমানে যে এস্টেট রাধামাধবের দেবত্র হয়ে যাওয়ার কথা, সেই এস্টেটকে রাধামাধবের দুঃখী অনাথ ছেলে মেয়েদের জন্যই দান করে দেয় মানসী। তবে বিনায়ক ও অমিতা সত্যই মাটিকে বেশী ভালোবেসেছে। মাটির মানুষদের বেশী ভালোবেসেছে। মাটিকে তারা স্বর্গের চাইতে বড় মনে করেছে। মানসীও তাঁর ভুল শোধরানোর জন্য এই শি(াতেই শি(ত করতে চেয়ে তাঁর সন্তান মন্টুকে বলেছে -

> "মানসী।। যদি কখনো ঘুমের মধ্যে
> আমাকে হারিয়ে ফেল বাবা,
> কেঁদ না তা হলে, শুধু ঐ নিশান
> উঁচু করে তুলে ধরো। তোমার
> হাতের ঐ নিশান দেখে আমি
> বুঝব - আমার মাণিক আমায়
> খুঁজছে।"[২১]

কারণ, মাকে ডাকবার একমাত্র নিশানা হল ঐ তিন রঙ্গা নিশান। এই মা আসলে দেশ মাতা। এই ধরিত্রীতে রক্ত(বীজের মতো লাখো লাখো দেশ মাতার উদ্ভব ঘটুক - এই ছিল নাট্যকারে উদ্দেশ্য। এই মানসী তাঁর বয়সকালে করা এক ভুল থেকে শি(া নিয়ে, নিজেকে শুধরে নিয়ে, শেষ পর্যন্ত দেশের কাজেই আত্মনিয়োগ করেছে। কারণ তাঁর দাদা যদি রাজার ঐ(র্য ত্যাগ করে পথের ধুলোয় এসে দাঁড়াতে পারে, তাহলে তাঁর বোনও এই ধূলো মাটির দেশের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। এই ধূলো মাটির দেশ বিনায়ক-অমিতার মত মানসীর কাছেও স্বর্গের চাইতে বড় হয়ে উঠেছে। এখানেই নাট্যকারের দেওয়া নামকরণের সার্থকতা। সব শেষ দৃশ্যে নাট্যকার মন্টুর ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মাকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। 'মা' শুধু মন্টুর নয়, চল্লিশ কোটী ভাই বোনের হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজেছেন নাট্যকার। সবশেষে নাট্যকারের এই নাটক যে কতখানি সার্থকতা লাভ করেছিল তার প্রমাণস্বরূপ সজনীকান্ত দাসের বক্ত(ব্য উল্লেখযোগ্য। যা থেকে জানা যায় -

> 'জীবন রঙ্গমঞ্চের এই কঠিন কঠোর ব্যাপক অভিনয় নাট্য রঙ্গমঞ্চের সংকীর্ণ (ে ত্রে যে বাস্তবের কিছুটা মহিমা লইয়া প্রতিভাত হইতে পারে নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক শ্রীযুক্ত(মহেন্দ্র গুপ্ত ষ্টার থিয়েটারে 'স্বর্গ হতে বড়' নাটকে তাহা দেখাইতে স(ম হইয়াছেন। আশ্চর্য্য নিপুণতা দ(তার সহিত তিনি তাহার মহৎ হৃদয়াবেগকে উপভোগ্য দৃশ্যরূপ দিয়াছেন। এদেশের ত(ণ ত(ণী কিশোর কিশোরীদের দেশাত্মবোধ বিস্তারে তাহার এই কীর্ত্তি সহায়ক হইয়াছে।'

তথ্যসূত্র

১) মহেন্দ্র গুপ্ত নাটক সমগ্র, চতুর্থ খন্ড, দেজ, কলকাতা পাবলিশার্স, ১৩, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮ জুন ২০১০, জীর্ণ খাপে তী(্ন তলোয়ার, শ্যামল ঘোষ।
২) জীর্ণ খাপে তী(্ন তলোয়ার, শ্যামল ঘোষ।
৩) জীর্ণ খাপে তী(্ন তলোয়ার, শ্যামল ঘোষ।
৪) দেশ-পত্রিকা বিনোদন সংখ্যা।
৫) মহেন্দ্র গুপ্ত নাটক সমগ্র, চতুর্থ খন্ড, দেজ, কলকাতা পাবলিশার্স, ১৩, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮ জুন ২০১০, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য - পৃঃ ১৫৭ ।
৬) তদেব - প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য -পৃঃ ১৫৯ ।
৭) তদেব - প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য -পৃঃ ১৭৮ ।
৮) তদেব - প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য -পৃঃ ১৭৯ ।
৯) তদেব - প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য -পৃঃ ১৬৮ ।
১০) তদেব - প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য -পৃঃ ১৬৯ ।
১১) তদেব - প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য -পৃঃ ১৭০ ।
১২) তদেব - প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য -পৃঃ ১৭৬ ।
১৩) তদেব - প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য -পৃঃ ১৮১ ।
১৪) তদেব - প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য -পৃঃ ১৮২ ।
১৫) তদেব - দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য -পৃঃ ১৯৪ ।
১৬) তদেব - দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য -পৃঃ ১৯৫ ।
১৭) তদেব - দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য -পৃঃ ১৯৮ ।
১৮) তদেব - দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য -পৃঃ ২০১ ।
১৯) তদেব - দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য -পৃঃ ২১০ ।
২০) তদেব - তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য - পৃঃ ২২৩ ।
২১) তদেব - তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য - পৃঃ ২২৬ ।

আকরগ্রন্থ

১) মহেন্দ্র গুপ্ত নাটক সমগ্র, চতুর্থ খন্ড, দেজ, কলকাতা পাবলিশার্স, ১৩, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮ জুন ২০১০।

সহায়কগ্রন্থ

১) অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মাঘ -১৪১১, জানুয়ারী, ২০০৫।
২) পবিত্র সরকার, নাটমঞ্চ নাট্যরূপ, দে'জ, প্রথম অখন্ড সংস্করণ, কলকাতা, ১৪১৪, মার্চ ২০০৮।
৩) (ে ত্রগুপ্ত, বাংলা নাটকের আলোচনা, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা।
৪) (ে ত্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০৯।

৫) দেবনারায়ণ গুপ্ত, একশো বছরের নাট্য-প্রসঙ্গ, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - শ্রাবণ ১৩৮৯।
৬) অজিতকুমার ঘোষ, নাটক ও নাট্যকার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০।
৭) অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ১৯৮৫।
৮) অজিতকুমার ঘোষ, রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪।
৯) সনাতন গোস্বামী, বাংলা নাটকের আলোচনা, পুস্তক বিপনি।
১০) আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী এন্ড কোং, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৬০।
১১) দর্শন চৌধুরী, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৫।
১২) দর্শন চৌধুরী, 'উনিশ শতকের নাট্যবিষয়', গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা, ২০০৭।
১৩) দর্শন চৌধুরী, গণনাট্য আন্দোলন, ওরিয়েন্টাল বাইন্ডার্স, ১৯৯৪।
১৪) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, সপ্তম খন্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯২।

পত্র-পত্রিকা

২১) পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।
২৫) বাংলা নাট্য সংকলন, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি।
২৬) বঙ্গদর্শন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।
৩৩) নাট্যচিন্তা, প্রথম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮১।

পট: বাংলার একটি প্রাচীন লোকচিত্রকলা

বিকাশ সরকার
গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্রকলা হল মানস দর্পন, কারণ চিত্রকলার মধ্যে দিয়ে সমকালীন দেশ-কাল-সমাজের নানা রূপ ফুটে উঠে চিত্রকরের অসামান্য রং, তুলির স্পর্শে। আর এই চিত্রকলার ইতিহাস সুদূর প্রসারী। যার সৃষ্টির কোন সঠিক কাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই প্রাচীন চিত্রকলার সৃষ্টি হয় লোকসমাজে। এই 'লোক' হল সাধারণ মানুষ তবে তিনি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়। 'লোক' হল সমষ্টি, দল বা জাতি বদ্ধ মানুষ। যারা সুদুর প্রাচীন কালে নানা গুহা গাত্রে প্রথম চিত্রকলা সৃষ্টি করেছিলেন। যেগুলি মূলত ছিল নানা ধরনের পশু শিকারের চিত্র। তবে এই চিত্রই ধারাবাহিক বিবর্তনের মাধ্যমে 'কলা' বা 'শিল্পে' পরিণত হয়। আর এই চিত্রকলা লোকসমাজ অঙ্কন করত বলে এই চিত্রকলা হল 'লোকচিত্রকলা'।

পট একটি প্রাচীন 'লোকচিত্রকলা' এই চিত্রকলার সঠিক উৎস ইতিহাস জানা সম্ভব হয় না। তবে নানা প্রাচীন নির্দশনে এই 'পটচিত্রকলার' উল্লেখ পাওয়া যায়। যা থেকে পট একটি প্রাচীন লোক চিত্রকলা এর সত্যতা প্রমানিত হয়। আজকে আমরা বাংলা ভাষায় যাকে 'পট' বলে থাকি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রন্থে এই 'পট' অর্থে 'চিত্র' বোঝানো হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বস্ত্র খন্ডের উপর অঙ্কিত চিত্রই হল 'পট'। এই পট শব্দের অর্থ 'চিত্র' হিসাবে কবে থেকে প্রচলিত সে সম্পর্কে প্রদ্যোৎ ঘোষ তার Kalighat Pats: Annals and appraisal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন -

> *"The origin and history of pat painting is unknow. The term pat is found in vedic Language meaning mainly cloth. In the sence of picture the word is found in the Mahabharat (5th Century B.C.) and Katyana Sutra. The teachnique of the pat painting is discusses elaboretly in Arja-Manjushri-Mula-Kalpa on ancient Budhist text, which has already been translated in tibetan and chinise."*

আবার খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বৈকারণিক পানিনি সৃষ্টি সংস্কৃতিক ভাষায় 'পট' শব্দটি খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে এর অর্থ ছিল বস্ত্র খণ্ড। তিনি সংস্কৃত শ্লোকে স্পষ্টতই পটের কথা

উল্লেখ করেছেন। তিনি দুই ধরনের শিল্পীর কথা বলেছেন (১) রাজ শিল্পী, (২) গ্রামীন শিল্পী। এই গ্রামীন শিল্পীরা গ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী চিত্র অঙ্কন করত। এরা যে পটুয়া ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চানক্য কিছু সংখ্যক সাপুড়ে পটুয়াদের নিয়ে তার গুপ্তচর বাহিনী গঠন করেছিলেন সে কথা অষ্টম শতকের কবি বিশাখ দত্তের রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' গ্রন্থ থেকে জানা যায়।

চতুর্থ শতাব্দীতে চিন থেকে ভারতে আসেন চৈনিক পরিব্রাজক ফা-ফিয়েন তার ভ্রমণ কাহিনীতে রাজ পথে কাপড়ে আঁকা বুদ্ধদেবের পটচিত্রের উল্লেখ করেছেন।

মহামতি ভাষ রচিত 'প্রতিমা নাটক' এর মধ্যে পটচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার কবি সতেন্দ্রনাথ লিখেছেন:

'বাঙালী পটুয়া বাঙলার পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।'

আবার গুরুসদয় দত্ত লিখেছেন:

'ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে বাংলার পট সবচেয়ে প্রাচীন
ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।'

ড: ধ্রুব দাস পটের প্রাচীনত্বের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন:

'পটের প্রাচীন নিদর্শনটি পাওয়া গেছে মিশরে।'

এই পট চিত্রকলাও তার প্রেক্ষাপট বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপে এসে দাঁড়িয়েছে। বিবর্তনের ধারা অনেকটা এইরূপ:

গুহা পট
–
শিলা পট
–
তাম্র পট
–
পাতা পট
–
কাপড় পট
–
কাগজ পট

অর্থাৎ যুগও কালের স্বাভাবিক উপাদানকে প্রেক্ষাপটে করে পটচিত্র অঙ্কিত হয়ে চলেছে কালের ধারায়। এই পটের যেমন প্রেক্ষাপট বিবর্তিত হয়েছে কালের ধারায় তেমনি এর নানা আঙ্গি কেরও বিবর্তন ঘটেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে গান, কাহিনী, এর ফলে পর্ব একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পকলার রূপ লাভ করেছে। একদম প্রাচীন কালে গুহা, শিলা, তাম্র প্রেক্ষাপটে যে চিত্র অঙ্কন করা হত তাকে চিত্র বলা চলে, যা পটচিত্রকলার আদি উৎস বলে ধরা নেওয়া যায়। কিন্তু পাতায় যে সময় থেকে পট অঙ্কন শুরু হয় তখন থেকে পট তার পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় এবং পটচিত্র পটচিত্রকলা হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐতিহ্যগত ধারাবাহিকতা ও যুগের তালে বিবর্তন এই দুই ধারা নিয়েই পটচিত্রকলা এখনও বর্তমান।

যারা এই ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলার ধারক ও বাহক তাদেরকে বলা হয় পটুয়া। পটুয়া শব্দটি 'পট' শব্দের সাথে 'উয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উৎপত্তি হয়েছে। এখানে 'উয়া' প্রত্যয়টি দক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'পট' অঙ্কনে যারা দক্ষ তাদের পটুয়া বলা হয়। এই পটুয়ারা সুদূর প্রাচীন কাল হতে এই পটচিত্র কলা সৃষ্টি করে চলেছে। তবে এই পটুয়ারা বর্তমানে নানা পদবী ব্যবহার করে থাকে। যেমন: চিত্রকর, মালাকার, পটুয়া ইত্যাদি।

এক সময় সমগ্র বাংলায় ছিল পটুয়াদের বসবাস তারা বাংলার গ্রামে গ্রামে পটচিত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াত। গ্রামের মানুষদের পট দেখাত, কাহিনী ও গান শোনাত ও অর্থ উপার্জন করত। বর্তমানে সভ্যতা ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বাংলার সকল স্থানে তার পটুয়াদের দেখা যায় না, বা সকল স্থানের পটুয়ারা আর পট চিত্র অঙ্কন করে না। বর্তমানে বাংলার সে সকল স্থানে পটুয়া ও পটচিত্র দেখামেলে তার মধ্যে অন্যতম হল - পূর্ব মেনিদীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, কালীঘাট, পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া ইত্যাদি এই সকল স্থানেই পটশিল্পীরা এখনও বসবাস করে এবং তাদের সেই ঐতিহ্যবাহী শিল্পোকলাকে বহন করে চলে। তবে পূর্বও পশ্চিম মেদিনীপুরের শিল্পীরা পটকে নব আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করে চলেছে তার সুফল তারা বর্তমানে পাচ্ছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নয়াগ্রাম, পিংলা, এখানকার পটুয়ারা যথেষ্ট খ্যাতির সাথে পটচিত্র অঙ্কন করে চলেছে।

একটা সময় ছিল যখন সমস্ত বাংলার মানুষ পটচিত্র কি তা জানত। কিন্তু বর্তমানে অনেকেই জানে না পটচিত্র কি? অর্থাৎ পটচিত্র অবলুপ্ত প্রায় হতে বসেছে। পটুয়ারা পট দেখিয়ে, বা পটচিত্র বিক্রয় করে যখন তাদের সংসার চালাতে পারছিল না। তখন তারা এই শিল্প ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় নিজেদের নিযুক্ত করে, ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পটচিত্র অঙ্কন বন্ধ হয়ে যায় এবং কালক্রমে হারিয়ে যেতে বসে পটচিত্র। এর কারণ হিসাবে যার কথা বলা যায় তা হল — সভ্যতার বিবর্তন, মানুষের রুচির পরিবর্তন, দূরদর্শনের প্রভাব, বিশ্বায়ন, এই সকল কারণ, মানুষের সামনে চলে আসে নানা চোখ ধাঁধানো চিত্র যা থেকে মানুষ আর নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। আর এই প্রাচীন রংতুলির সাদামাটা পটচিত্রকলা সেই সকল চোখ ধাঁধানো চিত্রের কাছে হার মেনে যায়। ফলে ধীরে ধীরে অতল গভীর নিরুদ্দেশের পথের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে বাংলার ঐতিহ্যবাহী পটচিত্রকলা।

কিন্তু এটি একটি লোকশিল্প, যা লোকমানসে, লোকসমাজের ঐতিহ্যে প্রবাহমান। সেই কারণে সকল পটুয়া এই চিত্রকলাকে ছেড়ে দিতে চায়নি বা পারেন নি। তারা তাদের শত দুঃখ ও কষ্টের মধ্যেও এই পটচিত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। যার জন্যই আজও বাংলায় পটচিত্রকলা জীবিত আছে। নতুনভাবে পুনঃজন্মের পথ অনুসন্ধান করছে, মেদিনীপুরের পটুয়াদের হাত ধরে। এছাড়াও বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী নানা সংস্থা নানা প্রাচীন লোকশিল্পগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নানা রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা শিল্পীদের নানা ভাবে উৎসাহ দিচ্ছে, অনুদান দিচ্ছে, যার জন্য এই সকল লোকশিল্পীরা তাদের শিল্পের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে। অনান্য শিল্পের সাথে এই সুযোগ সুবিধা পটশিল্পের শিল্পীরাও পাচ্ছে। যার ফলে পটের শিল্পীরাও পটচিত্র অঙ্কনের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে।

শিল্পীদের এই আগ্রহ পটশিল্পের পুনঃপ্রচারের, পুনঃপরিচিতির দিক নির্দেশ করছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই আশা করা যায় আগামী অদূর ভবিষ্যতে বাংলার সমস্ত মানুষের কাছে এই পটশিল্পের কদর বাড়বে। বাংলার সমস্ত জ্ঞানীগুনী, বুদ্ধিজীবী মানুষেরা পটশিল্পকে চিনবে, জানবে এবং তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে। পটচিত্র শিল্প তার হারানো অতীত গৌরব ফিরে পাবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. রহমান মহঃ মতিয়র, পটুয়াগীত: সমন্বয়ী সাংস্কৃতির ধারা, লোকসংস্কৃতি ও আদিসাবী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৬।

২. বড়পন্ডা কুমার দীপক, পটুয়াসংস্কৃতির পরম্পরা ও পরিবর্তন, শতাব্দী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯।

৩. সাঁতরা তারাপদ, পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পী ও শিল্পী সমাজ, লোকসংস্কৃতি ও আদিসাবী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ২০০০।

৪. ভট্টাচার্য, অশোক, পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র, লোকসংস্কৃতি ও আদিসাবী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, জুন ২০০১।

৫. ঘোষ দীপঙ্কর, বঙ্গীয় শিল্প পরিচয়, লোকসংস্কৃতি ও আদিসাবী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, জানুয়ারী, ২০০৪।

৬. চক্রবর্তী বরুণ, লোকজ শিল্প, পারুল প্রকাশনী, ২০১১।

৭. ঘোষ বারিদ বরণ, পট পটুয়া পটগীত, লোকসংস্কৃতি ও আদিসাবী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ১৯৯২।

৮. ভট্টাচার্য মিহির, লোকশ্রুতি, লোকসংস্কৃতি ও আদিসাবী সংস্কৃতি কেন্দ্র তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, ১৯৯৯।

৯. নায়ক জীবেশ, লোকসংস্কৃতি বিদ্যা ও লোকসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০।

১০. www.amarbangla.com

১১. www.potomaya.com

বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

মহঃ আছের আলি শেখ

কালিক পর্যায়ের দিক থেকে যে তিনটি বিশ্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল তারমধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্ম অন্যতম। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতমবুদ্ধ। খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন যীশুখ্রীষ্ট। বৌদ্ধধর্ম যেমন তৎকালীন নীতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম, খ্রিষ্টানধর্ম তেমনি তৎকালীন আদর্শভ্রষ্ট ইহুদীধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম। G.galloway তাঁর "The philosophy of Religion" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে —

"After religion had run for long on the dead level of legal observances and mechanical performance, the spirits of the older prophets flamed forth a new in jesus and reached to heights before unknown."

অর্থাৎ "দীর্ঘকাল ইহুদীধর্ম প্রাণহীন যান্ত্রিক আচার বিচারের স্তরে আবদ্ধ থাকার পর মৃত মহাপুরুষদের আত্মিক শক্তি যেন নতুন করে যিশুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় এবং ধর্মকে যিশু এমন এক পর্যায়ে উন্নিত করেন যা মানুষ আগে কোনদিন চিন্তা করতে পারেনি।"

বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে চরিত্রগত কিছু মিল যেমন আছে তেমনি অমিলও আছে।

মিল বা সাদৃশ্য ঃ

বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন -

প্রথমত ঃ- বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মই ধর্মের প্রকৃতিগত বিচারে এবং আবেদনের দিক থেকে বিচার করলে বিশ্বজনীন। উভয় ধর্মই দাবি করে যে, তারা জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় সব রকম সংকীর্ণ গন্ডিকে অতিক্রম করে গেছে। ভিন্ন ধর্মের মানুষকেও এই দুটি ধর্মে দীক্ষিত করা চলে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই দুটি ধর্ম তাদের জন্মস্থানের ভৌগলিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচারিত হতে পেরেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ - বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মের নীতিতত্ত্বে দয়া, ক্ষমা এবং ভ্রাতৃত্বের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উভয় ধর্মই স্ব - স্ব প্রবর্তকের মহান ব্যক্তিত্বের উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধদেবের যে স্থান খ্রিষ্টানধর্মে যিশুখ্রিষ্টেরও সেই স্থান। ম্যায়েল এডওয়ার্ডসকে অনুসরণ করে বলা যায় —

"The heart of Buddhism is Buddha, the soul of Christianity of Christ."

অর্থাৎ "বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্মের হৃদয় আর যিশুখ্রিষ্ট খ্রিষ্ট ধর্মের আত্মা।"

তৃতীয়ত ঃ - দুটি ধর্মেই জীবের মুক্তির কথা বলা হয়। বুদ্ধ বলেন, 'আমার ধর্মীয় নিয়ম সবার পরিত্রাণের নিয়ম।" যিশুখ্রিষ্ট বলেন, 'তোমরা সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর পিতার নিয়ম অনুসরণ করলে তবেই পাপ স্খালন সম্ভব।"

চতুর্থত ঃ - দুটি ধর্মেই অপার্থিব অদর্শকে পার্থিব আদর্শ অপেক্ষা উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধমতে, জাগতিক বৈভবকে অবহেলা পূর্বক পরিত্যাগ করে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে, নৈতিক ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান হতে হবে। অনুরূপ ভাবে যিশুখ্রিষ্টও বলেন - "আধ্যাত্মিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলে সমগ্র জগতের সম্পদ হবে নিষ্ফল।"

অমিল বা বৈসাদৃশ্য ঃ

বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য যেমন আছে তেমনি অমিল বা বৈসাদৃশ্য তেমনি আছে। উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্যগুলি হল —

প্রথমত ঃ- যিশুখ্রিষ্ট নিজেই মুক্তিদাতা। যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী ঈশ্বরের হয়ে যিশুখ্রিষ্ট তাদের করুণা করেন, তাদের ক্ষমা করেন এবং তাদের মুক্ত করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব কখনোই বলেন না যে তিনি মানবের মুক্তিদাতা। বরং মোক্ষলাভের দায়িত্ব ব্যক্তিকে নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে, এই হল তার নির্দেশ।

দ্বিতীয়ত ঃ - বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টান ধর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল - মুক্তির ধারণাকে কেন্দ্র করে। বুদ্ধমতে - "মুক্তি হল দুঃখমুক্তি, আর এই মুক্তি লাভের পথ হল কামনা বাসনা পরিত্যাগ।" যিশুখ্রিষ্টের মতে -"মুক্তি হল পাপ মুক্তি, আর ঐ মুক্তি লাভের উপায় হল 'কামনা বাসনা সংযত করা, তাদের দৈহিক ভোগসুখে নিয়োজিত না রেখে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধনে নিয়োজিত করা। এ প্রসঙ্গে গ্যালোয়ে মন্তব্য করেছেন —

"Christianity does not seek to save men from the world, but from the sin which is the deepest source of human misery and degradation."

অর্থাৎ "বুদ্ধদেবের মুক্তির পথ মানুষকে জগৎবিমুখ করে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী করে। খ্রিষ্টের ধর্ম মানুষকে জগৎবিমুখ করার পরিবর্তে পাপ থেকে নিবৃত্ত করে, যে পাপ মানুষের দুঃখ কষ্টের অধঃপতনের মূল উৎস।"

অনুরূপভাবে মায়েল এডওয়ার্ডসও মন্তব্য করে বলেন, "The salvation of buddhism is deliverance from struggle, that of christianity victory in struggle."

অর্থাৎ "বৌদ্ধধর্মের মুক্তি হল সংগ্রাম থেকে মুক্তি, খ্রীষ্টানধর্মের মুক্তি হল সংগ্রামে জয়লাভ।"

তৃতীয়ত ঃ - প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে সমাজকল্যাণের প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি, ব্যক্তির দুঃখ মুক্তির কথাই বলা হয়েছে। 'নির্বান' অর্থে ব্যক্তি জীবনের আত্যন্তিক দুঃখ মুক্তি এবং এই মুক্তিলাভের দুর্গম পথে ব্যক্তির কোন সঙ্গী নেই, সাহায্যকারী নেই সে নিঃসঙ্গ ও একাকী। অপরদিকে, খ্রিষ্টধর্মে যে ঈশ্বরের রাজত্বের কথা বলা হয় সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি পরার্থে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত থেকে পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়।

চতুর্থত ঃ - বৌদ্ধধর্মে মূল অকল্যাণ হল দুঃখ এবং বৌদ্ধমতে অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই দুঃখ ভোগ করা। কাজেই অস্তিত্বই হল অকল্যাণ যার থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করা দরকার। বৌদ্ধধর্ম মতে বিষয়ের প্রতি আসক্তিই ব্যক্তির মধ্যে জন্মগ্রহণের বাসনা সৃষ্টি করে। জন্মগ্রহণ করার জন্যই মানুষকে দুঃখ কর্মের অধীন হতে হয়। অপরপক্ষে, খ্রিষ্টধর্মে অকল্যাণ হল

নৈতিক অকল্যাণ। এই অকল্যাণ দুঃখ নয়, পাপ। খ্রিষ্টানধর্ম মানুষকে জগতের হাত থেকে রক্ষা করতে চায় না, বরং যে পাপ মানুষের দুঃখ ও অবনতির কারণ তার থেকে মানুষকে রক্ষা করতে চায়। পাপ থেকে মুক্তি হল আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া , বাহ্য আচার অনুষ্ঠান পালন নয়।

গ্যালোয়ের মত অনুসারে, পরিশেষে বলা যায় যে, অন্যান্য ধর্মের তুলনায় খ্রিষ্টানধর্মের বিকশিত হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে অধিক মাত্রায় নিহিত, খ্রিষ্টধর্মের মহত্ব প্রকাশিত হয় তার বিকশিত হবার ক্ষমতার মধ্যে। তাই এই ধর্ম মানব জাতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেও এগিয়ে চলে এবং দুঃখপীড়িত মানুষের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনও মিটিয়ে চলে। গ্যালোয়ে বলেন —

"Only a religion which developes can be a truly Universal Religion."

অর্থাৎ কেবলমাত্র যে ধর্ম প্রগতিশীল, সেই ধর্মই যথার্থ বিশ্বজনীন ধর্ম হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

1) Miall Edwards - The Philosophy of Religion.
2) G. Galloway - The Philosophy of Religion.
৩) প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত — ধর্ম দর্শন।
৪) সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য — ধর্ম দর্শন।
৫) ডঃ বিমলেন্দু সামন্ত — ধর্ম দর্শন।

ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ধারা : উৎস থেকে মোহনা

মধুশ্রী বসাক

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই মানুষের জ্ঞান ও তথ্যের ধারক বাহক রূপে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগার শুধুমাত্র তার পাঠককে শিক্ষা , গবেষণা, চিত্তবিনোদন, অবসর যাপনেই সাহায্য করে না, মানব সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের প্রয়োজনে সমাজের দ্বারা এক সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রন্থাগারের উদ্ভব। বিশ্বায়নের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যবহারকারীর পরিবর্তিত চাহিদা মেটাতে পরিবর্তিত গ্রন্থাগার আজ নিজ ভূমিকায় স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন সময়ে ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মূল শব্দ : প্রাচীন ভারত, জ্ঞান ও তথ্যের ধারক, প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রন্থাগার, মধ্যযুগীয় ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

১. উপস্থাপনা :

মানব সভ্যতার বিকাশে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম হল গ্রন্থাগার। মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল থেকেই গ্রন্থাগার তার ভূমিকা পালন করে এসেছে। মনুষ্য স্মৃতির বিস্তার হল গ্রন্থাগার। মানবজাতির চিন্তা , ভাব, মনন, অনুভব ও সৃষ্টিশীল রচনাগুলিকে বর্তমান প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করাই গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য।

গ্রন্থাগার গঠিত হয় গ্রন্থ, মেধা ও আবাস দিয়ে। এছাড়াও গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় চতুর্থ উপাদান হল পাঠক। যার অনুপস্থিতি গ্রন্থাগারকে সমাধিস্থলে পরিণত করে। তাই গ্রন্থাগার একটি প্রতিষ্ঠান। একটি পদ্ধতি যা গ্রন্থ ও গ্রাফিক নথিপত্রের সংরক্ষণ ও ব্যবহার সহজ করে তোলে। সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থা গ্রন্থাগারের গঠনের গতিকে ত্বরান্বিত করে। কৌতুহলী মানুষ যাদের মন সক্রিয় ও অনুসন্ধিৎসু তারা গ্রন্থাগারে আসেন সামাজিক মেলামেশার উদ্দেশ্যে।

২. প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা :

প্রাচীন ভারতে সিন্ধু সভ্যতার কালে সঙ্কেত লিপি বা চিত্রলিপি বা গুহাচিত্রের প্রমাণ ধাতু বা পাথরের স্তম্ভে পাওয়া গেলেও তার সংরক্ষণের কোন উলে-খ মেলেনি। প্রাচীন ভারতে প্রথম গ্রন্থাগারের উলে-খ মেলে কৌটিল্যের সময়। সম্রাট অশোক (২৩৯ - ২৩২ বিসি) তার সময় পাথরের স্তম্ভে এবং শিলা গাত্রে তার প্রচার বা বাণী বিভিন্ন সড়কের ধারে প্রতিষ্ঠিত করতেন সেগুলি প্রথম সরকারী দলিল হিসাবে পরিচিত ছিল। যা তৎকালীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সূচনা করে। প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষার চর্চা কেন্দ্র হিসাবে নালন্দার বৌদ্ধবিহার

(৪০০ বিসি) অন্যতম যা প্রাচীন ভারতের জ্ঞানচর্চাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। নালন্দার বিশাল গ্রন্থাগার ধর্মগঞ্জ হিসাবে পরিচিত ছিল। তিনটি বৃহদায়তন প্রাসাদে রত্নসাগর, রত্নদধি ও রত্নরঞ্জক নামে তিনটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বৌদ্ধবিহারে পুঁথি নকল করার ব্যবস্থা ছিল। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর তথ্য অনুসারে প্রাচীন ভারতে কাশ্মীর, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি স্থানে বৌদ্ধ গ্রন্থাগারের উলে-খ পাওয়া যায়। এইসব গ্রন্থাগারে পাম পাতায় বৌদ্ধধর্মের কথা লেখা হত এবং সেগুলিকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হত। সমকালীন গ্রন্থাগার হিসাবে ভাগলপুরের নিকটবর্তী বিক্রমশীলা, বিহারের ওদন্তপুরি, উত্তরবঙ্গের সোমপুরি ও জগদ্দল মহাবিহারের নাম উলে-খযোগ্য। এই গ্রন্থাগার সংগ্রহ ছিল অতুলনীয়, সুসমৃদ্ধ ও বিশাল।

প্রাচীন ভারতের মঠ ও মন্দির গুলির সাথে গ্রন্থাগারগুলি যুক্ত ছিল না বৌদ্ধধর্ম এবং নানাবিধ বিষয়ের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাগণ নিজস্ব প্রাসাদে, রাজধানীতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক সাহায্যও করতেন। সমাজে গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা ছিল শাস্ত্রীয় গুণী পন্ডিতদের সমান। রাজারা গ্রন্থাগারের আর্থিক সাহায্য ছাড়াও গ্রন্থাগার সম্পদের সমৃদ্ধির দিকেও বিশেষ নজর দিতেন। তারা গ্রন্থাদি নকল করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং জ্ঞানচর্চা , পুঁথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, টীকা প্রণয়ণ ও পুঁথি সম্পাদনার জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। পুঁথি সংগ্রহের জন্য তারা বৈজ্ঞানীক পন্থাও ব্যবহার করতেন। রাজা, মহারাজাগণ, পন্ডিত, মুনিদের সাহায্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিকাশের উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

৩. মধ্যযুগীয় ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা :

৩.১ মুসলিম যুগ — মধ্যযুগীয় মুসলিম সাম্রাজ্যে ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। রাজারা নিজস্ব রাজপ্রাসাদে রাজকীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থাগারে তারা আরবি, ফারসি, ইসলামিক সংস্কৃতিচর্চা, বিদ্যাচর্চা, কাব্য সাহিত্য রচনা ইত্যাদির পাশাপাশি পুঁথি নকল, পুঁথি সংরক্ষণ ও পুঁথির বাহ্যিক উৎকর্ষতা সাধন প্রভৃতি কাজে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন যা মধ্যযুগীয় ভারতের সাংস্কৃতিকে এক অন্য মাত্রায় পৌছে দিয়েছিল। কবি জালালউদ্দিন খিলী (১২০৯) স্বচেষ্টায় একটি জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং আশীর খসরুকে তার গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। সেই সময়ের মুসলিম রাজা শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার আর্থিক অনুদানের দ্বারা একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে অনেক পান্ডুলিপি গ্রন্থাগার সম্পদ হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। কাশ্মীরের রাজা জৈন উল আব্দিন একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও বীজাপুর, গোলকুন্ডা, গুজরাট, খানদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের রাজাদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০৫৮ এ.ডি. কে রাম নারায়ণ চালুক্যরাজের সেনাপতি অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন যাদের মধ্যে চাটি, খালাসালা একটি বিশাল গ্রন্থাগার সহ আবাসিক মহাবিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই সময়ে কাগজ যথেষ্ট দূর্লভ ও মূল্যবান ছিল। ফলস্বরূপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পদগুলি পামপাতা অথবা পার্চমেন্ট পান্ডুলিপি হত। সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার

প্রচলন বিশেষ না থাকায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার সম্পর্কে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। গ্রন্থাগারের ব্যবহার শুধুমাত্র সমাজের কিছু উচ্চশ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

৩.২ মুঘল যুগ - মুঘল আমলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অপরিসীম উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। ১৫২৬ খ্রীঃ বাবর প্রথম মুঘল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বাবর তার গ্রন্থগারের সমস্ত পুঁথি চিত্রময় করে তোলে। বাবর তার গ্রন্থাগার সম্পদের সংগ্রহে তার পূর্বসুরির কাছ থেকে গৃহীত এমন কিছু পান্ডুলিপি রেখেছিলেন যা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বড়ই দুর্লভ এবং মূল্যবান। হুমায়ুন ছিলেন পন্ডিত ব্যক্তি ও গুণী গ্রন্থ প্রেমিক। তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী দিলী থেকে আগ্রাতে স্থানান্তরিত করেন। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশ্যে আকবর ফতেপুর সিক্রিতে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। আকবর তার রাজপ্রাসাদের গ্রন্থাগারে বহুসংখ্যক মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহের মাধ্যমে বিশাল ও সুসমৃদ্ধ করেছিলেন। আকবর পুঁথি অলঙ্করণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, জ্যোতিষ ও গণিত বিষয়ক রচনা আরবি ও ফারসিতে অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেন। মুঘল আমলে গ্রন্থাগারিককে নিজাম এবং সহ গ্রন্থাগারিককে বলা হত মুহাতিন বা দারোগ । গ্রন্থাগারে অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে ছিলেন বুক ইলাস্ট্রেটর, বুক বাইন্ডার, কলিগ্রাফার, কপিস্ট, ট্রান্সলেটর বুক বাইন্ডার ও গিল্ডার্স।

৩.৩ দাক্ষিণাত্য ভারত — মাইসোর, জয়পুর, দাক্ষিনাত্যের রাজাদেরও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ছিল চোখে পড়ার মত। টিপু সুলতান ও তার সাম্রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সমকালীন গ্রন্থাগার হিসাবে মাইসোর রাজ চিক্কাদেব রায়া (১৬৭২ - ১৭০৪ এ.ডি.), জয়পুরের মহারাজা সাই জয়সিং ইত্যাদির সংগ্রহ উলে-খযোগ্য। প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ১৫২৩ সালে তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব আজও বর্তমান। মধ্যযুগীয় ভারতে উজ্জয়িনী, বারাণসী, কাশ্মীর, নেপাল ইত্যাদি স্থানেও গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়।

৪. আধুনিক ভারতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ঃ

৪.১ প্রাক স্বাধীনতা পর্ব - আধুনিক ভারতে গ্রন্থাগারের বিকাশ শুরু হয় ব্রিটিশ প্রজাতির দ্বারা। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ দূর্গে প্রথম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ইউরোপিয়ান মিশনারীদের দ্বারা বাংলা সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে গ্রন্তাগারের উদ্ভবও হতে শুরু করে। ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রতিষ্ঠা করেন এশিয়াটিক সোসাইটি যা অধুনা ভারতের সংস্কৃতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্টউইলিয়ম যা একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল। ১৮৩৬ সালে রেফারেন্স এবং সার্কুলেশন লাইব্রেরী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী এবং কালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী একত্রীকরণ করে লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় ভারতে ১৯০২ সালে ইম্পেরিয়াল অ্যাক্ট পাশ হয় এবং ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী যা পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে পরিচিত পায়। এ বিষয়ে ভারতের কিছু উলে-খযোগ্য গ্রন্থাগারের নাম সারণী-১ এ প্রদর্শিত হল।

সারণী - ১

ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত গ্রন্থাগার

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থাগারের নাম	প্রতিষ্ঠার সাল
১	কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি	১৭৮৪
২	মুম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটি	১৮০৪
৩	হিন্দু কলেজ	১৮১৭
৪	শ্রীরামপুর কলেজ	১৮১৮
৫	মহারাষ্ট্রের নাসিক বিশ্ববিদ্যালয়	১৮৪০
৬	কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়	১৮৫৭
৭	ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী	১৮৫৯
৮	উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী	১৮৫৯
৯	মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি বিশ্ববিদ্যালয়	১৮৮২
১০	পাটনার খুদাবক্স লাইব্রেরী	১৮৯১
১১	মাদ্রাজের কোন্নেমারা লাইব্রেরী	১৮৯৬

ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারের পিছনে বরোদা রাজ্যের মহারাজা গাইওকারের যথেষ্ট অবদান লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর রাজ্যকে আলোর পথ দেখাতে তিনি প্রথম শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি এ রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন ও জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের সকল ধর্মের মানুষের জন্য তা উন্মুক্ত করে দেন। সাধারণ মানুষ যাতে সহজে ও সঠিকভাবে গ্রন্থাগার পরিষেবা পেতে পারে তিনি তার ব্যবস্থাও করেছিলেন। তিনি রাজ্যে মুক্ত ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন করেন। তিনি সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য আমেরিকার বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম বর্ডনকে ১৯১০ সালে Director of State Library এর পদে নিযুক্ত করেন। বর্ডনের ও গাইওকারের যৌথ উদ্যোগে ভারতে ১৯১১ সালে প্রথম স্থাপিত গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ স্কুল। যেখানে বরোদা রাজ্যে স্থাপিত গ্রন্থাগারগুলির কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

গ্রন্থাগার উন্নয়ণ সংক্রান্ত যে সমস্ত কনফারেন্স বা সম্মেলন এই সময় হয়েছিল সেগুলি হল -

* The first Conference of Library workers and personal inter ested in the movement was held a Beswada, Andhra in 1914.

* The first All Indian Library Conference of Librarians was held in 1918 at Lahore.
* The first All Indian Library Conference was held at Calcutta in 1933.
* The first All Indian Public Library Conference of Librarians was held at Madras in 1934.

৪.২ স্বাধীনোত্তর পর্ব - স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সাধারণ গ্রন্থাগারের অগ্রগতি ও প্রসারের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়ের উদ্যোগই লক্ষণীয়। শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগারকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তার উন্নতি প্রকল্পে অর্থও বরাদ্দ করা হয়। শিক্ষার হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৎকালীন সরকার সম্প্রসারণমূলক পরিষেবা, সামাজিক শিক্ষা, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা ইত্যাদির উপর জোর দেন এবং এর মূল দায়ভার পরে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ওপর বর্তায় ফলে ক্রমেই গ্রন্থাগার জাতীয় উন্নয়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়।

১৯৫০ সালে ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অন্যতম কোন্নেমারা লাইব্রেরী মাদ্রাজের State Central Library তে পরিণত হয়। ১৯৫১ সালে UNESCO তত্ত্বাবধানে প্রথম পাইলট প্রজেক্ট লাইব্রেরী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় দিলি- সাধারণ গ্রন্থাগার। ১৯৫৪ সালে Delivery of Books Act পাশ করা হয় যেখানে সংবাদপত্রকে সংযোজিত করা হয়। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক প্রকাশক তাদের প্রকাশিত পুস্তকের একটি প্রতিলিপি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বম্বের এশিয়াটিক সোসাইটি, মাদ্রাজের কোন্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরী এবং দিলি- পাবলিক লাইব্রেরীতে জমা করতে বাধ্য থাকবে।

১৯৫৭ সালে কে.পি. সিনহার নেতৃত্বে Advisory Committee for Libraries গঠিত হয়। এই কমিটি ১৯৫৯ সালে Model Library Bill পেশ করেন। ১৯৬৪ সালে প-্যানিং কমিশন গঠন করে Working Group of Public Libraries যারা ১৯৬৫ সালে 'Model Public Library Act' এর একটি রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৭২ সালে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম দ্বি শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে UNESCO -র সহায়তায় Department of Culture, Ministry of Education-র অধীনে স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজা রামমোহন র্রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হল দেশের সকল গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে উন্নতির জন্য ম্যাচিং গ্রান্ট এর আকারে আর্থিক সাহায্য করা এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নতির জন্য State Central Library এবং District Central Library গুলিকে সাহায্য করা।

১৯৮৫ সালে প্রফেসর ডি.পি. চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় National Policy on Library and Information System। এই কমিটি ১৯৮৬ সালের মে মাসে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, শিক্ষাশ্রয়ী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা, জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষেবা, গ্রন্থপঞ্জীমূলক পরিষেবা, উন্নয়ণ এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার আধুনিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। এ বিষয়ে

বিভিন্ন রাজ্যের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত পাবলিক লাইব্রেরী আইনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যভিত্তিক এই পাবলিক লাইব্রেরী আইনগুলির স্থাপনের সময়কাল সারণী - ২ এ উলে-খিত হল।

সারণী - ২

রাজ্যভিত্তিক পাবলিক লাইব্রেরী আইনের সূচনার সময়কাল

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্যের নাম	আইন প্রণয়ণের সময়কাল
১	তামিলনাড়ু	১৯৪৮
২	অন্ধ্রপ্রদেশ	১৯৬০
৩	কর্ণাটক	১৯৬৫
৪	মহারাষ্ট্র	১৯৬৭
৫	পশ্চিমবঙ্গ	১৯৭৯
৬	মণিপুর	১৯৮৮
৭	কেরালা	১৯৮৯
৮	হরিয়ানা	১৯৮৯
৯	মিজোরাম	১৯৯৩
১০	গোয়া	১৯৯৩/৯৪
১১	গুজরাট	২০০০/০১
১২	উড়িষ্যা	২০০১
১৩	উত্তরপ্রদেশ	২০০৫/০৬
১৪	উত্তরাখন্ড	২০০৫
১৫	রাজস্থান	২০০৫/০৬
১৬	পন্ডিচেরী	২০০৭/০৮
১৭	বিহার	২০০৭/০৮
১৮	ছত্তিশগড়	২০০৯
১৯	অরুণাচলপ্রদেশ	২০০৯

২০০৫ সালের ১৩ই জুন তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং এর নেতৃত্বে National Knowledge Commission বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি,শিল্পের জ্ঞানের গবেষণামূলক কার্যের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে বিশ্বে ভারতের স্থান নিশ্চিত করতে গঠিত হয়।

বর্তমানে উন্নয়ণশীল দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ সারির উপরিস্তরে অবস্থিত। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জেলাস্তরে বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগার, তথ্যকেন্দ্র ইথ্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেগুলি স্থানীয় মানুষজনকে সঠিত সময়ে সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করে থাকে। বহু গ্রামীণ গ্রন্থাগার বর্তমানে বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক পরিষেবার দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের শিক্ষা, বিনোদন, বৃত্তিগত চাহিদা মেটাতে সমর্থ হয়েছে। স্বাধীনতার ৬০ বছর পর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার সঙ্গে তথ্য প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটলেও এখনও অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারের চেষ্টা অব্যাহত।

৫. উপসংহার :

ভারতের রাজা মহারাজাগণ বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাদের রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্বুদ্ধ হন। সাধারণ মানুষ যাতে গ্রন্থাগারগুলি থেকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা পান, সেইদিকেও যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়। আধুনিক ভারতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির ধারা অব্যাহত ছিল। আগামী দিনেও এই অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে আমরা সকলেই আশা রাখি।

তথ্যসূত্র :

* B. Sengupta, B.C.(1981). Library Science and Librarianship, Calcutta: World Press.
* Public Library Acts in the States: a study. (1991), ILA Bulletin , 26 (4), 187-197.
* চট্টোপাধ্যায়, প.(১৯৮২). গণজ্ঞাপন, কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
* নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, অ. ভ. (১৯৯০). বিষয় : সাধারণের গ্রন্থাগার, কলকাতা; সাহিত্যলোক।
* পীযূষকান্তি মহাপাত্র, ভ.চ. (১৯৮৬). গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরিচয়, কলকাতা: ওয়ার্ল্ড প্রেস।
* মুখোপাধ্যায়, ব. (১৯৫৬). গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা, কলকাতা: কলিকাতা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।
* রায়চৌধুরী, প. (১৯৯২). পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ণের রূপরেখা, রঙ্গনাথন জন্ম শতবর্ষ কর্মশালা, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। আলোচ্য প্রবন্ধ (১৬-২০), কলকাতা; গ্রন্থাগার পরিষেবা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' : ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন

ডঃ মণিদীপা শিকদার

সারসংক্ষেপ :

ঐতিহ্য বলতে সাধারণভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় বয়ে চলা সংস্কার, আচার বিচার, নিয়ম কানুন, রীতিনীতি ও অনুশাসনকে বোঝায়। আর ঐতিহ্যকে রক্ষা করা বলতে বোঝায় দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সংস্কার ও নিয়মগুলিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বারা যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া এবং সেগুলির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। এই ঐতিহ্য শুধুমাত্র পারিবারিক নয়, প্রতিষ্ঠানিক হতে পারে। তবে এই প্রচলিত ঐতিহ্য মেনে চলার অর্থ পুরোনো নিয়ম লংঘন করতে না চাওয়া এবং নতুন ধরণের চিন্তাধারা - মানসিকতাকে অস্বীকার করা। অন্যদিকে আধুনিকতা বলতে বোঝায় নতুনত্বের প্রতি ঝোঁক, নতুন যুগের প্রতি আকর্ষণ। প্রচলিত পুরাতন মানসিকতা ও ধ্যানধারণাকে সরিয়ে নতুন যুগকে আহ্বান জানানো, সর্বক্ষেত্রে নতুনকে বরণ করে নেওয়া আধুনিকতার লক্ষণ। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'অচলায়তন' নামক তত্ত্বনাটকটির মধ্যেও একাধারে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা - এই দুই মানসিকতারই প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। মহাপঞ্চক হল স্থবিরতার প্রতীক। সে অচলায়তনের হাজার বছর ধরে চলে আসা প্রাচীন নিয়ম নীতিকে রক্ষা করতে চায়। আবার তার ভাই পঞ্চক হল মুক্তির প্রতীক, আধুনিকতার প্রতীক। সমস্ত রকম নিয়ম কানুনের মধ্যে দুধরণের মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে আর তার থেকেই এসেছে দ্বন্দ্ব। তবে শেষে রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই দুই মানসিকতার মেলবন্ধনও ঘটিয়েছেন দেখা যায়।

মূল শব্দ : ঐতিহ্য, স্থবিরতা, আধুনিকতা, মুক্তি।

মূল লেখা :

ঐতিহ্য বলতে সাধারণভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় বয়ে চলা সংস্কার, আচার বিচার, নিয়ম কানুন, রীতিনীতি ও অনুশাসনকে, মূল্যবোধ, ধর্মীয় আবেগ তথা মনোভাবকেই বোঝায়। আর ঐতিহ্যকে রক্ষা করা বলতে বোঝায় দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সংস্কার ও নিয়মগুলিকে সেই পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দ্বারা যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া এবং সেগুলির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। পূর্বপুরুষদের প্রচলিত পুরানো এই সংস্কার রীতিনীতি, অনুশাসনকে মেনে চলার মাধ্যমেই বংশের উত্তর পুরুষেরা ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখে। এভাবে ঐতিহ্যকে রক্ষা করার মাধ্যমে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে থাকে। এই বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যই

প্রত্যেক পরিবারকে সমাজে স্বাতন্ত্র্য মর্যাদায় ভূষিত করে। এই ঐতিহ্য শুধু মার্ত পারিবারিক নয়, প্রতিষ্ঠানিকও হতে পারে। তবে এই প্রচলিত ঐতিহ্য মেনে চলার অর্থ পুরোনো নিয়ম লংঘন করতে না চাওয়া অর্থাৎ নতুনকে মানতে না চাওয়া, নতুন ধরণের চিন্তাধারা - মানসিকতাকে অস্বীকার করা।

অন্যদিকে আধুনিকতা বলতে বোঝায় নতুনত্বের প্রতি আনুগত্য, নতুন যুগের প্রতি আকর্ষণ। প্রচলিত পুরাতন মানসিকতা ও ধ্যানধারণাকে সরিয়ে নতুন যুগকে আহ্বান জানানো, সর্বক্ষেত্রে নতুনকে বরণ করে নেওয়া আধুনিকতার লক্ষণ। নতুন মূল্যবোধ, বিচার, বিবেচনা, যুক্তিবাদী চেতনা ও মনন আধুনিক মনস্কতার মূল বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য - উপন্যাস - নাটকে - ছোটগল্পে কখনো ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যের বার্তা বহন করেছেন আবার কোথাও আধুনিকতার ধ্বজা উড়িয়ে তার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর 'অচলায়তন' নামক তত্ত্বনাটকটির মধ্যেও একাধারে ঐতিহ্য ও আধুনিকতা - এই দুই মানসিকতারই প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। বলাবাহুল্য শুধুমাত্র দুই মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে তাই নয়, দুই মানসিকতার মেলবন্ধনও ঘটেছে এই 'অচলায়তন' নাটকে।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নামক তত্ত্ব নাটকটি প্রকাশিত হয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনার এবং ধ্যানের ভারতবর্ষের রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি ভারতের ইতিহাসের সেই উজ্জ্বলতম যুগকে এই নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন যখন এদেশে জ্ঞান কর্ম প্রেমের পরিপূর্ণ মিলন সাধিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষের মহান আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই গুরুত্ব দিয়েছেন। এই নাটকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে। তবে তার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে আমরা তাঁর আধুনিক চেতনার, আধুনিক মনস্কতারও পরিচয় পাই এখানে। পাশাপাশি এটাও বলা যায় যে, ঐতিহ্য ব্যক্তিবিশেষের পছন্দ অপছন্দের ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু আধুনিকতাবোধ অনকেটাই ব্যক্তিনির্ভর। স্বাভাবিকভাবেই পুরাতনকে সরিয়ে নতুনত্বের আগমনে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এই নাটকেও তাই আমরা প্রথমে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই কাব্যিক সৌন্দর্য্য ছাড়াও তত্ত্বগত দিকটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই তত্ত্বের আড়ালেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনের সঠিক পথের সন্ধান দেন। এই নাটকের তত্ত্বের আপাত কাঠিন্যের আড়ালে তিনি জীবনের তাৎপর্য ও মুক্তির বাণী শুনিয়েছেন। কিন্তু এই দুটি দিক ছাড়াও তাঁর সব নাটকে সমাজ বাস্তবতার দিকটি যথেষ্টই তাৎপর্যবাহী। 'অচলায়তন' রাজ্যটি স্থবিরতার প্রতীক যেন রাজ্যটির চারধারে পাথরের প্রাচীর। আর এই পাথর বেষ্টিত রাজ্যে প্রাণের গতি যেন রুদ্ধ। গানের বিকাশে এই পাথরের প্রাচীর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই স্থিরতা ও স্থবিরতা রাজ্যে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বাধা পায়। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে নানা কুসংস্কার বাসা বাঁধে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই রাজ্যের বাসিন্দারা স্বাভাবিকভাবেই নানা আচার বিচারের বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়ে। তার ফলে তাদের মধ্যে মুক্তির কামনা বাসনাও জেগে থাকে না আর। হাজার বছর ধরে সেখানকার মানুষ একই কুসংস্কার, একই নিয়ম, একই বিধি নিষেধের বেড়াজালে বন্দী হয়ে থাকে। পাশাপাশি এটাও বলতে হয় যে, তারা এই বন্দীত্ব দশাই পছন্দ করতে শেখে, এর বাইরের

মুক্ত পৃথিবীকে তারা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে, অবজ্ঞা করে। মুক্তির আস্বাদ তারা বোঝে না। তাদের অন্তরে অন্তরে তা জাগেও না। তারা শুধু জানে শুধুমাত্র শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমেই বেঁচে থাকা। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আচার বিচার ও বিধি নিষেধের মধ্যে নিজেদেরকে বন্দী রাখতে অচলায়তনের অধিবাসীরা ভালোবাসে।

"অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মতো বজ্রের মতো শক্ত হয়ে জমে আছে।" পুঁথির নিয়মে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেই জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করতে চায় তারা 'পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই সব নানা রেখার গন্ডি, এই স্তুপাকার পুঁজি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি।"

এখানকার প্রধানরা এই সমস্ত আচার বিচার কুসংস্কারের ধারক ও বাহক। তারা হাজার বছরেও প্রথম ঊষার অন্ধকারকে নষ্ট হতে দেয়নি। সেখানকার সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যেও তাদের এই স্থবিরতার মনোভাবকে তারা প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে। এর দ্বারাই তারা চরম আত্মপ্রসাদ লাভ করে ও আরও বেশি জটিল মানসিকতার ধ্বজাধারী হয়ে ওঠে। নতুন যে কোন কিছুকে তারা পরিহার করতে চায়, অজানা অচেনাকে তারা ভয় পেয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। এরা সামনের দিকে তাকাতে চায় না, চলতে চায় না, আসলে এগিয়ে যেতে তারা ভয় পায়। এই রাজ্যের সবকিছুই প্রাচীনতার ইঙ্গিতবাহী। জড়াজীর্ণ এই নিয়ম ও কুসংস্কারগুলি এখানকার অধিবাসীদের পিছনের দিকে টেনে ধরে রাখে। তাই জড়তাগ্রস্ত ও স্থিতিশীল জীবনযাপন করে তারা এবং সেটাই তাদের কাম্য। প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবনকে তারা পরিহার করে কুসংস্কারকেই জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে রাখতে চায়। অচলায়তনের আচার বিলাসী অধিবাসীরা নিজেদেরকে বিভিন্ন বাধা নিষেধ ও কুসংস্কারের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী করে রেখেই জীবনের চরম উৎকৃষ্ঠতা লাভ করতে চায়। জীবনের আস্বাদ তারা পেতে চায় না। জীবনের প্রকৃত রূপ রং কী তারা জানতে চায় না। শুধুমাত্র প্রাণহীন রীতিনীতি ও নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সেখানকার প্রধানদের সাথে সাথে অধিবাসীরাও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে — 'ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয় ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় স্বর বসত্বানি' মন্ত্রটি প্রত্যহ সূর্যোদয় - সূর্যাস্তে ঊনসত্তর বার জপ করলে নব্বই বৎসর পরমায়ু হয়। চক্রেশমন্ত্র, শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচঞ্চুপরীক্ষা, ছাগলোমশোধন, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণই তাঁদের বেঁচে থাকার আশ্রয়।

এই নাটকে মহাপঞ্চক ও পঞ্চক দুই ভাই। কিন্তু দুই ভাই হলেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তারা দুই মেরুর বাসিন্দা। মহাপঞ্চক সংযম ও স্থিরচিত্তের প্রতীক। উপাধ্যায়, জয়োত্তম, বিশ্বম্ভর, সঞ্জীব - সবাই একই মানসিকতার অধিকারী। আচার্য, উপাচার্য, সুতসোম - সকলেই অচলায়তনের নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে বেশ সুখেই আছে। নিজেদের কর্মপদ্ধতির উপর তাদের বিশ্বাস অটুট - "আমাদের এখানে সেই প্রথম উপর বিশুদ্ধ অন্ধকারকে হাজার বছরেও নষ্ট হতে দিই নি। তারই পবিত্র অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হয়ে বসে আছি।" আচার্য নতুনত্বের আস্বাদ চান না, অচেনা পথে পা ফেলতে তার ভয় লাগে - "অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায়

তার অন্ত পাব? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত - এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায় - তার জন্য একটুও বাইরে যাওয়া দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি। .... আমাদের পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমদের আর চলবার শক্তি নেই।" উপাচার্য এই পাথরের মতো জীবনে শান্তি পায় - "এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছিনে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত।" আচার্য অদীন পুণ্য এই জ্ঞানসাধনার শিক্ষামন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহাপঞ্চক পিতার মৃত্যুর পর দরিদ্র হয়ে, সকলের অবজ্ঞা নিয়ে এই আয়তনে প্রবেশ করেছিল। সঙ্গে ছিল তার ভাই পঞ্চক। মহাপঞ্চক নিজের শক্তিতে সেই অবজ্ঞা কাটিয়ে অচলায়তনে নিজের স্থান সুদৃঢ় করেছে, নিজেকে সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অচলায়তনে সে আজ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করেছে। তারর পান্ডিত্যে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। তার কাছে সংগীতের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম - মন্ত্র তন্ত্র। গান শুনলে তার ররাগ হয় - 'সেটা কি খুব আনন্দ করবার বিষয়? তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হইবে? গানতো পাখিও গাইতে পারে।" বালক সুভদ্র অচলায়তনের উত্তরদিকের জানালা খুলে বাইরেটা দেখে ফেলে। কিন্তু উত্তরদিকের এই জানালা খোলা বারণ কারণ এক জটা দেবীর বসবাস। এতে মাতৃহত্যার পাপ হয়। তিনশো পঁয়তালি-শ বছর ধরে জানালাটা বন্ধ হয়ে আছে। মহাপঞ্চকের মতে - "আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।" প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তারর মত হল, "ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উলে-খ পাওয়া যায় না। একমাত্র ভগবান জ্বলনান্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়নে লিখছে অপরাধীকে ছয় মাস মহাতামস সাধন করতে হবে। .. আলোকের এক রশ্মিমাত্র সে দেখতে পাবে না। কেননা আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।" অতীতের ঐতিহ্য অনুসরণকারী একটি চরিত্র মহাপঞ্চক।

পঞ্চক হল প্রাণের প্রতীক। তার মধ্যে জীবনের নির্মল দিকগুলি প্রকাশিত। সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ প্রাণের অর্থহীন আচার - সর্বস্বতার রাজ্যে প্রথা ও কুসংস্কারকে খন্ডন করতে উদ্যোগ নেয় সে। নিশ্চল নিয়মের রাজ্যে নিশ্চিত শৃঙ্খলার মধ্যে হঠাৎ করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চায় পঞ্চক। প্রাণের প্রতীক সে অচলায়তনে মূর্তিমান বিদ্রোহ হয়ে দেখা দেয়। আধুনিক মানসিকতার অধিকারী পঞ্চক অচলায়তনে নতুন দিনের, নতুন চিন্তার আগমন ঘটাতে চায়। জড়তাগ্রস্ত পুরাতন ঐতিহ্যকে সে স্বীকার করতে চায় না। শাস্ত্রের যে নিয়ম মানুষের প্রাণের আবেগকে রুদ্ধ করে তাকে সে মানতে পারে না। নিয়মের মধ্যে অনিয়মের সূচনা করে সে।

পঞ্চকের এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, এই মুক্তির প্রতি একটা অদম্য আকর্ষণ অচলায়তনের নিশ্চিন্ত নিশ্চল জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পঞ্চম আচার্য অদীনপূণ্যের কাছে মহাবিস্ময়রূপে প্রতিভাত হয়েছে। তার অচলায়তনে আচার এবং প্রথাই গুরুত্ব পেয়েছিল। নিয়মের প্রাধান্য এবং প্রাণহীন আনুষ্ঠিকতা সেখানে আধিপত্য লাভ করেছিল। জ্ঞান ও বিদ্যার মুক্ত ক্ষেত্র পরিণত হয়েছিল কুপ্রথা ও কুসংস্কারের আঁতুড়ঘর। এই জড়তা আচার্যকে করে তুলেছিল শক্তিহীন, নিয়মরত দাসানুদাস মাত্র। তাকে বলতে শোনা যায়- "প্রথম যখন

এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা কিছু পাওয়া যাবে। সেইজন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠছিল। তারপর সেই সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম যে সিদ্ধি বলে কিছু একটা আছে .... আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পন্ডিত , তোর সব শাস্ত্রই তো পড়া হল, সব ব্রতই তো পালন করলি, এখন বল, মূর্খ কী পেয়েছিস। কিছু না কিছু .... আজ দেখছি এই অতিদীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিন করেছে। কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।" পঞ্চক শোন পাংশুদের সঙ্গে মেশে যাদের সবাই অত্যন্ত স্লে-চ্ছ বলে মনে করে। কিন্তু আচার্য পঞ্চককে নিয়ম ভাঙতে, ভুল করতে বাধা দেন না। পঞ্চক তার কাছে আদেশ চাইলে তিনি বলেন - "না, না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে - তুমি ভুল করো গে - আমাদের কথা শুনো না। আমাদের গুরু আসছেন পঞ্চক - তার কাছে তোমার মতো বালক হয়ে যদি বসতে পারি - তিনি যদি আমার জরার বন্ধন খুলে দেন, আমাকে ছেড়ে দেন, তিনি যদি অভয় দিয়ে বলেন আজ থেকে ভুল করে সত্য জানবার অধিকার তোমাকে দিলুম, আমার মনের উপর থেকে হাজার দুহাজার বছরের পুরাতস ভার যদি নামিয়ে দেন !"

পঞ্চকের চলা বাঁধা পথে নয়, কোন বন্ধন তার গতিকে রুদ্ধ করতে পারে নি। সে স্বচ্ছ দৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীকে দেখেছে, শাস্ত্র তাকে ঝাপসা করতে পারেনি। সে গেয়ে উঠতে পারে —

"ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে !"

প্রকৃতির সঙ্গে সে একাত্মতা অনুভব করে। তাই তো সুভদ্র উত্তরের জানলা খুললে পঞ্চক খুশি হয়ে ওঠে। কিন্তু পঞ্চক তার দাদা মহাপঞ্চককে খুশি করতে পারে না কারণ পঞ্চক গতির প্রতীক আর মহাপঞ্চক স্থিতির। গুরু অদীনপুণ্যের আয়তনকে মহাপঞ্চক সহ আরো কয়েকজন মিলে করে তুলেছে অচলায়তন।

এই নাটকে আমরা দেখি শোনপাংশুদের যাদের সাধনার পথ কর্ম। তারা কর্মের জয়গানের মাধ্যমেই উদ্দীপ্তকে পেতে চেষ্টা করে। তারা শুধু চলে প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে। স্থবিরতাকে তাদের অপছন্দ। জড়তা প্রাচীনত্বকে তারা মানতে চায় না। মন্ত্র তন্ত্রে রত শাসন তারা মানে না। তারা শুধু জানে গতিময় জীবনকে। তাদের রাজ্য অচলায়তনের একেবারে বিপরীত।

"যিনি — সকল কাজের কাজি, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর — নানারঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী।
তাঁর — বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা — যাই চলে আনন্দে,
ছুটি — পথের কাঁটা পায়ে দ'লে
সাগর গিরি লংঘি।"

কিন্তু উদ্দেশ্যহীন কর্ম মানুষকে সার্থকতা দিতে পারে না। শোন পাংশুরা সেই কারণে সম্পূর্ণতাা লাভ করতে পারে না। কারণ তারা জানে না যে গতির সঙ্গে স্থিতিরও প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে দৃঢ়তার।

দর্ভকেরা ভক্তিকেই তাদের মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা শাস্ত্র জানে না, আর কিছু মানে না, কেবরমাত্র ভক্তি দিয়েই পরামারাধ্যকে পেতে চায়। তাকে সংগীতের অঞ্জলি দেয়। প্রেম ও ভক্তিই তাদের মূলধন। কিন্তু এখানেও তারা পূর্ণতা পায়নি। কারণ এখানেও জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির মিলন ঘটেনি।

এরপরে আগমন ঘটে গুরুর। তিনি এসে সমস্ত সমস্যার সমাধান ঘটিয়েছেন। সমস্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করেছেন। তিনি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁর এ কাজের সঙ্গী পঞ্চক। আসলে পঞ্চকের হাত ধরেই এই নাটকে আধুনিকতার প্রকাশ। ঐতিহ্যের সবকিছুই তো অপ্রয়োজনীয় নয় আবার আধুনিকতার সবকিছুই বরেণ্য নয়। পঞ্চক অচলায়তনে আনল মুক্তির হাওয়া। প্রাচীনত্বের বেড়া ভেঙে নতুনত্বের আগমন ঘটল। যেখানে জ্ঞান, কর্ম ও ধনের প্রকৃত মিলন সম্ভব হয়েছিল। অচলায়তন থেকে অচলাবস্থার প্রস্থান ঘটল। পঞ্চক - মহাপঞ্চকের সমন্বয় সাধন মান আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের মিলন সাধন। শোনপাংশুদের চরিত্রের অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জিত হল এবং দর্ভকদের চরিত্রের ভুল ত্রুটিরও পরাভব ঘটল। তিনটি রাজ্য একটি রাজ্যে পরিণত হল। 'গুরু' রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি লক্ষ্যনীয় চরিত্র। এখানে দাদাঠাকুরই গুরু। যিনি সবারই ত্রাতা - সবাইকে মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন তিনি। পঞ্চকের জন্যই অধীনপুণ্যের স্বপ্ন সার্থকতা লাভ করল। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বের শেষে দুয়ের মিলন সাধিত হল।

গল্প

প্রতিদ্বন্দ্বী

তুলিকা সাহা

ঘড়ির কাঁটা ৭টা পেরোতেই সুচেতনার কপালে এই শীতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো। মহারানী কি ডুব মারলেন না কি আজ!? সুচেতনার মেজাজটা তেতো হয়ে গেল হঠাৎ। এই পার্বতীটাকে নিয়ে হয়েছে জ্বালা। যখন তখন বিবির কামাই আর তারপর তার ঘরের কেচ্ছার বিস্তারিত বর্ণনা শ্রবণ ইনিয়ে বিনিয়ে এবং বৈচিত্র্যহীনভাবে। আর সমাজ সেবা টেবার ধার ধারবে না সুচেতনা। ছাড়িয়েই দেবে এবার পার্বতীকে। দৃঢ়সংকল্প হয় সুচেতনা অন্য অনেক সকালের মতো। তারপর চিন্তা করে, এই টাকায় পার্বতীর মত কাজের লোক এই বাজারে কচ্চিৎ মেলে কিংবা নাও মিলতে পারে। নাহ! অবশ্য এই চিন্তাও আসে ওই অন্য সকালের মতই নিয়ম করে। এখন নির্মলের ব্রেকফাস্ট বানানো, লাঞ্চ প্যাক করে দেওয়া, নিজের খাবার গোছানো, স্নান - সুচেতনা আবার স্নানটা নমোনমো করে সারতে পারেনা এবং সবশেষে ন'টা দশের লেডিস স্পেশালটা কোনমতেই মিস না করা! সুচেতনা অসহায় বোধ করে। তবু ভাগ্যিস ছিল এই মাতৃভূমি ! কি দুর্দশাই না হতো তাহলে - এই টেনশনেও সুচেতনার মন অনির্দিষ্ট প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। সারা দিনরাতের এই যাতাযাতের সময়টুকু সুচেতনার নিজেকে রানী বলে মনে হয়। পৃথিবীটাকে পুরুষহীন মাতৃভূমি বলে ভুল হয়। কি মধুর ভুল। দীর্ঘশ্বাস আর প্রসন্নতা মিলেমিশে যায় সুচতেনার অবচেতনে। হঠাৎ ভোরবেলার আওয়াজ সুচেতনার আকাশ কুসুমকে এফোড় - ওফোড় করে দেয়। এক লাফে বিছানা ছেড়ে ওঠে মুখে একরাশ বিরক্তি আর স্বস্তির চোরাস্রোত নিয়ে সে দরজা খুলে দেয় পার্বতীকে।

"আসতে দেরি হয়ে গেল গো দিদি", কপাল আর থুতনি থেকে কুয়াশা আর চাদর সরাতে সরাতে বকবক করে সুচেতনার কাজের মেয়ে, "কাল মাঝরাত্তিরে মানুষটা আবার এমন শুরু করলে ....." ''তোমার মহাভারত পরে শুনিও" বাধা দেয় সুচেতনা। 'আগে চা আর ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দাদার দাড়ি কামানোর গরম জল আলাদা করে বাথরুমে রেখে এসে রান্না বসাও।'

পার্বতী রান্নাঘরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে নিঃশব্দে, দুরন্ত গতিতে।টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে ওর ক্ষিপ্র, ছিপছিপে শরীরের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে সুচেতনা। নির্মলদের অফিসের একটা গেট টুগেদারে নন্দিতার সাথে আলাপ হয়েছিল সুচেতনার। নন্দিতার প্রবল আকর্ষনীয় ফিগারে চোখ আটকে গিয়েছিল ওর। মিসেস পাকড়াশী ওর কানে কানে বলেছিল "She is in her 30`s ! নিজেকে কি maintain করে দেখেছো? কেউ বলবে ....." সেদিন আর সহজ হতে পারেনি সুচেতনা। ঈর্ষা করতে শুরু করেছিল নন্দিতাকে। পার্বতীকে দেখতে দেখতে সেদিনের সেই ঈর্ষার প্রচ্ছন্ন ছায়া পড়ে ওর চোখে। পার্বতী সুচেতনার ঠিকে ঝি। পার্বতীর স্বামী মদন কোন এক চটকলে কাজ করে। রাত্তিরে, কখনও সখনও মাঝরাত্তিরে, একগলা মদ গিলে বেহুঁশ হয়ে ঘরে ফেরে। আশ্চর্যের ব্যাপার, মদন

বেহুঁশ হয় বটে, কিন্তু বাড়ি ফেরার রাস্তা চিনতে মদনের ভুল হয়না একটুও। কোন কোন দিন নেশার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে অশ্রাব্য গালিগালাজে গোটা কলোনী মাথায় করে, ওদের পাঁচ বছরের ছেলে লাট্টুকে ধরে বেদম মারে। পার্বতী বাধা দিতে এলে লাট্টু আর পার্বতীর কোন ফারাক মদন করতে পারে না। মদনটা একটা জানোয়ার। তোয়ালেতে মুখ মুছতে গিয়ে মুখটা বিকৃত হয়ে যায় সুচেতনার। এসবই সে শুনেছে খোদ পার্বতীর মুখ থেকে। একবার তো সুচেতনা নিজে সমিতির মেয়েদেরকে নিয়ে পার্বতীদের কলোনীতে গিয়ে মদনকে চোখ রাঙিয়ে এসেছিল। এখানে বলা আবশ্যক সুচেতনা বেশ কিছু বছর ধরে ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ নামক একটি নারী কল্যাণ সমিতির কর্ণধারিকা। এখন পুরুষ বা নারী কে কার প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা আর কিছু সংস্থার নাম থেকে স্পষ্ট হয় না।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সুচেতনার কৌতুহলী চোখ পার্বতীর শরীরের আনাচে কানাচে কালশিটের সুলুক সন্ধান করছিল। ওই কালশিটে দাগগুলো মদনের পৌরুষের নীরব সাক্ষ্য। পার্বতীর মসৃণ ঘাড়ে একটা লালচে দাগও দেখতে পেল। সেটা মদনের অনাদরের দাগ না আদরের - ঘোর সন্দেহ হল সুচেতনার। ওই দাগটা যেন সুচেতনার গতজন্মের পুরনো স্মৃতি। আলগোছে নিজের ঘাড়ে একবার হাত বোলায় সুচেতনা। নির্মল গরম জল নিয়ে বাথরুমে ঢোকে।

“কাল রাত্রে কি হয়েছিল রে পার্বতী? মদন বুঝি ফের মদ গিলে ......” চায়ের কাপটা টেবিলে ঠকাস করে নামিয়ে রাখে সুচেতনা। “না তো কি! নেশা করলে মানুষটার আর কোন কান্ডজ্ঞান থাকে না। কি হুজ্জুতি ! যা দু পয়সা রোজগার করে তা ঘরে আসার আগেই ওই সর্বনাশা বোতলে উচ্ছুত করে দেয়। জ্বালিয়ে দিলে গো জীবনটা ....।

সুচেতনা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, “থাম তো। তোর কেবল মুখেই বড় বড় কথা। বকবক করবি আর পড়ে পড়ে মার খাবি। এভাবেই তো মদনের মত জানোয়ারগুলো প্রশ্রয় পায়। কতবার তোকে বলেছি আমাদের ওখানে যেতে। তোর সঙ্গে যে অন্যায় হচ্ছে তা সবাই জানুক, যাতে আর কোন মেয়ের সাথে এমনটা না হয়। দুদিন লকাপে থাকলেই সব নেশা উতরে যাবে। উত্তেজনায় হাঁপায় সুচেতনা। একবার অবশ্য পার্বতী দেখা করেছিল সুচেতনার সাথে ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’-এর অফিসে। কাজের খোঁজে গিয়েছিল লাট্টুকে কোলে করে। বলেছিল মাধ্যমিক ফেল আর খুব সেলাই জানে। সুচেতনা ফেরায়নি পার্বতীকে। বছর তিনেক ধরে পার্বতী সুচেতনার বাড়িতে রান্নার কাজে বহাল হয়েছে।

স্নান সেরে নির্মল প্রায় তৈরী। বেরোবে এখুনি। পার্বতীর গুছিয়ে দেওয়া লাঞ্চবক্স হাতে নিয়ে সুচেতনা শোবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। কি যেন খুঁজছে নির্মল। সুচেতনা নিঃশব্দে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা মেয়েলি রুমাল বের করে নির্মলের দিকে নিঃশব্দে এগিয়ে দেয়। ঈষৎ চমকে নির্মল রুমালটা অফিসব্যাগে ভরে নেয়। আবার ওরা খাবার টেবিলে এসে বসে মুখোমুখি। ওরা একসাথে নৈঃশব্দ সহযোগে ব্রেকফাস্ট সারে। সুচেতনা একটু বাদে স্নানে যাবে। খাওয়া সেরে ব্যাগ হাতে করে নির্মল অফিসে বেরিয়ে যায়। ওদের এই বারোশো স্কোয়্যার ফিটের ফ্ল্যাটে নির্মল, সুচেতনা আর নৈঃশব্দ একত্রে পাশাপাশি বাস করে। কি শান্ত নিস্তরঙ্গ এদের জীবন। পার্বতী প্রতিদিন বিস্মিত হয়। ওর নিজের জীবনের সঙ্গে একটা অযাচিত তুলনা ওর মনে এসেই পড়ে। ওর প্রায়ান্ধকার এককামড়ার

ঘর. গরিবী,মাতাল - নিষ্ঠুর স্বামী, অপুষ্টিতে ভোগা ছেলে, স্যাঁতসেতে কলপাড়, সবকিছু ওকে কেমন কোণ্ঠাসা করে দেয়। চারিদিকে শুধু অস্বাস্থ্য। চেতনাদিদি ওকে কতবার মদনকে ছেড়ে চলে আসার পরামর্শ দিয়েছে। ও নিজেও চরম দুঃখে পড়ে একথা ভেবেছে অনেকবার। লাট্টুর কথা ভেবে পারেনি। মদনের আত্মীয়স্বজন নেই কেউ। মদন এই পৃথিবীতে একেবারেই একা। মদন যদি মদ খাওয়াটা ছাড়তে পারত ! মদ খেলে ও অসহায় বোধ করে। মদ না খেলে মদন আরো বেশি অসহায় হয়ে যায়। পার্বতী ছাড়তে পারবে না মদনকে। লোকটার উপর লাট্টুর মতোই ওর কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে। তবু ওর বৌদিদির মতো সাজানো গোছানো সংসারের খুব সাধ। এমন সুন্দর ঘরবাড়ি, নির্মলদাদাবাবুর মতো এমন সুন্দর বর ...... পার্বতীও তো কুৎসিত নয়। বৌয়ের গায়ে হাত তোলা তো দূরে থাক, পার্বতী নির্মলকে কোনদিন গলা তুলে কথা বলতে শোনেনি। পার্বতীর পোড়া কপাল। কপাল বটে চেতনা বৌদির। অমন দেবতার মত স্বামী। স্নান ঘরে যেতে যেতে সুচেতনা পার্বতীর বিড়বিড়ানির শেষাংশটুকু শুনতে পায়। নির্মল দেবতাই বটে! অতি উচ্চমানের মাতাল অর্থাৎ মদ খেয়ে নির্মল কোনদিন মাতলামো করেনি এবং নির্মলের একটি অপ্সরাও বর্তমান। পার্বতীর ভাবনাটা আংশিক সত্য। বেশ কিছু মাস গলা তুলে কথা বলা তো দূরে থাক নির্মলের প্রয়োজনের বাইরে একটি কথাও বলেনি সুচেতনার সঙ্গে। ওরা বহুদিন হল আর ঝগড়া করে না। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ - এর কর্ণধারিকা তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারে না কোন এক অজ্ঞাত কারণে। নিরাবরণ হয়ে বাথরুমের বিশাল আয়নাটায় গাল চেপে ধরে চোখ বোজে সুচেতনা।

স্নান সেরে শোবার ঘরের আরো বড় আয়নাটার সামনে তৈরী হতে শুরু করে সুচেতনা। চায়ের গেলাস হাতে পার্বতী প্রশংসনীয় চোখে দেখে বৌদিকে। তারিফ করে বলে -“বৌদি কি ফর্সা গো তুমি ! যা পরো, তাতেই মানায়।” “আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে” সুচেতনা তাড়া দেয় পার্বতীকে। আর বকবক করতে হবে না, বাসনগুলো ধুয়ে কাজ গুছিয়ে নে, বেরবো এখুনি। পার্বতী রান্নাঘরে চলে যায়। সুচেতনা আড়চোখে পার্বতীর উন্নত বুক, কোমরের খাঁজ লক্ষ্য করে। “কপাল বটে তোমাদের বৌদি” - বেসিনে কাপ ডিশ ধুতে ধুতে বকবক করেই চলে পার্বতী। লেডিস এস্পেশালে কেমন আরামে যাবে, আসবে। আমাদের কলোনীর মেয়েগুলো সেই কোন সকালে কলে কাজে যায় ওদের আর মেয়েদের গাড়ি চাপা হয় না গো। সরকার যখন মেয়েদের গাড়ি দিল তখন আর দুটো গাড়ি বেশি দিতে পারলে নে! মেয়েগুলো বাঁচতো।” সুচেতনা চেঁচালো শাড়িতে সেফটিপিন লাগাতে লাগাতে, “খুব যে সরকারকে তেজ দেখাচ্ছিস; তোর বর যখন মদ গিলে তোকে ঠ্যাঙায় তখন তোর তেজ কোথায় থাকে রে ? দিতে পারিস না দু'ঘা।” পার্বতী শাড়িতে হাত মুছতে মুছতে সুচেতনাদের শোবার ঘরে এসে দাঁড়ায়। “তা কি আর দিই না ভেবেছ বৌদি? আমার গায়ে হাত দিলে আমিও চুলের মুঠি ধরে দিই ঘা কতক আচ্ছা করে। তারপর বড়ো ব্যাটাটা কি করে জানো?” পার্বতী ফিকফিক করে হাসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।

“কি করে ?” সুচেতনা ব্যাগ তুলে নেয় কাঁধে। “আমার পা জড়িয়ে ধরে লাট্টুর মতো হাউহাউ করে কাঁদে আর বলে, এবারকার মতো মাফ করে দে বউ। কাল থেকে আর নেশা করব না। যাস না কোথাও আমাকে ফেলে ....। “তারপর?” সুচেতনার কাঁধের

ব্যাগটা হঠাৎ খুব ভারী মনে হয়। তারপর আর কি! রোজ ভাবি লাট্টুকে নিয়ে ঘর ছাড়ব তা ওই বুড়ো ব্যাটা অমনি আদিখ্যেতা করে যে, খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ে পার্বতী। হাসিটা খুব অশ্লীল মনে হয় সুচেতনার। পার্বতীকে প্রায় টেনে বার করে দরজায় তালা লাগায় ও।

পার্বতী বলছিল, মদন ওর পা জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কাঁদে আর অমনি পার্বতী ওকে ক্ষমা করে দেয়। সারা শরীরে নন্দিতার গন্ধ মেখে অনেক রাতে বাড়ি ফেরে নির্মল। প্রতিদিনের নির্মল, একদিনও কি সুচেতনার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে পারে না। তাহলে সুচেতনাও পার্বতী হয়ে নির্মলকে এক মুহুর্তে ক্ষমা করে দিতে পারে। ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল সুচেতনার। হঠাৎ নারীকণ্ঠের প্রবল শোরগোলে সোজা হয়ে বসলো ও। সন্ধ্যাবেলার লেডিস স্পেশালটা মোটামুটি ব্যারাকপুরের পর থেকেই ফাঁকা হতে শুরু করে। এসময় গোল কিসের। সুচেতনা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ট্রেনের দরজার কাছেই জড়ো হয়েছে গুটিকতক যাত্রী বা যাত্রিনী। দরজার মাঝখানের দন্ডটা ধরে প্রাণপণে ঝুলছে একটা কালো রোগা মত লোক। লোকটার একটা পা শূন্যে দোদুল্যমান। একটু লক্ষ্য করলেই মালুম হয় লোকটা মাতাল। নেশার ঘোরে মারাত্মক ভুল করেছে সে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অন্যায়ভাবে লেডিস স্পেশালের কামরায় উঠে পড়েছে। বেশ তো উঠে যখন পড়েছে, এখন নেমে যেতে হবে। নাহলে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়ে ভুল সংশোধন করতে হবে। সাফ যুক্তি যাত্রিনীদের। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে। লোকটা ওইভাবে ঝুলতে ঝুলতেই তার মা বোন দের কাছে কাতর অনুনয় করে চলেছে। এই একটা ষ্টেশন, পরের ষ্টেশনই নেমে যাবে সে। লোকটা শ্রমিক শ্রেণীর, তায় মাতাল। একে মেয়েদের কামরায় একটা ষ্টেশনও অ্যালাউ করার ঝুঁকি কে নেবে। সুচেতনা ভিড় কেটে দরজার দিকে এগোতে চাইল। লোকটা তীব্রস্বরে কাঁদছে। ট্রেনের দরজায় পৌঁছতেই শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে যায় সুচেতনার। এই লোকটাকে ও চেনে। নোয়াপাড়া কলোনীতে সে একবারই মাত্র গিয়েছিল। তবু ভুল হবার নয়। আর সময় দিল বা নিল না সুচেতনা। ট্রেন অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটছে পূর্ণগতিতে। সুচেতনা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে লোকটাকে প্রচন্ড জোরে একটা ধাক্কা .....। সুচেতনা চোখ বুজল।

কে যেন কাঁদছে .... একটানা। সুচেতনা কান খাড়া করলো। গত সন্ধ্যের ভুল করে লেডিস স্পেশালে উঠে পড়া মাতালটির কান্না নাকি পার্বতীর স্বামী মদনের নেশা উতরানো কান্না? উহু, নারীকণ্ঠের কান্না। পার্বতী না? মদন কি আবার নেশা করে ঠ্যাঙাচ্ছে পার্বতীকে। নাকি পার্বতী এতক্ষণে খবরটা পেয়ে গেছে ...... ? কান্নার সুর চড়ছে। আর সহ্য করতে পারা যাচ্ছে না। সুচেতনা কানে বালিশ চাপা দেয়। কান্নার শব্দটা এবার সুচেতনার বাড়ির দোর গোড়ায় সুচেতনা ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়। ডোরবেল বাজছে। অস্থিরভাবে। যন্ত্রচালিতের মত ঘড়ির দিকে তাকালো সুচেতনা। ঘড়ির কাঁটা সাতটা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দরজার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে সে। এই শীতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করলো।

ফিরে দেখা

রণজিৎ প্রামাণিক

- সোমলতা ?

শ্যাম বর্ণের। তবে উজ্জ্বল নয়। গরিব ঘরে জন্মালে কালোই বলত লোকে। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুটের ঢ্যাঙা চেহারা। মুখ - চোখের চেহারা মাঝারি ধরণের। যতটা সুশ্রী, নামের গুণে তার চেয়েও ভালো। অন্তত রুদ্রজিতের কাছে। রুদ্রজিৎ তাই এই নামকে কখনো হ্রস্ব করেনি। বারবার উচ্চারণে যেন ঘনিষ্ঠ আবেশ খোঁজে।

কিন্তু ওপাশ থেকে কোন সাড়া শব্দ হয় না। রুদ্রজিৎ আবার বলে - সোমলতা তো?

- বলছি। আপনি ?

- গলা বুঝলে না? আমি রুদ্রজিৎ। কেমন আছ?

- ভালো । কিন্তু এতদিন বাদে? হঠাৎ কী মনে করে?

- তোমাকে খুব দরকার। একদিন দেখা হয় না?

- মেয়ে এখন ক্লাস ইলেভেনে। মেয়ের স্কুলেই এসেছি। তুমি ভালো আছো?

- একদিন তোমার মেয়ের স্কুলে আমিও তো যেতে পারি? কতদিন কথা হয়নি। তা বছর কুড়ি হয়ে গেল - তাই না?

সোমলতা রুদ্রজিৎকে বোঝে না। এত বছর বাদে এসব কেন? মুখে বলে - নম্বর পেলে কী করে?

- সে পেয়েছি। আসল কথা মনের চাওয়া।

- শোনো, আমার একটু তাড়া আছে। মেয়ের ক্লাস টিচারের সাথে কথা বলতে হবে। আমি রাখছি।

- ফোনটা রেখেই দিল সোমলতা। কী ব্যস্ত যেন! সত্যিই কি তাই? না কি রুদ্রজিতের সাথে কথা বলতেই চায় না? কোনো যোগাযোগ থাক চায় না। রুদ্রজিৎকে সে চোখে হারাত। সেই রুদ্রজিৎ কথা বলছে। তার রক্তে শিহরণ জাগানো রুদ্রজিৎ। তার এ জীবন, পর-জীবন, সাত-জীবন নাকি রুদ্রজিৎ। সোমলতা খুশি হল না?

- রুদ্রজিৎ বোঝার চেষ্টা করে। কয়েক মাস ধরেই সে লড়ছে। এ লড়াই ভেতরের লড়াই। একার লড়াই। ফোন করবে। কথা বলবে। কিছু না বলা কথা। না বললে স্বস্তি নেই। একটা অশান্তি বুকে করে বয়ে চলেছে। অনিঃশেষ দহন। পুড়ে খাক হয় রুদ্রজিৎ। সোমলতা কি আজও পোড়ে ?

এবার পুজোর ছুটিতে রুদ্রজিৎ তখন দেশের বাড়িতে। বরুণও এসেছিল। রুদ্রজিৎ আর সোমলতার প্রতিবেশী বরুণ। তাদের কেমিস্ট্রির অনুঘটক। চিঠি চাপাটি, খবরাখবর, মান-অভিমান সবই তো বরুণের দায়িত্বে। আর ছিল সোমলতার ছোট ভাই বোলান।

বরুণদের চারচালা মাটির ঘর। পশ্চিমের চালাটা বরুণের একার। টালির ছাউনির নীচে বাঁশের ঝাঁপের আবরণ। চালার বাইরেটাও বাঁশের ঝাপ দিয়ে ঘেরা। ভেতরের দিকে

মাটির দেয়াল। সেই দেওয়ালে ইঁদুরের বাস। মাঝে মাঝে সাপেরও। বর্ষায় প্রায় প্রতি বছর ওঝা এসে সেই গর্ত থেকে সাপ বের করে। কেউ কেউ বলে, কোমরে সাপ জড়িয়ে ওঝা ঘরে ঢোকে। ধরা সাপ আবার ধরে। টাকা কামায়। কয়েকশো টাকার দন্ড তো দিতেই হয় বরুণদের।

সোমলতা ভয় পেত। বরুণকে বারবার বলত গর্তগুলো ভাল করে বন্ধ করতে। তবু আসত। রুদ্রজিৎ তো থাকেই। এখানে কত নিঃস্তব্ধ সময় বয়ে গেছে। নিঃসাড়ে কত কথা বলাবলি। কত ছেলেমানুষি। ঘনিষ্ট বিকেল গড়িয়ে কখন যে সন্ধ্যে নামত। হুঁশ থাকবার কথা নয়। শাঁখ বাজলে চমকে যে যার বাড়ি ফেরা। প্রাণে শান্তি নিয়ে। অনেক পড়তে হবে সংকল্প নিয়ে।

সেই চালাটা আজ আর নেই। ভাঙা পড়েছে পুরো বাড়িটাই। দালানবাড়ি তুলেছে বরুণ সেখানে। বরুণ কোলকাতার চাকুরে। বরুণ ভাগ্যবান। সোমলতার শ্বশুরবাড়ির দেশে চাকরি করে। বরুণের দালানবাড়ি রুদ্রজিৎ ঘুরে ঘুরে দেখে। দুটো বেডরুম, রান্নাঘর, ডাইনিং আর পায়খানা বাথরুম নিয়ে আটশো স্কয়ার ফুট। নিজের হিম্মতে গড়েছে বরুণ। রুদ্রজিৎ ঘুরে ঘুরে দেখে। আর প্রশংসা করে। উদ্যোগপতি বরুণ খুশি হয়। খুশি তো হবারই কথা। একদা সাপেদের সাথে সহবাসী বরুণ এখন নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

চা এনে দিল বরুণের বৌ। খুব লক্ষ্মী বৌ পেয়েছে। চা খেতে খেতে রুদ্রজিৎ কথাটা বলল - সোমলতার সাথে দেখা হয়?

- ইচ্ছা করলেই দেখা করা যায়।
- দেখা হয়েছে ?
- তা তো হয়েছেই।
- অনেকবার ।
- তা বছরে তিন -চার বার তো হয়।
- আগের কথা বলে ? আমার কথা ?
- তোর কী মনে হয় ? সেসব বলা চলে ?

কথা বলতে পারে না রুদ্রজিৎ। খুব অভিমান নিয়ে চলে গেছে সোমলতা। শুধু কি বাইরেটাই দেখবে? তার ভেতরের কথা জানবে না ? রুদ্রজিৎ ভেবে সারা হয়। আসলে মানুষটা ভেতরে থেকে গেলে, বাইরে থেকে দেখাটা ঠিকঠাক হয় না। মন জানার জন্যই তো ভাষা। রুদ্রজিতের মন ভাষা হয়ে ফুটতে পারেনি। কেননা, রুদ্রজিৎ বিশ্বাস করত সোমলতা ঠিক তাকে বুঝবে। না বলা কথা মনের কানে শুনবে। অন্তত কিছু কথা বুঝে নিতে হয়। আসলে রুদ্রজিৎ সোমলতাকে কষ্ট মুক্তি দিয়েছিল।

- শোন, বরুণ। একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকেই গেল। কেউ কারোর কথা ভালো করে জানান হল না। হয়তো হবেও না কোনদিন। তবে চেষ্টাটা থাকা দরকার।

একটা করুণ অস্ফুট শব্দ করে রুদ্রজিৎ। ওর ভেতরটা কি ভেঙে পড়ল? না কি মনের বন্ধ কপাট শব্দ করে খুলে গেল। বরুণ বোঝার চেষ্টা করে। রুদ্রজিতের কথাগুলো বোঝে না। তবে মনোযোগী হয় আরো বেশী। রুদ্রজিৎ আপন মনে বিড়বিড় করে — যদি

একদিন দেখা হত। অন্তত কথা বলতাম।

বরুণ সান্ত্বনা দেয়। আর কেন? তোদের আলাদা সংসার হয়েছে। তোর ছেলে, সোমলতাদির মেয়ে হাইস্কুলে পড়ছে। নিজেদের মতো থাক না।

- খুব দরকার রে। তুই বুঝবি না।
- অতো বুঝে কাজ নেই। যা গেছে, তা গেছে।
- কয়েকটা কথা বলবার আছে। একবার দেখা হলে হয়।
- তা আর হয় না। ওসব ভাবনা ছাড়া।
- তুই কত দূরে থাকিস ?
- ওরা বেহালায় । আর তুই খিদিরপুরে।
- ফোন নম্বরটা জোগাড় কর।
- সোমলতাদির ?
- হুঁ। খুব দরকার।
- উলটো পালটা কিছু হবে না তো।
- আমরা সবাই সংসার পেতেছি। সোমলতা কুড়ি বছর। আর আমি ষোলো বছর। অতো ভাবিস না।
- কিন্তু ফোন নম্বরে কি হবে ?
- একবার কথা বলব। খুব যন্ত্রণা নিয়ে সোমলতা চলে গেছে। একবার কথা বলা দরকার।
- তাই বোধহয় তোর কথা একবারও বলে না। কী হয়েছিল ?
- সে অনেক কথা। তুই ফোন নম্বর এনে দে।
- সে এনে দেব। কিন্তু আমার কথা কেউ যেন না জানে। তাহলে ওবাড়ির দরজা বন্ধ হবে।
- তাতে আমারই মাথায় বাড়ি পড়বে। তুই নিশ্চিন্তে থাক।

সোমলতা আসে। সোমলতা চলে যায়। রুদ্রজিতের মনে। মনে মনে। কী যে মনে লাগা! কত যে খুনসুটি ! সেই কি ভোলা যায়? বাইরে একটা সংসার। ভেতরে আরেকটা। সব ছাপিয়ে ওঠে। রুদ্রজিৎ ভেসে যায়। বুদ্ধিমান রুদ্রজিৎ। সে কলেজে পড়ায়। কিন্তু নিজেকে পড়াতে পারে না। একটা ভুল পদক্ষেপ। কিংবা সঠিকই। সব শেষ করে দিল। সংসার আলাদা হওয়ারই ছিল। তবে ভালোলাগাটা বেঁচে থাকত। সব বিশ্বাস আর নির্ভরতাও বেঁচে যেত। সব হারিয়ে সোমলতা আজ ভেসে গেছে। ভেসে গেছে পাগলপারা সেই বোঝাপড়া।

এদিকে পুজো চলে গেল। পুজোতে রুদ্রজিৎ খুব আশা করেছিল তা সোমলতা জন্মভিটেতে আসবে। আসেনি। কাজের মানুষেরা কাজে ফিরে গেল। পুজোর পরেই শীত এল। শীত এল কাঁপুনি দিয়ে। হাড় হিম করা শীতের সময়ে সোমলতা আসে। রুদ্রজিতের ফিরে দেখা মনে। ভোরের ঘুম ভাঙা অবসরে। সকালের কুয়াশাভেদী রোদ্দুরের ওমে। না পড়ানো দুপুরের স্টাফরুমে। ম্যাগাজিন হাতে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যের পেছনে ফেরায়। শীতের নিয়মে শীত চলে যায়। শীতের উত্তর বসন্তের প্রার্থনা। আসে মধুমাস। আসে সোমলতা। চলে যাবার জন্যেই আসে। বারবার আসে। যত বার আসে, তত বার চলে যায়। থাকে শূন্য মাঠ। খাঁ খাঁ দুপুর। বাতাসে লু। মাটিতে ফাটল। পেরিয়ে জ্যৈষ্ঠের হাফবয়েল।

অথচ বরুণ তার কথা রেখেছে। দশটা ডিজিটে পুরোদস্তুর সোমলতা এখন রুদ্রজিতের ফোনবন্দি। ফোনের সেটটাও যেন জাতে উঠল। সুতরাং কৃতজ্ঞতা ফোন যায় বরুণের ফোনে।
- কী করে পেলি?
- ওর ভাইয়ের ফোন থেকে সরানো। আর কত নিচে নামাবি ?
- আমি তো তোকে মাথায় তুলে রাখি।
- আমি আমার কথা রেখেছি। এখন তোর দায়িত্ব।
- নিশ্চিন্ত থাক। আশা করি, গরমের ছুটিতে দেখা হবে তোর সাথে।
- অবশ্যই।
ফোনে বাঁধা আছে সোমলতা। রুদ্রজিৎ কথা বলবে। তালিকা তৈরী করে মনে মনে। কথামালার তালিকা। কোনটার পরে কোনটা। শুরুটাই বা কীভাবে ? কত কাটাকুটি। কত ভাঙা গড়া। জীবন, সম্পর্ক এবং কথামালাও।

আরো মাসখানেকের টানাপোড়েন। বাধার পাহাড়। সেই পাহাড়ে ঠেকে মেঘমালা। বৃষ্টি হয়ে ঝরে। সুতরাং বর্ষাও এসে গেল্ এই বৃষ্টি। এই রোদ্দুর। সেদিন অঝোরে বৃষ্টি। রুদ্রজিতের মেঘ ভারমুক্ত। তাই বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে ফোন।

কিন্তু ফোনের গলা টিপে মারে সোমলতা। সোমলতা কি সত্যিই মেয়ের স্কুলে ব্যস্ত - সময়ে ? রুদ্রজিৎ জানে না। রুদ্রজিতের কথা মালা হয়ে উঠতে পায় না। মন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। থিতু হবার সময় লাগে। কুড়ি বছর পার করে সোমলতা এখন তেতালি-শে। সোমলতার চেহারা কি ভেঙেছে ? বরুণ বলে, শান্ত আর গম্ভীর হয়েছে। পঁয়তালি-শের রুদ্রজিৎ ভাবে। ভাবার জন্যেই ভাবনা।

দুপুর যায়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়। রুদ্রজিতের সামনে নাইনে পড়া ছেলে পড়ছে। পাশের ঘরে বৌ সিরিয়ালে মগ্ন। কতদিন বাদে একটা ফোন। টুকরো টুকরো কথা। সোমলতা খুশি হয়নি ? রুদ্রজিৎ বোঝার চেষ্টা করে। সাত পাঁচ ভাবনায় ডুবে যায় রুদ্রজিৎ। সামনে রাখা ফোনের পর্দা জ্বলে ওঠে। ভেসে ওঠে কালো অক্ষরে সোমলতা। সোমলতা। ফোন হাতে রুদ্রজিৎ ঘরছুট। পায়ের নিচে কংক্রিটের রাস্তা। রাস্তায় টিমটিমে মফস্বলি আলো। ফোন নিভে গিয়ে আবার জ্বলে ওঠে। সোমলতা ফোন করেছে। সারাটা দিন দুশ্চিন্ত া আর লজ্জায় রুদ্রজিৎ কুঁকড়ে ছিল। সে সব সরে গিয়ে এখন ফুরফুরে। সপ্রতিভ হয়ে ওঠে। খুশির বাঁধ ভেঙেছে।
- সোমলতা, বলো।
- না, সোমা না। আমি ওর হাজব্যান্ড ফোন করেছি।

কী বদরাগী গলা ! ঝগড়া করবে নাকি ? সোমলতাকে ছেঁটে সোমা করে নিয়েছে। রুদ্রজিৎ তো ভাবতেই পারে না। কিন্তু রূপেশ কেন সোমলতার ফোনে ?
- দুপুরে সোমাকে ফোন করেছিলেন ?
- আপনি কেন ফোন করেছিলেন ?
- সোমাকে ফোন করেছিলেন কেন ?

- সেটা তো সোমলতাকেই বলতে চেয়েছিলাম।
- না, আপনার কিছু বলবার নেই। বলবেনও না। আপনার কোনো কথা সোমা শুনতে চায় না।
- সোমলতা বলেনি তো ?
- আমি বলছি। এটাই যথেষ্ট। আপনি স্বার্থপর। দায়িত্বজ্ঞানহীন। কেন ফোন করেছেন? যাকে ভালোবাসেন নি, তাকে কেন আবার ? আপনার সাথে এ বিষয়ে আমার কোন কথা নেই। আপনি ফোন রাখতে পারেন।

রূপেশের গলায় হুমকি। কংক্রিটের রাস্তায় হেঁটে চলে রুদ্রজিৎ। আবছা আঁধার ভারী হয়ে আসে। লোডশেডিং হয়েছে রাস্তায়। সোমলতা কেন নিজেই বললে না ? মাথার ওপর মেঘলা আকাশ। মেঘে ঢাকা তারা। বাতাসও ভারী খুব। বুক চাপা ব্যথা। তিরতির করে টাটায়। রুদ্রজিৎ ছলনা জানে না। তাই কথা বলা খুব দরকার হয়ে পড়েছিল।

ফোন থেকে মুছে যায় সোমলতা। রুদ্রজিৎ মোছে। কিন্তু গেঁথে যায় গহনে। সেইখানে রূপেশ চৌকিদার থাকে না। নিকষ অন্ধকারে ফিরে দেখা চির আমলতা জেগে থাকে।

ড্রাইভার

অনিত মুখার্জী

বাসটা চলতে শুরু করেছে প্রায় আধঘন্টা হলো। এই রুটে বাস খুব বেশী চলে না। এই বাসটায় তাই যাত্রীর ভিড় হয় খুব। সেই সকালে নিয়মমতো সময়েই বাসটা ছেড়েছে 'নবোদয়' হাসপাতালের পাশের বাসস্ট্যান্ড থেকে। এখনো বাসে তেমন ভিড় হয়নি তবে সামনের কয়েকটা স্টপেজ গেলেই ভিড়ে গমগম করবে বাসটা। আধা পাকা আধা কাঁচা রাস্তায় হেলেদুলে চলেছে বাসটা। তার ডানদিকের জানলা দিয়ে পূর্বের সূর্যের আলো এসে পড়েছে তার চোখে। রোদের তেজ এখনো তেমন বাড়েনি, কিন্তু বাড়বে একটু পরেই। কন্ডাক্টরটার গলার তেজ কিন্তু এখনই বেশ বোঝা যাচ্ছে। সামনে একটা ভ্যান রিক্সা রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে। হর্ন শুনেও সরছে না ব্যাটা। আর সেজন্যেই চড়েছে কন্ডাক্টরের গলা। চেঁচিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে যে রাস্তা না ছাড়লে ভ্যান - রিক্সার চালক আর তার পরিবারের সঙ্গে সে কি কি করে ছাড়বে। ওর মুখ ওরকমই। হাজারবার বারণ করেছে ওকে ওরকম মুখ খারাপ না করতে। কে শোনে কার কথা। যাইহোক রাস্তা পাওয়া গেল অবশেষে। বাসের হর্ন না কন্ডাক্টরের গলা কোনটায় কাজ হল সে জানে না। যাইহোক হেলেদুলে এগিয়ে চললো বাসটা।

সামনে নবীনপাড়ার স্টপ থেকে ওঠে একদল কচি কাঁচা। আধময়লা জামা কাপড় ও চোখে উজ্জ্বল আশা নিয়ে। কারো কারো মা হয়তো অনেক যত্ন করে চুলে তেল দিয়ে টেরি বাগিয়ে আঁচরে দিয়েছে। আবার কারো ভাগ্য হয়তো অতো ভালো নয়। তার চুলে সকাল সকাল জোটেনি মায়ের মমতার ছোঁয়া। সবার ভাগ্যে তো সমান জোটে না। তারই কি ভাগ্যে জুটলো ? না, কথাটা পুরোপুরি ঠিক না। মায়ের স্নেহ জোটেনি ঠিকই, কিন্তু মমতা - সেটা তো পেয়েছিল সে। পাশের বাড়ির দোলামাসি। সেই তো তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। সবসময় তাকে আগলে রাখতো দোলামাসি। ঠিক যেভাবে আগলে রেখেছে ওই ভদ্রমহিলাটি। প্রথম স্টপ থেকে উঠে বাঁদিকের দ্বিতীয় সারির জানলার ধারের সিটটায় বসেছে যে মহিলা। কেন জানে তাকে দেখতেও লাগছে দোলামাসির মতো। কে জানে হয়তো দুনিয়ায় সব স্নেহময়ী, মমতাময়ীর ওই একই রূপ। তার জন্মের সময় মারা যায় তার মা। তার তো এতে কোন দোষ ছিল না। কিন্তু তার বাবা কোনদিনও ক্ষমা করেনি তাকে। সেটাই বোধহয় তার জীবনের প্রথম অযাচিত ভুল। যে ভুলের প্রায়শ্চিত্য সে হয়তো কোনদিন করতে পারবে না। তাই তার জীবনে বাবা থেকেও নেই। অবশ্য বাবার ছোঁয়া যে সে পায়নি তা নয়। বহু রাতে মাতাল হয়ে যখন বাড়ি ফিরেছে বাবা, তখন তার কপালে জুটেছে বাপের ছোঁয়া। কখনো কখনো দু'তিন সপ্তাহ জুড়ে থেকেছে সে ছোঁয়ার রেশ। কখনো পিঠে, কখনো পেটে, কখনো হাঁটুতে। সেইসব দিনগুলোতেও তার একমাত্র মলম ছিল দোলামাসির হাতে স্নেহের গন্ধ। কিন্তু সেও তো বেশিদিন সইলো না কপালে। প্রায় একমাস ধরে ভুগে শেষে মারা গেল সে। জীবনে দ্বিতীয়বার মাকে হারালো সে। এবারেও বিনা দোষে। ওই যে

ছেলেটা দুষ্টুমি করছে জানলার ধারে কোলে বসে আর মাঝে মাঝে বকুনি খাচ্ছে জানলার বাইরে হাত বের করার জন্য, তার ভাগ্যেও কি একই পরিণতি জুটবে ? না না, তা হয় না। অভাগা তো আর সকলে হয় না, হয় তার মত কেউ কেউ। হঠাৎ কন্ডাক্টরের চেঁচানিতে চিন্তার জাল কাটলো তার। বাসস্টপ এসে গেছে। ব্রেক কষলো সে।

পিলপিল করে বাসে উঠলো একদল কচি কাঁচা। সবার শেষে উঠলো যে ছেলেটি, তার স্কুলব্যাগটা অনেক জায়গায় ছেঁড়া, তাপ্পি মারা। কে জানে কত হাত ঘুরে তারপর তার পিঠে জায়গা পেয়েছে ব্যাগটা। চেনটাও কাটা আর তার ফাঁক দিয়ে যেন উঁকি দিচ্ছে মনে হল একটা পেটকাঠি চাঁদিয়াল। ঘুড়ি ওড়ানোর বড় শখ ছিল তার ছোটবেলায়। আর এব্যাপারে তার সাকরেদ ছিল পল্টু। পিসিমার জার থেকে আচার চুরি করে তাকে খাওয়ানো আর তার ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া দু'ব্যাপারেই সমান পটু ছিল সে। ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারে তার যে পাড়ায় সুনাম ছিল বেশ। তার অনেকটাই বোধহয় পল্টু আর তার হাতের দেওয়া মাঞ্জার প্রাপ্য। আর কাটা ঘুড়ি তাড়া করে ধরার ব্যাপারেও পল্টুর সমকক্ষ ছিল না কেউ। কিন্তু শেষমেশ সেটাই যে কাল হল। মনে মনে অনেকবার ভেবেছে সে। কি হত যদি সেদিন সেই সুন্দর দেখতে পেটকাঠি চাঁদিয়ালটি যদি সে না কাটতো। তাহলে পল্টুও দৌড়াতো না কাটা ঘুড়িটা ধরার জন্য। আর তাহলে খালপাড় দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে পা পিছলে পড়তোও না সে জলে। বেচারা সাঁতার কাটতে যে কেন শেখেনি। সে নিজে তো দিব্যি সাঁতার কাটতে পারতো। শেখাতেও পারত সে অনায়াসে পল্টুকে। কিন্তু সে তো তা করেনি। করেনি বলেই তার জীবনে দ্বিতীয়বার অপর একটা মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী হল সে। অনিচ্ছাকৃত হয়তো, কিন্তু দায়ী তো বটে।

পাশ দিয়ে একটা মোটরভ্যান কালো ধোঁয়া ছাড়তে হর্ন বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। মনে মনে নিজেকে গালি দিল সে। এইসব চিন্তা করতে করতে নিশ্চয়ই বাসের স্পিড কমিয়ে দিয়েছিল সে। নাহলে কি করে ওই ভুটভুটিটা তাকে ওভারটেক করে বেরিয়ে যায়। দাঁতে দাঁত চেপে গিয়ার শিফট করে এক্সিলেটরটায় পায়ের চাপ দিল সে। আধমিনিটের মধ্যেই ভুটভুটিটাকে ওভারটেক করে ফেলল সে। সামনে এখন শুধু ফাঁকা রাস্তা। বাসের স্পিড আরো বাড়ালো সে। সামনের মোড়টা পেরোলে জনবসতি বাড়তে শুরু করলো। রাস্তার দুদিকে বসেছে বাজার হাট। হঠাৎ দূরে তার চোখে পড়লো একটা মসজিদ। মুহূর্তের জন্য একটু শিউড়ে উঠলো সে। সেই অনুভূতিটা তাহলে আজও হয়। তাদের গ্রামে গোটা পনেরো হিন্দু বাড়ির পাশেই ছিল বিশঘর মুসলমানের বাস। দিব্যি সুখে শান্তিতেই ছিল সবাই পাশাপাশি। হঠাৎ কোথা থেকে শোনা গেল হজরতবাল না কি। মসজিদ দেখলেই তারপর থেকে তার মনে ভেসে ওঠে ওই একটাই কথা। তখন মানে বোঝেনি সে। পরে শুনেছিল। বোঝার চেষ্টা করেছিল। কোথায় দূরে কাশ্মীরে নাকি কোন এক মহাপুরুষের, যিনি প্রায় দেড়হাজার বছর আগে বেঁচেছিলেন, তাঁর মাথার চুল উধাও হল, আর এত মাইল দূরে এতগুলো কুঁড়েঘর পুড়ে ছাই হল। মানুষের এই হাস্যকর যুক্তিবোধ যে কত মানুষের কান্নার কারণ হয়ে উঠতে পারে, তা নিজে অনুভব না করলে বোঝা দায়। হায় রে মানবজাতি, এই তোর বিচারবুদ্ধি আর এই বুদ্ধির জন্য তোর এত গর্ব !

আবার সেই কন্ডাক্টরটার হাঁক ডাকে বাস্তবে ফিরল সে। সামনেই কারখানা। সকালের শিফট শেষ করে বাড়ি ফিরছে শ্রমিকের দল কালি - ঝুলি মেখে। এই স্টপেজের পর থেকেই বাস একদম ভিড়ে গিজগিজ করতে থাকে। সবাই উঠে পড়লে কন্ডাক্টরটা দড়িতে টান দিল। টুংটুং শব্দে ঘন্টিটা বাজতেই আবার বাস স্টার্ট দিল সে। এরকমই একটা কারখানা। সেটাকে ঘিরে কত আশা, কত স্বপ্ন। ওই যে বাসের পাদানিতে দাঁড়িয়ে শরীরের অর্ধেকটা বাইরে ঝুলিয়ে পান খেয়ে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলো বার করে হাওয়া খাচ্ছে যে, ঠিক তেমনটা ছিল অমিয়। পাশাপাশি মেশিনে কাজ করতো দুজনে। মাথায় বুদ্ধি ছিল কম ব্যাটার, কিন্তু পুষিয়ে দিত গায়ের জোরে। কারখানায় ঢোকার প্রায় সপ্তাহখানেক পরে একদিন মেশিনে কাজ করতে করতে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল সে — "হ্যাঁরে, আমাদের কারখানার মালিক কি চীনে থাকে?" প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। তার মুখ দেখে বোধহয় অমিয় বুঝতে পেরেছিল সেটা। তৎক্ষণাৎ ব্যাখ্যা করে বলেছিল, - "না ওই যে গেটে ঢোকার মুখে রোজ পোস্টার দেখি। আজকে দেখলাম কয়েকজন গেটের পাশে দাঁড়িয়ে স্লোগানও দিচ্ছে।" শুনে এত হাসি পেয়েছিল তার যে প্রায় পাঁচমিনিট ধরে খিলখিল করে হেসেছিল সে। হ্যাঁ, সে আনন্দের, হাসির দিনগুলোর জন্যই তো এত পরিশ্রম, এত আয়োজন। বেশ লাগতো বক্তৃতা শুনতে। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় যাদের, কোন একদিন সেই অন্নবস্ত্রের সন্ধানে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে না আর তাদের। সেইসব সোনালী দিনের স্বপ্ন সফল করতেই তো এই সংগ্রাম। দিনেরবেলা লেদ মেশিন আর রাতেরবেলা সাদা কাগজে লাল কালি, কালো কালি আর তুলি। সেই তুলির টান দিতে দিতে স্বপ্ন দেখা। স্লোগান দিতে দিতে নিজেদের আত্মবিশ্বাসটা ঝালিয়ে নেওয়া। তারপর এল সেই রাত। অমিয়র কথায় - "চেয়ারম্যান সাহেবের জন্যই হল এসব। কি দরকার রে বাবা তোর। কারখানা করেছিস এখানে আর থাকছিস চীনে? এখানে একবার দেখা দিলেই তো হয়। আর এত ঝামেলা হয় না।" অমিয়র সরল কথায় সেদিন হাসতে ভুলে গেছিল সে। স্লোগানের মাঝে শোনা গেল সাইরেনের শব্দ। আর তার মুহূর্ত পরে হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কি। কি থেকে যে কি হয়ে গেল। আজ আর ঠিক মনেও পড়ে না। শুধু মনে পড়ে হাসপাতালের করিডোরে একগাদা মানুষের ভিড়ে কপালে, হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে পড়ে থাকা। তার বাঁহাতের ভাঙ্গা হাড়টা ঠিকমতো জোড়া লাগেনি আর কখনো। ঠিক যেমন জোড়া লাগেনি অটুট বিশ্বাসের ছিন্ন সূত্রগুলো। বাঁহাতটা তারপর থেকে আর কোনদিনই পুরোপুরি সোজা করতে পারেনি সে। হয়তো তার অচরিতার্থ বামপন্থী জীবনের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে সেই হাতটি এক গভীর ব্যঞ্জনায়। নিজের অজান্তেই সেই হাতটার দিকে চোখ চলে গেল তার। বাঁহাতে গিয়ার চেঞ্জ করল সে। না, এই হাতটা তার কর্মদক্ষতায় কোন থাবা বসাতে পারেনি। থাবা বসিয়েছে শুধু একটা আদর্শের প্রতি সরল আস্থায়। এক্সিলেটরে পা চেপে বাসের গতি বাড়ালো সে।

সূর্য এখন মধ্যগগন থেকে হেলে পড়তে শুরু করেছে পশ্চিমে। এই জায়গাটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। রাস্তার দুধারে ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে দু'একটি বাড়ি, গোলাঘর। একটু এগিয়েই সেই জায়গাটা। এক মানুষ সমান বা তারও একটু বেশী উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। একসময়ে কত মানুষের মিছিল, স্লোগান, গুলির শব্দ আর আহতের আর্তচিৎকারে

ভরা। আর এখন শুধুই শ্মশানের নীরবতা। দেওয়ালে এখনো কত পোস্টার লেগে আছে। 'উন্নয়ণ' শব্দটা জ্বলজ্বল করছে বিভিন্ন পোস্টারে। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। উন্নয়ণ আর কোথাও নেই আশেপাশে। আছে শুধু পোস্টারের ওই হরফে। পেছন থেকে হর্ন শুনে বাসটা বাঁদিকে চাপলো সে। পাশ দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে গেল একটা ধবধবে সাদা টয়োটা গাড়ি। এরকমই অনেকগুলো গাড়ির মালিক ছিল তার মনিব। তার মনে হত তিনি তাকে ভালোই বাসতেন বেশ। আর বাসবেনই না বা কেন। গাড়িতে কোনদিন একটা আঁচড়ও পড়তে দেয়নি সে। কিন্তু ওই যে, যেমন ভাগ্য করে এসেছে সে। সুখ বেশীদিন কপালে টেঁকে না আর টেঁকে না একজায়গায় বেশীদিন স্থায়ী হওয়া। প্রমোটারী করে হঠাৎ বড়লোক হওয়া মনিবের উচ্ছন্নে যাওয়া ভাইপো। ওই গাড়িতে আর কাউকে হাতে দিতে দিত না সে। কিন্তু মনিবের ভাইপো বলে কথা। সে চাইলে তো গাড়ির চাবি তুলে দিতেই হয় তার হাতে। উপায় কি। সামনের সাদা গাড়িটা ডানদিকে বাঁক নিল। ওদিকে এধরণের গাড়ি যাওয়ার একটাই গন্তব্য - 'নিরালা রিসর্ট'। তার পিছনের বাড়ির বুড়ো কানাইয়ের ছেলে কেষ্টার ভাষায় - 'বড়লোকের বৃন্দাবন'। মনিবের ভাইপোও হয়তো সেদিন রাতে ফিরছিল ওরকমই কোন রিসর্ট থেকে। তাতে কোন ক্ষতি ছিল না। ক্ষতি হল মাতাল হয়ে গাড়ি চালানোয়। ক্ষতি হল বড় রাস্তায় ঢোকার মুখে এক বৃদ্ধাকে চাপা দেওয়ায়। আরো বড় ক্ষতি হতে যাচ্ছিল তার। বেঁচে গেল মদনের জন্য। মনিবের গিন্নির গাড়িটা চালাত সে। কোথা থেকে যেন জানতে পেরে তাকে জানাল সে। বিদেশী এ.সি. গাড়ির কালো কাঁচের আড়ালে চালক কে থাকে, সহজে ঠাওর করা যায় না। তাতেই বেরিয়ে পড়ল সমাধান। ভাইপোকে বাঁচাতে বলি হবে ড্রাইভার। সহজ বিনিময়। সেদিন সে বুঝেছিল যে তার মতো লোকের প্রতি কারো ভালোবাসা থাকে না, থাকতে পারে না। তাদের মত লোক পৃথিবীতে এসেছেই শুধু অন্যের স্বার্থসিদ্ধির আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে। কখনো সে স্বার্থ পাড়ার মস্তানের লেবার ইউনিয়নের লিডার হওয়ার, কখনো উঠতি বড়লোকের ছেলের জেলের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার। তার মতো লোকেরা সারাজীবন শুধু ব্যবহৃত হবে আর পাঁচটা স্টেশনারী দোকানের জিনিসের মতো। ওখান থেকে রাতের বেলা পালিয়ে যাবার পর বহুমাস আতঙ্কে কেটেছে তার। আতঙ্ক প্রতি মুহূর্ত ধরা পড়ার। আতঙ্ক আরো একবার জীবনে নিজের দোষ না থাকা সত্ত্বেও সাজা পাওয়ার।

টুংটাং ঘন্টার শব্দ কানে আসায় ব্রেক কষে বাস দাঁড় করালো সে। আরো একটা স্টপেজ। এখন বিকেল। বাসের ভিড় অনেকটাই হালকা হয়ে এসেছে। স্টপেজে শেষ নামলো একটা মেয়ে। টুকটুকে লাল রংয়ের একটা শাড়ী পরনে, পাড়টা সবুজ। মাথায় সিঁদুরের পরিমাণ আর হাতে ঝকঝকে শাখা পলা দেখে মনে হয় সদ্য বিবাহিত। তার ঠিক আগেই নামলো যে ঘিয়ে রংয়ের পাঞ্জাবী পড়া লোকটা তারই নামের সিঁদুর নিশ্চয়ই মেয়েটার সিঁথিতে। সুমিত্রার কথা মনে পড়ে গেল তার। অনেকদিন থেকেই মনে মনে তাকে ভালবাসতো সে। বহুবার সামনাসামনি বলতে চেয়েছে, সাহস পায়নি। নেহাৎ পাড়ার খোকন, ঝন্টু, মানস এরা মিলে মেসোমশাইকে বুঝিয়ে ....। নাহলে আর তার মতো বাপ মা হীন অজ্ঞাতকুলশীলের সাথে লোকে মেয়ের বিয়ে দেয়। বিয়ের পর প্রথম দেড় বছর ছিল একেবারে স্বপ্নের মতো। মনে হয়েছিল এবার বোধহয় সুখের দিন স্থায়ী হবে। স্থায়ী হবে

বাসঘর। কিন্তু না, এবারেও বিধাতা বাধ সাধলেন। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেল সে। ঠিক তার মায়ের মতো। হয়তো সে সত্যিই অপয়া। বাবা তো তবু দোষারোপ করার জন্য তাকে পেয়েছিল। সে কাকে দোষারোপ করবে? তার ছেলেও যে মৃতই জন্মালো। আবার। আবার সে নিজের অনিচ্ছাকৃতভাবে দুটি মৃত্যুর জন্য দায়ী হল। কবে যে এই পালা শেষ হবে। হয়তো তার নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

"আরে ওস্তাদ থামাও গাড়ি। ঝড়ের মতো চলছো কোথায় ?" - কন্ডাক্টরটার কথা কানে আসায় থমকে গেল সে। গাড়িটাকেও থমকে দাঁড় করালো সে। সত্যিই তো, বাস এখন পুরো ফাঁকা। শুধু সে আর কন্ডাক্টর। আর কন্ডাক্টরটা এখানেই নেমে যাবে। এরপর মহামায়াতলায় গাড়ি গ্যারেজ করার রাস্তাটুকু তো সে একা। 'গুডবাই বস' বলে কন্ডাক্টরটা লাফিয়ে নামলো বাস থেকে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনটা ভারী বিষন্ন হয়ে উঠলো তার। ভারী ডাকাবুকো ছেলে। ঠিক যেমন ছিল প্রমোদ। সুমিত্রার মৃত্যুর পর তার বহুবার ইচ্ছে হয়েছে সুইসাইড করার। করতে পারেনি প্রমোদের জন্য। সুমিত্রা মারা যাবার পর প্রত্যেক সন্ধ্যায় সে তার বাড়িতে আসতো। রাত পর্যন্ত চলতো তাসখেলা। যখনই সে মরার কথা তুলেছে, তাকে দাবড়িয়ে শান্ত করেছে প্রমোদ। সেই প্রমোদ কিনা শেষ পর্যন্ত ....। না, জগতে তার মতো শ্রেণীর লোক যারা, তাদের সাহসী হওয়া মানায় না। তারা জন্মেছেই অন্যের লাথি ঝাঁটা খেয়ে রাতে বিছানায় কুঁকড়ে শুয়ে থেকে মৃত্যুকামনা করার জন্য। সেখানে প্রমোদ কিনা ..... ? ওপাড়ার ষোল বছরের কিশোরীটাকে কারা যেন ধর্ষন করে গলার নলি কেটে ফেলে গেছিল মাঠে। পুলিশ এল, মন্ত্রী এল, টিভি চ্যানেল এল। পুলিশ প্রশ্ন করল, খাতায় নোট করল, চলে গেল। মন্ত্রী ভাষণ দিল, টাকা বিলালো, চলে গেল। টিভি চ্যানেল সাক্ষাৎকার নিল, টি.আর.পি বাড়ালো, চলে গেল। কেউ চেষ্টা করল না অপরাধী ধরার। চেষ্টা করছিল প্রমোদ। সে চেষ্টা শেষ হল যখন ওই একই মাঠে একদিন ভোরবেলা তার মুন্ডুহীন ধড় আবিষ্কার হল। ওকে অনেক বুঝিয়েছিল সে। বুঝিয়েছিল অত সাহসী, ডাকাবুকো না হতে। শোনেনি প্রমোদ। তার অপয়া ভাগ্যের দোষে তার কাছের সব লোকই দূরে চলে যায়। প্রমোদও গেল। আরো একটা মৃত্যু। আরো একটা দায়িত্ব।

হঠাৎ উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির হেডলাইট চোখে পড়লো তার। ঘোরটা যেন কাটলো তার। সূর্য অস্ত গেছে প্রায়। চারদিকটা প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। যদিও এখনো তেমন গাঢ় নয়। সামনে ঝোলানো আয়নায় নিজের মুখটা দেখল সে। আবছা আলোতেও তার কপালের বলিরেখাগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। আজকে বড্ড ক্লান্ত লাগছে তার। এখনো কিছুটা রাস্তা বাকি গাড়ি গ্যারাজ করতে। এই রাস্তাটুকু সে একা। কত লোক সারাদিনে বাসে উঠলো, নেমে গেল। দিনের শেষে সে সেই একা। ঠিক তার জীবনের মতো। বড় ক্লান্ত লাগছে এখন। এই শেষ রাস্তাটুকু এইভাবেই কাটবে, ভাবলো জীবনপুরের বাস ড্রাইভার। স্মৃতির ভারে আজ বড়ই ক্লান্ত সে।

জনমদুঃখিনী

কল্পনা মন্ডল (বিশ্বাস)

আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। কাজের লোক বলতে তিন্নি। তিন্নিকে আমরা আমাদের মেয়ের মতই দেখতাম। বিশেষ করে আমি। আমার কোন সন্তান না থাকার কারণে বা ওর দুঃখের কারণে হোক। শুনেছি ওর মা নাকি বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে কোন কারণে বাপের বাড়ী চলে আসে। পরে ওর মা গ্রামের কোন এক বিবাহিত ছেলের সঙ্গে প্রেম করে এবং তার অবৈধ ফসল হল তিন্নি। মা আর মুখ দেখাতে পারত না। তিন্নির বাবা তিন্নি আর তার মাকে নিজের বাড়ীতেও রাখতে পারছে না। কারণ ওর বাবার আগের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আছে। তাই তিন্নির মা তিন্নিকে নিয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকত। বাপের বাড়ী আর ক'দিন ? বৌদিদের মুখ ঝামটাও সহ্য করে থাকতে হত। বাচ্চা মেয়েকে বাপের বাড়ী রেখে ওর মা লোকের বাড়ী বাড়ী কাজ করতে যেত। পরে কোন কারণে ওর মা আত্মহত্যা করে। তিন্নি তখন খুব ছোট্ট। তাই কারণটাও ভাল জানত না।

তা যাই হোক, তিন্নির জীবনটা আমি আর কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না। ওকে যখন আমি আমার মেয়ের মত দেখি তখন ও বাড়ীতে কাজ করলেও ওর জীবনটা আমি গড়ে দেব। বয়স কতই বা হবে বড় জোর চৌদ্দ থেকে পনের। আমরা তিন বৌ মিলে যে ওকে ভাল বাসতাম সেটা তিন্নির মামাবাড়ীতেও জানত। ওর মামারা ভাবত তিন্নিকে নিয়ে আমাদের আর কোন চিন্তা নেই। ওরাই তিন্নির সব ব্যবস্থা করে দেবে বিয়ের।

আমার ছোট জা ইতিমধ্যে কোথা থেকে এক সম্বন্ধের কথা তুলেছে। তবে আমি বলেছি, সব দেখে শুনে তবেই আমি তিন্নির বিয়ে দেব। ছোট আমায় বলল, তুমি কি একাই তিন্নিকে ভালবাসো আমরা কি বাসিনা। যেখানে ভাল মনে করব সেখানেই আমি ওর বিয়ে দেব। ছোটকে বললাম ভাল তো তবে একটু দেখে শুনে।

তিন্নির আজ নাকি বিয়ে। কদিন হল ও কাজেও আসছে না। আমি কিছুই জানি না, কি করে কোথা থেকে এ বিয়ে ঠিক হল। শুনে ছুটে গেলাম। তিন্নিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম। তুই কি ছেলেকে দেখেছিস? কে এনেছে এই সম্বন্ধ? তোর মামারা কেউ? তিন্নি অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর উত্তর দিল ছোট মা। ছোট মা। কই আমাকে বলল না তো একবারও। বলবে কি করে কেমন যেন গোপন রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

তিন্নির বিয়ে হয়ে গেছে। অষ্ট মঙ্গলায় এসেছে। সঙ্গে এসেছে ওর শ্বশুর, যদিও বা কারণটা পরে বুঝলাম। তিন্নির শ্বশুর আমায় বলল - আমি কখনো চাইনি ছেলের বিয়ে হোক। মাত্র তিন দিনের জন্যে তীর্থে গেছি, এসে দেখি ছেলের মা ছেলেকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছে। বার বার বলেছি এই পাগল ছেলেকে যেন বিয়ে না দেয়। তবে কি তিন্নির কপালটা আবার পুড়লো। তিন্নির শাশুড়ী ভেবেছিল ছেলের বিয়ে দিলে নাকি ছেলের পাগলামি বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে মাস ছয়েক কেটে গেল। কোন কিছুই কি হল না। ওষুধ খেলে ক্ষণিকের সুস্থ, যেমন বিয়ের দিন বিয়ে করতে এসে বিয়ে হয়ে যাওয়া মাত্রই চলে যাওয়া এটাই নাকি

ওদের নিয়ম ছিল। কারণটা যদিও এখন স্পষ্ট। তিন্নিকে এখন বাপের বাড়ী বলতে মামার বাড়ীতে আসতেও দেখা যায় না। ওর জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হয়। তবে আমার বোনের শ্বশুর বাড়ী পাশের গ্রামে। বোন যখন আমার বাড়ী বেড়াতে আসতো তখন তিন্নি দেখেছে বোনকে কয়েকবার। বোনকে ফোনে বলি তিন্নির খোঁজ নিতে। যেতে বলি তিন্নির শ্বশুরবাড়ী এবং বোন যায় আর তিন্নির সাথে কথাও হয়।

তিন্নিকে ওর স্বামী ও শাশুড়ী মারধর করে ও অসহ্য হয়ে উঠেছে। ও নিজের অনেক কথা জানায়। বোনের কাছ থেকে ফোনে সব শুনি। আমি এখনও মেয়েটাকে দেখিনি ওই অষ্টমঙ্গলায় ছাড়া। ওর মুখের দিকে নাকি আর তাকানো যায় না। আর কবে ওকে দেখবো তাও জানি না। ওর জন্য মনটা ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এখন আমি ভাবলাম জীবনের এখনো অনেক কিছু বাকি কিছুই শেষ হয়ে যায় না। ওকে আমি বাইরে কোথাও নিয়ে চলে যাব। আমার মাসিরা তো দিলি- থাকে। ওখানেই যদি ওকে নিয়ে গিয়ে ভালো পরিবার দেখে বিয়ে দিই। তিন্নির শ্বশুর এতে রাজীই হবেন উনি খুব ভালো মানুষ। আমি সব ব্যবস্থা করে দুটি টিকিটি কাটলাম দিলি-র। বোনকে বললাম সবটা এবং ওকে দায়িত্ব দিলাম তিন্নিকে আমার কাছে এনে দিতে একটি জায়গায়। তিন্নি আমার কথা শুনলে না করবে না। একছুট দিয়ে চলে আসবে। বোন ওকে চুপি চুপি আনতে গেছে। তিন্নির শ্বশুর বাড়ীর কাছে পৌঁছাতেই দেখল। ওর শ্বশুরবাড়ী এত লোকজন কেন ? জানলাম তিন্নি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বোন আমায় ফোন করে বলল তিন্নি আত্মহত্যা করেছে সবটা শুনে আমার মধ্যে আমি আর নেই। তিন্নিকে আমি পারলাম না শেষ রক্ষা করতে। শুধু ছোটকে ডেকে বললাম জেনে শুনে তিন্নিকে তুই এরকম .... ? এটাই কি তোর তিন্নির প্রতি ভালবাসা !

একাকী একান্তে

নন্দদুলাল কর্মকার

অনন্যা তখনও মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়নি, পাশের পাড়ার মৈনাকের সাথে প্রাইভেট মাষ্টার মহাশয়ের বাড়িতে পড়তে যেতে যেতে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। অনন্যার কোনদিন যেতে বিলম্ব হলে মৈনাক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, অনন্যা মৈনাককে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে কি ব্যাপার এখানে কি করছো ? মৈনাক বলে না কিছু নয় চলো আমাদের বোধহয় আজ দেরিই হয়ে গেল। এইভাবে লেখাপড়া চলতে লাগল। গড়তে থাকল দুজনের বন্ধুত্বও। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলে দুজনের দেখাদেখি আগের মতন প্রতিদিন আর হয় না। অনন্যা বাড়িতেই থাকে। মৈনাক অনন্যাকে না দেখে বেশিদিন থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে অনন্যাদের পাড়ায় আসে, ছেলে বন্ধুদের সাথে গল্প করে কখনো অনন্যার সাথে দেখা হয় কোন কথা হয় না, চোখাচোখি হলে কেবল মুচকি হাসি বিনিময় হয়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল অনন্যা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু মৈনাক দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক এক স্কুলেই ভর্তি হয়েছে, ছেলে ও মেয়েদের একসাথেই ক্লাস চলে। এখন প্রতিদিনই দুজনের দেখা ও কথাবার্তা চলে। অনন্যার ততটা টান মৈনাকের প্রতি না থাকলেও মৈনাক অনন্যার আরো কাছে আসতে চায়। মৈনাক একদিন বলে অনননন্যা আমার সাথে চলো একটা ভালো জায়গায়। অনন্যা অবাক হয়ে বলে তোমার সাথে ভালো জায়গায় সে আবার কোথায় কেন? ভালো লাগবে আর সেখানে আরও অনেক লোক থাকবে, যে কোন একদিন স্কুল কামাই হবে। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময়েই আমরা ফিরে আসবো। তা কি করে হবে কেউ যদি আমাদের দুজনাকে একসাথে দেখে বাড়িতে বলে দেয় তখন কি হবে? কেউ দেখবে না আমরা এই মদনপুর থেকে অনেক দূরে থাকব, কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না। তুমি বাড়ি থেকে সামান্য কিছু খেয়ে এসো আমরা হোটেলে খাবো। মৈনাক তোমার কথায় আমার ভীষণ ভয় করছে। আরে না কোন ভয় নেই তুমি দেখে নিও কেউ জানবে না। ঠিক হয় পরের দিন দুজনায় স্কুল পালিয়ে বেড়াতে যাবে। অনন্যার মনে কিছুটা ভয় এবং কিছুটা চিত্তচাঞ্চল্য কাজ করছে। স্কুল থেকে বাড়িতে এসে কেমন যেন অন্যমনস্কতা কাজ করছে অনন্যার মনে। টয়লেটে ঢুকেও অন্যমনস্ক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে মা ডাকছেন অনন্যা টয়লেট হলো কি করছিস ভাত নিয়ে বসে আছি। মায়ের ডাক শুনে চেতনা ফেরে অনন্যার। এই আসছি মা বলে বাইরে এসে ভাত খেতে বসেও একই অবস্থা সামান্য খেয়ে উঠে যায়। মা বলেন তোর কি হয়েছে বলতো ভাত খেলি না কেন? মা আজ তেমন খিদে নেই স্কুলের একটি মেয় লুচি আর আলুর দম খাইয়েছে। রাতেও ঘুম আসে না অনন্যার, ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নে দেখেছে অনন্যা, বিকট আকার বিশাল বড়ো কালো অচেনা একটি পশু হা করে অনন্যার দিকে আসছে, অনন্যার দৌড়ে পালানোর ক্ষমতাও নেই। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গিয়েছে, ভয়ে চিৎকার করতেও পারছে না, গলা দিয়ে ঘড় ঘড়ে শব্দ বের হচ্ছে সমস্ত শরীর ঘামে ভেজা,

মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙে। চোখ মেলে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মা বলেন কি স্বপ্ন দেখছিলি, নে এবার উঠে পর। অনন্যা আজ লেখাপড়ায় খুব মনোযোগ দিয়েছে, মা এসে বলেন কিরে স্কুলে যাবি না। ঘড়িতে কটা বাজে দেখেনে, এই তো মা এখুনি উঠছি আরও অনেক সময় অতিবাহিত হবার পরে অনন্যা স্নান করে এসে ভাত খেতে বসে। সামান্য একটু খেয়েই উঠে যায়, মা বলেন কি রে ভাত যে পড়েই থাকল। হ্যাঁ মা সময় নেই আমার কাছে টাকা আছে স্কুলের টিফিনের সময় কিছু খেয়ে নেব খন। মা আর কথা না বাড়িয়ে নিজের কাজে চলে যায়। অনন্যা স্কুলের ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় রাস্তার মোড়ে অটো স্ট্যান্ডে এসে দেখছে মৈনাক আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছে। মৈনাক বলে এই অটোটায় ওঠ। অনন্যা চারিদিকে একবার দেখে নেয় কোন চেনা লোক আছে কিনা, অটোয় উঠে বসে অটো কল্যাণীর দিকে চলতে থাকে। কল্যাণীতে নেমে মৈনাক বলে চলো আগে এখানে ভালো হোটেল আছে, দুজনে একটা হোটেলে গিয়ে দু পে-ট বিরিয়ানি ও চিকেন কষা দিতে বলে। খাওয়া হলে মূল্য মিটিয়ে বাইরে এসে বলে আমরা গঙ্গা পার হয়ে ওপারে যাব। অনন্যা বলে কেন ওপারে কেন ? ওপারে হংসেশ্বরী মন্দির আছে চলো ভালো লাগবে। দেখবে কত লোক ওখানে যায়। বাড়ি যেতে দেরি হয়ে যাবে না তো। অন্যদিনের থেকে আগেই বাড়ি যেতে পারবে, দুজনায় গঙ্গা পার হয়ে বাসে চড়ে ত্রিবেণীতে গিয়ে নামে, রিকশায় চড়ে হংসেশ্বরী মন্দিরে যায়। ঘুরে ঘুরে দেখে দেবীকে প্রণাম করে মন্দিরের বাইরে আসে। মৈনাক বলে অনন্যা একটি সত্যি কথা বলতে হবে, কি কথা? মন্দিরে প্রণাম করে কি চাইলে বলো ? কিছু না, তা কি হয় এই যেমন আমি বর চাইলাম তোমার আমার যেন খুব তাড়াতাড়ি অনন্যা মৈনাকের মুখ চেপে ধরে বাকি কথা মৈনাককে বলতে দেয় না।

আরও কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরে গঙ্গার ঘাটে এসে দুজনে খেয়া নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। মৈনাক বলে অনন্যা দেখ ওই দিকটায় নৌকাটা কেমন পাল খাটিয়ে হাওয়ার টানে চলে যাচ্ছে। মাঝির কাজ কেবল হালটি ধরে রাখা। আকাশে কয়েকটি গাঙচিল উড়ছে অনেক উপরে। মৈনাক অনন্যার কাধের উপরে হাত রেখে বলে আমার মনে হচ্ছে আমরা দুজনেও গাঙ চিলদের মতন আকাশে উড়ে বেড়াই। খেয়া পার হওয়ার জন্য আরও কয়েকজন ঘাটে এসে অপেক্ষা করছে এতলোকের সম্মুখে এই কথাগুলো মৈনাক অবলীলায় বলেছিল। কিন্তু অনন্যার লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল। মৈনাককে বলে তোমার মুখে কিছুই আটকায় না এত লোকের মধ্যে এইসব বলতে তোমার লজ্জা করে না। লজ্জা একটু আধটু করে না তা নয় তবে কি জানো লজ্জা করলে এখন লোকসান কারণ "লাভ" হয়ে গিয়েছে তাই লজ্জাটুকু এক প্রকার ত্যাগ করি আমরা দুজনাই।

এই কথাগুলো বলতে বলতে একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতা আসে বাবু ঝালমুড়ি নেবেন, মৈনাক অনন্যাকে বলে নেব ঝালমুড়ি? তোমার ভালো লাগলে নাও। মৈনাক ঝালমুড়ি নিয়ে অনন্যার দিকে এগিয়ে দেয় ঝালমুড়ি খেতে খেতে নৌকা ঘাটে এসে দাঁড়ায়। দুজনাই নৌকায় চড়ে এপারে এসে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

এইভাবে মেলামেশা চলতে থাকে দুজনার এবং সাথে সাথে লেখাপড়াও, অনন্যার মনে একটি আশা সর্বদা পোষন করে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। উচ্চমাধ্যমিকে খুব ভালো

নম্বর পেয়ে পাশ করেছে, ইংরাজীতে পুরো নম্বর পেয়েছে অন্যান্য বিষয়গুলোতেও ভাল ফল করেছে। কলেজে ভর্তি হয়েছে ইংরাজীতে অনার্স পেয়েছে কাঁচরাপাড়া কলেজে কিন্তু মৈনাক খুব ভাল ফল করতে পারেনি তাই কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা না করে কর্মখালি পত্রিকা দেখতে এবং বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মলাভের জন্য আবেদন করতে লাগল, এবং সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম লেখাল। এইভাবে চেষ্টা করতে করতে একটি বেসরকারী কারখানায় শিক্ষানবিশের সুযোগ পেয়ে গেল তিন বৎসর শিখতে হবে। এই তিন বৎসর হাত খরচা বাবদ কিছু অর্থ পাবে শিক্ষা শেষে সম্পূর্ণ বেতন পাবে। অনন্যা ইংরাজীতে অনার্স পেয়ে বি.এ পাশ করেছে। অনেক জায়গায় চাকরির জন্যে আবেদনও করেছে। সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্রে নাম লিখিয়েছে। ইতিমধ্যে মৈনাকের বাবা, মা ওদের দুজনের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কের কথা জেনেছেন এবং মেনেও নিয়েছেন। প্রথমে অনন্যার মা সরলাদেবী মহাশয়া একটু অমত করেছিল কিন্তু পরে একমাত্র মেয়ের আবদারের কাছে হার মানেন। দুই বাড়ির সম্পর্ক বেশ মধুর পর্যায়ে এসেছে। দুই বাড়ির মধ্যে আসা যাওয়া আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণ করা এইসব ব্যাপারগুলো চলতে লাগল।

অনন্যা স্কুলে শিক্ষিকার কাজে পাবার জন্যও পরীক্ষায় বসেছিল সে অনেক দিন হয়েও গিয়েছে, অনন্যা ভুলেও গিয়েছিল। এক সোমবারে অনন্যা বাড়িতেই আছে, ডাকপিওন এসে ডাকছে অনন্যা কে আছেন? অনন্যার মা সরলাদেবী দরজা খুলে দেন পিওন জিজ্ঞাসা করে আপনি অনন্যা চন্দ? সরলা দেবী বলেন না, অনন্যা আমার মেয়ে। বাড়িতে থাকলে ডাকুন রেজিস্ট্রি চিঠি আছে। সরলাদেবী অনন্যাকে ডাকেন, অনন্যা এসে স্বাক্ষর করে মুখবন্ধ খামে ভরা চিঠি নেয়। ঘরে এসে চিঠিখানা খুলে দেখে এই চিঠিখানা স্কুলের শিক্ষিকার কাজে যোগ দেবার নিয়োগপত্র। অনন্যার বুকের ভিতরে কেমন একটা অনুভূতি হতে লাগল। অনন্যার মনে উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্র তটে যেমন ঢেউয়ের পরে ঢেউ আছড়ে পড়ে আবার জল হয়ে ফিরে গিয়ে সাগরের জলের সাথে মিশে যায়। বসন্তে কুসুম পাপড়ি মেলে দিয়ে প্রজাপতি, ভ্রমর, মৌমাছিদের আমন্ত্রণ করে অনন্যার মনেও এই অনুভূতিগুলো হতে লাগল। ইচ্ছা করছে এখনই মৈনাককে বলতে কিন্তু মৈনাক কাজ করে প্রাইভেট কোম্পানীতে। সাতদিনের মধ্যে একদিন ছুটি পায়। সেই দিনটি ওর কত কাজ থাকে অনন্যার সাথে দেখা হয় সেই সোমবার। অনন্যার স্কুলের কাজে যোগ দেবার দিনটাও সেই সোমবারেই পরেছে। আনন্দ এতটাই অনন্যা অনুভব করছে মাকে বলতেও ভুলে গিয়েছে। মা সরলাদেবী অনন্যার ঘরে এসে দেখে অনন্যা চিঠিখানা বুকের ওপরে দুইহাত দিয়ে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে, মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সরলাদেবী অনন্যার মুখ দেখে বুঝেছেন কিছু একটা খুশির খবর ওই চিঠিতে আছে বলেন। অনন্যা কার চিঠি ওরকম চোখ বন্ধ করে আছিস কেন? মা মৈনাককে একবার খবর পাঠাতে হবে, মা আমি স্কুলের শিক্ষিকার চাকরির নিয়োগপত্র পেয়েছি। আগামী সোমবারে কাজে যোগ দিতে হবে। অনেকটা দূরে হরিণঘাটা থেকেও বাস বদল করে অনেকটা ভিতরে, লগরউখরা জুনিয়ার হাইস্কুলে। মৈনাককে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। মা বলেন বেশ তো মৈনাককে খবর পাঠা, তোর তো একজন ডাকহরকরা আছেই। মনে পড়ছে না? অমন আদুরে পল্টু ভাইটি, একখানা মুড়ি কেনার

পয়সা পেলে তো, সপ্ততল ভেদ করে মানিক তুলে এনেছে এতকাল দিদির জন্য। মা তুমি যে কি বলো না। ঠিক আছে তোমার কথা মতন পল্টুকে ডাকছি, দেখি কি হয়। মা চলে গেলেন নিজের কাজে। অনন্যা গুটি গুটি পায়ে পাশেই কাকার বাড়ি, পল্টু অনন্যার কাকার ছেলে, দিদির খুব বাধ্য। অনন্যা গিয়ে একবার মাত্র ডেকেছে। পল্টু যেন তৈরী হয়েই ছিল ঘর থেকে দৌড়ে দিদির সম্মুখে। দিদি বলো কি করতে হবে? তেমন কিছু কাজ নয় কেবল মৈনাক দাদাকে একটা চিঠি দিবি আর আসার সময় মুড়ি আর দুইখানা চকলেট চুষতে চুষতে আসবি এইনে বলে, একটি পাঁচটাকার মূদ্রা দিলে পল্টু টাকা ও চিঠি নিয়ে দে দৌড়। পরের সোমবার সকালেই মৈনাক এসে বলে অনন্যা চলো, আমি তৈরী হয়েই এসেছি। অনন্যাও প্রায় তৈরীই ছিল। একটু বসো এখনি হয়ে যাবে, মৈনাক চেয়ারে বসে, একটু পরে অনন্যা এসে বলে চলো, মাকে ডেকে বলে মা আমরা আসছি। মা সম্মুখে এসে বলেন এসো তোমরা, মাকে দুজনেই প্রণাম করে বলে মা আশীর্বাদ করো যেন সব শান্তি মতো হয়। মা হাতের অভয় মুদ্রা দেখিয়ে আশীর্বাদ করলেন। অনন্যা ও মৈনাক সাইকেলে চড়ে রওনা দিল। সাইকেল গ্যারেজে রেখে বাস ধরল। যথাসময়ে স্কুলে পৌঁছে দেখল স্কুলের সামনে অনেক ছেলে মেয়ে খুব তর্ক করছে। স্কুলের গেটের পাহারাদারের কাছে গিয়ে জানতে পারল, ছেলেমেয়েরা বলছে আমরা এই পাড়ার ছেলেমেয়ে আমরা চাকরি পাব ন আরা কিনা বাইরে থেকে এসে চাকরি করবে, আমরা তা হতে দেব না। অনন্যা মৈনাক গেট দিয়ে ঢুকতে না পেরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে একজন বয়স্ক শিক্ষক এলেন এবং সকলকে বললেন তোমরা এত হইচই কেন করছ? স্যার আমরা টেটের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে বসে আছি আর আমাদের পাড়ার স্কুলে চাকরি করবে বাইরে থেকে এসে আমরা তা হতে দেব না। শিক্ষক মহাশয় বলেন তোমরা অনেক ছেলেমেয়ে তোমাদের সকলের সাথে কথা তো বলা যাবে না? তোমাদের মধ্যে থেকে দুইজন তোমাদের প্রতিনিধি পাঠাও এমন কাউকে পাঠাবে তাদের কথা তোমরা সকলেই মানবে। দশ মিনিট সময় দিলাম এর মধ্যে পাঠাতে হবে, অন্যথায় তোমরা আমাদের কাজ বাধা দিলে আমি কিন্তু আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। দুইজনা ভিতরে আসবে আর বাকিরা স্কুলের সীমানা থেকে একশত মিটার দূরে থাকবে। এই কথা বলে শিক্ষক মহাশয় ভিতরে চলে গেলেন। অনন্যা মৈনাক জটলার পিছনে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। ছেলেমেয়েরা দুজনকে নির্বাচিত করল একজন ছেলে একজন মেয়ে দুজনে গেটের ভিতরে প্রবেশ করল বাকিরা স্কুলের খেলার মাঠের ওপারে চলে গেল। অনন্যা মৈনাক এবার গেটের নিরাপত্তা কর্মীকে অনন্যার নিয়োগপত্রখানা দেখাতেই ওদের বলল আপনারা ভিতরে গিয়ে ডানদিকে গিয়ে দেখবেন একজনা বয়স্কা মহিলা ওনাকে আপনার এই কাগজখানা দেখাবেন উনি বলে দেবেন আপনার কোথায় বসবেন। অনন্যা মৈনাক ভিতরে গিয়ে ডানদিকে ঘুরতেই দেখল একজন বয়স্কা মহিলা চেয়ারে বসে খাতাপত্র দেখছেন। অনন্যার নিয়োগপত্রখানি দেখাতেই বললেন, বসুন ওই চেয়ারে। হেডস্যার একটু ব্যস্ত আছেন আপনাদের ডাকবেন। অনন্যা মৈনাক চেয়ারে বসল। ওদিকে প্রধান শিক্ষক মহাশয় দুইজন প্রতিনিধিকে বললেন আপনাদের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, আমার কিছু করার নেই। কাজটির একটি মাত্র পদ নির্বাচন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এখানে আমার কিছু করার

নেই আমাকেও সরকারী নির্দেশ পালন করতে হবে। আমি জানি আপনারা প্রত্যেকেই শিক্ষক -শিক্ষিকা পদে যোগ দেবার উপযুক্ত। তবুও আমার ক্ষমতা থাকলেও আমি শুধুমাত্র একজনকেই এই পদে বহাল করতে পারতাম। কিন্তু এখানে আপনার অনেকজন, আপনাকেই যদি এই পদে বহাল করি তবে তো আপনার সহযোদ্ধারা সকলেই হতাশ হবেন। আমার কিছু ক্ষমতাই নেই উপরওয়ালাদের সিদ্ধান্তের বদল ঘটানোর। আপনি সকলকে বুঝিয়ে বলুন আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের জন্য কখনো যদি কিছু করতে পারি চেষ্টা করবো, আজ এখানকার এই খবর আপনারা জানলেন, কি করে বলতেন যদি কোন বাধা না থাকে - বাধা আছে বলে গৌরব ও সবিতা বাইরে এসে সকলকে কথাগুলি বুঝিয়ে বলাতে সকলে মেনে নেয়, দু-একজন বিরোধিতা করলেও অধিকাংশ ছেলেমেয়ে এই কথাগুলো মেনে নিয়ে যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

সকলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করার পরে অনন্যাকে ডেকে পাঠালেন প্রধান শিক্ষক ভবতোষবাবু। অনন্যা ও মৈনাক আসে এবং অনন্যা বলে ভিতরে আসব স্যার, আসুন। মৈনাককে দেখে বলেন ইনি? ইনি আমার সাথে এসেছেন আজ প্রথমদিন তাই ঠিক আছে। আপনার কোন চিঠি আছে? আছে স্যার বলে অনন্যা ওর নিয়োগপত্রখানি ব্যাগ থেকে বের করে দেখায়। খামে ভরা চিঠিখানা নিয়ে খুলে দেখে, মৈনাককে বলেন আপনি বাইরে বসুন। মৈনাক বাইরে এসে বারান্দায় পাতা বেঞ্চে বসে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় অনন্যাকে বলেন জানেন তো সরকারী স্কুলের চাকরির আপনাকে কিছু নিয়ম নীতি মানতে হবে। এই সার্ভিসবুকে সব লেখা আছে পড়ে দেখে স্বাক্ষর করুন। তারপরে আপনাকে নিয়ে ক্লাসে যাব। অনন্যা স্বাক্ষর করে। প্রধান শিক্ষক ভবতোষ রায় বলেন চলুন আপনাকে আজ ক্লাসের ছাত্রদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। জুনিয়র হাইস্কুল অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চলছে তবে ভবিষ্যতে আরও বড়ো হবে স্কুল, ভবতোষ বাবু অনন্যাকে নিয়ে সব ক্লাস ঘরগুলোয় গেলেন এবং সব ছেলেদের বললেন ইনি তোমাদের নতুন ইংরাজির শিক্ষিকা। তোমরা সকলে এনার কথা শুনবে। সব ছেলেরা একসাথে বলে হ্যাঁ স্যার আমরা নতুন শিক্ষিকার কথা শুনবো। ইনি কাল থেকেই তোমাদের ক্লাস করাবেন। ভবতোষ বাবু অনন্যাকে শিক্ষকদের ঘরে নিয়ে আসেন। অনন্যার নিয়োগপত্রে প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর করার স্থানে স্বাক্ষর করে দেন। অনন্যা ও মৈনাক প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে বাড়িতে ফিরে আসে। অনন্যা পরের দিন থেকে একাই চাকুরীর স্থানে যাওয়া আসা করতে লাগল। চাকরীতে যোগদানের এক বৎসর পূর্ণ হবে আগামী জানুয়ারীর এক তারিখে। মৈনাক বলেছে অনন্যা বন্ধুদের নিয়ে পার্টি দিতে হবে কিন্তু। অনন্যা শুনে একটু হাসে এবং তা মহাশয় এই এক বৎসরে নিজের তো পদোন্নতি হয়েছে তার জন্য কি হবে? তার জন্য একটা অসাধারণ আয়োজন হবে যা দেখে আমাদের সমস্ত বন্ধুরা ধন্য ধন্য করবে। সেটা এমন কি হবে যা দেখে সকলে ধন্য ধন্য করবে? সেটা এখানে বলা যাবে না। সেটা বলতে হবে নীরবে, নিভৃতে নির্জনে একাকী একান্তে, সখী কেমনে কহিব গোপন কথা?

এবারে অনন্যা যেন একটু লজ্জিত হয়, কপট রাগ করে, মৈনাককে বলে তোমার সবেতেই তামাশা করতে ইচ্ছে করে। অনন্যার চাকরির বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে দুই বাড়ির

অভিভাবকগণ একত্রিত হলেন এবং সকলে একটি সিদ্ধান্তে একমত হলেন অনন্যা ও মৈনাককে এক সুতোয় বাঁধার আয়োজন করতে হবে এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি হয়। পঞ্জিকার মতে দিন ধার্য করলেন মৈনাকের বাবা মা। অনন্যা মা-ই অনন্যার বাবার অভাব পূরণ করেছেন। অনন্যার খুব অল্প বয়সে বাবা একটি দুর্ঘটনায় প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। মা অনেক কষ্টে অনন্যাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। মা গানের টিউশানি করে লোকের বাড়ি বাড়ি সকাল বিকাল গানের তালিম দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের। সেই কষ্টার্জিত অর্থে মা - মেয়ের অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থা হয়েছে এবং অনন্যার লেখাপড়া হয়েছে। মৈনাকের সাথে অনন্যার কথা হয়েছে মাকে একলা ছেড়ে যেতে পারবে না অনন্যা, মৈনাক বাবা মাকে এই প্রস্তাবে রাজি করতে পেরেছে। শুভদিনে শুভলগ্নে মৈনাক অনন্যার মালাবদল সমাপন হল। সানাই বাজল দুই তরফের আত্মীয় বন্ধু নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সমবেত হয়ে দুজনাকে আশীর্বাদ করে প্রীতিভোজে অংশগ্রহণ করলেন। মৈনাক অনন্যার জীবন এক সুতোয় বাঁধা হল, বিবাহ বন্ধনে বাঁধা জীবন বয়ে চলল নদীর কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলার মত।

একটা প্রণাম

বিপ-বেন্দু বিশ্বাস

সম্প্রীতি মঞ্চের অনুষ্ঠান সেরে ঘরে ফিরে বিপিনকে জিজ্ঞেস করে সুনীতি, কৈ? তোমাদের সেই সায়নকে দেখতে পেলাম নাতো এই অনুষ্ঠানে। শুনেছি যে ঐ শশধর দেবরায় মানুষটিই সায়নের বিপদের দিনে ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য তোমার মার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

— হ্যাঁ ঠিকই শুনেছো, উত্তর দেয় বিপিন স্ত্রী সুনীতিকে।

সেদিন সম্প্রীতি মঞ্চে অর্থাৎ চাকদহ পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত একটি ভাড়া বাড়িতে শশধর দেবরায়ের শ্রাদ্ধের ভোজের আয়োজন ছিল। ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্র রজতাভ এই মঞ্চে সেই আয়োজনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

রজতাভদের সঙ্গে বিপিনদের পরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। বিপিনের দাদা বিমান যখন স্কুলে পড়তো তখন ঐ শশধর বাবু বিমানকে বাড়িতে এসে প্রাইভেট পড়াতেন। সেই তখন থেকেই এই দুই পরিবারের মধ্যে এক আত্মীক সম্পর্কের সূত্রপাত।

এই শশধর দেবরায় ব্যক্তি জীবনে শিক্ষকতা করলেও এলাকায় অতি সজ্জন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। চাকদহ শহর থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরে বিরহি নামক গ্রামের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। সেই বিদ্যালয়ে এক সময়ের ছাত্র ছিল এই সায়ন। পরবর্তী সময়ে সায়নের বাবার অকাল প্রয়াণের দরুন ওর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সেই সময় সায়নের মার পাঁচ সন্তানের মধ্যে এই সায়নই ছিল সকলের বড়। স্বভাবতই সংসারের দায়িত্ব তখন সায়নের কাঁধে চেপে যায়। সায়নের বাবা মারা যাওয়ার সময় মাত্র দুই তিন বিঘা জমি ছিল ওদের সম্বল। সায়ন তখন অষ্টম শ্রেণিতে উঠেছে।

ঠিক এই সময় একদিন রাত্রে আমার বাবা অফিস থেকে যখন বাড়ি ফিরলেন শশধর বাবু তখন আমার দাদা বিমানকে পড়াচ্ছিলেন। পড়ানো শেষ হলে চা বিস্কুট খেতে খেতে শশধরবাবু বাবাকে বলেন, বিনয়বাবু আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। আপনি যদি অনুরোধটি রাখেন তাহলে একটি মেধাবী ছাত্রের ভীষণ উপকার হয়, নইলে ওর ভবিষ্যতটাই নষ্ট হতে বসেছে। আসলে প্রকৃত একজন শিক্ষক ছিলেন বলেই হয়তো উনি উনার দূরদৃষ্টিতে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সেদিন।

বাবা বললেন - খুলেই বলুন না মাষ্টারমশাই ছেলেটির ব্যাপারে।

শশধর বাবু তখন জানালেন, ছেলেটির নাম সায়ন। আমি বিরহিতে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি সায়ন এক সময় এই বিদ্যালয়েই পড়তো। ভীষণ মেধাবী। বর্তমানে ওখানকারই হাইস্কুলে পড়ে। এবার সবে অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছে। ও বরাবরই সব ক্লাসে প্রথম হয়। কিন্তু ওর বাবার চিকিৎসা করাতে ওদের প্রায় সর্বস্ব শেষ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক মারাই যান। এখন ওর পড়াশোনা একরকম বন্ধ। এমতাবস্থায়, আপনি যদি ছেলেটিকে

আশ্রয় দেন তবে ও ভবিষ্যতে হয়তো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

আমার মা কুমুদিনী পাশে বসে সব কথাগুলো শুনছিল। তারপর মা বলে, মাষ্টারমশাই আপনি কালই ছেলেটিকে নিয়ে আসুন। মা সেদিন ঐ কথা বলার পর থেকে বাবা আর দ্বিমত করেননি।

পরেরদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় সায়নকে সাথে করে এনে মার কাছে রেখে গেলেন শশধরবাবু। মা দেখলো, সায়নের পরনে একটি ময়লা হাফহাতা সার্ট ও পায়জামা এবং পায়ে খয়ে যাওয়া একজোড়া হাওয়াই চটি। গায়ের রং ময়লা, লিকলিকে চেহারার একটি ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। শশধরবাবু যাওয়ার সময় শুধু সায়নকে বলে গেলেন, তুমি উনাকে প্রণাম কর। তুমি এখন থেকে উনার বাড়িতে, উনার কাছে থেকেই মন দিয়ে পড়াশোনা করবে।

যতদূর মনে পড়ে তখন ষাটের দশক। সেই সময় স্কুল পরিবর্তনের তেমন কোন ঝামেলা ছিল না। তাই আামদের এলাকার স্কুল পূর্বাচল বিদাপীঠের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সহিত কথা বলে শশধরবাবু সায়নকে ঐ অষ্টম শ্রেণীতেই ভর্তি করিয়ে দেন। আমার দাদা বিমানও তখন ঐ ক্লাসের ছাত্র ছিল। ওরা দুইজনেই একসাথে স্কুলে যাতায়াত করে পড়াশোনা করতে থাকে।

ওরা দুজনেই যখন দশম শ্রেণীতে ওঠে সেই সময় বিমানের একটি কঠিন অসুখ হয়,ফলে সেই বছর বিমানের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। এবং পরের বছর বিমান যথারীতি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে যায়। তাই এক ক্লাস তফাতের বিনিময়ে ওরা দুজনেই নৈহাটির ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ থেকে বি.কম. (অনার্স) পাশ করে।

সায়ন আমাদের বাড়িতে আসার পর প্রথম কিছুদিন আমার মাকে কাকিমা আর বাবাকে কাকু বলে ডাকতো। এর অল্প কিছুদিন যাওয়ার পরই মাকে কাকিমা শব্দ বাদ দিয়ে 'কাকিমনি' বলে ডাকতে শুরু করে, কিন্তু বাবাকে যথারীতি কাকু বলেই ডাকত। একথা এলাকায় সর্বজনবিদিত। যদিও পুরনো লোকেদের মধ্যে হাতে গোনা দুইচার জন জীবিত আছেন এখনো পর্যন্ত।

এরপর বিমান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.কম. ; এল.এল. বি. পাশ করে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্যাঙ্কে প্রবেশনারী অফিসার পরীক্ষায় পাশ করে অফিসার পদে বিভিন্ন শাখাতে চাকরি করতে থাকে। অপরদিকে পারিবারিক প্রচন্ড আর্থিক চাপের জন্য সায়ন প্রথমে একটি সাধারণ চাকরি পেয়ে আমাদের বাড়ি ছেড়ে কর্মস্থলে থাকতে শুরু করে এবং এরও কয়েক বছর পরে ডবি-উ.বি.সি.এস. পরীক্ষায় পাশ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে কাজ করতে থাকে। এই পর্যন্ত একরকম মোটামুটি ঠিকঠাকই ছিল। এরপর আমার বাবা একদিন মারা যান। তারপর থেকে কোন এক অজ্ঞাত কারণে সায়ন আমাদের সাথে ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়াতে থাকে।

ততদিনে আমি নিজেও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ একটি দপ্তরে পরিদর্শক শ্রেণীর কর্মচারীপদে কাজ করছি। এদিকে লোকমুখে সায়নের বিয়ের কথা বা সল্টলেক এলাকায় কোন এক ফ্ল্যাটে থাকার কথা

শুনতাম। সত্যি বলতে কি আমরা কোনদিনও সায়নের কাছে কোন কিছুর জন্য যাইনি আর যাওয়ার জন্য কোন প্রয়োজনও বোধ করিনি কখনো।

আমার বিয়ের অল্প কিছুদিন পর একদিন রাতে এসে হঠাৎ করে হাজির। এসে মাকে বললো, কাকিমণি অফিসের কাজে বাইরে থেকে ফিরে আসতে বেশ দেরি হয়ে গেছে, তাই ভাবলাম রাতটুকু এখানে তোমাদের কাছে কাটিয়ে আবার ভোরবেলা ছুট দেবো।

সেই প্রথম সুনীতি অর্থাৎ আমার স্ত্রী সায়নকে দেখতে পায় এবং সেই রাতে সুনীতিই বেশ আদর যত্ন করে খাইয়ে দাইয়ে রাতের শোবার ব্যবস্থা করে দেয়। যদিও পরদিন ভোরবেলাতেই চা বিস্কুট খেয়েই আবার অফিসের কাজে বের হয়ে যায়। আপাতত সেই শেষ ছিল আমদের বাড়িতে আসা।

এদিকে শশধরবাবু এবং ছেলে রজতাভর প্রায় একরকম নিয়মিত যাতায়াত ছিল আমাদের বাড়িতে। শশধরবাবু মার সঙ্গে বসে অনেক গল্পগুজব করতেন আর সেখান থেকেই মা জানতে পারত কবে কবে সায়ন ওদের বাড়ি ঘুরে গেছে। তাছাড়া সায়নের লেখা কি সব বই টই বাজারে ছাপিয়ে বেরোচ্ছে ইত্যাদি। শশধরবাবু কিন্তু সায়নের এহেন ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন মার কাছে।

একদিন ছুটির সকালে রজতাভ এসে আমাকে বললো, জানো বিপিনদা সায়নদার লেখা একটি বই পড়ে জানলাম তোমাদের বাড়িতে থাকার সময় তোমার মা নাকি সায়নদাকে দিয়ে বাড়ির মুটেগিরির কাজ করাতো। ঠিকমতো খেতে টেতে দিত না। তাই রানীনগরের গঙ্গার ধারের ক্ষেত থেকে ছোলাগাছ চুরি করে তুলে এনে অন্য কোথাও তা আগুনে ঝলসে নিয়ে পেটের ক্ষুধা মেটাতো ইত্যাদি ইত্যাদি সব বিবরণ। এরপর রজতাভ চলে গেলে বিপিন গিয়ে ওর মাকে এইসব কথাগুলো বলে।

মা কথাগুলো শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, শোন বিপিন তবুতো লেখাপড়াটা শিখেছে। তাই এসব লিখতে পারছে। নইলে এতদিনে কোথায় হারিয়ে যেত।

এর বেশ কয়েক বছর পর বয়সজনিত কারণে আমাদের মা-ও আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। যেহেতু সায়নদা আমাদের মাকে কাকিমণি বলে ডাকত তাই ভাই ভেবে দাদা মার মৃত্যুর খবরটা দিতে বলায় ফোনে ওকে জানাই এবং আমি নিজে এই মৃত্যু সংবাদ জানানোর সময় ঐ রজতাভ আমাদের বাড়িতে আমার সামনেই উপস্থিত ছিল।

এরপর যথাসময়ে মার পারলৌকিক কাজকর্ম হয়ে গেলে একদিন সকালে আমি যখন বাজারের পথে তখন আমাদের পাড়ারই এক দাদা মণিমোহন সাহার সঙ্গে দেখা হয়। মণিমোহনদাই আমাকে ডেকে বলে কয়েকদিন আগে উনি কলকাতায় গিয়েছিলেন। সেখানে হঠাৎ সায়নের সঙ্গে উনার দেখা হয়েছিল এবং কথায় কথায় সায়ন জানায় যে, ও নাকি আমার মায়ের মৃত্যু সংবাদ জানেই না। তারপরেই আমাকে বলে, তা তোমরা ওকে খবরটা দাও নি।

মণিমোহনদার মুখে খবরটা শোনার পর বিপিন বলে, আপনি তো শশধরবাবুর ছেলে রজতাভকে চেনেন, তা ওকেই ডেকে জিজ্ঞেস করবেন যে, সায়নকে জানানো হয়েছিল কিনা !

তাহলে সায়ন যে বললো, ও এসবের কিছুই জানে না - বলে মনিমোহনদা।

—থাক ওসব প্রসঙ্গ, এই কথা বলে বিপিন বাজারের পথে এগিয়ে যায়।

রজতাভকে পরে বিপিন কথাগুলো জানিয়ে ছিল যা মনিমোহনদার কাছ থেকে শুনেছিল। তাই সেদিন সম্প্রীতি মঞ্চের অনুষ্ঠানে সায়নকে না দেখতে পেয়ে সুনীতি যখন বিপিনকে প্রশ্ন করেছিল তার উত্তরে বিপিন তখন বলে, সায়ন দিন কয়েক আগে ওদের বাড়িতে এসেছিল। ওদের সাথে দেখা করে গেছে। হয়তো সকলের সামনে আসে নি, কিংবা আমাদের সাথে যদি এখানে দেখা হয়ে যায় তাই হয়তো সেই কারণে আসেনি এখানে।

শুনে সুনীতি আবারও বলে, আচ্ছা সায়ন এইভাবে তোমাদের এড়িয়ে চলে কেন ?

হয়তো ভাবে যতি কোন প্রতিদান দিতে হয়, বিপিন জানায় ওর স্ত্রী সুনীতিকে।

এরপর সুনীতি বলে, ভবিষ্যতে যদি ঐ রকম কোন ছেলের মানুষ করার দায়িত্ব পাও তবে কি করবে ?

বিপিন জানায় 'কাকিমণি' ডাকা সায়নের শরীরের রক্ত হয়তো আলাদা কিন্তু আমাদের শরীরে সরাসরি আমার মায়ের রক্তই বইছে।

উত্তরটি পেয়ে সুনীতি বলে, বাংলায় একটি প্রবাদ আছে যে ন্যারা একবারই বেলতলায় যায় আর তোমরা দেখছি তারও ব্যতিক্রম।

হাসতে হাসতে বিপিন বলে, সেদিন আমার মা কিন্তু কোন প্রতিদানের আশায় কিছু করেনি। তাই মায়ের কোন কষ্ট বা দুঃখ কোনটাই ছিল না। কারণ মার উদ্দেশ্য ছিল অসহায় ছেলেটি যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। সমাজে একটু হলেও প্রতিষ্ঠা পায়। সেদিক থেকে মা কিন্তু পুরোটাই সফল। তাই মায়ের আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হই, তুমি কি তাই চাও! সুনীতি, প্রশ্ন করে বিপিন ?

শুনে সুনীতি শুধু বলে তোমায় একটি বার প্রণাম করতে দেব ! আরও একটি অনুরোধ আমাকে একবার সায়নদার বাসায় নিয়ে যেও পারলে কোনদিন।

কেন ? ওখানে আবার যেতে ইচ্ছে করছে কেন? জিজ্ঞেস করে সুনীতিকে বিপিন।

- সুনীতি বলে, বারে! সায়নদাকেও তো একটা প্রণাম করতে হবে যে !

খুব মৃদুস্বরে বিপিন জানায়, সায়নদার বাসায় যেতে চেও না।

কেন নিয়ে যাবে না ? সুনীতি জানতে চায় বিপিনের কাছে।

হয়তো চিনবে না বলে, একটু আনমনা হয়েই কথাগুলো ছুঁড়ে দেয় বিপিন।

তবু বৃষ্টি নামে

সুমন চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় বিশ্বে প্রেমের গল্প লিখতে নেই, যদিও বা ফেলা হয় বাস্তব থেকে তা রেখে দিতে হয় যোজন দূরে। প্রেমিকের থ্যাতলানো মুখে থুপে দিতে হতে পারে বেওয়ারিস লাসের টোকেন। প্রেমিকার চুলে কেরোসিন। নইলে, যদি প্রণয় ঠাকুর অনুমতি দেন চকচকে অ্যালবামে মেটে সিঁদুর, নীলাভ গাল। রূপকথায় অবিশ্বাস থাকলে পয়লা বিশ্বের কোনও সবুজ বাগানে আপেল, বরফ।

তবু তৃতীয় বিশ্বের অচল জেলার নিভু নিভু প্রান্তে প্রেম আসে। লোককথা, সংগীত, ইতিহাসে চেপে বসে, বাঁশ ঝাড়ের ... হাওয়ায় ফাঁকা মাঠে ছাঁচে ঘাপটি মেরে বসে থাকে প্রেম। কারও চোখ,কখনও অকাল বসন্ত। একে একে বধ হতে থাকে মানুষ। আদি দেবতা, পঞ্চায়েতের কাজ বাড়ে। এমনি বধ হল হুমায়ুন পূর্ণ চক্রলোকে।

মাচা বাঁধা স্টেজে তখন তুফান তুলেছে মিস টিনা। নিস্পলকে সে যেন জিতে নেবে লক্ষীন্দর, পুরুষের চোখে সে কামনার দেবী। তাও হুমায়ুনের চোখ ভেসে বেড়ায়। মরা কোটালে গতি বেশ ধীর। প্রাণপনে ছুঁড়লেও ফিরে আসে। আসার পথে নাবাল জমিনে থেমে গেল মণিদীপা।

শুরু হল তৃতীয় বিশ্বের এক মানব - মানবীর জীবন চরিত্রের। তাদের পাশে আমরা বসব না। তাদের মনের বাঁধন খুলব না। ওদের বয়ে যেতে দেব। ওদের মান অভিমানে সূত্রধরের কাজ করব না। পৃথিবীর সৃষ্টিকাল থেকে বহমান যাপন ধারার শর্ত হিসেবে, দেখে নেব তাদের একে অপরের উদ্দেশ্যে লেখা কিছু রোজনামচা, আমাদের একমাত্র শর্ত মৌনতা। দৃষ্টিশ্রবণ ছাড়া আমরা অন্য ইন্দ্রিয়ের ছুটি ঘোষণা করি এসো। আমরা নিমগ্ন হই এক প্রেমকাহিনীতে।

আশা সরিয়েই হুমায়ুন ও মণিদীপার সঙ্গী হই। হেটে চলি কিছুটা পথ। পরিস্থিতি সময়ের হাতে সঁপে দিই মন মনন। আমরা এসে দাঁড়াই আকাশের নীচে, মাটিতে পা রেখে।

আমার মণি,

'মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥'

আমি হয়তো হেরে যাচ্ছি। লড়াই তেমন জোরদার ছিল না হয়তো। নিজের কাছেই কি তবে হার! আজও কোনও খবর এলো না সাহিল ভাইয়ের তরফ থেকে। রাজিয়া আপার জন্য কষ্ট হয়। আচ্ছা মণি মানুষের জীবন কি সুন্দর হতে পারে না; মানুষ না আমাদের মতো মানুষের! মাস শেষ হতে চললেও মাইনে পেলাম না। জানো কাল রাতে একটা সাপ ঢুকে পড়েছিল ঘরে। প্রতিটা ঘটনাই যেন অভিযোগ তাই না। কার উদ্দেশ্যে কেন বুঝি না। হয়তো নিজেকে উদ্দেশ্য করেই।

আজ দুপুরে টি.ভিতে দেখলাম বিবেকানন্দ উড়ালপুল ভেঙে পড়েছে। আরও

কতগুলো জীবন পিষে গেল দেখ, পরিজন পরিচয় সব রেখে শেষ। আজকাল মনে হয় অনেকদিন বাঁচব জানো। অনেক কবরে মাটি দেব, অনেক চকচকে সফল মুখ দেখব, মণি আমি জানি এটা প্রেমপত্র নয়। সবাই অভিজ্ঞ না হয়ে প্রেম করলেও আমি জানি এ চিঠি নিজেকে লুকানোর।

বৈষ্ণব পদাবলির দুটো লাইন দিলাম তোমায় চিঠির শুরুতে। পদাবলী ছাড়িয়ে লাইনদুটো যেন সমান্তরাল দুই রেললাইন। কোনও মুহূর্তে ট্রেন আসতে পারে। বা মরচে ধরে যাবে। আজ হয়তো বৃষ্টি হতে পারে। পৃথিবীর কপালে নেমে আসা প্রথম বৃষ্টি তোমায় দিলাম।

তোমার হুমায়ুন

আমার পাগল,

আজও বৃষ্টি হলো না। ঝোড়ো হাওয়ায় ওলট পালট হলাম ছাদে। তুমি বিসর্জন দেখেছ কখনও। উন্মাদ এক চিলতে মজার শেষে ফাঁকা ভ্যান নিয়ে ক্লান্ত পিছুটান। সেদিন বিকট গান আর উদ্যাম নাচ। কেউ ফিরেও তাকালো না অন্ধকার ছাদে একটা মেয়ে একা উতল হাওয়ায় কাঁপছে।

ইদানিং লোডসেডিং খুব বেড়েছে জানো। পাল-া দিয়ে আড্ডা। ওরা অনেকটা এগিয়ে যায়। আমি অন্যমনস্ক হয়ে থেমে যাই। সন্ধ্যেবেলা আচমকা পুরনো সময়ের গন্ধ ভেসে আসে। ভুলে যাওয়া কিছু চেনার খোঁটা দিয়ে হারিয়ে যায়। ঘুম ভাঙলে আর স্বপ্নজাল থেকে বেরোতে ইচ্ছে করেনা। আত্মগোপনের রাস্তাগুলোতে প্রায় ধস নামছে। দেখো হুমায়ুন আমরাও কেমন অস্বীকার করছি নিজেদের। বারবার সুতোয় জট।

আমাদের পূর্ব পুরুষ আমাদের উৎসব ধর্ম সবই কি আমাদের ! বয়ে চলা এক ধারার পথিক আমরা বাক্যবাগিসের দল। সিঁদুরে খুব লোভ ছিল জানো, কনে সাজেও কম না। 'যদি' শব্দটা নদীতে না ভাসিয়ে দুবেলা মনে বসিয়ে ঘটনা সাজাই। ডজন সিঁদুরের প্যাকেট মাথায় ঢালি, কনুই পেরিয়ে শাঁখা পলা। তোমার জন্য না হয় লুকিয়ে নিলাম সব। তোমার বুকে মাথা রাখলাম এবার। আমার ঘুম এনে দাও।

তোমার মণি

মণি,

কাল রাতে 'আটবছর আগের একদিন' আবার পড়লাম। মাঝে মাঝে মনে হয় নিরক্ষর হলে ক্ষতি ছিল না বিশেষ। কি যে বলে চলি ভুলভাল ; রবীন্দ্রনাথ কি একেই বাজে খবরের মধ্যে মানুষ চেনা যায় বলেছিলেন। গভীর রাতে কত সে সুর ভেসে আসে। কান্নার উলুধ্বনি, যাত্রার সংলাপ, সুন্দর মিথ্যে কথাও শুনতে ভালো লাগে।

শ্বাস নিতে কষ্ট হয় দেখি এখন। গন্ডি কমতে কমতে চৌকাঠে এসে পাহারায়। সিলিং ফ্যানও মজবুত নয় তেমন। তোমার জন্য নির্জন দুপুরের পুকুর ঘাট দিলাম। চুপি চুপি স্বপ্নগুলো ভাসিয়ে দিও।

তোমার 'যদি'

হুমায়ুন,

রুনুদের পাখিটা খাঁচা রেখে নিরুদ্দেশ। দূর দূর ভেসে বেড়ানোর পরও নিশ্চয় আরও একটু উড়তে চাইছিল সে। মুক্তি কি স্বাধীনতারই আরেক নাম।সব স্বাধীনতা কি মুক্তি দিতে পারে হুমায়ুন। শৃঙ্খলেরও তো বশীকরণের ক্ষমতা থাকে। হয়তো বা ব্যবহারিক অভ্যাস।

জল-জমিন-আসমান, চানের জল, সিরিয়ালের সুখ সব সব
জুড়ে তুমি, তোমায় ছেড়ে কোথায় পালাবো হুমায়ুন !

মণি

মণিদীপা,

তোমার 'যদি'র হাতে হাত রেখেই পরজন্ম চাই। সে জন্মে অভিযোজন অভিব্যক্তির চলমান ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে থেমে যাবো। আসার জন্য যাওয়া প্রয়োজন ! তাই না !

হুমায়ুন

হুমায়ুন,

কয়েকটা কাগজের নৌকা বানালাম। এখনো ভুলে যাইনি তাহলে ! নৌকাগুলো আলমারিতে তুলে রাখলাম পরবর্তী জীবনে ভাসতে ইচ্ছে সখ হলে কাজে আসবে। এখন ভীষণ ঝড়। তোমায় মনে রেখে দিলাম।

মণিদীপা

কানে আসা চোখে ভাসা হাজার মুখরোচক গল্পের গলিতে রাস্তায় হারিয়ে গেছে মণিদীপা হুমায়ুন। অনুমানে, মনের মতো ঠিক করে দিতে ইচ্ছে হয়তো হতে পারে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের। সে অনুমান কল্পনা - পরিকল্পনার কাঠামো তৈরী করুক।

আমরা বাসের সিটে, ট্রেনের গেটে প্রতিদিন তাদের দেখছি। বুকে বয়ে আসা ধারার আগামীকাল নিয়ে চিন্তিত হচ্ছি। মনে মনে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি স্বর্গে। একবারও মৃত মুখ মনে আনছি না অবশ্য।

তবুও পৃথিবীর বুকে মানুষ প্রেমে মেশে, ভাসে, হারায়, কখনো হয়তো বা জেতে।

জীবন যে রকম

দীপক ভট্টাচার্য

এবার জামসেদপুর গিয়ে হঠাৎ অনির্বানের সঙ্গে দেখা হলো।কয়েকদিন শুধু নয়, মনে হল যেন কত যুগ পরে। সেই ছোটবেলাটা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। অদ্ভুত ভাল লাগায় ভরে গেল মনটা। সেই প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা দিনগুলোর কথা অনির্বান বারবার গল্প করতে লাগল। সেই ছোটবেলার দিনের স্মৃতিগুলো রোমন্থন করতে করতেই বেশ কয়েকটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন অনির্বান আমার ছোটবেলার অন্তরঙ্গ বন্ধু। গিয়েছিলাম জামসেদপুর অন্য কাজ নিয়ে, কিন্তু অনির্বানের পাল-য় পড়ে যেতে হলো উড়িষ্যায়। যদিও আমারও অনির্বানকে পেয়ে আরো কটাদিন ওর সঙ্গে কাটানোর ইচ্ছা জাগছিল - সুযোগ হয়ে গেল। যেদিন পৌছিলাম, তার পরদিন ছিল দোলপূর্ণিমা। একটা গোল থালার মতো চাঁদ উঠেছিল গাছপালার ফাঁক দিয়ে। ওই পূর্ণিমার চাঁদকে অসাধারণ সুন্দর লাগছিল। আঃ কি আনন্দ। জঙ্গলের গন্ধ পাচ্ছি নাকে, কান ভরে উঠছে সুখকর সব শ্রবণানন্দে। চাতক চোখ ফিরতে চায় না মেন দৃশ্য থেকে। হ্যাঁ, অনির্বান আমাকে জঙ্গলের রূপ দেখাতে এখানে এনেছে। ও যে এত জঙ্গল ভালবাসে, তা আমি জানতাম না। এই অপূর্ব পৃথিবীকে - অর্থাৎ এই প্রকৃতিকে দেখতে দেখতে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিলাম। অনির্বানের কথায় ফিরে এলাম। অনির্বান বলতে লাগল 'অর্থ, নারী, সম্মান-খ্যাতি, প্রতিপত্তি স-ব একদিকে করেও জঙ্গলের ভাল লাগার ভালবাসার ভারের সমান হরো না কখনও মনের নিক্তিতে। আমি ওর কথায় খানিকটা অবাক হয়ে গেলাম। বললাম তুই যে জঙ্গল এতো ভালোবাসিস জানতাম না তো আগে। আমারও এই প্রকৃতি পরিবেশ ভালো লেগে গেল। কখনো চমকে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া দ্রুতগতি হাওয়াকে যে পথের লালধুলো তাড়া করে যায়। এমন সুন্দর সেই পথই চিরদিন হাতছানি দেয়। উপত্যকা থেকে পাহাড়ে, পাহাড় থেকে উপত্যকায়, নদী থেকে সমুদ্রে এমন করেই প্রকৃতির আহ্বান আমাদের নাড়া দেয়। আবার আমরাই এই প্রকৃতিকে ধ্বংস করি নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য। এই আমাদের সভ্যতা।

এবার আমরা কটক থেকে বেড়িয়ে আরও অনেক জায়গা পার করে আমরা অংগুল বলে একটা জায়গায় পৌছালাম। আবার সেখান থেকে পৌছালাম লবঙ্গী। এক নালার পাশেই, কুকুর নামে ক্যাম্প। তারই পাশে অনির্বানের এক সময়ের কলিগ রামসুন্দরের বাসা। আমরা পৌছলে সে আমাদের সাদরে গ্রহণ করল। সেখানেই রাত্রি যাপন করলাম। পরদিন সকালে যখন সূর্য্য উটে সারা জঙ্গল উদ্ভাসিত করে তুলেছে। জংলি আমের গাছে গাছে বোল এসেছে এখন। সে এক প্রাণভরা আনন্দ সুধা পান করতে জীবন আমাদের উন্মুখ হয়ে উঠল। অথচ এই রকমই এক একটি বনস্পতি কয়েক ঘন্টা লাগে মাত্র ধ্বংস করতে। কত সামান্য সময় লাগে সব কিছু শেষ করতে। প্রেম, সম্পর্ক, ভালোবাসা, মমতববোধ, বন্ধুত্ব -অথচ গড়ে তুলতে হয় তিল তিল করে। সব কিছুতেই তিলোত্তমা গড়ারই মতো। কিন্তু ভাঙা

জিনিস কি আগের মতো গড়া যায়। এই যে আমরা অবিরাম ধ্বংস করে চলেছি সবুজ। বুঝতে পারছি না কি এর পরিণতি।একসময় অক্সিজেন সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। প্রকৃতি ও আবহাওয়া ক্রমশই দূষিত হয়ে যাবে। বড় ভয়ঙ্কর দিন ক্রমশই এগিয়ে আসছে আমরা তা বুঝতে পারছি না।

এরকম জঙ্গলে এলেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব মনে পড়ে। হ্যাঁ সত্যিই বিভূতিবাবুকে ভুলে থাকা মুশকিল এরকম চাঁদের আলোয় ভরা জঙ্গলে এলে। ওর লেখার মধ্য দিয়েই ওকে চেনা আমার। পরের দিন জঙ্গল এলাকায় ঘুরতে ঘুরতেই এখানে বসবাসকারী আদিবাসী এবং জঙ্গলবাসী মানুষের দেখা পেলাম। আমরা নিজেরাই তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম। তাদের নিকট থেকেই জানতে পারলাম কি ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন যাপন। এখানকারই দুজনের কাছে জেনে ছিলাম কালাহান্ডির কথা, যদিও এখান থেকে তা অনেক দূর। এরা দুজন সেখানকার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার জন্য চলে এসেছিলেন, ওনাদের সঙ্গে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সেই ভয়াল দুর্ভিক্ষের কোপে অনাহারে ও অপুষ্টিতে রাস্তাতেই মারা যায়। এরকম অনেকে ওখান থেকে পালিয়ে আসার পথে - পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাই এরা দুজনেই পানুয়ানালা এলাকায় এসে অবশেষে একটু থাকবার জায়গা পান। কঠোর পরিশ্রমে দুমুঠো ভাতের জন্য অসহায় দিন যাপন করতে বাধ্য হয়। এই উড়িষ্যা সরকার সেই দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হন। তার ফলে বহু মানুষ মারা যান। 'স্কন্ধমাল' আর একটা জায়গা। এ নামটা প্রায় সকলের কাছেই খুব চেনা। সেখানেও প্রায়ই একই অবস্থা। সরকার সেখানে জঙ্গলবাসী মানুষকে উচ্ছেদ করে কর্পোরেট শিল্পপতিদের কাছে ওই এলাকার অর্থাৎ সেখানকার জঙ্গল, পাহাড় সব বিক্রি করে দিচ্ছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এ আর এক নিদর্শন। গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখা। তবে সেখানকার মানুষ এসবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা লাগাতার আন্দোলনে সামিল, এমনই একটি পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এই লবঙ্গীতেই। ওদের কাছেই শুনেছিলাম 'স্কন্ধমালে'র মানুষের আন্দোলনের কথা। এক বিদেশী শিল্পগোষ্ঠী ওখানকার পাহাড় ও জঙ্গল থেকে স্থানীয় মানুষদের উচ্ছেদ করে ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয় এবং একাজে আমাদের দেশের ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার যথেষ্ট রকম সাহায্য করে আর পুলিশ দিয়ে প্রতিবাদী মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। এর ফলে বেশ কিছু জঙ্গলবাসীর প্রাণ যায়। কিন্তু এতো কান্ডের পরও আন্দোলনকারীরা পিছু হটেনি। এখনো পর্যন্ত যা খবর আপাতত কারখানার কাজ বন্ধ থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে কারখানা গড়ার কাজ চালু হবে হয়তো। আমরা একথা প্রায় অনেকেই জানি ও বুঝি। উড়িষ্যার এই অঞ্চলের কারখানা গড়ার বিরুদ্ধে সাধারণ উচ্ছেদ হওয়া মানুষের আন্দোলনের কথা আমার আগের লেখায় বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করেছি।

এমনই আরো একটি ঘটনার কথা বলতে হয়। এই উড়িষ্যারই এক শীতের রাতে পুরুনাকোটের জঙ্গলে শুয়োর মারা হচ্ছে জানতে পেরে একটা জায়গা দেখে বসলাম। প্রচন্ড শীত। কোলের কাছে মাটির সরায় কাঠকয়লার আগুন। মাঝরাতে হঠাৎ গ্রামে একটা সোরগোল শুনলাম। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে সঙ্গের একজন বলল একটা মেয়ের বাচ্চা

হল। এরপর শেষরাতে হঠাৎ নারীকণ্ঠের এক আর্ত চিৎকারে শিশির ভেজা শীতার্ত বন পাহাড় চমকে উঠল। আমরা ও .... নাই হতচকিত। তারপর আবার শোরগোল। তারপর সব চুপ। শুধু একক নারীকণ্ঠের দীর্ঘ একটানা কাঁপা কাঁপা বিলাপ। তাও একসময় থেমে গেল। আবার জিজ্ঞাসা করাতে শুনলাম মাটির ঘরের নবজাতকের মাথা , মাথার ঘিলু সব ছুঁচোয় খেয়ে গেছে। তাই সন্তানহারা মায়ের অমন আর্ত চিৎকার।

আমাদের দেশের বিশেষ করে জঙ্গল এবং আদিবাসী এলাকায় মেয়েরা সন্তান হারালে কাঁদার বিলাসিতা করতে পারে না বেশিক্ষণ। সন্তানের জন্ম হলেও ইংরাজী কাগজের ব্যক্তিগত কলামে তা বিজ্ঞাপিত হয় না। এরকম অজস্র ঘটনা প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ঘটেছে।

মহানদীর ওপারে টিকরপাড়া, এখন যেখানে কুমির প্রকল্প হয়েছে। তার কাছেই আর এক গ্রাম বাঘরমুন্ডা। এই বাঘরমুন্ডাতে একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে দূর গ্রাম থেকে আসত, এখানকার বাংলোয় ফাইফরমাস কাটতে। অনেক হাতি, বাইসন, বাঘ ভরা জঙ্গল পেরিয়ে পেটের তাগিদে। ওদের পরিধান বলতে একটি দুভাজ করা গামছা। উর্দ্ধাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গ ঢাকবার জন্য। কি ভয়ঙ্কর দারিদ্র তা সেটা সহজেই অনুমেয়। শীতের রাতে বাছুর ছাগল মুরগী ও হাঁসের সঙ্গে একই মাটির ঘরে আগুন জ্বেলে শুতো পুরো পরিবার। আরও মর্মান্তিক যা - প্রথম রাতে বুক দিয়ে শুতো আগুনের দিকে,তারপর তাপে বুক পুড়ে যাবার উপক্রম হলে উল্টে পিঠ দিয়ে শোয়। এমনি করেই এপিঠ ওপিঠ করতে করতে বসন্তের শুরুতে দেখা যায় সাপের খোলসের মতো ওদের গায়ের খোলসেরই এক পরত চামড়া উঠে যায়। কিন্তু তবু কোন অভিযোগ নেই এই মানুষদের। 'দয়া করো দীনবন্ধু আজ, দাউ শুভ দিন' গান গেয়ে দীনবন্ধুর উপরই নিজেদের ইহকাল পরকালের সব ভার চাপিয়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে থাকে ওরা। এদের কথাই লিখে চলেছি সব লেখাতে। এ ঘটনা বলেছিল অনির্বান। ওর সঙ্গে উড়িষ্যা ভ্রমণে বিরাট অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলাম। ওরও চেতনা ফিরল প্রকাশিত জীবন দেখতে দেখতে। শুধুমাত্র উড়িষ্যায় নয়, এসব দারিদ্র চেতনার অভাবে দীর্ঘদিন বিভিন্ন অত্যাচার মেনে চলা, সারা দেশব্যাপী পরিব্যপ্ত। এইসব সামাজিকতার বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে। এসব ভাবতে ভাবতেই আমার জায়গায় ফিরে এলাম। অনির্বান বলল কেন সাম্প্রতিক যা ঘটেছে উত্তরবঙ্গে ? ডানকান গোষ্ঠীর চা বাগানগুলিতে যা ঘটছে! আমি বললাম হ্যাঁ অবর্ণনীয়, চা বাগানের অভাবী মেয়েরা আজ শরীর বিক্রি করছে। আমাদের এই স্বাধীন ভারতবর্ষে। কেন্দ্র,রাজ্য কোন সরকারেরই কোন হেলদোল নেই এ ব্যাপারে। আর কতদিন চলবে এই সাধারণ মানুষের ওপর এই অন্যায় ?

প্রতিযোগীতা

ধ্রুব তালুকদার

হ্যালো টেসটিং, হ্যালো টেসটিং আপনারা সবাই ভালো করে শুনুন, আজ আপনার যে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন, তার নাম হল ধৈর্য্য বনাম লক্ষ্য। এর নিয়মাবলী হল, এই বড় মাঠের মধ্যে টেবিলের উপরে একটি সোনার তৈরি মানুষ আছে যার ওজন প্রায় এক কেজি হবে এবং এর বর্তমান মূল্য হল তিন লাখ টাকা। সকার সাতটায় এই সোনার মানুষের ত্রিশ ফুট দূর থেকে চারিদিকে গোল করে ঘুরতে হবে, থেমে থাকা চলবে না, কোন খাবার এমনকি জল পর্যন্ত দেওয়া হবে না, দাগের বাইরে গেলেই আউট হয়ে যাবেন। রোদ-বৃষ্টি যাই হোক না কেন ঘুরতেই হবে। সর্বশেষ যে প্রতিযোগী থাকবেন সেই হবে বিজয়ী ও তার হাতেই ঐ সোনার মানুষটি তুলে দেওয়া হবে। প্রতিযোগীদের সংখ্যা হল ১২ জন। যাদের নাম হল —

নাম		বয়স
১. নয়ন সরকার	—	২৮
২. মেঘলা চৌধুরী	—	২৬
৩. লক্ষ্মী হাজারী	—	৫৫
৪. সুজিত রায়	—	৩৫
৫. রফিকুল মোল-া	—	৬০
৬. বিকাশ আগরওয়াল	—	৪৪
৭. সঞ্জিত সরকার	—	২১
৮. শ্যামল ভক্ত	—	৩৮
৯. কৃষ্ণ বেরা	—	৪৫
১০. সত্যজিৎ চৌধুরী	—	৫২
১১. গোপাল নায়েক	—	৩৯
১২. শক্তিধর সামন্ত	—	২৭

অতএব আজ রাতে আপনারা সবাই এখানে বিশ্রাম করুন। কাল সকাল ৭টা থেকে প্রতিযোগীতা শুরু হবে। আর একটা কথা, আপনারা প্রতিযোগীতা শুরু হবার আগে পর্যন্ত খেতে পারবেন। কিন্তু শুরু হবার পর চাইলেও আর পারবেন না। আউট না হওয়া পর্যন্ত। এই বলে যিনি মাইক্রোফোন রাখলেন তিনি হচ্ছেন 'সীতারাম জুয়েলার্স' এর মালিক বিজয় বড়ুয়া। এই প্রতিযোগীতার কথা তার মাথায় প্রথম আসে এবং এটা তার দোকান ও কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের বিরাট মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে তার জন্য। ১২ জন প্রতিযোগীদের মাঠের পাশে হল ঘরে থাকার ব্যবস্থা হল রাতে। সবাই একই ঘরে শুয়ে আছে খাবার খেয়ে। খাবার ব্যবস্থা ছিল ভাবনার বাইরে। প্রতিযোগীদের যে যা খেতে চেয়েছে সবাইকে তাই

দেওয়া হয়েছে। কেউ বা পেট ভর্তি ভাত, কেউ বা রুটি খেল,কেউ খেল ভাত না চিবিয়ে যাতে অনেকক্ষণ থাকে, আবার কেউ জল কম খেল যাতে বাথরুম কম যেতে হয়। একজন তো রিভাইট্যাল ঔষুধ খেল যাতে এনার্জি পায়। রাতে কেউ কারো সাথে কথা বললো না। কারণ সবাই সবার বিরোধী পক্ষ। একে অপরের নামে উল্টো পাল্টা বলে যাচ্ছে মনে মনে। কেউ আবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে যে, 'হে ভগবান, কাল যেন আমি ছাড়া সবার বাথরুমের প্রেসার/ বেগ বেশী করে হয়, তাহলেই বাড়ি গিয়ে তিন লাখ টাকা থেকে এক লাখ দিয়ে তোমার মন্দির বানাবো।' একে অপরের দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যে সুযোগ পেলেই গলা টিপে মারবে, তাহলে প্রতিযোগী কমে যাবে। রফিকুল মোল-া বলল - 'হে আল-াহ সবার যেন পায়ে পাথরের খোঁচা লাগে, পা মচকে যায়, খিদে পায়, বাথরুম পায়, তাহলে আমি মাজারে চাদর চড়াবো, জুম্মাবারে সিন্নি দেবো' বরে সেলাম ঠুকলো। এই কথা শুনে বুড়ো মানুষ সত্যজিৎ চৌধুরীর মাথায় গেল খুন চেপে। সে রেগে গিয়ে বলল, 'ওরে হারামজাদা সবাই পাথরের খোঁচা খাবে, পা মচকাবে, খিদে পাবে, বাথরুম পাবে আর তোর আমাশা হবে।' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এই কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু হাসি আর কতক্ষণ আবার সবার সেই গম্ভীর মুখ। পারলে এ ওকে মারে আর ও একে খুন করে। এই করে করে সবাই রাত দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল।

ও দাদা উঠুন, ও ম্যাডাম উঠে পড়ুন। রেডি হতে হবে বলে মাইক্রোফোনে একজন ডাকলেন। সবাই আড়মোড়া ভেঙে চোখ ডলতে ডলতে উঠলো। আবার ভদ্রলোকটি মাইক্রোফোনে বললেন আপনারা এক ঘন্টার মধ্যে বাথরুম, স্নান সেরে মুখ ধুয়ে ফেলুন। আপনাদের টিফিন দেওয়া হবে। তারপরই প্রতিয়োগীতা শুরু হবে। কথাটি শেষ হতে না হতেই রফিকুল মোল-া বলল দাদা গরম ভাত পাওয়া যাবে, মানে তাহলে অনেকক্ষণ ঘুরতে পারতাম। লোকটি বললেন অবশ্যই পাওয়া যাবে। আপনাদের গত রাতের মতন যে যা চাইবেন তাই পাবেন তবে, চিকেন আর আড্ডা বাদ। এর মধ্যেই শ্যামল ভক্ত বলে উঠলেন - 'ডিসগাস্টটিং, আর্লি মর্নিং য়েই রাইস, ও গড ইউ আর গ্রেট, ইট ইজ ভেরি ভেরি ফানি।' ইতিমধ্যেই মেঘলা চৌধুরী (বয়স - ২৬, গায়ের রং অতিব ফর্সা,মুখের গড়ন দেবী মায়ের মতন, সূচালো নাক, মাথায় অনেক চুল, এক কথায় স্বর্গের উর্বষি) বলল দেখুন শ্যামলবাবু বাংলায় জন্ম নিয়ে ভাতকে অবহেলা করছেন, আপনার তো লজ্জা হওয়া উচিত। আর কথায় কথায় ইংলিশ বলছেন, কমবেশি সবাই ইংরেজি জানে আপনাকে আর জানাতে হবে না, আপনি ইংরেজি জানেন। শ্যামলবাবু বলল - 'অয়েল ইওর ওন মেসিন. ইট ইজ ভেরি ব্যাড'। এই করতে করতে পনেরো মিনিট কেটে গেল। তারপর সবাই ফ্রেস হয়ে স্নান সেরে যখন টিফিন করতে এল, সবাই টিফিন করল কিন্তু রফিকুল মোল-া প্রোগ্রামে ভাত খেয়েই চলেছে। বিকাশবাবু বললেন এই যে মেঘলা ম্যাডাম ইধার আও, আপ তো বড় বড় ডায়ালোগ ঝারতা হ্যায়, লেকিন আপনে ভাত কিউ নেহি খায়া ? মেঘলা বলল প্রতিযোগীতা শেষ হলে আপনার ভাগের ভাতটা খায়েঙ্গে, সামঝা বিকাশবাবু। বিকাশবাবু বিরবির করে কি বললেন তারপর একটু জোরে বললেন ছোটা লেড়কি হুয়া তো কেয়া হুয়া, বাত তো বড় বড় হ্যায়। আসলে খুব ছোটবেলা থেকেই মেঘলা খুব চালাক ও মুখরা কাউকে ছেড়ে কথা

বলে না। সবাই কিছু না কিছু কথা একে অপরের সাথে বলছিল আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল হে ভগবান আমি যেন জিততে পারি। কিন্তু কথা বলছিল না শুধু একজন সে তার নিজের মত টিফিন খেয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে সুজিতবাবু বললেন 'ও ইয়ং ম্যান তুমি কি কথা বলতে পার না ? কাল থেকে এই যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়েছে এতে অংশগ্রহণ করো না হলে পস্তাবে। সুজিত বাবুর কথাতে ফিরে তাকালো নয়ন সরকার (বয়স - ২৮, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, উঁচু লম্বা সুশিক্ষিত পরিমার্জিত) বলল আমি বোবাও নই, কালাও নই তবে আপনাদের বাকবিতন্ডায় শরীরের এনার্জি নষ্ট হয়ে যাবে, আর এনার্জি নষ্ট হলে বেশি ঘুরতে পারব না। সবাই একসাথে অবাক চোখে তাকালো নয়নের দিকে, হঠাৎ করে মেঘলা বলল আপনার এনার্জির জয় হোক, বলে হো হো করে হেসে উঠল।

এরপর সবাই প্রস্তুত হয়ে প্রতিযোগীতার স্থানে আসলো। আর এর মধ্যে সবার টান টান উত্তেজনা শুরু হয়ে গেছে। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে 'সীতারাম জুয়েলার্স' এর মালিক হ্যালো টেসটিং, হ্যালো টেসটিং এই শুনে মেঘলা হাত চেপে বলে উঠল মনে হয় জীবনে কোনদিনও মাইক্রোফোনে কথা বলেনি। মাইক্রোফোন টেস্ট করছে না নিজের গলা টেস্ট করছে সেটাই বোঝা যাচ্ছে বলে মৃদু মৃদু হাসি এই দেখে সবাই হেসে উঠল, শুধুমাত্র নয়ন বাদে। নয়নও হাসতে যাচ্ছিল তাকে বাধা দিয়ে মেঘলা বলল একদম না, একদম হাসবে না, তাহলেই এনার্জি নষ্ট হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে যেন হাসির রোল উঠল। এরকম করে প্রায় পৌনে ৭টা বাজে সবাইকে দিয়ে বন্ড পেপারে সই করানো হল এবং বন্ড পেপারের উক্তি ছিল 'এই প্রতিযোগীতায় অংশ নেবার পর যদি কোন প্রতিযোগীর শারীরিক, মানসিক ও যেকোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল, কঠিনভাবে আক্রান্ত হলেও কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়ী থাকবে না, সব দায়ভার ও নিজ দায়িত্ব প্রতিযোগীর নিজের উপর। সবার কাছ থেকে ফোন নিয়ে নেওয়া হল, যেই না নয়নের কাছ থেকে ফোন নিতে গেছে কর্তৃপক্ষ, অমনি নয়ন বলল আচ্ছা আমি তো ঘুরতে ঘুরতে কথা বলতে পারি এতে আপনাদের অসুবিধা কোথায় ? আর এই কথা যেই না বলেছে অমনি মেঘলা বলে উঠল অসুবিধাটা ওনাদের নয় আপনারি হবে। নয়ন বলল কেন আমার কি অসুবিধা হবে শুনি মেঘলা - এনার্জি নষ্ট হবে বলে আবার সবাই মিলে হেসে উঠল। শুনুন শুনুন নিয়মাবলীতে তো লিখে দেওয়াই আছে ফোন সাথে রাখা যাবে না। নিন আপনার সকলে প্রস্তুত হলে এই গোল দাগটা আছে তার পাশ দিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পরুন। সকলে তাই করল। ঠিক সাতটায় বাঁশি বাজিয়ে ঘোরা শুরু হল পর পর বারোজন অনবরত ঘুরছে। সবার মুখেই হাসি, খুশি মনে হচ্ছে যেন সোনার মানুষ পেয়ে গেছে। প্রথমে রয়েছে মেঘলা, তারপর সবাই আর সবার শেষে নয়ন পড়েছে। ঘোরা শুরু হবার ৬ মিনিট বাদে কর্তৃপক্ষ চলে গেল। হঠাৎ করে মেঘলা তার পিছনের শক্তিধর সামন্তকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল এবং পড়ে গেল শক্তিধর বাবু। এবং পড়ে গিয়ে চেঁচাতে শুরু করেছে 'আমাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে,আমাকে ফেলে দেওয়া বলে মেয়েদের মত হাত নাড়াতে লাগল, হঠাৎ করে কর্তৃপক্ষ ছুটে এলো কি হয়েছে এখানে। মেঘলা দেখুন স্যার হাঁটতে হাঁটতে দুর্বল হয়ে পড়ে গেছে। আর বলে, 'আমাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আমাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।' কেন কাল রাতে আর আজ সকালে কি ভাত, টিফিন কিছুই

খাননি? কর্তৃপক্ষ বলর দেখুন আপনি বসে পড়েছেন আর তার চেয়েও বড় কথা আপনি দাগের বাইরে আছেন অতএব আপনি আউট। না আমাকে এই মেয়েটি ফেলে দিয়েছে বলে শক্তিধর বাবুও মেঘলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। এরপর শক্তিধর বাবুকে তারা জোর করে বের করে দিল। এরকম করে কিছুক্ষণ ঘোরার পর লক্ষ্মী হাজারি (বয়স ৫৫) বলল, 'ডটার তোমাকে বলছি, মেঘলা বলল আমাকে বলছেন বলুন, আবার লক্ষ্মী দেবী বলল, 'ইউ আর মাই ডটার বাট আই অ্যাম নট ইওর মাদার', কি করে সম্ভব? মেঘলা বলল বাংলায় বলেন। লক্ষ্মী দেবী বললেন 'তুমি আমার মেয়ে, কিন্তু আমি তোমার মা নই, এটা কি করে সম্ভব? মেঘলা বলল সম্ভব, কারণ আপনি আমার বাবা হন, যেই না বলেছে যে আপনি আমার বাবা হন ওমনি সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মেঘলা আবার লক্ষ্মীদেবীকে বললেন, 'আচ্ছা বাবা আমার মা কোথায়?' হাসির স্বর যেন আরো উচ্চস্বরে হল। লক্ষ্মীদেবী বললেন এই যে মেয়ে তুমি আমায় যতই রাগিয়ে দেবার চেষ্টা কর না কেন আমি কিছুতেই দাগের বাইরে যাচ্ছি না। আবার সবাই ঘুরতে শুরু করল। এরমধ্যে হঠাৎ করে রফিকুল বলল, এই যে ছেলে, বলে নয়নকে ইশারা করল 'তুমি বলতো এই সোনার মানুষটা কে জিতবে? নয়ন জানিনা কাকু বলে উত্তর দিল। রফিকুল বলল এই সোনার মানুষটা আমিই জিতব কেন জানো কারণ মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে আমি খুবই শক্ত পোক্ত। আবার ঘোরা শুরু। এরমধ্যেই গোপাল নায়েক বলল আমার তো নিজেরই ১০লাখ টাকার চেন আছে, ঘড়ি আছে, তবুও আমি এখানে এসেছি এর কারণ হল আমি ধৈর্য্য ধরে, কষ্ট সহ্য করে কতক্ষণ থাকতে পারি এটা দেখার জন্য। বিকাশবাবু ঘুরতে ঘুরতে বললেন শুনুন সবাই 'আসলি বাত হলো এই সোনা কা যো প্রতিমা হ্যায় না ও মাল চোরি কা হ্যায়, নইলে সোনাকে সাত ঘুম ঘুম করকে যো আদমি লাস্ট রুকেঙ্গে ও আদমি উস সোনা পায়েঙ্গে ,সোনা কা কেয়া দাম কমে গেল ভাইলোক।' মেঘলা বলল - 'ঠিক বলেছেন কাকু, এক কাজ করেন আপনি চুরির মাল না নিয়ে বাড়ি চলে যান'। বিকাশবাবু বলল, 'এই লেড়কি ও তো নেহি হোনে দেঙ্গে, হাম নেহি যায়েঙ্গে ? এই কথোপকথন চলছে আর একের পর এক পর পর ঘুরছে। এইমধ্যে মেঘলা কৃষ্ণ বেরা নামে ভদ্রলোককে আবার এক ল্যাং মেরে ফেলে দিলেন, কৃষ্ণ বেরা একদম দাগের বাইরে গিয়ে পড়ল। সাথে সাথে মেঘলা ডাক দিল এই যে গার্ড এখানে একজন দুর্বল হয়ে পড়ে গেছে এবং আউট হয়ে গেছে। দয়া করে একে সরিয়ে নেবেন। এরপর গার্ড এসে কৃষ্ণ বেরাকে ধরে চলে গেল মাঠের বাইরে। এর দুই মিনিট পর ঘুরতে ঘুরতে নয়ন বলল 'এই ম্যাডাম আপনি ওনাকে ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছেন এবং সেটা আমি দেখেছি'। মেঘলা বলল 'আপনি যদি ওনার জায়গায় থাকতেন তাহলে এতক্ষণ কিন্তু আপনি মাঠের বাইরে থাকতেন। নয়ন বলল, 'হোয়াট ডু ইউ মিন? আপনি কি বলতে চান। আমি ওখানে থাকলে আপনি কি আমাকেও ল্যাং মারতেন? মেঘলা অবশ্যই বলে হাসলো। নয়ন বলল, 'হোয়াট দ্য হেল আর ইউ টকিং'? একদম স্যাটাপ, মেঘলা বলল এত 'যখন ইংরেজি ঝারছেন তাহলে এখানে এসেছেন কেন?' ও বুঝতে পেরেছি বাঙালি তো তাই আলকাতরার লোভ সামলাতে পারেননি।' নয়ন বলল, 'একদম বাজে কথা বলবেন না, আই অ্যাম প্রাউড টু বি বাঙালি'। আস্তে আস্তে বেলা প্রায় ২টো সবার

গলা শুকিয়ে এসেছে। কারো কারো খিদে পাচ্ছে, সর্বোপরি মাথার উপরে রোদের তাপ, যা অসহ্যকর। এরমধ্যে মেঘলা হঠাৎ করে তার পকেট থেকে চোচরা পাতা (বিচুটি পাতা) বের করে সবার অলক্ষ্যে ও সাবধানে, তবুও নয়ন এর নজরকে ফাঁকি দিতে পারেনি। নয়ন বড় বড় চোখ করে একরাশ রাগ নিয়ে মেঘলার দিকে তাকাচ্ছে। আর মেঘলা বিচুটি পাতা দুটি আস্তে করে সুজিত রায় (৩৫) এর জামার কলারের মধ্যে দিয়ে পিঠে ঢুকিয়ে দিল। আর যায় কোথায় একটু বাদেই সুজিতবাবু চুলকোতে চুলকোতে মাটিতে বসে পড়ল। এর মধ্যেই মেঘলা হাঁক দিল এই গার্ড এইমাত্র আমাদের একজন প্রতিযোগী এলার্জি রোগে পড়ে গেছে তাকে বাউন্ডারির বা....... না না সে নিজেই চলে গেছে বলে মাঠের দরজার দিকে তাকালো। তখন দেখা গেল সুজিতবাবু চুলকোতে চুলকোতে দৌড়ে পালাচ্ছেন। ঘোরা চলছে সবাই অল্প ক্লান্তভাব অনুভব করছে। এরমধ্যেই রফিকুল বলে উঠল এই যে মেয়ে আমাদেরকে কিছু খেতে দেবে না? মেঘলা বলল এটা তো খাবারের প্রতিযোগীতা নয়, এটা সোনা জেতার প্রতিযোগীতা, পারলে এই সোনার মানুষকে খেয়ে নিন। আচ্ছা এক কাজ করেন রফিকুল চাচা আপনি বরং জিজ্ঞেস করে আসেন। না হলে জানবেন কি করে? ঠিক বলেছো মেয়ে আমি বরং জিজ্ঞেস করে আসি বলে যেই না এক পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ করে বাঁধা দিয়ে নয়ন বলল, 'এই যে চাচা আপনি কি বোকা? জিজ্ঞেস করতে গেলেই তো আউট হয়ে যাবেন।' হঠাৎ করে রফিকুল চাচা থমকে দাঁড়ালেন। আর বললেন - 'তাই তো '। মেঘলা রেগে গিয়ে বলল, এই যে উনি আউট হলে আপনার কি? আর তাতে আপনারও তো লাভ। বোকা সোকাদের নিয়ে পড়েছি জ্বালায়। রফিকুল এই মেয়ে একদম খারাপ ব্যবহার করবে না বাচ্চা ছেলেটার উপর। তখন থেকে তুমি ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করেই যাচ্ছো। মেঘলা বলল - 'ঠিক বলেছেন চাচা এক কাজ করেন আপনি আর উনি মিলে আমার উপর রাগ করে বাড়ি চলে যান।' এতে নয়নের মাথা নীচু হয়ে গেল। আর মেঘলা বলল - আচ্ছা দেখুন আপনার সাথে আমার ওভাবে কথা বলাটা ঠিক হয়নি। নয়ন বলল - 'ইটস ওকে, সমস্যার কিছু নেই এখন সবাই আমার সাথে এভাবেই কথা বলে, সো আই অ্যাম উইডস টু '। মেঘলা - কেন বলুন তো? নয়ন - আপনি আমার প্রিয়জন নন তাই বলা যাবে না। মেঘলা - 'আসুন আমরা প্রিয়জন হই, আপনার ভালো লাগবে।' নয়ন বলল - আপনি খোঁচা মারা ছাড়া কথা বলতে জানেন না। সমস্যাটা কি? মেঘলা - 'আসলে আপনি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছেন, তাই নাড়তে চাইছেন না। বলে দুজন দুজনের দিকে তাকালো। মেঘলার চোখ রোমান্টিক মুহূর্তে ভরা কিন্তু নয়নের চোখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। হঠাৎ করে সত্যজিৎ চৌধুরী ওয়াশরুম খুঁজতে খুঁজতে দৌড়ে পালাল। নয়ন বলল সত্যি আমাদের ভাগ্যটা বড় ভাল। ঝড় বৃষ্টি নেই। মেঘলা - আপনার তো আরো বেশী ভাগ্য ভাল কারণ আপনি বাড়িতে চলে যান সোনা পেয়ে গেছেন? নয়ন - 'মানে আপনি কি বলছেন? মেঘলা - আমি সোনা পাওয়া মানেই তো আপনার পাওয়া। নয়ন - কেন? মেঘলা - বিকজ ইউ লাভ মি। যান চলে যান। নয়ন বলল - দেখুন এইসব ভালোবাসা টাসা নিয়ে উল্টো পাল্টা কথা বলবেন না, ফুট।' মেঘলা - আপনি এই ফুট শব্দটি বলার সময় ঠোঁট দুটি যেরকম করেন না মাইরি বলছি আমি পাগল হয়ে যাই। রাত প্রায় নটা। সবাই ধীরে ধীরে

একের পিছনে অন্যজন ঘুরেই চলেছে। জল নেই, খাবার নেই, গোপালবাবু বললেন এই গার্ড আমাদের কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর আর তো পারা যাচ্ছে না। গার্ড বলল - 'সরি স্যার; প্রতিযোগীতা শুরু হবার পর কোন খাবার জল আপনি পাবেন না। এটাই নিয়ম, আর যদি একান্তই না পারেন তাহলে লাইন থেকে বেরিয়ে যান। সত্যি সত্যি কথা বলার পর আর গোপাল নায়েক এক সেকেন্ড দেরি করেনি। চলে গেছে মাঠের বাইরে। এরপর শ্যামলবাবু ভাইসব এই সীতারাম জুয়েলার্সের মালিক আমাদের সাথে গেম খেলছে। আসলে এটা ধর্মের পরীক্ষা নয়, ওনার দোকানের মস্ত বড় একটা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। তাই চলুন সবাই আমরা কষ্ট করব আর উনি বিজ্ঞাপন দেবেন তা হতে পারে না আমরা এ অন্যায় সহ্য করবো না। তাই এই প্রতিযোগীতা ছেড়ে সবাই চলে যাই চলুন। চলুন বলে এগোতে গিয়েও আবার সবার সাথে ঘুরতে লাগলেন সোনার মানুষের চারিদিকে। মেঘলা বলল নিজেকে খুব চালাক মনে করেন না। বলে শ্যামলবাবুর দিকে কটমট করে তাকালো। নয়ন বলে বসলো তাতে আপনার কি মেঘলা ম্যাডাম।' মেঘলা বলল - 'তাতে আপনারই লাভ, আপনার বউ মানে আমি গাড়ি পাবো।' নয়ন - দেখুন এইসব উল্টো পাল্টা কথা বলবেন না। মেঘলা - তাহলে সোজাসুজি বলি আমি আপনার বউ। নয়ন এই যে গার্ড এদিকে আসুন বলে খুব জোরে ডাক দিল। সাথে সাথে গার্ড এল। তখন নয়ন মেঘলাকে দেখিয়ে বলল, ইনি হলেন মেঘলা,শুরু থেকে আমাদের সকলকে ডিসটার্ব করছে। গার্ড বলল - পি-জ ম্যাডাম আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করুন, কাউকে বিরক্ত করবেন না। মেঘলা বলল - 'ওকে স্যার।' যেই না গার্ড চলে গেছে অমনি মেঘলা গম্ভীর গলায় নয়নের দিকে তাকিয়ে বলল - 'এই এই আমাদের স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে অন্য কেউ কেন আসবে, সত্যিকারের হলে ডিভোর্স দিয়ে দিতাম। বিকজ ইউ লাভ মি।' নয়ন কি যে করবে, পারলে নিজের মাথার চুল টেনে ছেঁড়ে, ও ফুট।'

রাত বারোটা রফিকুল চাচার পা এক পা পড়ে তো আরেকটা পড়েনা। মাথা নীচু করে থমকে দাঁড়ালেন, আর বুক ফেটে যাচ্ছে, দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কারণ তার কর্মক্ষেত্রে আজ প্রায় বছর কুড়ি হল বন্ধ। মালিক শ্রমিকের ঝগড়ায় কারখানার গেটে তালা, ঘরে তিনটে বড় বড় মেয়ে, কারোরই বিয়ে হয়নি টাকা পয়সার জন্য। সংসার চলছে সবজি বিক্রি করে আর হেম করে। তাই এই প্রতিযোগীতায় আসার আগে অনেক অনেক বড় বড় আশা দেখিয়ে এসেছে বাড়ির সবাইকে, এমনকি সোনার দোকানে টাকা রেডি রাখতে বলেছিল জিতে এসেই সোনা দিয়ে টাকা নেবে আর মেয়েদের বিয়ে দেবে। সবজি বিক্রি করতে গিয়ে মাঝে মাঝে দুপুরে না খেয়ে থাকত তাই তখন অত কষ্ট হত না বলে ভেবেছিল যে এই প্রতিযোগীতায় প্রথম হবে। তাই আস্তে আস্তে হাঁটছে আর বলছে, 'না রে মা পারলাম না বিয়ে দিতে তোদের? আমি যে আর খিদের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না, হাঁটতে পারছি না, তোরা তো আশা করে আছিস আর আমার যে পা চলছে না।' দুগাল বেয়ে চোখের পানি বয়ে চলল রফিকুল চাচার। হঠাৎ কে মেঘলা বলল এই যে নয়নবাবু ঝিমোবেন না তাতে আপনি আউট হয়ে যাবেন। আচ্ছা একটা কথা বলবেন নয়নবাবু। নয়ন বলল বলুন। এই সীতারাম জুয়েলার্সের মালিক একটা বিজ্ঞাপন করছেন এরকম যদি বাস্তব জগতে সব কিছু পাওয়া যেত। নয়ন অবাক হয়ে বলল - মানে? মেঘলা বলল মানে হল এই সোনার

চারিদিকে মিউজিক্যাল চেয়ার খেলার মত ঘুরলে পরে সোনা পাওয়া যাবে, ঠিক তেমনি আপনার চারিদিকে ঘুরে যদি আপনাকে পাওয়া যেত। নয়ন - হোয়াট। নয়ন, আপনাকে না আমার খুব ধন্যবাদ দিতে মনে হচ্ছে কেন জানেন মেঘলা দেবী। মেঘলা - কেন? নয়ন - কারণ এই সময়ে আপনার মতনই একটা লোক দরকার ছিল যে এমন এমন কথা বলবে যে ঝিমুনি কষ্‌টে কেটে গিয়ে এনার্জি এনে দেবে, আর তা আপনি করছেন। মেঘলা বলল তাহলে আরো এনার্জি আনার টিপস শুনবেন? নয়ন বলল - পি-জ বলবেন আগ্রহ সহকারে। মেঘলা - আমাকে আপনি কোলে করে নিয়ে সোনার চারিদিকে ঘুরুন তাতে এনার্জি পাবেন। নয়ন - ও গড মাই ফুট। মেঘলা দেখতে পেলো রফিকুল চাচার আর চলার শক্তি নেই, তাই মেঘলা চিৎকার করে বলল ও চাচা আমাদের মার্কেটে একটা বিরিয়ানির দোকান আছে মটন টা কাচ্চি ঘানি সরষের তেল দিয়ে রাঁধে আর সাথে আলু ও ধনেপাতার চাটনি ও সব শেষে দুই গ-াস কোলড্রিংক্স যখন গলা দিয়ে নামবে তখন মনে হবে স্বর্গের সুখ। রফিকুল চাচা চোখের জল ফেলতে ফেলতে হাঁটু গেরে বসে পড়ল। মাথা প্রায় মাটির সাথে ঠেকে ঠেকে আর মুখে শুধু বলছে 'মারে আমি পারলাম না। খিদের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না। এমন সময় মেঘলা বলল চাচা বিরিয়ানি খাবেন? চাচা বলল একটু জ....ল, এ-ক-টু জ ...... সাথে সাথে ধপাস করে একটা আওয়াজ হল চাচা পড়ে গেল মাটিতে জ্ঞানহীন অবস্থায়। তারপর এক হাত দিয়ে মাঠের ঘাস দু-তিনটে ছিঁড়ে শক্তিহীন অবস্থায় মুখে পুড়তে লাগলো। রাত অনেক হয়েছিল তাই কাছাকাছি গার্ড ছিল না বলে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাচাকে দেখতে লাগলো। সবার চোখে জল গড়িয়ে পড়ছে। নয়ন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। মেঘলা দু-পা এগিয়ে দাঁড়ালো হঠাৎ করে তার দুচোখ থেকে দু ফোঁটা জল পড়ল মাটিতে। ইতিমধ্যে কোথা থেকে গার্ড এসে বাঁশি বাজিয়ে ঘুরতে বলল, সবাই সাথে সাথে চলতে শুরু করল আবার, মেঘলা চেঁচিয়ে আধো আধো গলায় কান্না সহযোগে বলল 'ওনাকে গ-ুকোজ দিন,খাবার দিন।' তারপর নয়নের দিকে তাকিয়ে মেঘলা বলল আসলে উনি এখন আউট তো তা - আ - ই বল - লাম। একটু পরে মেঘলা তার পিছনের লক্ষ্মী দেবীকে দেখে বলল আপনি পারবেন না , এখনও সময় আছে আপনি কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে খাবার খেয়ে নিন। লক্ষ্মীদেবী বলল - না আমি কিছুতেই লাইন থেকে সরে দাঁড়াবো না, দরকার পড়লে তুমি আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়াও। রাত ৩-৩৫ মিনিট, সঞ্জিতের মা বাবা এসে সঞ্জিতকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল বাড়িতে। তার কিছুক্ষণ বাদেই কাঁদতে কাঁদতে বিকাশবাবুর স্ত্রী এসে হাতে পায়ে ধরে নিয়ে চলে গেলেন। লাইনে রয়েছে মাত্র চারজন। প্রথমে মেঘলা, লক্ষ্মী দেবী, শ্যামলবাবু, নয়ন সবার শেষে। হঠাৎ করে শ্যামলবাবু বললেন হায়রে বিধি লোভে পাপ আর পাপ আজ আমাদের মৃত্যুমুখী করে তুলেছে। বলতে বলতে আকাশের দিকে চাতক পাখির মত তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটছে। এই দেখে মেঘলা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, কারণ খুব চালাক, মুখরা হলেও সে একটা নারী যে নালীর হাজার কষ্ট, গর্ভ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলেও চোখের জল কখনোই সহ্য করতে পারে না। তাই অঝোরে কাঁদছে মেঘলা, কাঁদতে কাঁদতে দেখতে পেল তার পিছনে লক্ষ্মীদেবী প্রায় ঝিমটি কেটে পড়ে যাচ্ছিল তাকে ধরতে গিয়ে একহাত দিয়ে ধরে বলল মা, মা, এই কথা শুনে লক্ষ্মীদেবী

চমকে উঠল, ঝিমটি কেটে গেল। সজাগ হয়ে বলল আঃ আঃ শান্তি কতদিন পর মা ডাক শুনলাম পুরো ১৩ বছর ২ মাস ২৪ দিন বাদে, মেঘলা বলল কেন মা? লক্ষ্মীদেবী বলল ১৩ বছর আগে আমার ছেলে আমাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে যায়, মা বাবা যে কত আদরের, কত যত্ন করে মুখের খাবার না খেয়ে ছেলে মেয়েকে খাইয়ে মানুষ করে, বড় করে, তাহলে ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে কেন মা বাবাদের দেখে না এই কথাগুলো লক্ষ্মীদেবী বলছেন আর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। এখন বৃদ্ধাশ্রমে ও আর টাকা পাঠায় না। আশ্রমে ধুপকাঠি, পাঁপড় বানিয়ে নিজের পেটের খাবারের দাম দিন কিন্তু আজ সকাল না খেয়ে থাকতে থাকতে আর পারছি না বলে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। মেঘলা শক্ত করে ধরে লক্ষ্মীদেবীকে বললেন আমারও বাবা - মা নেই আমি অনাথ বলে কেউ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় না,চোখের জল মুছিয়ে দেয় না। লক্ষ্মীদেবী বললেন এই প্রতিযোগীতায় আসার কারণ হল যদি জিততে পারি তাহলে নিজের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আরো আমার মত কয়েকজন মায়ের জীবনের শেষদিনও ব্যবস্থা করে যাবো। কিন্তু .... মেঘলা বলল দাও না মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে, চোখের জল মুছিয়ে, লক্ষ্মীদেবী মা ডাকে আত্মহারা হয়ে, পাগল লাইন টপকে গিয়ে মেঘলার সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, চোখের জল মুছিয়ে দিল। মেঘলা একটু মাথা নীচু করে মুখ তুলে জল ভরা দুচোখ নিয়ে অট্টহাসি হাসতে লাগল। বারবার অনেকক্ষণ হাসি হাসার পর বলল চাচি আপনি লাইন টপকে আসাতে আউট হয়ে গেছেন। হা ..... হা......হা..... চাচি আপনি আউট হয়ে গেছেন। লক্ষ্মীদেবী আধবোজা নয়নে তাকিয়ে মেঘলার গালে সজোরে একটা থাপ্পর মারলো এবং সাথে সাথে জ্ঞানহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেলেন। মেঘলা সাথে সাথে লক্ষ্মীদেবীকে কোলে তুলে নিয়ে সজোরে চিৎকার করলো, কেউ আছেন পি-জ এখানে আসুন এনাকে বাঁচাতে হবে, সাথে সাথে গার্ড এসে লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে গেল। মেঘলা অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। ভোর প্রায় সাড়ে পাঁচটা তখন মেঘলা জোরে চিৎকার করে বলল 'এই যে নয়নবাবু আপনি তো সারাজীবন আমাকে অপরাধী ভাববেন যে আমি সোনা জয়ের আনন্দে পাগল হয়ে গেছি, মনুষত্ব হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু না লক্ষ্মীদেবীর সাথে এই অপরাধ করার কারণ কি জানেন কারণ হল লক্ষ্মীদেবীকে যদি ওভাবে এখান থেকে আউট না করতাম তাহলে উনি হয়তো জীবনের শেষ দিনের উপার্জন করতে গিয়ে জীবনটাই শেষ করে ফেলতো, ওনার বয়স হয়েছে। এই বয়সে না খেয়ে সারা রাত, সারাদিন হাঁটছে এতে ওনার মৃত্যু ছাড়া গতি ছিল না। নয়ন কান্না করছে, মেঘলা কান্না করছে, শ্যামলবাবু শুধু উপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ করে কোন কথা নেই বিদ্যুৎ চমকালো। দু এক ফোঁটা করে অঝোরে বৃষ্টি নামল। শ্যামলবাবু হাঁ করে দু এক ফোঁটা জল জিভে পড়তেই খালি পেটে জলের আস্বাদ পেয়ে জ্ঞান হারালো ও লাইনের বাইরে চলে গেল। এখন লাইনে শুধু মেঘলা আর নয়ন। দুজন মুখোমুখি বসে আছে কেউ হারবে না এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অথচ দুজনেই কান্না করছে হঠাৎ করে মেঘনা বলল নয়নকে, আপনি শিক্ষিত মানুষ ভালো ভালো চাকরি করে এরকম অনেক সোনা কিনতে পারবেন। নয়ন বলল না ম্যাডাম আমি শিক্ষিত হতে পারিনি। গ্রাম থেকে শহরে এসেছি 'ল' নিয়ে পড়তে কিন্তু অর্থনৈতিক ও পরিবেশের চাপে পড়ে আজ

আমি মৃত্যুমুখী। তারপর মেঘলাকে উদ্দেশ্য করে বলল আপনি তো একটা মেয়ে, দেখতে সুন্দরী আপনার ভালো ঘরে বিয়ে হবে ও আপনার স্বামী আপনাকে সোনায় মুড়িয়ে দেবে। মেঘলা কান্না করতে করতে বলল তা কোনদিনই হবে না, জানেন তো আজ অনেকদিন পর কান্না করলাম, কান্না কি জিনিস প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম শক্ত সমাজের পাল-য় পড়ে। নয়ন বলল মেঘলাকে শেষ কবে কেঁদেছিলেন? মেঘলা বলল ২৯ শে আগষ্ট ১৯৯০ সালে, যখন আমার মা মারা যায়। নয়ন আর আপনার বাবা, ও বাবা সে তো কি জিনিস তার স্বাদ আমি পাইনি বলল মেঘলা। দুইজনেই বৃষ্টিতে ভিজজে এরপর মেঘলা লাইন ভেঙে লাইনের বাইরে চলে এল ও নয়নকে বলল এই যে নয়নবাবু জানি না আর আপনার সাথে দেখা হবে কিনা? তবে আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি আর কোনদিনও কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করবো না, পারলে আমায় ক্ষমা করে দেবেন আর আজ আপনি জিতলেন এই প্রতিযোগীতায় কারণ সোনা জেতাটা আপনার দরকার না হলে 'ল' পড়া কমপি-ট হবে না। আর আমার মত অনাথ মেয়ে সমাজে না থাকলেও চলবে। আজ তবে আসি ভালো থাকবেন বলে কিছুটা চলে যেতেই নয়ন হাঁটু গেড়ে বলল মেঘ.....লা আমি তোমায় ভালোবাসি চিৎকার করে বলতে লাগলো। মেঘলা ছুটে গিয়ে নয়নকে জড়িয়ে ধরল। দুজন দুজনকে হৃদয়ে আবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। নয়ন বলল মেঘলা জীবনে বাঁচতে গেলে টাকার সাথে সাথে জীবনের ভালোবাসাকে আজ জিতে নিলাম। প্রচন্ড ধারায় আজ বৃষ্টি দুজনকে ভিজিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিল তোমরা আজ বিজয়ী।

রান্না ঘরে ফোস ফাস

চিত্ত সরকার

রান্না ঘরে ফোস ফাস, এই ঘটনা প্রথমে আবিষ্কার করে তিথি। যুথির ছোট বোন তিথি, মদনপুর ষ্টেশনের পূর্বদিকে বেশ খানিকটা দূরে, একটি গ্রামে তিথি দিদির বাড়ি বেড়াতে এসেছে। শান্তিপুরের মেয়ে যুথি। এই মদনপুরে এক চাষি পরিবারে বিয়ে হয়েছে। যুথির স্বামীর নাম চন্দ্রনাথ মলি-ক। চাঁদু নামেই গ্রামের সবাই ডাকে। ৫ বছরের একটি ছেলে আছে ওদের। মানে তিনজনের সংসার। জমি জমা আছে, চাষের উপরেই নির্ভর করে বেঁচে আছে। সংসারে কখনো একটু আধটু টানাটানি হয় বৈকি, তাই বলে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় এতটা খারাপ অবস্থা নয় ওদের।

তিথি শান্তিপুর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী, কলেজে ছুটি পড়েছে। তাই এই সুযোগে দিদির বাড়ী বেড়াতে এসেছে, ও মাঝেই বেড়াতে আসতো। এবার অনেক দিন পরে এল। চন্দ্র মাঠ থেকে দুপুরে বাড়ী এসে দেখল - তিথি এসেছে। খুশি হয়ে - কখন এসেছো তিথি, খবর সব ভালোতো, হ্যাঁ ভালো, আপনি ভালো আছেন তো জামাইবাবু, এই ভাবে কুশল বিনিময় হল দুজনের।

আমি স্নানটা সেরে আসি, তুমি আমার জন্য ভাত বাড়তে থাকো থালায় - বলে চন্দ্র। উত্তরে তিথি আমার বয়েই গেছে, যে দেবার সেই ভাত বেড়ে দেবে,আমি কাজ করতে আসিনি, বেড়াতে এসেছি বুঝলেন মহাশয়। বুঝলাম তুমি শুধু তিথি নও অতিথিও বটে। আমি বলছিলাম ওহে মহাশয়া শালিকাম তাছাড়া এরপর কাউকে তো খেতে দিতেই হেব, রান্না করতে হবে, তাই এখন থেকে অভ্যেস করো, এই কথাগুলি চন্দ্র তিথিকে বলছিল।

চন্দ্র স্নান সেরে খেতে বসে, এই শুনছো তিথি এবার অনেক দিন পরে এল। কাল সকালে বাজারে গিয়ে মাংস নিয়ে আসব। কিসের মাংস আনি বলোতো, মুরগি না খাঁসি। উত্তরে যুথি - যার উপলক্ষ্যে মাংস আনবে তাকেই জিজ্ঞেস করো, ছেলে বুবাই উঠানে ছিল, মা আমি মাসিকে ডেকে আনি, ঘরে বসে টিভি দেখছে। এসে বলে যাক মুরগি হবে না খাঁসি হবে। এই মাসি তুই মুরগি না খাঁসি, এই কথাটা বারে বারে বলতে বলতে ও মাসিকে ডাকতে গেল,মাসি তুই মুরগি না খাঁসি।

তিথি বুবাইয়ের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে বুবাইকে একটা ধমক দিল যেমন বাপ তেমন ছেলে কেউ কম যায় না, ছড়া বলা হচ্ছে। মাসি তুই মুরগি না খাঁসি, বলি কি - আমি মুরগিও না, খাঁসিও না, মুরগি হবে তোর মা, আর খাঁসি হবে তোর বাপ বুঝলি। যুথি মুখটা ঘুরিয়ে হাসতে লাগলো, চন্দ্র হাসতে হাসতে আরো রাগ করছো কেন শালিকা তুমি তো বুবাইয়ের মালিকা। কাল সকালে বাজারে যাব মাংস আনতে তাই বলছি, ককর কক খাবে না ভেঁ ভেঁ খাবে। যদি মুরগি আনি ঠোকর খেতে হবে, আর যদি খাঁসি আনি তাহলে তোমার গুতো খেতে হবে। এবার তুমিই বলো কোনটা খেতে ভালোবাসো সেটাই আনব, তিথি - মুরগির মাংস বাড়িতে মাঝে মাঝে হয়, খাঁসিটা হয় না। তাই আপনি খাঁসির

মাংস আনবেন, চন্দ্র যুথির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম তিথি তুমি গুতো খেতেই ভালবাসো। উত্তরে তিথি - গুতোতো কেউ কম দিচ্ছেন না, একবার ছেলে গুতোচ্ছে, একবার তার বাপ গুতোচ্ছে, খাঁসিই বা বাদ যাবে কেন।এর গুতোও খেয়ে দেখি। যুথি এবার হো হো করে হেসে উঠল।

পরদিন সকালে চন্দ্র বাজারে চললো। তিথি যুথিকে বোলে বুবাইয়ের হাত ধরে চন্দ্রের পিছু নিল। বাজার হতে প্রয়োজনীয় জিনিসিপত্র কিনে বাড়িতে ফিরে এল তিনজনে। এরপর চন্দ্র মাঠের কাজে বেরিয়ে গেল, দুপুরে ফিরে আসব, যুথিকে বলে গেল তাড়াতাড়ি দুজনে সিলে রান্না করো, আমার আজ তাড়াতাড়ি খিদে পেয়ে যাবে। যুথি তিথিকে সাথে নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকে গেল। বুবাই উঠানে খেলতে লাগল আর মাঝে মাঝে রান্নাঘরে উঁকি মেরে - মা আমার কিন্তু খিদে পেয়ে গেছে।

যুথি রান্না করতে বসে গেল। আর তিথি সহযোগিতা করতে লাগলো। আলু কাটা, মাংস ধুয়ে দেওয়া, পেঁয়াজ, রসুন ছুলে দেওয়া, টুকি টাকি কাজ একদম কম নয়, ভালো ভাবেই চলছে রান্নার পর্ব। যুথি রান্নাঘরের বাইরে গেল অল্প সময়ের জন্য। তিথি আপন মনে কাজ করছে। এমন সময় ফোস ফোস শব্দ। তিথি ভয়ে চমকে উঠল। এতো সাপের ফোস শব্দ। কান খারা করে তিথি হ্যাঁ শব্দটা অবশ্যই সাপের, রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে যায় তিথি।

বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবে তিথি, সাপটা রান্নাঘরে ঢুকলো কখন, কোথা দিয়ে ঢুকলো, কোথায় লুকিয়ে আছে, ওকি কাউকে কামড়াবার জন্য ঢুকেছে। সাপেরা কাঁচা মাংস খায় জানি। তাই বলে খাঁসির মাংসের উপরে এত লোভ, নাকি রান্না করা মাংস চাই। মেয়ে সাপ নাকি পুরুষ সাপ যদি হয় তাহলে তো তিথির রূপ লাবণ্য দেখার জন্য ঢুকেছে। এমনটাও হতে পারে কারণ সুন্দরী মেয়ে দেখলে অনেক পুরুষের মাথা ঠিক থাকে না।

যুথি এসে - কিরে তিথি বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? ভয়ে বাইরে এসেছি, রান্না ঘরে ফোস ফাস, যুথি - কি আবোল তাবোল বলছিস।

তিথি - হ্যাঁরে দিদি, রান্না ঘরে সাপ ঢুকেছে, ফোস ফাস করে করে আমাকে বের করে দিল।

যুথি - কি সাপ ঢুকেছে, কত বড়, তুই ঢুকতে দিলিকেন। আওয়াজটাই শুনেছি।

যুথি একটা লাঠি হাতে ভয়ে ভয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো। এটা দেখছে ওটা দেখছে, লাঠি দিয়ে নেরে চেরে দেখছে, কোথাও সাপ দেখা গেল না, ফোসফাসের কোন শব্দ শোনা গেল না। তিথিকে একটু বকে দিল। ভীতুর ডিম কোথাকার, কিসের শব্দ শুনেছে কে জানে। ভয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। রান্না ঘরে ঢোক অনেক কাজ বাকি আছে। তিথি সাপের ভয়ে ঢুকতে চাইছে না,দিদির ভয়ে ঢুকতে হল। মানে - সাপের ফোস ফাসের চেয়ে দিদির ফোস ফাসে জোর বেশি, এরপর দুইবোনে রান্নার সব কাজ সেরে নিল, আর কোন শব্দ শোনা গেল না।

চন্দ্র মাঠ থেকে এসে যুথির কাছে এই রান্না ঘরে ফোসফাসের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল, তিথির উদ্দেশ্যে। এই বয়সের মেয়েরা এরকম শব্দ শুনেই থাকে, এটা কোন দোষের না। আমার বিয়ের আগে আমিও শুনতে পেতাম। এবার তিথি উত্তর দিল, আমি না হয় ভুলই শুনেছি, দয়া করে এবার আপনি থামুন।

চন্দ্র স্নান সেরে এল। চারজনে মিলে রসিয়ে রসিয়ে ভাত খাওয়ার পর্ব শেষ করে,

হাত ধুতে গেল যুথি, তিথি টিভি দেখতে বসলো। পাশের বাড়ীর শ্বেতা এবার উচ্চ মাধ্যমিক দিল, ও এসে বৌদি ও যুথি বৌদি,যুথি একটু উঁকি দিল, তোমাদের রান্নাঘর থেকে একটু লবণ নিচ্ছি, তেঁতুল খাব, তুই নিয়ে নে। শ্বেতা রান্নাঘরে যায় - লবন নিয়ে বাঁচাও বাঁচাও বৌদি বাঁচাও, বেড়িয়ে আসে। যুথি ও তিথি টিভি ঘর থেকে ছুটে এসেছে। কিরে শ্বেতা কি হয়েছে তোর। চিৎকার করলি কেন? বৌদি গো সাপ, তোমাদের রান্নাঘরে সাপ আর একটু হলে আমায় খেয়েছিল। যুথি রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

যুথি - তুই সাপ দেখেছিস শ্বেতা।

শ্বেতা - না বৌদি আমি সাপ দেখিনি, কিন্তু ফোস ফাস শব্দ শুনেছি, মনে হল ফোস ফাস করে তেড়ে আসছে কামড়াতে।

তিথি - দেখলি তো দিদি, তোরা আমার কথা বিশ্বাস করলি না। আমি বলছি কিছু একটা আছে।

যুথি - তোর জামাইবাবুকে ডাক তো।

তিথি - জামাইবাবু তো নাক দিয়ে মিনি জেনেটার চালিয়ে ঘুমোচ্ছে। নাকের কি মিউজিক, ভর ভর ভর ভর।

যুথি - ঠিক আছে ডাকতে হবে না। আমিই দেখছি। লাঠি হাতে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো, কোথাও সাপ নেই, শব্দও নেই। তিথি ও শ্বেতা দুজনেই আমার কাছে রান্নাঘরে আয়, দুজনে ভয়ে ভয়ে রান্না ঘরে যায়। তিনজনে মিলে ঘুরে ঘুরে সব দেখে কোন শব্দ নেই। তিনজনে বেড়িয়ে আসে, তিনজনেই চিন্তিত।

পরের দিন সকালে চন্দ্র মাঠের কাজে গেল। যুথি বাড়ীর কাজে ব্যস্ত আছে। পাশের বাড়ীর মাসিমা এসে - বৌমা কটা কাঁচালঙ্কা দাওতো, রান্না করতে গিয়ে দেখি একটা লঙ্কাও নেই। কাঁচালঙ্কা রান্না ঘরে আছে আপনি নিজ হাতে নিয়ে নিন মাসিমা বলে যুথি। মাসিমা রান্না ঘরে গিয়ে কাঁচালঙ্কা হাতে নিয়েই চিৎকার বাঁচাও বাঁচাও সাপ সাপ বলতে বলতে বাইরে বেড়িয়ে এল। কি হয়েছে মাসিমা? কোথায় সাপ? আপনি সাপ দেখেছেন মাসিমা ? মাসিমা হাঁপাত হাঁপাতে - না বৌমা সাপ দেখিনি, তবে ফোস ফোস করছিল, মনে হল যেন পায়ের কাছে রয়েছে। যুথি লাঠি নিয়ে আগের মতো সব কিছু দেখলো। কোন সাপ নেই, কোন ফোস ফাসো নেই। পাড়ার ছেলে পিন্টু যাচ্ছিল যুথি তাকে ডাকলো এই পিন্টু আমাদের রান্নাঘরে মনে হয় সাপ ঢুকেছে, তুই একটু দেখতো, পিন্টু লাঠি নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকেছে আর ফোস ফাস শুরু হয়ে গেল। পিন্টু সাবধানে লাঠি দিয়ে সব কিছু নেরে চেরে দেখলো কোথাও সাপ পেল না। বৌদি সাপ তো পেলাম না কিন্তু খুব জোরে জোরে ফোস ফোস করছে।

যুথিকা - তাহলে কি করা যায় বলতো পিন্টু, তুই আমার সাথে রান্নাঘরে আয় দুজনে একসাথে দেখি, দুজন একসাথে রান্না ঘরে গেল। কোন ফোস ফাস শব্দ নেই, বেড়িয়ে এল পিন্টু। খবরটা ছড়িয়ে পড়লো, এক জন এক জন করে ভিড় হলো।

বাড়ীর লোক রান্না ঘরে গেলে কোন শব্দ নেই, অন্য বাড়ীর লোক রান্নাঘরে

ঢুকলেই ফোসফাস শুরু হয়ে যায়। অন্য বাড়ীর লোকেরা কখন এক জন আবার কখন দল বেঁধে রান্না ঘরে ঢুকে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখছে, ফলাফল একই রকম। বাড়ীর মানুষ সাথে থাকলে কোন শব্দ নেই, অন্য বাড়ীর কেউ ঢুকলেই সেই ফোস ফাস শব্দ, কিন্তু কোন সাপ দেখা যাচ্ছে না। তাজ্যব ব্যাপার, এতো ভুতুরে কান্ড। পাড়ার মানুষের ঢল নামলো এই বাড়িতে, চন্দ্র মাঠ থেকে বাড়ীতে এসেছে খবর পেয়ে, সাপের এই ভৌতিক কান্ড এখন অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। পাড়ার সবাই এই নিয়ে আলোচনায় বসল।

কয়েক জন রান্নাঘরের সমস্ত জিনিসপত্র বাইরে বের করে ঘরটাকে পরিষ্কার করে ফেললো। কোথাও সাপ নেই শুধু ফোসফোস শব্দটা রয়েছে। আলোচনায় ঠিক হল যদি ভুতুড়ে কান্ড হয়, তবে ভুত ছাড়ানো ফকিরকে আনতে হবে, আর যদি সাপের কান্ড হয়, তবে সাপ তাড়ানো ওঝাঁ আনতে হবে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না এটা কোন কান্ড। এই কান্ড নিয়ে সবাই লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে।

কেউ বলে ফকির আনো, কেউ বলে ওঁঝা আনো, কেউ বলে দুটোই আনো, এই গেম খেলাটা আজকেই শেষ করতে হবে, পাশের গ্রামে ফকিরের বাড়ী একজন চলে গেল ফকিরকে আনতে, ওঝাঁর বাড়ী অনেক দূরে - দুই জন গেল ওঝাঁকে আনতে। যুথি ও তিথি সবাইকে চা বিস্কুট দিতে থাকে, পাশের বাড়ীতে খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা করালো চন্দ্র। দুপুরে সবাইকে খিচুরি খাওয়াবে।

কিছুক্ষণ পরেই ফকির এসে গেল, এসেই জয় কাপালি বাবার জয়, যা ভেবেছি ঠিক তাই হয়েছে, কি হয়েছে একটু ভালো করে দেখুন ফকির বাবা, কথাটা বললো একজন পর্শি। এই বাড়িতে ভুতের দৃষ্টি পড়েছে, সেই জন্যই অঘটন ঘটছে। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে এক মাইল দূরে একটা তাল গাছ আছে, সেই গাছ থেকেই ভুত দৃষ্টি দিচ্ছে। ফক্টে বলে উঠলো ওটা তাহলে তালোই ভুত হবে, আমার তালোই তাল গাছ থেকে রস বের করে - তালের রস বিক্রি করতো। গুড় বানিয়ে বিক্রি করতো তারপর তালশাস বিক্রি করতো। একদিন তালগাছ থেকে পড়ে গিয়ে পটল তোলে, তারপর থেকে মনে হয় ঐ তাল গাছেই ভাড়া থাকে। অর্থাৎ বলা যায় - তাল গাছের তালোই ভুত। ফকির বলল সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আমিতো এসে গেছি, আপনারা কেউ টেনশন করবেন না।

পটলা বলে, না না আমরা টেনশন করছি না, আপনি যখন এসেছেন তখন ভুতেরাই টেনশনে পড়ে গেছে। একজন পর্শি বলেন, ফকিরবাবা আপনি কাজ শুরু করে দিন। ফকির - জয় কাপালি বাবার জয়, আমি কাপালি বাবার শিষ্য, কড়াল ফকির আমার নাম, কামরূপ কামাক্ষায় ধাম, কাছাকাছি আমার বাস, ভুতপেত্নি সব আমার দাস, এই সব কথা বলতে বলতে রান্না ঘরের চারপাশটা ঘুরে এল, ভাব দেখে মনে হচ্ছে গাঁজা খেয়ে চুর হয়ে আছে, বিরবির করে আরো কত বলল, দক্ষিন দিকে মুখ করে জয় জয় যা - দূরে যা - চন্দ্রর উদ্দেশ্যে বাবুগো আমার কাজ শেষ, দাও পাওনা গন্ডা দাও বাড়ি যাই।

ফক্টে রান্না ঘরে ঢুকে কইগো কড়াল ফকির কি ফিকির করলে সেইতো ফোসফাস করছে, শুনে পটলা ঢুকলো - তাইতো ফোস ফাস রেকডিং তো দিব্যি চলছে, ওহে কাপালির শিষ্য কড়ালি, তোমার তন্ত্র মন্ত্রে কাজ হল না। আসল যন্ত্র রয়েই গেছে, বুঝলে ফকির।

ফকির একটু সময় তো লাগবেই ৫ মিনিটের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে, পাওনা গন্ডা নিয়ে চলে গেল ফকির।

একটু পরে ওঝাঁ এসে গেল। মানুষের মধ্যে একটা গুঞ্জন শোনা গেল। এবার কাজের কাজ হবে, ওঝাঁ রান্নাঘরের চারদিকে ঘুরে দেখে, পিছন দিক থেকে এক মুঠো মাটি এনে নাকে শুকে দেখল ওঝাঁ, সবার জন্য বললেন,রান্না ঘরের ভিটের মাটিতে সাপ আছে। গোখড়ো সাপ। সবার মধ্যে আবার গুঞ্জন শোনা গেল। এখন দুপুর হয়েছে আপনারা খাওয়ার ব্যাপারটা সেরে নিন। এর পর কাজ হবে। ওঝাঁর পরামর্শ মতো খিচুরি খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে নিল চন্দ্র। এখন সামান্য বিশ্রাম সকলের।

বিশ্রাম পর্ব শেষ হল। ওঝাঁ বললেন রান্না ঘরের সমস্ত বেড়া খুলে সরিয়ে দাও। মুলি বাঁশের বেড়া বাঁশের খুটি টালির চাল এই দিয়ে রান্নাঘর তৈরী, ওঝাঁর কথামতো বেড়া খোলা হল। টালি নীচে নামিয়ে দেওয়া হল। চারজন সাহসী যুবককে বলা হল চারটে কোদাল দিয়ে রান্না ঘরের চার দিক দিয়ে মাটি কাটতে কাটতে এগোবে, তবে খুব ধীরে ধীরে সাবধানে। সাপ কোথায় আছে বলা যাচ্ছে না। তবে আছে, তাই বুদ্ধির সাথে কাজটা করতে হবে, ভুল হলেই বিপদ হবে।

চারজনেই পায়ে গামবুট পরে মাটি কাটতে লাগল। সবার কৌতুহল মনে, বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল মাটি কোপানোর দিকে। থেকে থেকে চিৎকার সবার । ঐ যে নড়ে উঠছে, না কিছু না, ঐ যে লেজ দেখা যায়, না না ওটা দড়ি। মাটি কাটতে কাটতে চারজনেই এগিয়েছে। এখন শুধু ঘরের মাঝখানটা বাকি। কখনো ফোস ফাস আওয়াজ, কখনো চুপ। হাঁপিয়ে গেছে চার জনে, একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছে।

রান্নাঘরের পিছনের বেড়া বরাবর নিচের দিকে একটি ইঁদুরের গর্তের মুখ দেখা গেছে। বেড়া থাকাকালীন এটা দেখা যায়নি। ওঝাঁ বললেন যে, সাপ আছে। আমরা প্রায় সাপের কাছাকাছি চলে এসেছি। সবাই সাবধানে থাকুন, ছোটদের দূরে সরিয়ে রাখুন, যেকোন সময়ে সাপ বেড়িয়ে দৌড় দিতে পারে। সামনে যাকে পাবে তাকেই কামড় দেবে মনে হয় গর্তের মধ্যে সাপে ডিম পেরেছে, তাই ওর এতো রাগ, এতো জোরে ফোস ফাস করছে।

আবার মাটি কাটা শুরু হল। এবার দুজনে মাটি কাট শুরু করলো। কেউ কেউ লাঠি নিয়ে তৈরী রইল। সাপ বেরোলেই পিটিয়ে মারবে। এখনো সামান্য বাকি আছে। একজনে মাটি কাটছে, সাপ ভয়ে গুটো সুটো হয়ে আছে। ওঝাঁ টর্চ লাইট দিয়ে গর্তের ভিতর সাপ দেখতে পেল। এবার ওঝাঁ নিজে দু কোদাল মাটি কাটলো, তারপর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সাপটাকে গর্ত থেকে বের করে আনলো। পূর্ণ সাইজের একটি গোখরো সাপ। সবাইকে দেখালো। তারপর ঝাঁপির মধ্যে ঢুকিয়ে লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখলো। যাতে সাপটা কোনভাবে বেড়োতে না পারে। যারা মাটি কেটেছে, তাদেরকে ওঝাঁ বললেন গর্তের ভিতরে সাপের ডিম আছে, ওই ডিমগুলি বের করুন নইলে ঐ ডিম ফুটে বাচ্চা হবে শেষে বিপদ বাড়বে।

ওরা গর্ত থেকে ডিম বের করতে লাগল। কোদালের খোঁচা লেগে কোন কোন ডিম ফেটে গেল। ডিম যেই ফেটে গেল, অমনি সাপের বাচ্চা কিলকিল করে চলতে শুরু

করল। কোনটা আবার ফনা তুলে মাথা উঁচু করে রইল। ওঝাঁ সব ডিম ও বাচ্চা, গোখরো সাপের ঝাঁপিটা খুলে তারমধ্যে রেখে আবার লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল। ওঝাঁ এও জানালো কালকের মধ্যেই সব ডিম ফুটে বাচ্চা বেড়িয়ে আসবে।

একজন পর্শি ওঝাঁর কাছে জানতে চাইল বাড়ীর লোক রান্নাঘরে গেলে কোন ফোস ফাসের শব্দ হতনা, কিন্তু অন্য কেউ গেলে শব্দ হত কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ওঝাঁ জানালো বাড়ীর লোকের শরীরের গন্ধ ও তার হাঁটাচলাতে মাটির কম্পন এই দুটির সাথে সাপের পরিচয় হয়ে যায়, তাই সাপ চুপ থাকতো, অন্য কেউ এলে সাপ ভাবতো যে এ কোন চোর হবে, আমার ডিম চুরি করে নিয়ে যাবে, তাই রেগে গিয়ে জোরে জোরে ফেরস ফাস করে। চোরকে ভয় দেখাতো, ডিম ফোটার আগে বিষয়টার সমাপ্ত হল। এইভাবে রান্না ঘরে ফোস ফাসের গোপনীয়তা সবাই জানতে পারে ও বুঝতে পারে।

চন্দ্র যুথিকে বলল, আমি তিথির উপরে খুশি হয়েছি, সামনে দূর্গাপূজাতে তিথিকে একটা দামী শাড়ি কিনে উপহার দেব, উত্তরে তিথি জানালো দামী শাড়ী চাইনা আমি, সাধারণ মেয়ে আমি, সাধারণ শাড়ি হলেই চরবে, আপনারা শেষ পর্যন্ত আমার কথাটা মেনে রান্নাঘরে ফোসফাসের কথাটা বিশ্বাস করেছেন, এখানেই আমি আমার বড় বা দামী উপহার পেয়ে গেছি, বুবাই কোথা থেকে ছুটে এসে এই মাসি তুই মুরগি নাকি খাঁসি।

বাসাভাড়া ডট্ কম

প্রশান্ত পাল

দেবুর গ্রামের বাড়ি থেকে কলকাতার অফিসের দূরত্ব প্রায় একশো কিমি.। প্রতিদিন বাস ও ট্রেনপথ হয়ে তাকে যাতায়াত করতে হয়। বর্তমানে লোকসংখ্যার তুলনায় যানবাহনের যা অবস্থা তাতে করে একদিন ব্রয়লার মুরগির মতো ঝিমন্ত হলে আরেকদিন বাদুড়ের মতো ঝুলন্ত। এছাড়া যান্ত্রিক ত্রূটি, বিক্ষোভ, অবরোধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসব ঘটনা তেরো পার্বনের মতো লেগেই আছে। এরকম ধকল সহ্য করে বেশ কয়েকবছর চলার পর দেবুর মন এবং দেহ ক্রমশঃ নেতিয়ে যেতে লাগল। বাসাভাড়া নেওয়া ছাড়া চাকরী রক্ষাও অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকল। একদিন বাধ্য হয়েই সহকর্মী আকাশকে সঙ্গে নিয়ে দেবু হাজির হল কলকাতার এক বাড়িওয়ালার সাথে কথা বলতে।

বাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় অফিস, কোথা থেকে আসতে হয়, বেতন কত, বাচ্চা কটি ইত্যাদি। দেবুর এখনও বিবাহ হয়নি একথা শোনামাত্রই আপত্তি জানিয়ে বললেন, ইতিপূর্বে একজন অবিবাহিত যুবককে তিনি ঘর ভাড়া দিয়েছিলেন। কিছুদির পর সে তার বড় মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে। সুতরাং আর কিছুতেই তিনি নেড়ার মত দু'বার বেলতলায় যাবেন না।

সেদিন ট্রেনে হঠাৎ পুরনো বন্ধু শ্যামলের সাথে দেখা হয়ে গেল। কৌতুকপূর্ণ ব্যবহার ও মেয়েলি কন্ঠস্বরে নিমেষেই সে সবাইকে হাসিখুশিতে মাতিয়ে দিল। যাত্রাদলে কাজ করে এখন তার বেশ নাম হয়েছে। দেবু কিছুতেই বাসাভাড়া পাচ্ছে না শুনেই তার হাসির বেলুন চুপসে গেল। চিমড়ে মুখেই সে দৃঢ়তার সাথে বলল, বাসাভাড়ার খবর আমিই দিতে পারব। কয়েকদিন পরেই একটি বাসার সন্ধান পেয়ে দেবু, আকাশ আর শ্যামল তিনজনেই সেখানে হাজির হ'ল।

এই বাড়ির মালকিন একজন বিধবা মহিলা তিনিও দীর্ঘ প্রশ্নোত্তরের পর্ব শেষ করে যখন শুনলেন দেবু অবিবাহিত তখন বললেন, আগে একজন যুবক এখানে থাকতো। অবিবাহিত যুবকটি ইচ্ছেমতো যেকোন বান্ধবী জুটিয়ে ঘরে এনে থাকায় প্রতিবাদ করেছিলাম। সে বলেছিল একা থাকতে ভাল লাগে না। বাইরের লোকের আপত্তি থাকলে আপনিও থাকতে পারেন। ক্লাবের ছেলেরাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং অবিবাহিতকে তিনি কিছুতেই ঘরভাড়া দেবেন না।

এধরণের ব্যর্থতায় তিনবন্ধুই হতাশ হয়ে পড়ল। এ যেন চাকরীর ইন্টারভিউ থেকেও কঠিন। শ্যামল বলল, দশবছর যাত্রাদলে রয়েছি, নাচগান শিখে অসংখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছি, এবার দরকার হলে দেবুর বৌ সেজে দিনের বেলাতেও অভিনয় করব। বাসাভাড়া নিতেই হবে। এটা আমার চ্যালেঞ্জ। আকাশ বলল, ধরা পড়লে মান-সম্মান সব যাবে। দেবু বলল, নকল বৌ সেজে লোক ঠকানো; মাথা খারাপ হ'ল নাকি। শ্যামল বলল মাথা খারাপ হয়েছে বাড়িওয়ালাদের। ওদের ঢপের চপ খাওয়াতেই হবে। আমরা তো

অভিনয় করছি মাত্র , কারো ক্ষতি তো করছি না। সোজা পথটাতো নিজের চোখেই দেখলি এখন চল বরবধূর একটা ছবি তুলে আনি। এরকম জোর করেই দেবুকে নিয়ে ওরা চলল পরিচিত এক স্টুডিওতে।

সপ্তাহ খানিক পর আরেকটি বাড়ির সন্ধান পেয়ে আকাশ আর দেবু নতুন পরিকল্পনায় হাজির হ'ল। বেতন, কর্মস্থল, ঠিকানা ইত্যাদি বুঝে নিয়ে বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতেই স্টুডিওতে তোলা ফটোটি এগিয়ে দিয়ে দেবু বলল, গত সপ্তাহে তোলা হয়েছে আর আকাশ বলে উঠল গত বছরের বিয়ের ছবি। তা শুনে বাড়িওয়ালা সন্দেহপ্রকাশ করতেই আকাশ সামলে নিয়ে বলল একবছর আগের বিয়ের নেগেটিভ গত সপ্তাহে ওয়াশ করা হয়েছে। বেশ ভাল। তা বৌমার নাম কি? দেবুর মুখ থেকে বের হ'ল শ্যামল। তিনি কানের যন্ত্র সামলাতেই আকাশ সামলে নিয়ে বলল, আজ্ঞে শ্যামলী। বেশ ভাল। তোমরা তাহলে সামনের এক তারিখ থেকেই থাকতে পার। সেদিন স্বর্গকে একরকম হাতের মুঠোয় পুরে ওরা প্রস্থান করল।

নাটকীয় জয়ের সুবাদে শ্যামলী ঠিক যেন গৃহবধূ। মেয়েলি গলা আর যাত্রার রেওয়াজ থাকার কারণে খুব একটা অসুবিধা হল না। তবে নিত্য নতুন প্রতিবেশী মহিলারা হাজির হ'তে লাগল। কি রান্না হবে, বাপের বাড়ি কোথায়, শ্বশুরবাড়ি কোথায়, সন্তান নিচ্ছ না কেন ইত্যাদি প্রশ্নে তারা নাজেহাল করে দিতে থাকল। একদিন বাড়িওয়ালার যুবতী মেয়ে এসে বলল, বৌদি কাপড়টা পড়িয়ে দিতে হবে। খেন ব্যস্ত আছি, ভাল পারি না, এসব কোন অজুহাতেই কাজ হ'ল না। অগত্যা লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে ঘেমে নেয়ে একাকার অবস্থা। কতদিন সে তার পুরুষ সত্ত্বাকে আঁচলে ঢাকা দিয়ে রাখবে। দিনে দিনে একঘেয়েমি জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। সব শুনে দেবু বলল সামনের মাসের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বধুর বদলি হচ্ছে। শ্বশুরবাড়ীতে শ্যামলী কিছুদিনের জন্য যাবে, এই খবর প্রকাশ হতেই শুরু হয়ে গেল কবে চেক-আপ করলে, ক'মাস চলছে ?

এদিকে গ্রামের বাড়িতে দেবুর বিবাহের জন্য মেয়ে দেখার পালা চলছে। সুশীলবাবু বললেন এক বন্ধুর মেয়ে আছে সোদপুরে। দেবুর বাবা অরুণবাবু তাকে সঙ্গে নিয়েই মেয়ে ও তার পরিবার দেখে পছন্দ করে ফেললেন। মেয়ের বাবাও বসে না থেকে এক ঘটক পাঠালেন দেবুর অফিসে। ঘটক অলকেশবাবু অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে সন্তুষ্ট হ'লেও বাসা বাড়িতে গিয়ে দেখলেন ঘরে তালা দেওয়া। বাড়িওয়ালা বললেন দেবু স্ত্রীর সাথে কোথাও বেরিয়েছে। মেয়ের বাবা বিশ্বনাথবাবু একথা শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বললেন অবিশ্বাস্য। তখনই ফোনে বন্ধু সুশীলবাবুর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করতেই তিনি বললেন দেবু অবিবাহিত, পরিচিত এবং বিশ্বস্ত। আরেকবার খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন ভেবে ঘনিষ্ট প্রতিবেশী তাপসবাবু আর রাহুলবাবুকে গোপনে অনুরোধ করলেন। তারা গিয়ে দেবুর সাক্ষাৎ প্রার্থী হতেই শ্যামলী ভদ্রভাবে বসতে বলে পাশের ঘরে গেল। টেবিলেই রাখা ছিল বরবধূর ছবি তা ক্যামেরাবন্দি করতেই চা বিস্কুট নিয়ে শ্যামলী হাজির হল। গোপনে কিছু কথাবার্তা রেকর্ডিং করে তারা ফিরে এল বিশ্বনাথবাবুর কাছে।

পরেরদিন এই তিনজনেই সুশীলবাবুর বাড়িতে এসে প্রশ্ন করলেন, দেবু সম্পর্কে

আপনি সবকিছু জানেন তো? উত্তরে তিনি বললেন, যাত্রাদলের সামান্য সহঅভিনেতা থেকে প্রথমে ম্যানেজার হয়েছি। পরবর্তীতে দুটো যাত্রাদলের মালিক হয়েছি। জীবনে অসংখ্য মানুষ ঘেঁটেছি। চেহারা দেখেই বলে দিতে পারি কে কেমন চরিত্রের। দেবুর বাড়ির সাথে আমি খুবই ঘনিষ্ট। এরপর শোনার পর সেই রেকর্ডিং বাজানো হল। তার সাথে বরবধূর ফটোর কপিও তাকে দেখান হ'ল। এসময় বিশ্বনাথবাবু বললেন, এর পরেও কি বলবেন দেবু অবিবাহিত ?

বেশ খানিকটা মর্মাহত হয়ে সুশীলবাবু সেই ফটো দেখতে থাকলেন এবং বারংবার সেই রেকর্ডিং শুনতে থাকলেন। এরপর তিনি রেকর্ডিং যন্ত্রের সুইচ অফ করে গম্ভীর নীরবতায় ডুব দিলেন। ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দ শুধু শোনা যেতে থাকল। একসময় তিনি বলে উঠলেন ছবির বধূটি বেশ পরিচিত মনে হচ্ছে। গলাটাও চেনা চেনা লাগছে। একটু বসুন, বলে তিনি ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটি পুরনো ধুলো মাখা ফটোর অ্যালবাম এনে পাগলের মত পাতা উল্টাতে থাকলেন। হঠাৎ একটি পাতায় থেমে তিনি বললেন, পেয়েছি, সামধান পেয়েছি। ঝুঁকে সেখানে দৃষ্টিপাত করে বিশ্বনাথবাবু বললেন এটাতো যুবক বয়সে সুশীলকুমারের যাত্রার ছবি। তাপসবাবু বললেন, কিন্তু এই পুরনো ছবিতে বর্তমানের শ্যামলীর ছবি এল কোথা থেকে। রাহুলবাবু ভাল করে অ্যালবামটি দেখে বললেন, মনে হচ্ছে ছবিটি শ্যামলীর মতো দেখতে অন্য আরেকজনের। একথা সমর্থন করে সুশীলবাবু বললেন এটা শ্যামলীর ছবি নয়। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে মানব নামে এক যুবক যাত্রাদলে মানসী নামে মহিলার চরিত্রে অভিনয় করত এটা তার ছবি। তার একটি পুত্র সন্তানও ছিল। আমার ধারণা আজকের শ্যামলী তার সন্তান। সবার তো চক্ষু চড়কগাছের মতো অবস্থা, এমন সময় ভিতর থেকে আকাশ বেরিয়ে এসে সুশীলবাবুকে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ বাবা। শ্যামলী আসলে সেই মানস কাকুরই ছেলে শ্যামল। অবিবাহিত দেবুকে কেউ বাসাভাড়া দিচ্ছিল না। শ্যামলকে সেই কারণেই বধূ শ্যামলী সাজতে হয়েছে।

কড়িবরগা

- রবিশংকর সেন

বিশাল অট্টালিকার মাঝে আজও একাকী দাঁড়িয়ে সুবল। সুবল পুরকায়েত। এক সময় এ বাড়ীর সবকিছুর দেখ্ ভালের দায়িত্ব ছিল তারই উপর। সেসব কতদিনকার আগের কথা। তখন সুবলের বয়স বছর পাঁচ ছয় হবে। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বাবা মাধাই পুরকায়েতের হাত ধরে একদিন সে ওঠে এই সাত মহলার অন্দরে। অলক্ষ্যেই যেন রোপিত হয় এক বট বৃক্ষের চারা। রোশনাইয়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ সে এক স্মৃতির বিশাল বটবৃক্ষ। সেদিনের সাতমহলা আজ ধ্বংস্বাবশেষের দোরগোড়ায়। চারিদিক জুড়ে ঝোপজঙ্গল। মহলার গায়ে গায়ে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য গাছ নিজেদের বাঁচাবার তাগিদে বলিষ্ঠ শিকড় দিয়ে চুনবালি ভেদ করে চলেছে। কড়িবরগার ফাঁকে ফাঁকে ঝুলের ফাঁদ। আর আছে অসংখ্য প্রাণীর আনাগোনা। সাপ-খোপ-ইঁদুর-চামচিকে - কে নেই! তারা আজ এই সাতমহলাকে নিজেদের মতো করে যেন ফিরে পেয়েছে। শুধু বাকী ঐ সুবল। সুবলকে তাড়াতেই পারলে যেন জবরদখলটা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু সুবলটা যে যেতেই চায়না। জীবনের সামান্য কিছু মুলধন সঞ্চয় করে আজও যেন সে একা কুম্ভের মতো আগলে রাখতে চায় এই সাতমহলাকে। কিন্তু কতদিন আর। দেখতে দেখতে সময়তো কম পথ পেরিয়ে গেল না। সুবলের শ্বাস প্রশ্বাস বলে, ষাটও হতে পারে, আবার সত্তরও। তবু সুবল আছে। জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে একক লড়াইয়ের অসম পটভূমিকায়।

সুবল কোন কিছুকেই আজ আর ভয় পায় না। ভয় পায় শুধু কড়িবরগার ফাঁকে বাসা বাঁধা একজোড়া ধবধবে সাদা পায়রার বকম বকম ডাকে। চমকে ওঠে সে। খোলা চোখে ভালো করে ঠাওর করার চেষ্টা করে ওদের। ওই সাদা পায়রাগুলো তো আর আজকের নয়। সে যখন এই মহলায় প্রথম আসে তখন থেকেই ওদের ডাক শুনে আসছে। সাতমহলার সব রঙ, সব আওয়াজ পাল্টে গেলেও পাল্টায়নি ওদের রঙ, ওদের আওয়াজ। তাইতো কতদিন ঘুমের মধ্যে ওই ডাক শুনে সে চমকে ওঠে। ভাবে, সেদিনের সাতমহলার রোশনাই আবার বুঝি ফিরে এল। কিন্তু চারপাশে জমাট বেঁধে থাকা অন্ধকার আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, ছুঁচোর কেত্তন ছাড়া আর কিছুই হাতড়ে পায় না সে।

সুবল অশক্ত শরীর, বিধ্বস্ত স্মৃতিকে সরিয়ে রেখে ভাবার চেষ্টা করে সেদিনের সেই সাদা পায়রাদুটো আজও কিভাবে টিকে গেল। ওরা কি কোন সক্ষ-সাক্ষী। নাকি সন্তান-সন্ততির প্রজন্ম পেরিয়ে ওরা সবার অলক্ষ্যে ধরে রেখেছে আবহমানতাকে। আর সুবল! সেও তো টিকে গেছে। আর কতদিনই বা তাকে টিকে থাকতে হবে! তার কি এখান থেকে মুক্তি নেই? এই সাতমহলার অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, ততদিনই কি তাকে দায়বদ্ধতার বোঝা টেনে বেড়াতে হবে!

রুদ্রপ্রতাপ রায়। ফিঙেপুরে জমিদার বংশের এই মানুষটি যখন জমিদারীর দায়িত্ব হাতে পান, তখন জমিদারী প্রথাটি নামেই টিকে আছে। ইংরেজ সরকার সামান্য কিছু

জমিজমা বাদে জমিদারদের জমির বাকী অংশ অধিগ্রহণ করে নিয়েছে। তবুও সেই অস্তমিত জমিদারীর জৌলুষও কিন্তু কিছু কম ছিল না। ষোলো আনা যা বজায় ছিল তা হল আভিজাত্যের আড়ম্বর। কিন্তু রুদ্রপ্রতাপ মানুষটাই ছিলেন অন্যরকম। তিনি ফানুসের মতো হাওয়ায় ভেসে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করেননি। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই ছিল তার জীবনধারা। আর ছিল একটি পরোপকারী মন। নাইবা থাকলো জমিদারী। তবু প্রজারা তো ছিল। তারা তাদের সুখ দুঃখের কথাতো আর ইংরেজদের শোনাতে যাবে না। তারা আসতো তাদের কাছের মানুষ রুদ্রপ্রতাপের কাছে। সুবল প্রথম দর্শনেই সেই মানুষটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু কাছে যাবার সুযোগ হয়নি। তারপর একদিন হঠাৎ করে তার বাপটা মরে গেলে রুদ্রপ্রতাপ তাকে কাছে যেকে নিয়ে বলেছিল, সুবল, তুই আমাকে কথা দে এই বাড়ীর ভালোমন্দের সব ভার তুই নিবি, কোনদিনও এই বাড়ী ছেড়ে যাবি না।

তখন সুবলের বয়স বছর পনেরো। রুদ্রপ্রতাপের কথাগুলো শুনে কেন যে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে তার পায়ে হাত রেখে বলেছিল, দাদাবাবু, আপনাকে কথা দিলাম, এই বাড়ীর ভালোমন্দের সব দায় আজ থেকে আমার। আমি মরার আগে এ বাড়ী ছেড়ে যাব না।

রুদ্রপ্রতাপের একমাত্র মেয়ে মীনা। সুবল ঐ বাড়ীতে আসার পরই মীনার জন্ম। মীনার মা সুলতাদেবীকে সুবল মনিমা বলে ডাকতো। মনিমা ছিল সবারই মা।

এই সাতমহলা বাড়ীতে রুদ্রপ্রতাপের পরিবার ছাড়াও থাকতো তার ভাই রুদ্রনারায়ণের পরিবার। সে জমিদারের মেজাজে চলতো। রুদ্রনারায়ণ বিয়ে করেছিল নাজিরা নামে এক মুসলিম কন্যাকে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র সামাজিক কিছু বাধ্যবাধকতার জন্যই রুদ্রপ্রতাপ তাদের এই মহলার একপ্রান্তে আলাদা করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। রুদ্রনারায়ণ শুধুমাত্র অর্থের লোভেই ধনীর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছিল। রুদ্রনারায়ণ যদি ভালোবেসে নাজিরাকে বিয়ে করত, তাহলে তাকে মন থেকে মেনে নিতে দ্বিধা করতেন না রুদ্রপ্রতাপ। কিন্তু ভাইয়ের চালচলন ও অর্থলিপ্সা তাকে আতঙ্কিত করেছিল। তাই তিনি ওদের একঘরে করে দূরে সরিয়ে রেখে বিপদ থেকে সাবধান হতে চেয়েছিলেন।

মীনার জন্মের কয়েকবছর পর হঠাৎ করেই মনিমা কোন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বিছানা নেয়। তার শরীর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে শুরু করে। এইসময় মনিমা তার মেয়ের দেখভালের দায়িত্ব তুলে দেয় সুবলের হাতে। সুবল ছাড়াও বিন্দিয়া নামক একটি মাঝবয়সী মহিলাই ছিল জমিদার বাড়ীর দাসদাসী মহলের শেষ সলতেটুকু।

মীনার সব দায়িত্ব নেওয়ার সাথে সাথে মীনার কাছ থেকে অনেককিছু শিখেও নিয়েছিল সুবল। তবে সবথেকে ভালো শিখে নিয়েছিল আঁকাটা। মনিমার ইচ্ছে এবং মদতেই সুবল এতকিছু চেনা জানা শেখার সুযোগ পেয়েছিল। শেখার ক্ষেত্রে মীনা ছিল যতটা আনাড়ী, সুবল ততটাই মনোযোগী। তাইতো আঁকার মাস্টার এলে সুবল যেখানে পেনসিল-রঙ তুলিতে ডুবে যেত, সেখানে মীনা হয় পেনসিলের শীষ ভেঙে, নাহলে খাতার পাতার ছিঁড়ে নষ্ট করে, রঙ পেনসিলে হিজিবিজি করে বসে থাকত। তারপর সুবলের জিনিষপত্র নিয়ে টানাটানি শুরু করত। আসলে মীনার আঁকা শেখায় মন না থাকলেও ষোলো আনা

রাগ ছিল সুবলের আঁকা শেখায়। আঁকার মাস্টার পর্যন্ত এক একদিন রেগে গিয়ে মীনাকে জোর বকুনি দিয়ে বলত আমি তোমাকে আঁকা শেখাতে পারব না। তুমি নিজে নিজে যা পার কর। সুবল হেসে বলত, না মাস্টারবাবু দেখবেন মীনা একদিন মস্ত বড় আর্টিস্ট হবে। শুনে মীনার গায়ের চামড়া যেন আরও বেশী চিরবিড় করে জ্বলে উঠত।

মীনা প্রায় দিনই আঁকার মাস্টার চলে গেলে মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করে বলত, মা আঁকার মাস্টার ভালো না। ওকে তুমি তাড়িয়ে দাও। মনিমা তাই শুনে বলত, আহারে, মাস্টার আবার কি অন্যায় করল ! মীনা বলে, ও আমাকে আঁকা শেখায় না। শুধু সুবলদাকে দেখিয়ে দেয়। ভালো ভালো আঁকা সব সুবলদাকে দিয়ে দেয়। মাস্টারটা পচা। মনিমা বলে, হ্যারে সুবল, এতো দেখছি মাস্টারের ভারি অন্যায়। ওকে একটু বকে দিতে হবে। আর তুই-ই বা কেমন ছেলে,মাস্টারকে বলতে পারিস না ওকে একটু ভালো করে শেখাতে।

মনিমার কথা শুনে সুবল দৌড়ে গিয়ে দুটো আঁকার কাগজ নিয়ে আসে। প্রথমে একটা খুলে বলে, মনিমা দেখ, মাস্টারবাবু ওকে এই মানুষটার ছবি আঁকতে দিয়েছিল, আর ও সেটা না করে সারা পৃষ্ঠাটা হিজিবিজি করে ভরিয়ে রেখেছে। তার ওপর রবার ঘষে ঘষে কি করেছে। ধরা পড়ে গিয়ে মীনা ভ্যা করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, মাস্টার যদি মানুষ আঁকা না শিখিয়ে দেয় তবে কেন আমার দোষ হবে ! মনিমা বলে সুবল, মাস্টারকে সামনের দিন আসলে বলে দিবি ও যেন আমাদের মীনাকে হাতে ধরে ঠিক মতো মানুষ আঁকা শিখিয়ে দেয়। নাহলে মাস মাইনে বন্ধ করে দেব।

সুবল বলে, বুড়ো মানুষটার মাস মাইনে বন্ধ করা কি ঠিক হবে মনিমা। মনিমা বলে, কেন মাইনে বন্ধ হবে? সুবল বলে, কারণ মীনা কোনদিনই মানুষ আঁকা শিখতে পারবে না। আর তাহলে মাস্টারবাবুর আর কোনদিন মাইনে হবে না। বলতে বলতে সুবল একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর, ওকেও তাড়িয়ে দাও বলে মীনা মাটিতে বসে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে।

পরদিন আঁকার মাস্টার এলে মীনাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সুবল একা একাই একটা ছবি এঁকে আপন মনে রঙ করতে থাকে। ছবিটা যখন সে প্রায় শেষ করে এনেছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে মীনা এসে সেই ছবিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে , দুহাতে নিয়ে আসা কাদা মাখিয়ে ছবিটার বারোটা বাজিয়ে দেয়। হতভম্ব সুবল কিছু না বলে ছবিটার দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে থাকে। তার কান্ড দেখে মাস্টার ভীষণ রেগেমেগে বলে, এটা কি হল মীনা? মীনা এবার হাতের বাকী কাদাটুকু মাস্টারের গায়ে ছুঁড়ে মেরে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়।

সেদিন সারাদিন আর সুবল মীনার সাথে কথা বলে না। মীনাও জেদ দেখিয়ে দূরে সরে থাকে। বিকেলের দিকে মনিমার শরীরটা আবার খারাপ হলে সুবল ডাক্তারবাবুকে খবর দেয়। ডাক্তার এসে মনিমাকে দেখার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে কিছু ওষুধ লিখে দিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। ডাক্তারের দীর্ঘনিঃশ্বাস কিন্তু সুবলের দৃষ্টি এড়ায় না। সে বাইরে এসে ডাক্তারের পথ আটকে, জোড় হাত করে বলে, ডাক্তারবাবু , আমার মনিমা

ভালো হয়ে যাবে তো? বহুদিনের পারিবারিক ডাক্তার কোনরকমে হাতের পিছন দিয়ে চোখের কোণগুলো সামাল দেয়। তারপর একহাতে সুবলের মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে বলেম এখন আসিরে সুবল। ডাক্তারের চলে যাওয়া পথের দিকে সুবল একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। তার রেখে যাওয়া ইঙ্গিতটি সুবলের বুকের মধ্যে কোথায় যেন আঘাত হানতে থাকে।

রুদ্রপ্রতাপ ছিলেন সহজ সরল মানুষ। তিনি জানতেন যে তার ভাইটি একটি অকম্মার ঢেঁকি। সে দিনরাত খায়দায় আর ফূর্তি করে বেড়ায়। বদ সঙ্গে মিশে টাকা ওড়ায়। কিন্তু আচমকা একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন যে, তার ভাইটি নিতান্তই অকর্মা নয়। অসৎ লোকের পাল-য় পড়ে, তাদের কুমন্ত্রণাতেই আজ রুদ্রনারায়ণের এই পরিণতি। তাকে পথে বসাবার আয়োজন আজ একরকম সাড়া হয়ে গেছে। ওদিকে তার স্ত্রীর আজ যা অবস্থা তাতে পরিণতি একমাত্র যে মৃত্যু, সে বিষয়ে রুদ্রপ্রতাপের মনে কোন সন্দেহ থাকে না। বাকী রইল তার একমাত্র মেয়ে মীনা। কিন্তু অবস্থার ফেরে রুদ্রপ্রতাপ আজ তার আদরের মেয়ের কথাও ভুললেন। শুরু হল তার অধঃপতন। যে মদ তিনি কোনদিনও ছুঁয়েও দেখেননি আজ সেই মদই তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগলো। তার ভালোবাসার প্রজারা রুদ্রপ্রতাপের অধঃপতন দেখতে দেখতে প্রমাদ গুণতে শুরু করল। সেদিন ডাক্তার চলে যাবার পর সুবল এসে বসে তার মনিমার মাথার কাছে। বলে, মা, তোমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব? দেখবে, ভালো লাগবে। মনিমা বলে, তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে দে।

সুবল মনিমার চুলে হাত বোলাতে থাকে আর মনিমা চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে। সুবল দেখে তার মনিমার দুচোখের কোলে জল কাটতে শুরু করেছে। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মনিমা বলে, হ্যাঁরে সুবল, মীনা কইরে ? ওকে তো দেখছি না। সুবল লক্ষ্য করে মীনা ঠিক সেই সময়েই নিঃশব্দে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে সুবল বলে, মনিমা, তোমার কাছে আমার একটা নালিশ আছে।

নালিশ! কার নামে রে? মীনার নামে বুঝি! তা ও আবার কি দুষ্টুমি করল।

সুবল এবার চুপচাপ উঠে গিয়ে লাইট জ্বালিয়ে একটা কাগজ নিয়ে আসে। তারপর সেটাকে মনিমার সামনে খুলে ধরে বলে, এ্যইটা দ্যাখো।

মীনা তখনও দরজায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ছবিতে চোখ পড়তেই মনিমা বলে, একীরে এটা কে করল? মীনার ছবিটা কিন্তু দারুণ হয়েছিল। কে এটাকে এমন বিশ্রীভাবে রঙ ঢেলে, কাদা মাখিয়ে .....

কে আবার। পরশু মীনার জন্মদিন। ওকে উপহার দেব বলে এটা আঁকছিলাম কিন্তু ওই হিংসুটেটা এসে ......

মনিমা এবার দরজার দিকে খেয়াল করে বলে, মীনা এই কাজটা করতে পারলি? তুই এতবড় হিংসুটে হয়ে উঠেছিস।

সুবল লক্ষ্য করে মীনার চোখের কোল বেয়ে বড় বড় ফোটা গড়াতে শুরু করেছে। মীনা কোনরকমে বলে কি করে জানব যে ওটা কার ছবি।

মীনাকে ফোঁপাতে দেখে সুবল তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ওর চোখের কোল নিজের

জামার প্রান্ত দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, না মা, ওর কোন দোষ নেই। ওর জায়গায় থাকলে হয়তো আমি তুমিও এরকম কাজই করতাম। আমি আবার আরও সুন্দর ওর একটা ছবি আঁকব। তাইনারে মীনা ! আয় মীনা, মনিমার মাথার কাছে বসে মা'র মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে। তাহলে দেখবি তোর সব দোষ মাপ হয়ে যাবে।

মীনার জন্মদিনের দিন সকালে দাদাবাবুর খোঁজ করতে গিয়ে সুবল দেখে দাদাবাবু মদ খেতে শুরু করেছে। সুবল বলে, দাদাবাবু, আজ মীনার জন্মদিন। আজ আপনি এসব খারাপ জিনিষ খাবেন না। আজকে আমরা সবাই মিলে একটু আনন্দ করব ঠিক করেছি।

হারামজাদা, যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা। বলি তুই এসেছিস আমাকে জ্ঞান দিতে! চাকর হয়ে মাথায় উঠতে চাস নাকি! ফূর্তি করবে। আমার পয়সায় খাবে আর .... শুয়োর ..... বলতে বলতে ক্ষিপ্ত রুদ্রপ্রতাপ একটা খালি মদের বোতল তুলে নিয়ে সুবলকে লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে মারে। কাঁচের বোতলটা সুবলের মাথায় লেগে ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। পড়ে যেতে যেতে নিজেকে কোনরকমে সামলে নেয় সুবল। অজান্তেই হাত চলে যায় কপালের গভীর ক্ষতটায়, যেখান থেকে দরদর করে ঝরে পড়ছে রক্ত। একটা হাতে কপালের ক্ষতটা চেপে ধরে আরেক হাতে ঝাট দিয়ে বোতলের ভাঙা টুকরোগুলো পরিষ্কার করতে থাকে। হঠাৎ সুবলের ওরকম অবস্থা দেখে মীনা ছুটে এসে বলে, সুবলদাদা তোমার কি হয়েছে? মাথায় কাটলো কি করে? সুবল হেসে বলে, ও কিছুনা একটু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। চলো মনিমার কাছে যাই মনিমা ওষুধ লাগিয়ে দেবে।

সুবলের অবস্থা দেখে মনিমা ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে। পরিস্থিতির চাপে পড়ে লোকটা ... সে নিজে একরকম শয্যাশায়ী। কি করবে তা ভেবে না পেয়ে মনিমা ওষুধের শিশিটা শুধু মীনাকে দেখিয়ে দেয়। ওষুধ লাগানোর পর মীনা নিমেষে তার একটা নতুন ওড়না ফালি করে সুবলের মাথায় ফেট্টি বেধে দেয়। সুবলের জলে ভেজা চোখদুটো নীরবে শুধু বুঝে নিতে চায় যে সবার যেমন সবটুকু ভালো হতে পারে না, তেমনি আবার সবটুকু ভারাপও হতে পারে না। ভালো খারাপ মিলেমিশে তবেইতো মানুষ তৈরী হয়।

মীনার জন্মদিন পালন করার জন্য সুবল নিজের হাতে পায়েস রান্না করে। দাদাবাবুর কাছ থেকে ওরকম ব্যবহার পেয়ে সুবল নিজের জমানো টাকা থেকে মিষ্টি আর ফুল কিনে আনে। মীনার দুচারজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর ইচ্ছা থাকলেও বাড়ীর পরিস্থিতির কথা ভেবে সে চেপে যায়। মীনাই তাকে বারণ করে। বলে, আজ বরং চলো কাকা, কাকিমা আর ভাইকে বলে আসি। আজ আমাদের বাড়ীর যা পরিস্থিতি তাতে আর জাত বেজাতের তফাত কোথায়? রাতারাতি মীনার এই পরিণত বোধ সুবলকে আশ্চর্য করে। পরিস্থিতিই যে মানুষের চিন্তাধারাকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে .... সুবল মুখে বলে, সেই ভালো।

বিকেলে সুবলের আঁকা তার নিজের ছবিটা দেখে মীনা খুব খুশী হয়। বলে, তুমি আমাকে এত সুন্দর করে কবে দেখলে সুবলদা। মীনার কথা শুনে সুবল প্রমাদ গোনে। তাড়াতাড়ি মীনার মুখে হাতচাপা দিয়ে ফিসফিস করে বলে, সব কথা মুখে বলতে নেই মীনা। যে মনের থেকে সুন্দর তার সৌন্দর্য্য আপনিই ফুটে ওঠে। তাকে আলাদা করে সুন্দর করার

দরকার পড়ে না।

মীনা এবার নীচু স্বরে বলে, তোমার এ কথাটা যে ঠিক নয় তা আমি বুঝি সুবলদা। আসলে আমি খুব অকর্মা আর হিংসুটে কিনা, তাই তুমি এমনভাবে ঘুরিয়ে বলছ। সুবল বলে, মীনা, অকম্মা আর হিংসুটেদের মূল্যও কিন্তু এ বাজারে কিছু কম নয়। তারা না থাকলে করিৎকর্মাদের কদর বোঝা যাবে কি করে। সাদার মধ্যে সাদা রঙের কোন মূল্য থাকে না। সাদাকে সব থেকে ভালো ফুটিয়ে তুলতে পারে শুধু কালো। আর হিংসার কথা বলছ! আমিও যদি হিংসুটে না হব, তাহলে মায়ের কাছে তোমার নালিশ করতে যাব কেন?

মীনা বলে, তোমার আরও পড়াশুনা করে বড় হওয়া উচিত সুবলদা। সুবল বলে, যে বড় হবার সে আপনা আপনিই বড় হতে পারে। পড়াশুনাটা শুধু একটা বাহুল্য মাত্র। বাইরের আড়ম্বরটাই কিন্তু সব নয়। পুজোয় ফুল বেলপাতা মন্ত্রতন্ত্রর ঘটার থেকেও অনেকবেশি প্রয়োজন মনের ভক্তি শ্রদ্ধার। ওতেই যে অর্দ্ধেক পুজো সারা হয়ে যায়। বাইরের শুচিতা - অশুচিতা হয়তো সমাজের চোখে বড় হয়ে ধরা দেয় কিন্তু তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে ওঠে মনের শুচিতা - অশুচিতার কাছে। অনেকসময় ভালো কথাও লোকের কাছে বাচালতা মনে হয়। আবার তাদের নিজেদেরই বাচালপনার সময় হুশজ্ঞান থাকে না। মীনা, আমার দেওয়া ছবিটি তোমার কাছে যত্ন করে রেখে দিও। আমার কাছে অনেকবেশী মূল্যবান তোমার নিজের হাতের নষ্ট করে দেওয়া সেই কাদামাখা ছবিখানা। ওটা যে শুধুই আমার। মীনা বলে, তখনতো শুধু ছবিখানা নষ্ট করেছিলাম মাত্র। এবার হাতে পেলে ওটাকে পুড়িয়ে ছাড়ব।

দুটি কিশোর কিশোরীর অসতর্ক কথাবার্তার ফাঁক গলে কখন গোধূলি নেমে আসে। তাকে পাশ কাটিয়ে সুবল ব্যস্ত হয়ে পড়ে ঘরটাকে সাজিয়ে তুলতে। চৌদ্দ বছরে পা দিতে যাওয়া মীনাও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। ওরা মিলে ঘরটাকে সামান্য উপকরণের আড়ম্বরে অসামান্য আন্তরিকতায় সাজিয়ে তোলে। ঘরের মাঝখানে টেবিলের ওপর সাদা কাপড়ের বুকে রেকাবিতে স্তান পায় একটা সুন্দর কেক, যাকে ঘিরে থাকে চৌদ্দটা মোমবাতি।

ঘর গোছানো হয়ে গেলে ওরা মনিমাকে ধরাধরি করে খাটের একপাশে বালিশে হেলান দিয়ে বসিয়ে দেয়। সুবলের কিনে আনা একটা সাদা গাউনে মীনা যেন আরও সুন্দরী হয়ে ওঠে। একসময় কাকাকে ছাড়াই কাকীমা নাজিরা ও ভাই পত্রবকে গুটি গুটি পায় সঙ্কোচে ওদের ঘরের দরজার পাশে দেখা যায়। সুবল ওদের এনে ঘরে বসায়। একে একে হাজির হয় বাড়ীর আর গুটিকয়েক লোক। অনুষ্ঠানের আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ, ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ মনিমা বুকের যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করে। নিমেষে সব আয়োজন পন্ড হয়ে যায়। দৌড়াদৌড়িতে সাজানো টেবিল উল্টে গিয়ে কেক গড়াগড়ি খেতে থাকে মাটিতে। মীনা গিয়ে বসে মায়ের কাছে। সুবল দৌড়ায় ডাক্তার ডাকতে। আর হতভম্ব নাজিরা ছেলে পত্রবকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের এককোণে। সে না পারে এগোতে, না পারে চলে যেতে।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে টলতে টলতে হাজির হয় রুদ্রপ্রতাপও। নেশা জড়ানো

চোখে নাজিরা আর পত্রবকে দেখে তার মাথায় খুন চড়ে যায়। তার বলিষ্ঠ হাতের ফাঁদে আটকা পড়ে পত্রব।

ডাক্তার নিয়ে বাড়ীতে ঢুকতেই সুবল দেখে উন্মত্তের মতো অট্টহাসি করতে করতে ছুটে বেড়াচ্ছে তার দাদাবাবু। আর ঘরের দরজার সামনেই পড়ে আছে পত্রবের নিথর দেহটা। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখে ততক্ষণে আরও একটা শরীর জীবনের মানে হারিয়ে এলিয়ে পড়ে রয়েছে শয্যার উপর। দু'দুটো মৃত্যু সবার চোখের সামনে। অথচ কোনরকম কান্নার টু শব্দটি নেই কোথাও। শুধু ওই একটা উন্মাদ মাতালের অট্টহাসিই ছড়িয়ে পড়ছে সাতমহলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। বুঝতে পারে এই ধ্বংসের মধ্যেই শক্তহাতে হাল ধরতে হবে তাকে। ডাক্তারবাবুকে বিদায় জানিয়ে প্রথমেই সে অন্যদের সাহায্যে পাগল ও খুনী রুদ্রপ্রতাপের হাত পা বেঁধে ফেলে। খাঁচা বন্দী বাঘের মত সুবলের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফুসতে থাকে রুদ্রপ্রতাপ। সুবল শুধু মনে মনে বলে, আমাকে ক্ষমা করো দাদাবাবু।

বাবাকে ওভাবে দড়ি দিয়ে বাঁধতে দেখে মীনা ছুটে এসে সুবলকে বলে, এটা তুমি কী করছ সুবলদা। সুবল বলে, তুমি ঘরে যাও মীনা। আমাকে আমার কাজ করতে দাও। এ বাড়ীর ভালো মন্দের দায় আমার উপর। তাই এ মুহূর্তে এছাড়া আমার অন্য কোন উপায় নেই। এখন তিনি শুধু উন্মাদ নন, খুনীও। ছাড়া পেলে তোমাকে আমাকেও খুন করে বসতে পারে। ওনাকে তাই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ইতিমধ্যে পুলিশ এসে রুদ্রপ্রতাপের সাথে সাথে মনিমা ও পত্রবের দেহদুটি তুলে নিয়ে যায়। সুবল নাজিরার সাথে মীনাকেও পৌঁছে দিয়ে আসে ওর কাকীমার ঘরে।

সেদিনের রাতটা একরকম অস্থিরভাবে পায়চারি করে কাটে সুবলের। সে একা একা কি করবে ভেবে তার কুলকিনারা পায় না। দাদাবাবুকে সে যে কথা দিয়েছিল তা কি করে রাখবে? ইতিমধ্যে রুদ্রনারায়ণ বোধকরি খবর পেয়ে থাকবে। লোভ লালসার এ ভয়ঙ্কর পরিণতি মাথায় নিয়ে রাতের অন্ধকারেই সে বাড়ী ফেরে। সুবল টের পেয়েও মাথা ঘামায় না। হাজার প্রশ্নের উথাল পাথাল স্রোতে ভাসতে ভাসতেই একসময় সে দিনের আলোর সামনে এসে পড়ে। ক্রমে সকাল হয়, সকাল গড়িয়ে দুপুর। এক অসীম নিস্তব্ধতার মাঝ থেকে লোকজন একটু একটু করে গা ঝাড়া দিয়ে স্বাভাবিকতায় ফেরার চেষ্টা করে। কিন্তু সুবল অক্লান্ত। চারদিকে তার তীক্ষ্ণ নজর। বিকেলের দিকে খবর আসে রুদ্রপ্রতাপকে গ্রেফতার করে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে তার মানসিক চিকিৎসার জন্য। পোষ্টমর্টেম হয়ে চলে আসে পত্রব ও মনিমার দেহও। খবর পেয়ে লোকজন জড়ো হতে শুরু করে। এতক্ষণকার নিস্তব্ধতা খান খান করে ওঠে কান্নার রোল। মীনা ও নাজিরা কাকীমার বুক ফাটানো আর্তনাদ যেন শেল বেঁধাতে থাকে সুবলের বুকটাতে। তবুও সুবল এখন অনেকবেশী নিশ্চিন্ত হতে পারে। কারণ বুকের ভেতর চেপে রাখা কান্না যে মানুষের অনেকবেশী ক্ষতি করতে পারে - ক্ষতি করতে পারত মীনা ও নাজিরার।

সেদিন রাতে শবদাহ সেরে ফিরতে ফিরতে আরও একটা দিন এসে হাজির হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে এরমধ্যেই যেন মীনা আরও অনেকটা পরিণত হয়ে ওঠে। সে সুবলকে বলে, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও সুবলদা। দু'দিন ধরে জেগে জেগে অনেক ঝড় সামাল দিয়েছ

তুমি। তোমার কিছু হয়ে গেলে আমাকে কে দেখবে। তুমি যে বাবাকে কথা দিয়েছ।

অশৌচের কাজের পর একসময় শ্রাদ্ধ শান্তির কাজও ভালোভাবে মিটে যায়। এই কাজে সুবল, মীনার সাথে নাজিরা বা রুদ্রনারায়ণের কোনো তফাত রইল না।

পরদিন সকালে রুদ্রনারায়ণ তার ঘরে সুবল ও মীনাকে ডেকে পাঠালেন। মীনাকে বললেন, মীনা ভগবানের দেওয়া এই সাজা আমি মাথা পেতে নিলাম। আমার দেবতুল্য দাদা -বৌদিকে না বুঝতে চেয়ে যে অনাচার-অপরাধ করেছি, যে লোভ লালসার পথে পা বাড়াতে চেয়েছি অন্ধভাবে, সেই অমার্জনীয় অপরাধের যথাযোগ্য সাজাই আমাকে দিলেন ভগবান। শুধু দুঃখ রইল তোদের সবার জন্য। তোরাতো কেউ দোষ করিসনি,তবে কেন এত বড় সাজা পেত হল তোদের। আমি কোনদিন অসুস্থ বৌদির খোঁজ নিইনি, তোদের পাশে গিয়ে দাঁড়াইনি। আমার জন্যই অমন ভালোমানুষ দেবতুল্য দাদা কখন মদ খাওয়া ধরল, মদের নেশায় খুন পর্যন্ত করে বসল তাও টের পেলাম না। টের পেলাম সবকিছু শেষ হয়ে যাবার পর। আমি জানিনা, এরজন্য আমি কার কার কাছে ক্ষমা চাইব। কে আমাকে ক্ষমা করবে! মীনা, তুই পারলে আমাকে ক্ষমা করিস। সুবল, তুইও তো এই বাড়ীরই একজন হয়ে গেছিস, পারলে তুইও আমাকে ক্ষমা করিস।

মীনা বলে, ক্ষমা কর, না করায় আর কি যায় আসে কাকুমণি। তোমাদেরও যেমন কিছু আর রইল না,তেমনি আমারও। এ বাড়ীতে আমার আর মন টিকবে না। আমাকে শহরের কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে এসো। বাবার কি হবে জানিনা। তবুও সে যদি কখনও আবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসার সুযোগ পায়, তখন হয়তো তার দায়িত্বটাও নিতে হবে।

রুদ্রনারায়ণ বলে, আমাদের পক্ষেও আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। পত্রবের স্মৃতি আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে। আমরা দূরে কোথাও নতুনভাবে জীবন শুরু করার চেষ্টা করব। আর অপেক্ষায় থাকব নতুন এক পল-বের।

নাজিরা বলে, কোন অনাথ আশ্রম নয়, মীনা আমাদের সাথে যাবে। কোন নতুন পল-ব এলে তার সাথী হবে। যতদিন না মীনা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, ততদিন আমরাই হব ওর বাবা - মা।

সুবল বলে, আর আমি ! এই বাড়ীটা! রুদ্রনারায়ণ বলে, শুনেছি একদিন এই বাড়ীর ভালমন্দর সব দায় দাদা তোর উপর দিয়ে গেছে। তাই তোকে এখানে থাকতেই হবে। এখানে থেকে যক্ষের মত এই বাড়ী সামলাতে হবে। কিন্তু কতদিন কাকুমণি !

যতদিন না আমরা বা আমাদের বংশের কেউ এখানে ফিরে আসি। তুই বিয়ে থা করে এখানে বংশানুক্রমে অপেক্ষা করবি। এইসব সম্পত্তি আমি তোর নামে লিখে দিয়ে যাব। ফেরত দেওয়া না দেওয়া তোদের মর্জি।

সুবল বলে, তার দরকার হবে না। আমি মরে গেলেও এ ধন যক্ষের মত রক্ষা করে যাব যতদিন না এই পরিবারের কোন বংশধর ফিরে আসে। সে ফিরে এলে তবেই আমি মুক্তি পাব।কাকুমণি, তুমি যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ এটাই আমার কাছে বড় পাওনা। কিন্তু এরজন্য আমাদের অনেকবেশী দাম দিতে হল। তবুও বোধকরি ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই । মীনাকে তোমরা আপন করে নিও। আর হ্যাঁ, যদি কোন পত্রবের খোঁজ

পাও, তাকে কিন্তু আমার কাছে আনতে ভুলো না।

আজ কতগুলো বছর হয়ে গেল। সুবল দিন তারিখ বছরের কোন হিসেব রাখতে পারেনি। শুধু যক্ষের ধনের মত আগলে রাখতে চেয়েছে এই সাতমহলা বাড়ীটাকে। দেখতে দেখতে অনেক কিছু চুরি চামারি হয়ে গেছে। অনেককিছু জবর দখল হয়ে গেছে। ভেঙে পড়েছে সাতমহলার বেশীরভাগ অংশই। তবু সুবল অক্ষত রাখতে পেরেছে দাদাবাবুর ঘরটাকে। প্রতিদিন সে ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে রাখে। বলা যায় না, হঠাৎ করে যদি দাদাবাবু বা অন্য কেউ ফিরে আসে। ফিরে আসলেও ওরা কি সুবলকে আর চিনতে পারবে। সুবলও বোধহয় পারবে না। পঞ্চাশ বছরেরও বেশী হয়ে গেল, সময়টাতো কম নয়। কাকুমণি সুবলকে বলে গিয়েছিল বিয়ে করতে। কিন্তু কাকে? সে তো এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একবারের জন্যও ফিরে এল না। সুবল এখন ঠাঁই নিয়েছে দাদাবাবুরই ঘরের এক অংশে। সেখানে একটা টিনের বাক্সের মধ্যে সযত্নে আগলে রাখা একটা ছবিকে সে যে কতবার শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। রঙ ধেবড়ানো, কাদা মাখা সেই ছবিটার পেছন থেকে কাকে যেন সে খুঁজে বেড়িয়েছে। অথচ নতুন করে আর কোনো ছবিই সে কোনদিন আঁকতে পারেনি। শুধু পায়ের তলা থেকে সময়টা খালি সরে সরে গেছে। এখন সেই ছবিটা আর তার চোখে আগের মত স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। শুধু চারধারের আগা ছাড়া যেন ধীরে ধীরে সবকিছু গ্রাস করে নিতে চায়। ঝোপজঙ্গলের মাঝে সাতমহলার শেষ চিহ্ন এখন দাদাবাবুর ঘরখানাই। আগাছাদের শেকড়ের স্পর্ধায় একটু একটু করে ফুটিফাটা হয়ে মাটির বুকে লুটিয়ে পড়েছে বাকী অংশ। অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে সুবল শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে, কিছু করতে পারেনি। দাদাবাবুর মহলাও আজ শেষের অপেক্ষায়। একপাশে কোনরকমে টিকে থাকা কড়িবরগার উপর চাদের অংশটাই সুবলের আস্তানা। আর ওরই ফাঁকে ফাঁকে আজও ডেকে চলা একজোড়া সাদা পায়রা। ওরাই যেন সমস্ত ধ্বংসের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে এক অমলিন প্রেমের স্মৃতি।

সেবার বন্যার জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল সাতমহলার শেষ আচ্ছাদনটুকুও। হারিয়ে গেল সুবল। হারিয়ে গেল রঙ ধেবড়ানো, কাদামাখা এক জীবনের ছবি। কড়িবরগার ফাঁদে পড়ে হারিয়ে গেল একটা সাদা পায়রাও। আরেকটা একচোখ শূন্যতা নিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল চারপাশে।

ফোনি - ফানি - ফোন

পাপিয়া মলি-ক

ইদানিং আর 'মনে মনে', 'মুখোমুখি', 'কানাকানি' এগুলো আর হয় না। তার বদলে 'ফোনাফোনি' সবসময়, যখনতখন। দারুণ জম্পেশ একটা যন্ত্র বটে ! খানিকটা phoney , আবার অনেকটা funny। ফোনেই আজকাল বিজয়ার প্রণাম, নববর্ষের শুভেচ্ছা, কেউ মারা গেলে খবর দেওয়া, প্রত্যুত্তরে শোকবার্তা, জন্মদিনের শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ আর অফিসে বসেও বাড়ির মাসকাবারির মুদি দোকানের তালিকা আর গোপন সংগোপন প্রেমালাপও বাদ যায়না।

মাঝে মাঝেই আবার এই ফোনের মাধ্যমেই বড় ছোট মাঝারি অপরাধীদেরও ধরা যায়, এই মোবাইলের কললিস্ট চেক করে। একটা ছোট্ট যন্ত্রে এতরকম সুযোগ সুবিধা ! তবে ঢের বেশি আছে ফানি ব্যাপার। আছে টিভি, সিনেমা,কম্পিউটার, ইন্টারনেট,ক্যামেরা, দেশ বিদেশের নানান রকম গেম্ কত কী-ই না তার মধ্যে বন্দি। দক্ষিণাটি অবশ্য সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী।

আমার এক বিশেষ বন্ধু এতদিন ধরে ভেবে এসেছে, কোনরকমেই সে 'মোবাইল' ব্যবহার করবে না। কিন্তু কাঁহাতক আর ল্যান্ডফোনের বাঁদরামি সহ্য করা যায়। ল্যান্ডফোনটি নিয়ে তার বেশ একটা গর্বও ছিল। সেই ল্যান্ডফোনের গন্ডগোল সারাতে তার শেষপর্যন্ত মোবাইলটি কিনতেই হলো। সে নাকি তার বি.এস.এন.এল-এর ল্যান্ডফোনটি খারাপ হয়েছে বলে এক্সচেঞ্জে কমপে-ইন লেখাতে গেছিল। সেখানে গিয়ে তার বেইজ্জতের একশেষ। কমপে-ইন লেখানোর সাথে সাথে কর্মচারীটি প্রথমেই তার মোবাইল নাম্বারটি চাইলেন। বন্ধুটি তো অবাক। আর তার মোবাইল নেই শুনে কর্মচারীসহ আরো যারা ওখানে ছিলেন, সব্বাই ধাঁ করে বন্ধুর দিকে ঘুরে গেলেন। যেন এক 'আজব চিড়িয়া' দেখছেন। মোবাইল নেই? এ কে রে? কোন শতাব্দীর? অশোকের আমলের নাকি? এর তো এক্সপায়রি ডেট'ও পেরিয়ে গেছে। মিটিং ডেকে ফুলের মালা গলায় দিয়ে মঞ্চে তুলতে হবে রে ! চারিদিক থেকে নানারকম সরস মন্তব্য ছুটে ছুটে আসতে লাগল। ফাউ হিসাবে সাথে গা - জ্বালানো হাসির ছর-রা। কে জানত এক ফোনের কমপে-ইন লেখাতে আর এক ফোন লাগবে ! তার ওপর লাইনে দাঁড়ানো একজন অযাচিত শুভানুধ্যায়ী বলে উঠলেন - "দাদা, মোবাইলটি লাগবেই। ওরা যে ডকেট নাম্বারটা দেবে, সেটা আপনার মোবাইলে মেসেজ যাবে, কমপে-ইন নাম্বারও পেয়ে যাবেন, রেফারেন্সের জন্য লাগবে, বুঝলেন। যান যান আগে একটা মোবাইল কিনে ফেলুন, কত আর দাম! শুধু শুধু সময় নষ্ট করবে না। সবারই সময়ের মূল্য আছে। যত্ত সব।" বন্ধুবর অবাক হয়ে নাকাল হয়ে লাইনের থেকে সরে দাঁড়াল। তারপর পাবলিক বুথ থেকে সরাসরি অফিসে আমার ফোনে কাতরোক্তি - "এখন-ই অফিস থেকে বেড়ো" - তারপর একটা রাস্তার নাম করে বলল, "আমি এখানে তোর জন্য অপেক্ষা করছি, এক্ষুনি আয়। জীবন-মরণ সমস্যা।" আমি কোনরকমে কাজের দায়ভার একজনের কাঁধে চাপিয়ে

বন্ধু উদ্ধারে বেরিয়ে পড়লাম। যথাস্থানে গিয়ে দেখি বন্ধু উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে আমাকে খোঁজার ব্যাকুল চেষ্টা চালাচ্ছে, অর্থাৎ আমি যে কোনদিক থেকে আসবো তা ঠাওর করতে পারছে না। বুঝলাম। আমাকে দেখতে পেয়েই যতটা speed-এ পারে সব বলে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম - 'কি করতে চাস তবে? সে একেবারে ডাকাতিয়া ভঙ্গিতে বলে উঠল - "বুঝতে পারছিস না রাস্কেল এখনই আমাকে কোন ফোনের দোকানে নিয়ে চল, এক্ষুনি আমার ফোন চাই, শালা যার যা খুশি তাই বলে গেল?বলে কিনা অশোকের আমলের লোক, এক্সপায়রি ডেট পেরিয়ে গেছে! সহ্য হয় এসব কথা ? তার ওপর আবার হনুমানের মতে দাঁত ক্যালানো চারিদিক থেকে ? চল চল আর দেরি করিস না।'

অবশেষে মোবাইল কেনা হল। তবে একটা বড়লোকি ফোন নয়, কাজ চলার মতো একটা বেস্ মডেল। সিম্ ফিম্ ভরে দু-দিন পর থেকে চালু বন্ধ বরের নতুন মোবাইলটি। সত্যিই একটা ছোট্ট যন্ত্রের কি সাংঘাতিক বনেদিয়ানা। অফিসের বস্ থেকে রিক্সার ড্রাইভার, নায়িকা থেকে বড়লোকের বাড়ির রান্নার চাকরি করার মহিলাটির হাতেও ঐ যন্ত্রটি দৃশ্যমান।

মোবাইল দুনিয়াটাকে বেশ ছোট করে ফেলেছে সন্দেহ নেই। কোরিয়া থেকে করিমপুর, বন্ থেকে বনগাঁ, রোম থেকে রসুল-্যাপুর, ইটালী থেকে ইটাহার যেখান থেকে খুশি সেখানেই কথা বলা যায়। তবে সামান্য মুশকিল হয়েছে অপরাধীদের। এই প্রলোভন ত্যাগ করতে না পারায় বেশিরবাগই ধরা পড়েছে। কি বাজে ব্যাপার বলুন তো।

তবে একটা খুব সু-অভ্যাসের বিপ-ব এনে দিয়েছে এই মোবাইল। সেটা একাগ্রতা, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মদের।

প্রসঙ্গ যখন উঠলই তখন কিছু চাক্ষুস ঘটনার উলে-খ করতেই হয়।

১ম ঘটনা একটি সুবেশা সুন্দরী তরুণী স্কুটি চালাতে চালাতে হেলানো মাথা, কারণ কানে ঐ ফোন যন্ত্রটি। হাসছে, সুন্দর দাঁতের সারি স্পষ্ট, মাথা ঝাঁকানো, কথা সবই চলছে। হঠাৎ একজন বয়স্ক মানুষের সাইকেলের পেছনে বেশ মোক্ষম একটি ধাক্কা। মানুষটি সাইকেল থেকে পড়ে গেলেন, সবাই হৈ চৈ করে তাঁর কাছে পৌঁছে তাকে তুলে পাশের দোকানে বসিয়ে কোথায় কোথায় লেগেছে দেখে জল টল দেওয়া হলো। ভদ্রলোকের হাঁটুটা কেটেছে বেশ খানিকটা। তাকে পাশের ওষুধের দোকান থেকে ফার্স্ট এড দিয়ে আনা হলো। তার মধ্যে কয়েকজন ঘিরে ধরেছে সুন্দরীকে। স্কুটি থেমে গেছে,তাকে ঘিরে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে গেছে - যা হয় আর কি ! মেয়েদের'ত গায়ে হাত দেওয়া যায় না, তবে মুখে যতটা পারা যায় আর কি বেশ হম্বিতম্বি চলছে - আশ্চর্য্য দৃশ্য - তখনো মেয়েটির কানে ফোন, মুখে দারুণ হাসি! একজন কান থেকে ফোনটি নেওয়ার পর দেবদূতির মতো মুখে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল - "কি ব্যাপার? ফোনটা নিলেন কেন, সকাল বেলা এভাবে" - তাকে থামিয়ে কয়েকজন বলল, "একজন বয়স্ক মানুষকে সাইকেল শুদ্ধু ফেলে দিয়ে দ্যায়লা হচ্ছে? অবাক চোখে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, এমা তাই? আগে বলবেন'ত ? কোথায় উনি? ভাবুন - কি কঠোর একাগ্রতা ! তার ফোনালাপে বা প্রেমালাপে এতটুকু ছেদ পরেনি এতবড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও। অহো, কি অপূর্ব মহিমা।

আর একটি কথোপকথন - বাসের মধ্যে শোনার অসুবিধার জন্য লাউডস্পিকারে

কথা হচ্ছে - " বাসযাত্রী — আর কেমন আছি! জীবনটা শালা, হেল করে দিল মা আর মেয়ে ! নেপথ্যকণ্ঠ — কি হলো টা কি, খুলে বল না। বাসযাত্রী — আরে মা মেয়ের বায়নার শেষ নেই , কোন শাড়ি নতুন এসেছে বাজারে, এর সাথে কি গয়না যাবে, ফ্রিজটা একদম মিটসেফের মতো হয়ে গেছে, নতুন কেন,এক একদিন এক এক বায়না, বুঝলি ? ধার করে শোধ দিয়ে হাতে থাকে মাসে পনেরো। এই টাকা হাতে দিতে গেলে ঘরটা আর ঘর থাকবে, রণাঙ্গন হয়ে যাবে না ? নেপথ্য - শালা পেছনে লাথি মেরে আগে বুড়িটাতে তাড়া। বাসযাত্রী — কি করে তাড়াব, থাকিত বুড়ির বাড়িতেই। নেপথ্য — তবে আর কি তাক পরে পাঁকে। বাসযাত্রী — ভাবছি, আজ শালা মাল খেয়ে হেব্বী বাওয়ালি করব বাড়ি ফিরে। আসবি নাকি ঠেকে ?"

এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে সব তো আর লেখা যায় না। দুটো একটাই চলে। তবে কয়েকটা সপক্ষে আর বিপক্ষের যুক্তি দেওয়াই যায়। কি বলেন!

বিপক্ষ —মোবাইল ব্যবহার যত কম করা যায় ততই ভালো। দরকারী কথাটুকু যত সংক্ষিপ্ত হয় তাই করা উচিত। যার সাথে সবসময় দেখা হচ্ছে তাকে নাই বা ফোন করলাম। ফোনে ভুল বোঝাবোঝি বেশি হয়, কারণ দুপক্ষেরই অভিব্যক্তি দেখা যায় না।

ফোনের ব্যবহার আমাদের অসামাজিক করে তুলেছে। ফোনে বেশি ক্ষণ কথা বললে শরীরের ক্ষতি হয়। অতি সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত হবেষকগণ গবেষণা করে জানতে পেরেছেন ফোন থেকে যেকোন মারণব্যাধি অনায়াসেই শরীরে প্রবেশ করতে পারে। মস্তিস্ক এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।

সপক্ষ — ঘড়ি পড়ার দরকার নেই। অন্ধকারে টর্চের আলাদা করে প্রয়োজন নেই। যেকোন সামাজিকতা রক্ষায় খরচ এবং সময় দুই-ই বাঁচে। যত খুশি 'সেলফি' তোলা যায়। ক্যালকুলেটর কেনার প্রয়োজন নেই। অ্যালার্ম ঘড়ির দরকার নেই। ইন্টারনেট থেকে যেকোন জটিল তথ্য বা ইনফো চটপট দেখে নেওয়া যায়। চাকদার লেভেল ক্রশিং পার হতে হতে অনায়াসে পাওনাদারকে বলা যায়, আজ আসবেন না দাদা, আমি ধর্মতলায়, শুনতে পাচ্ছেন না কেমন গাড়ির আওয়াজ। তারপর রয়েছে, গেম, চ্যাটিং, ফেসবুক মেসেজ, নানারকম বিনোদনমূলক ছবি আর ট্রেনে বাসে উঠে কানে হেডফোন গুজে নিজের পছন্দমতো যা খুশি তা শোনা। আর এ বাজারে একটা মোবাইল না থাকলে স্টেটাস থাকে নাকি ?

একটি বিদেশী সংস্থার প্রচারিত খবরটি লিখে শেষ করব — হেডলাইন - ভারতে শৌচাগারের থেকে অনেক বেশি মোবাইলের সংখ্যা - কার্টুন ছবি নীচে - একটি লোক উবু হয়ে রেললাইনে বসে প্রাতঃকৃত্য সারছে মোবাইলে কথা বলতে বলতে ......

সত্যি সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ !